

দুই বাংলার যুক্তিবাদীদের চোখে ধর্ম

প্রবীর ঘোষ ও ওয়াহিদ রেজা



দুই বাংলার
যুক্তিবাদীদের চোখে ধর্ম

দুই বাংলার যুক্তিবাদীদের চোখে ধর্ম

যুক্তিবাদীদের চোখে ধর্ম

সম্পাদনা
প্রবীর ঘোষ
ওয়াহিদ রেজা



দে'জ পাবলিশিং ॥ কলকাতা ৭০০ ০৭৩

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

DUI BANGLAR UKTIBADIDER CHOKHE DHARMA
Edited by PRABIR GHOSH & OYAHIDH REJA
Published by Sudhangshu Sekhar Dey, Dey's Publishing
13 Bankim Chatterjee Street, Kolkata 700 073
Phone : 2241-2330/2219-7920 Fax : (033) 2219-2041
e-mail : deyspublishing@hotmail.com
Rs. 150.00

ISBN 81-7612-831-7

প্রথম প্রকাশ : কলকাতা পুস্তকমেলা, জানুয়ারি ২০০২, মাঘ ১৪০৮
দ্বিতীয় সংস্করণ : মে ২০১০, জ্যৈষ্ঠ ১৪১৭

প্রচ্ছদ : প্রবীর সামন্ত

১৫০ টাকা

সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশেরই কোনওরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনও যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনও মাধ্যম, যেমন ফোটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য সঞ্চয় করে রাখার কোনও পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনও ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

প্রকাশক : সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং

১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

বর্ণ-সংস্থাপনা : দিলীপ দে, লেজার অ্যান্ড গ্রাফিকস্

১৫৭বি মসজিদবাড়ি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০০৬

মুদ্রক : সুভাষচন্দ্র দে, বিসিডি অফসেট

১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উৎসর্গ
ডঃ আহমদ শরীফ
বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ যুক্তিবাদীর স্মৃতিকে শ্রদ্ধা

প্রবীর ঘোষের অন্যান্য বই

আমি কেন ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না
অলৌকিক নয়, লৌকিক (১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ)
সংস্কৃতি : সংঘর্ষ ও নির্মাণ
যুক্তিবাদের চোখে নারী-মুক্তি
পিংকি ও অলৌকিকবাবা
অলৌকিক রহস্যজালে পিংকি
অলৌকিক রহস্য সন্ধানে পিংকি
বিশ্ব কুইজ
ধর্ম-সেবা-সম্মোহন
যুক্তিবাদীর চ্যালেঞ্জাররা
প্রবাদ-সংস্কার-কুসংস্কার
স্বাধীনতার পরে ভারতের জলন্ত সমস্যা
অলৌকিক দৃষ্টি রহস্য

সূচিপত্র

কিছু কথা / ৯

প্রথম অধ্যায়

নাস্তিকের ধর্মচিন্তা / আহমদ শরীফ / ১৩

মানুষের জন্য ধর্ম, না ধর্মের জন্য মানুষ / কবীর চৌধুরী / ১৬

মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িক শক্তিবৃদ্ধির রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত / বদরুদ্দীন উমর / ২০

মানবাত্মা কান্দে ধর্মের প্রহারে / হায়াৎ মামুদ / ৩০

ধর্মরাষ্ট্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও রাষ্ট্রধর্ম / আনিসুজ্জামান / ৩৫

আমার চোখে ধর্ম / বেবী ইসলাম / ৫০

ধর্ম ও সংস্কৃতি / বুলবুল ওসমান / ৫৩

মূল স্রোতে ধাবমান / নূরুর রহমান / ৫৯

বিরুদ্ধ স্রোতের যাত্রী / সৈকত চৌধুরী / ৬৮

ধর্মচেতনা ও ঈশ্বরবিশ্বাস / ওয়াহিদ রেজা / ৭৭

দ্বিতীয় অধ্যায়

সরস্বতী ও শিক্ষা / সুকুমারী ভট্টাচার্য / ৯৯

ধর্ম, নাস্তিক্য ও মানবতন্ত্র / শিবনারায়ণ রায় / ১২৩

শিক্ষা, সংস্কৃতি ও মৌলবাদ / পবিত্র সরকার / ১৪৩

সভ্যতার বিবর্তনে ধর্ম / জয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায় / ১৫৭

বিজ্ঞানমনস্কতা আধুনিক জীবনে অপরিহার্য / ডঃ তারকমোহন দাস / ১৭০

ধর্ম ও ভারতবর্ষ : আদি-পর্বের রূপরেখা / পল্লব সেনগুপ্ত / ১৮৩

ধর্ম, যেখানে 'তলোয়ার পৌছয় না' / জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায় / ১৯৮

ধর্মের অনুপ্রবেশ : এশিয়ায় আস্তঃরাষ্ট্র সম্পর্কের রদবদল / রাধারমণ চক্রবর্তী / ২১৭
ভাষা, চৈতন্য ও চিন্তাদর্শনের প্রাকযুগ / অসিত চক্রবর্তী / ২২৯
বামিয়ান ও তালিবান, হিন্দু-তালিবান... / গৌতম রায় / ২৩৭
অনীশ সংস্কৃতি—আধুনিক জীবনের অপরিহার্য সংস্কৃতি / সমীরণ মজুমদার / ২৪৫
ধর্ম ও নারী / কৃষ্ণা বসু / ২৬০
পুনর্বীর সীতা / দেবু দত্তগুপ্ত / ২৭১
মানুষের ধর্ম—মানবতা / সুমিত্রা পদ্মনাভন / ২৮০
ধর্মনিরপেক্ষতার মুখ ও মুখোশ / প্রবীর ঘোষ / ২৮৯

কিছু কথা

“‘ধর্ম’ মানে উপাসনা, ধ্যান, যোগ, তন্ত্র
‘ধর্ম’ মানে ব্রহ্মাণ্ডের খোঁজ দেহভাণ্ডে
‘ধর্ম’ মানে সৃষ্টিহীন অলস জীবন
‘ধর্ম’ মানে মদ, মৈথুন, পঞ্চমকার
‘ধর্ম’ মানে বলির রক্তে একটা সাগর
‘ধর্ম’ মানে মনুর বিধান
‘ধর্ম’ মানে জাত-পাতের ধূর্ত শেয়াল
‘ধর্ম’ মানে দলিত রক্ত, আঙুন ইতস্তত
‘ধর্ম’ মানে দেব-জ্ঞানে পতি সেবা
‘ধর্ম’ মানে ধনং দেহি, যশঃ দেহি, লোভী প্রার্থনা
‘ধর্ম’ মানে গীর্জায় মোম
‘ধর্ম’ মানে বাইবেলের স্বপ্নচারী গল্পমালা
‘ধর্ম’ মানে আদম-ইভের আকাশকুসুম
‘ধর্ম’ মানে বিবর্তনবাদ নিপাত যাক
‘ধর্ম’ মানে পাপ থেকে রোগ
‘ধর্ম’ মানে কোরান আল্লাহর আসমানী বাণী
‘ধর্ম’ মানে নামাজ, রোজা
‘ধর্ম’ মানে শরিয়তি আইন
‘ধর্ম’ মানে চারটে বউ
‘ধর্ম’ মানে স্ত্রী তোমার শয্যক্ষেত্র
‘ধর্ম’ মানে পুরুষ তুমি ইচ্ছে মত লাঙল ঠেল
‘ধর্ম’ মানে বোরখা ঢাকা অন্ধকার
‘ধর্ম’ মানে ‘খৎনা’ প্রথার লজ্জা ব্যথা
‘ধর্ম’ মানে বেহেস্তের বেশ্যাখানার ইস্তাহার
‘ধর্ম’ মানে পাপের পথকে পথ বলে ডেকেছে
www.amarboi.com ~

'ধর্ম' মানে সেবা বিনিময়ে ধর্মাস্তর
 'ধর্ম' মানে হিন্দু-মুসলিম... ব্রাদারহুডের কমপিটিশন
 'ধর্ম' মানে দাবিয়ে রেখে বাড়তে হবে
 'ধর্ম' মানে পাদরি পোড়াও
 'ধর্ম' মানে মসজিদ ভাঙো, মন্দির ওড়াও
 'ধর্ম' মানে মাতাল করা দারুণ নেশা
 'ধর্ম' মানে গণ-হিস্ট্রিরিয়া
 'ধর্ম' মানে ধর্মযুদ্ধের মহাশ্মশান
 'ধর্ম' মানে প্রশ্নহীন আত্মসমর্পণ
 'ধর্ম' মানে অলৌকিক মেগা সিরিয়াল
 'ধর্ম' মানে অনুশাসনের লতাতন্ত
 'ধর্ম' মানে অচলায়তন এক হোয়াইট হাউস

ওমোট আকাশ
 ঝড় হবে আজ
 ঝড় হবে আজ...

ধর্মের নীলখাতা বোঝাই সংজ্ঞা-শব্দ
 কালকের অবতারদের আঁকা কোলাজ
 আজকে শুধু মনভালোর দিন
 অতীত বাতিল করে সানন্দ সম্মতি দিয়েছে নতুন মানুষ
 'আজ থেকে মানুষের ধর্ম মানবতা'

—প্রবীর ঘোষ

প্রাচীন পৃথিবীর মানব সমাজে শুরুতেই প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের উপস্থিতি ছিল না। শুরুতে অসহায় মানুষ প্রকৃতির শক্তিকে ভয় ও শ্রদ্ধা করেছে। জল, ঝড়, বৃষ্টি, নদী, সমুদ্র, বন্যা, আগুন, পাহাড়, অরণ্য, ভূমি ইত্যাদি প্রকৃতির কাছে অসহায় মানুষ প্রার্থনা জানিয়েছে। প্রার্থনার মধ্য দিয়ে তুষ্ট করতে চেয়েছে সূর্য, চন্দ্র, পৃথিবী ইত্যাদি নক্ষত্র, উপগ্রহ, গ্রহকে। আর্থ-সামাজিক প্রয়োজনে গৃহপালিত পশু-সম্পদের সেবায় নিজেদের নিয়োজিত করেছে। ভূমি ও নারীর উর্বরতা বৃদ্ধি প্রার্থনা করেছে, উদ্বৃত্ত ফসল ও গোষ্ঠীকে শক্তিশালী করার প্রয়োজনে। এ'গুলোই ছিল প্রাচীন দেব-আরাধনার উৎস। এ'সবই আমরা জেনেছি অজস্র প্রত্নবস্তু থেকে।

পরবর্তীকালে গোষ্ঠীর শক্তিমান মানুষ ও বুদ্ধিমান মানুষ গোষ্ঠীর নেতৃত্ব হাতে নিয়েছে যৌথভাবে। শক্তিমান শাসক ও বুদ্ধিমান পুরোহিত শ্রেণী নিজেদের দেবতার প্রতিনিধি, দেবতার দূত হিসেবে প্রচার করেছে। গড়ে উঠেছে দেবস্থান, অসহায় মানুষের প্রার্থনা জানাবার স্থান। শাসক ও পুরোহিত সম্প্রদায়ের স্বার্থে যৌথ পৃষ্ঠপোষকতায় ধর্ম এভাবেই প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হয়েছে। এইসব দেব-পূজার প্রতিষ্ঠানই মানুষের ধর্মকে গুণের পরিবর্তে নানা সংজ্ঞায় নানা আচার-বিধিতে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে সচেষ্ট হয়েছে। এতক্ষণ আলোচিত এই দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত সমাজতন্ত্রের প্রতি পূর্ণ প্রত্যয় রেখে সম্পাদনার কাজে আমরা হাত দিয়েছিলাম।

এ কথা ঐতিহাসিকভাবে সত্য যে ভারতীয় উপমহাদেশে গত দশকে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের ও ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার আগ্রাসন বিশাল ব্যাপকতা পেয়েছে। সমাজবিজ্ঞানের ছাত্র হিসেবে আমরা জেনেছি—ইতিহাসের অনিবার্য গতি বিশ্বাসের বিপরীতে যুক্তির অভিমুখে। তার সঙ্গে এও জেনেছি, সত্য ততটাই এগায়, যতটা আমরা এগিয়ে নিয়ে যাই। এই ধর্মযুদ্ধে, চিন্তাযুদ্ধে সত্যকে প্রতিষ্ঠা করতে হলে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম, ‘ধর্মীয়’ সাম্প্রদায়িকতা, ‘ধর্মের’ সঙ্গে রাষ্ট্রের প্রকাশ্য ও প্রচ্ছন্ন সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়ে বিভিন্ন চিন্তাবিদদের সযত্ন অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণের সঙ্গে উপমহাদেশবাসীদের পরিচয় ঘটিয়ে দেবার প্রয়াস অত্যন্ত জরুরী। এই ধর্মযুদ্ধে, চিন্তাযুদ্ধে আমাদের সেনানী দুই বাংলার পঁচিশজন চিন্তাবিদ, সমাজ সচেতন, যুক্তিমনস্ক লেখক।

এই গ্রন্থটি সংকলনের কাজে হাত দিয়েছিলাম কয়েক বছর আগে। দু’দেশের লেখকদের লেখা প্রকাশে কিছু প্রাথমিক সমস্যা অবশ্যই ছিল। কিন্তু তার চেয়েও বড় হয়ে উঠেছিল, কিছু লেখকদের নিজেদের লেখাকে আরও বেশি করে গুণগত মানে পৌঁছে দেবার জন্য একাধিকবার পরিমার্জন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংশোধন প্রয়াস। দুই বাংলার লেখকদের কাছ থেকে যে সহযোগিতা ও সহমর্মিতা পেয়েছি, তাতে আমরা আশুত। প্রকাশক সুধাংশুশেখর দে যে ভাবে সুদীর্ঘ সময় ধরে লেখা পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংশোধনের বিষয়ে সহযোগিতা করেছেন, তা শুধু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনে প্রকাশ করা অসম্ভব। শ্রদ্ধা জানাই শতাব্দীর অন্যতম সেরা পণ্ডিত ডঃ আহমদ শরীফের স্মৃতির উদ্দেশে। তিনিই প্রথম এই গ্রন্থের জন্য তাঁর লেখাটি দিয়েছিলেন।

প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের স্বরূপকে বে-আব্রু করে ‘মানুষের ধর্ম মানবতা’—এই সত্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে গ্রন্থটি সামান্যতম ভূমিকা পালন করতে পারলে আমাদের সম্মিলিত প্রয়াস সার্থক মনে করবো।

৬ অক্টোবর
২০০১

প্রবীর ঘোষ (ভারত)
ওয়াহিদ রেজা (বাংলাদেশ)

নাস্তিকের ধর্মচিন্তা

আহমদ শরীফ

নাস্তিকের জীবচেতনা আছে, জগৎভাবনা আছে, ধর্মচিন্তা নেই। নাস্তিকের অবশ্য ধর্ম সম্বন্ধে চিন্তা আছে। ‘নাস্তিক’ শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অভিধা হচ্ছে ‘বেদের অপৌরুষেয়তায় আস্থাহীন অর্থাৎ যে বেদকে আসমানী বাণীরূপে মানে না, সেই নাস্তিক। এখন শব্দটি অর্থান্তর লাভ করেছে। এখন নিরীশ্বরকেই নাস্তিক বলা হয়, যারা নাস্তিক তারা শাস্ত্রের সত্যতায় আস্থা রাখে না। তাদের মতে ঈশ্বর যদি এক এবং চিরন্তন হন, তাহলে তিনি জনবহুল যুরোপে আফ্রিকার কালো মানুষের মধ্যে আমেরিকার রেড ইন্ডিয়ানদের কাছে কিংবা চীন-জাপান-অস্ট্রেলিয়া-নিউগিনিতে নবী-অবতার পাঠাননি কেন, কেবল পুরোনো কেনান তথা আধুনিক ইজরাইল থেকে সুয়েজ অবধি একটা বিরল বসতি অঞ্চলে এবং ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যেই শুধু এক লক্ষ চব্বিশ/চল্লিশ কিংবা দুইলক্ষ চব্বিশ/চল্লিশজন নবী পাঠালেন কেন? ভারতেই বা কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ ও রাম কৃষ্ণকে পাঠালেন কেন? মানুষের কাছে ঈশ্বরই যদি তাদের হিতার্থে আদেশ-নির্দেশ পাঠাতেন, তাহলে সে-বাণীর মধ্যে পার্থক্য ও বৈপরীত্য থাকত না। আর থাকত না সাময়িকতা। অন্তর্যামী ঈশ্বর কেন কালে কালে স্থানে স্থানে স্ববিরোধী বিপরীতমুখী বাণী পাঠাবেন মানুষের মধ্যে বিরোধ-বিবাদ-বিচ্ছেদ এবং নিত্যকালের সংঘর্ষ-সংঘাত ঘটানোর জন্যে? অস্ত্র মানুষের কল্পনাপ্রসূত বলেই ঈশ্বর সাকার কি নিরাকার, নারী কি পুরুষ তা আজো নির্ণিত হয়নি। তিনি কেন কি উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করলেন বিশ্বজগৎ সে সম্বন্ধেও কেউ একমত নয়। শাস্ত্র গ্রন্থগুলোর মধ্যে সমকালের পৃথিবীর মানুষের গোত্রিক গোষ্ঠীক এবং অবস্থানগত ভৌগোলিক পরিচিতিও নেই। নেই প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের বয়ানও। তাছাড়া আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত তত্ত্ব, তথ্য এবং সত্যও দুর্লভ দুনিয়ার সব চালু শাস্ত্রগ্রন্থে। এজন্যে শাস্ত্র গ্রন্থগুলোকে মানবমনীষা প্রসূত বলে সহজেই লোকে চিহ্নিত করে, আন্তিকমাত্রই স্বশাস্ত্র ব্যতীত অন্যদের শাস্ত্রকে ভুল, ত্রুটিপূর্ণ কিংবা সরাসরি বানানো শাস্ত্র বলেই জানে। শৈশব-বাল্যের মগজ-ধোলাইয়ের ফলে বিশ্বাস-সংস্কার পুষ্ট মানুষ তার ইহ-পরকালে প্রসূত জীবনে জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তি প্রয়োগে স্বশাস্ত্র যাচাই-বাছাই করার সাহস পায় না আত্মপ্রত্যয়ের ও সাহসের অভাবে। অতএব, কেউ অন্য কারো শাস্ত্র সত্য বলে জানে না, মানে না। কাজেই গড়ে শাস্ত্রমাত্রই মিথ্যা, বানানো, কেবল একটি

বিশেষ দলের কাছেই এক একটি শাস্ত্র সত্যমাত্র। ফলে যুক্তিযোগে কোন শাস্ত্রই সত্য বলে এমন কি সর্বকালের সর্বমানুষের জীবনে প্রয়োজনীয় বলে প্রমাণ করা যায় না। বিশ্বাসকে যুক্তি দিয়ে প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াসমাত্রই পুতুলে হাত-পা-চোখ-কান-নাক-মুখ-বসিয়ে তাকে জীবন্ত মানুষ প্রমাণ করার নামান্তরমাত্র। এখনকার শাস্ত্রগুলোকে সত্য আসমানী বাণীভিত্তিক মনে করলে মানতেই হবে যে ঈশ্বর একজন বহুরূপী এবং বিচিত্র মতলবে স্ববিরোধী আদেশ-নির্দেশদাতা ঈশ্বরের নীতি-নিয়মে কোন সঙ্গতি-সামঞ্জস্য নেই বলেই তাঁকে লীলাময় বলে। বহুকাল আগে ১৯০৪ [১৩১১ সনের] সালের ভাদ্রসংখ্যা মাসিক ‘নবনুর’ নামের সাহিত্য পত্রিকায় বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন লিখেছিলেন ‘আমাদিগকে অন্ধকারে রাখিবার জন্য পুরুষগণ ঐ ধর্মগ্রন্থগুলিকে ঈশ্বরের আদেশপত্র বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন...পুরাকালে যে ব্যক্তি প্রতিভাবলে দশজনের মধ্যে পরিচিত হইয়াছেন, তিনিই আপনাকে দেবতা কিংবা ঈশ্বর প্রেরিত দূত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।...ঐ ধর্মগ্রন্থগুলি পুরুষ রচিত বিধি-ব্যবস্থা ভিন্ন আর কিছুই নহে।...ঈশ্বর কি কেবল এশিয়ারই ঈশ্বর?’

নাস্তিক শাস্ত্র নির্দেশে চালিত নয় বটে, তবে নাস্তিকমাত্রই ন্যায়-অন্যায়, ভালো-মন্দ, বিচার-বিবেচনা করেই কর্ম-আচরণ করে। আত্মরতি বশে পরের ক্ষতি করে না, জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তির আলোকে নৈতিক চেতনা নিয়ে সামাজিক, আর্থিক ও রাষ্ট্রিক ন্যায়ের অনুগত থাকে। নাস্তিক সমস্বার্থে সংযমে সহিষ্ণুতায় সহযোগিতায় সহাবস্থানের তত্ত্বে ও আবশ্যিকতায় আস্থা রাখে। নাস্তিক ‘Live and let others live’ আদর্শে গুরুত্ব দেয়। যে-ক্ষতি, যে-যন্ত্রণা যে-পীড়ন সে নিজের জন্যে অনভিপ্রেত বলে জানে, বোঝে ও মানে, তা সে তার প্রতিবেশীর জন্যেও অকারণে কামনা করে না, কাজেই নাস্তিক যুক্তিবাদী আত্মপ্রত্যয়ী আত্মমর্যাদাসচেতন বলেই সে অন্যায়-অপকর্ম থেকে বিরত থাকে। পক্ষান্তরে শাস্ত্রে আস্থাবান আস্তিক ঈশ্বর অন্তর্যামী বলে জেনে-মেনেও করে না হেন অপরাধ-অপকর্ম-অন্যায় নেই। আস্তিকেরা কেবল সামান্য পরিমাণে বা মাত্রায় লোকনিন্দার ও রোষের এবং বহুল মাত্রায় সরকারী শাস্তির ভয়েই নানা অপকর্ম থেকে বিরত ও সংযত থাকার চেষ্টা করে মাত্র। তবু প্রলোভন প্রবল হলে সেই সব আস্তিক মানুষ করে না হেন অপকর্ম জগতে নেই।

মানুষের জীবন ঈশ্বর, না রাশিচক্র নিয়ন্ত্রণ করে, তাও নিয়তিতে ও জ্যোতিষগণনায় আস্থাবানেরা নিশ্চিত করে বলতে পারে না। আজ অবধি আমরা পৃথিবীর প্রাচীন ও আধুনিক ইতিবৃত্তে যত নাস্তিকের সন্ধান পাই, তারা মানুষ হিসেবে সাধারণভাবে উদার ও মহৎ, অনন্য ও অতুল্য। ভারতের বৈশেষিক, সাংখ্য, চার্বাক ও মীমাংসা দর্শন আর বৌদ্ধ-জৈন দর্শনও সাধারণ সংজ্ঞায় নাস্তিক্য দর্শন। কিংবা মিল বেঙ্হাম কোঁতে স্পিনোজো নিটসে কার্লমার্কস প্রমুখের দর্শনও মানুষকে মনুষ্যগুণরিক্ত হতে তথা মনুষ্যত্বের মানবিকতার-মানবতার অনুশীলনে নিরুৎসাহ

করেন না। বহুজনহিতে বহুজনসুখে সামাজিক ও রাষ্ট্রিক নীতি নিয়ম চালু করার কথাই বলেন। মানুষ মতবাদীর দলীয় জীবনে ভরসা রাখে, তাই স্বশাস্ত্র-মানা চোর-ডাকু-মিথোবাদী, মস্তান-গুপ্তা-খুনীদের ঘৃণ্য মনে করে না, সহ্য করে স্বদলীয় বলে। কিন্তু নিরপরাধ শিক্ষিত ধনী, গুণী, জ্ঞানী নাস্তিককে একেবারেই সহ্য করে না। হত্যা না করে, পতিত না করে, বিতাড়িত না করে অন্তত পীড়িত-লাঞ্ছিত না করে আশুকেরা স্বস্তি পায় না। উল্লেখ্য যে গত শতকের ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয় কুমার দত্ত প্রমুখ নাস্তিক ছিলেন, অনেকেই ছিলেন প্রত্যক্ষবাদী ও সংশয়বাদী এবং তাঁরা ছিলেন ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণে-চরিত্রে, আদর্শে ও নৈতিক চেতনায় জ্ঞানে-গুণে-মনীষায় মহৎ মানুষ। লেনিন-স্টালিন-মাও সে তুং-জওয়াহের লাল সার্ব, বাট্টাও রাখেনি প্রমুখও নাস্তিক, কিন্তু মানবপ্রেমী, অমানুষ নন কেউ। আজো দুস্থ মানুষকে শোষণ-পীড়ন পেষণ-দমন-লাঞ্ছনামুক্ত করার জন্যে যারা প্রাণপণ সংগ্রামে রত, তারা হচ্ছে মানবদরদী নাস্তিক-নিরীশ্বর কম্যুনিষ্টরাই। কম্যুনিষ্টরা কি নিরীশ্বর বলে অমানুষ?

মনোবিজ্ঞানীর ও দার্শনিকের মতে অজ্ঞ-অসহায় ক্ষতিভীরু মানুষের ভীকৃত্য থেকেই ঈশ্বরতত্ত্বের উদ্ভব। তাই কল্পনাসৃষ্ট বিভিন্নকালের ও স্থানের ঈশ্বরে কোন সাদৃশ্য নেই। মানুষকে ও শয়তানকে কেন সৃষ্টি করা হল, মানুষকে কেন পাপ করার অধিকার দেয়া হল, শাস্তিই বা দেয়া হবে কেন? তাতে কার কি উপকার বা লাভ? এসব প্রশ্নের উত্তর মেলে না। যুক্তিবাদী আত্মপ্রত্যয়ী সাহসী মানুষমাত্রই তাই নাস্তিক নিরীশ্বর।

মানুষের জন্য ধর্ম, না ধর্মের জন্য মানুষ?

কবীর চৌধুরী

সব ধর্মের কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থিত মানবকল্যাণের ধারণা, শান্তি ও সম্প্রীতি, পরহিতব্রত। সেই আদিকাল থেকে পৃথিবীর তাবৎ ধর্মপ্রচারকরা জোর দিয়েছেন শান্তি, ভালবাসা, সেবা ও পরোপকারের উপর, আদেশ দিয়েছেন হিংসা ও ঘৃণা, লোভ ও সহিংসতা পরিহার করতে। তাঁরা গুরুত্ব আরোপ করেছেন মানুষে মানুষে মিলন, সৌহার্দ্য ও সহিষ্ণুতার উপর, সঙ্কীর্ণতা ও বিভেদের উপর নয়, ঔদার্য ও মৈত্রীর উপর।

সব ধর্মেই কিছু পালনীয় প্রথা ও আচার আছে, কিছু আনুষ্ঠানিকতা আছে। এগুলির সার্থকতা ধর্মের প্রাণকে উজ্জ্বল ও শক্তিশালী করার মধ্যে নিহিত। আচার অনুষ্ঠানকে মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্ব দিলে, ধর্মের আচার অনুষ্ঠান পালনই সব চাইতে জরুরি এই ধারণাকে প্রাধান্য ও অগ্রাধিকার দিলে, ধর্মকর্ম নিষ্প্রাণ ও যান্ত্রিক হয়ে পড়ে।

তখন আর ধর্ম সব মানুষের জন্য কাজ করে না, ধর্ম সীমিত হয়ে পড়ে একটা গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের মধ্যে, মিলনের চাইতে বিভেদের কথাই তখন বড় হয়ে ওঠে, এবং সম্প্রীতির পরিবর্তে তখন সহিংসতাই মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। সব চাইতে ভয়াবহ পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যখন রাষ্ট্রীয় শক্তি এর মধ্যে নাক গলায়, ব্যক্তিমানুষের ধর্ম পালন বা না পালন করার উপর খবরদারি করার অধিকার ও দায়িত্ব যখন রাষ্ট্র নিজের উপর টেনে নেয়। মধ্যযুগে এই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনাটিই ঘটেছিল। অবশ্য পাশ্চাত্য জগতে তখন চার্চই ছিল সর্বশক্তিমান, চার্চের সংজ্ঞার মধ্যেই রাষ্ট্র অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং জাগতিক ও আধ্যাত্মিক উভয় অঙ্গনেই চার্চের ক্ষমতা ছিল সর্বব্যাপী ও চূড়ান্ত।

ধর্মীয় অন্ধত্ব, অসহিষ্ণুতা ও গোঁড়ামি মধ্যযুগের ইউরোপে এক বিভীষিকাময় পরিবেশের জন্ম দিয়েছিল। সপ্তদশ শতাব্দীতে সেখানে খ্রীষ্টীয় ধর্মাবলম্বীদের মধ্যেই প্রোটেস্টান্ট ও ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের মানুষ একে অন্যের বিরুদ্ধে ত্রিশ বৎসর ব্যাপী রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিল। মধ্যযুগে সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় ধর্মকে শাসনের অন্যতম হাতিয়ার রূপে ব্যবহার করা হয়। রোমান ক্যাথলিক চার্চের সমর্থনে সকল রকম মুক্ত চিন্তাকে অন্ধুরেই ধ্বংস করার লক্ষ্যে এবং রাজার যাবতীয় স্বৈরাচারী কার্যকলাপকে বৈধতা দানের জন্য তখন ইউরোপে অমানবিক ব্লাসফেমি আইনের ব্যাপক ব্যবহার শুরু হয়। চার্চের একমুখী বাধ্যতামূলক মতবাদ ও শিক্ষার

বিরুদ্ধে সেই প্রশ্ন তুলতো তাকেই ধর্মদ্রোহী আখ্যা দিয়ে পুড়িয়ে মারা হত। ১২১৫ সালে গঠিত ইনকুইজিশান আদালত এই কাজটিই করে। অসামান্য সাহসী দেশপ্রেমিক ফরাসী তরুণী জোন অব আর্ক নিজের বিবেকের নির্দেশ উপেক্ষা করে ধর্মযাজকদের এক তরফা রায়কে মেনে নেন নি, ফলে তাঁকে নির্মমভাবে বেঁধে আগুনে পুড়িয়ে মারা হয়। ১৫৪৩ সালে ওই ভাবেই হত্যা করা হয় জ্যোতির্বিজ্ঞানী কপারনিকাসকে, ১৬০০ সালে বিজ্ঞানী ব্রুনোকে, এবং ব্রুনোর পর গ্যালিলিও-ও শিকার হন ওই ব্র্যাসফেমি আইনের, যদিও সুচতুর আপসকামিতার সাহায্যে তিনি কোন রকমে বেঁচে যান। ধর্মকে ব্যক্তিগত কর্মের উর্ধ্বে তুলে তাকে রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কিত করলে নানা রকম বিপত্তির সৃষ্টি হয়। রাষ্ট্র ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তির তখন নিজেদের স্বার্থে ধর্মীয় গোঁড়ামিকে প্রশ্রয় দেন এবং বিভিন্ন গোষ্ঠীর মানুষদের ধর্ম ও সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে বিভক্ত করে তাদের মধ্যে হিংসাত্মক ভেদবুদ্ধি জাগিয়ে তুলে রক্তাক্ত সংঘর্ষের পথ সুগম করেন। মধ্যযুগে এ অবস্থা সব চাইতে বেশি ক্রিয়াশীল ছিল, কিন্তু তারপরেও এটা অবলুপ্ত হয় নি, এবং আজও বহু স্থানে এর উপস্থিতি আমরা লক্ষ্য করি। বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় ধর্ম রূপে একটি বিশেষ ধর্মের ঘোষণা ও স্বীকৃতি দান মধ্যযুগের দিকে মুখ ফেরানোরই সামিল। অবশ্য সাধারণভাবে বর্তমান বিশ্বে ধর্মকে এখন রাষ্ট্রব্যবস্থা থেকে আলাদা করেই দেখা হয়, প্রতিটি মানুষ যেন স্বাধীনভাবে নিজের ধর্ম বিশ্বাস অনুযায়ী তার ধর্মমত ও পথ অনুসরণ করতে পারে, অন্য কেউ যেন তার বাধা না দেয়, শুধু এটুকু সুনিশ্চিত করাই আজ রাষ্ট্রের দায়িত্ব।

আমরা আজকের বাংলাদেশে দেখছি ধর্মের চরম অপব্যবহার। একদিকে কতিপয় রাজনীতিক দল ও ব্যক্তি ধর্মকে হাতিয়ার করে ক্ষমতা দখলের ষড়যন্ত্র করছে, অন্যদিকে মৌলবাদী ধর্মাস্কন্ধ কিছু গোষ্ঠী ও ব্যক্তি ফতোয়াবাজিসহ নানা কুকর্ম দাপটের সঙ্গে চালিয়ে যাচ্ছে। সংগঠিত সম্প্রদায়ভিত্তিক এই সব তথাকথিত ধার্মিক মানুষরা ধর্মের প্রাণকে হরণ করে নানা রকম সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে আজ দেশকে অসহনীয় অবস্থায় নিয়ে এসেছে। অথচ ইতিহাস ও ঐতিহ্যগত দিক থেকে বাংলাদেশ একটি উদার ধর্মনিরপেক্ষ মানবতাবাদী সংস্কৃতির দেশ। আমরা চণ্ডীদাস, লালন, হাসন রাজা, রমেশ শীল, রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের ঐতিহ্যে লালিত। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনকালে ও পরবর্তী পাকিস্তানী নয়া-ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের যুগে সুপরিকল্পিতভাবে ওই মানবতাবাদী চেতনা ক্ষুণ্ণ করার চেষ্টা হয়েছিল। তখন অনেক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামাও হয়েছে।

বাংলাদেশের মানুষ হিসেবে আমাদের জীবনের বিশেষ গৌরবোজ্জ্বল দুটি ঘটনা হল ৫২-র ভাষা আন্দোলন ও ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধই চূড়ান্ত, কিন্তু অনিবার্য মুক্তিযুদ্ধের দিকে আমরা এগিয়ে গেছি ধাপে ধাপে। অলীক রাষ্ট্র পাকিস্তান সৃষ্টির অল্প দিনের মধ্যেই এ অঞ্চলের মানুষ উপলব্ধি করে যে শুধু ধর্ম নিয়ে একটা

জাতি গড়ে ওঠে না এবং দ্বিজাতিত্ব একটা অগ্রহণযোগ্য অসার তত্ত্ব।

১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ এদেশের মানুষের মনে ধর্মনিরপেক্ষতার চেতনাকে দৃঢ় করে তুলেছিল। স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী নতুন রাষ্ট্র বাংলাদেশে আমরা তাই স্বাভাবিকভাবেই ধর্মনিরপেক্ষতাকে পেলাম আমাদের রাষ্ট্রের অন্যতম মূল নীতি রূপে। সংবিধানে আরও তিনটি জাতীয় মূল নীতির কথা লিপিবদ্ধ হল : জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র। কিন্তু দেশের কিছু প্রতিক্রিয়াশীল স্বার্থপর কুচক্রী ব্যক্তি এই নীতিগুলি আন্তরিকভাবে মেনে নিতে পারে নি। বস্তুতপক্ষে বাংলাদেশের স্বাধীনতাকেই তারা আন্তরিকতার সাথে গ্রহণ করতে পারে নি। তারা একটা প্রতিবিপ্লব সংগঠিত করার জন্য সুযোগের অপেক্ষা করছিল। সেই কাজটি তারা করল ১৯৭৫-এর আগস্টে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যা করে।

জাতির পিতাকে হত্যা করার পর থেকে দেশকে সুপরিষ্কৃতভাবে মুক্তিযুদ্ধের সকল ইতিবাচক মূল্যবোধে বর্জিত করার অপচেষ্টা চলছে। যে বাঙালিত্বের চেতনা স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম প্রেরণার উৎস ছিল (স্মরণ করুন এই সব স্লোগান : জেগেছে জেগেছে বাঙালি জেগেছে, বীর বাঙালি অস্ত্র ধর বাংলাদেশ স্বাধীন কর, তোমার আমার ঠিকানা পদ্মা মেঘনা যমুনা, জয় বাংলা) তাকে ধূসর, স্নান ও অর্থহীন করার লক্ষ্যে আমদানি করা হল উদ্ভট বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের তত্ত্ব, যা প্রকৃত পক্ষে মুসলিম সাম্প্রদায়িক ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদেরই ছদ্মবেশী রূপ। ধর্মনিরপেক্ষতা সরাসরি নির্বাসিত হল সংবিধান থেকে। প্রথমে জেনারেল জিয়ার, তারপর জেনারেল এরশাদের এবং তারপর খালেদা জিয়ার সরকার বাঙালিত্বের চেতনাকে ধ্বংস করতে, ধর্মাত্মকে প্রশ্রয় দিতে, অর্থনীতির ক্ষেত্রে ধনীকে আরও ধনী ও দরিদ্রকে আরও দরিদ্র করার প্রক্রিয়া, এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও আচার আচরণকে ছলেবলে কৌশলে নস্যাৎ করে স্বৈরাচারকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার কাজে সোৎসাহে ব্রতী হল। আজ বাংলাদেশের চতুর্দিকে মৌলবাদ ও ধর্মাত্মতার বিকাশ ঘটে চলেছে ক্ষমতাসীন বিএনপি সরকারের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায়। মৌলবাদ ও ধর্মাত্মতার অপরিহার্য সঙ্গী হিসাবে আমরা দেশের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ বহু স্থানে আজ দেখতে পাই নিষ্ঠুর পেশীশক্তি এবং হিংস্র সহিংসতার অবিস্বাস্য বিস্তার। স্বাধীনতা বিরোধী ধর্মাত্ম মৌলবাদী শক্তি তাদের রাজনৈতিক দল ও ছাত্রসংগঠন নিয়ে আজ সন্ত্রাসকে একটা সংস্কৃতি ও জীবন দর্শনে পরিণত করেছে। অতি তুচ্ছ ঘটনা নিয়ে হত্যা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে উঠেছে। ছিনতাই রাহাজানি ধর্ষণ সম্পদ ধ্বংস ইত্যাদির কথা নাই বললাম। অথচ সরকার সম্পূর্ণ উদাসীন। প্রহসনের নির্বাচন অনুষ্ঠান করে ক্ষমতায় আবারো দীর্ঘকাল থেকে বাংলাদেশকে একটি মধ্যযুগীয় থিওক্র্যাটিক রাষ্ট্রে পাকাপাকিভাবে রূপান্তরিত করার জন্য তারা বদ্ধপরিকর। কিন্তু এটা ক্রিচ্ছুতেই হতে দেয়া চলে না। মুক্তিযুদ্ধে বিপুল ত্যাগের

মাধ্যমে বাংলাদেশ মানবিকতার জয় ধ্বজা উড়িয়ে স্বাধীনতা অর্জন করেছিল, তাকে ধর্মাত্মতার ঘূর্ণিঝড়ে কিছুতেই ছিন্নভিন্ন হতে দেয়া চলবে না। একদা যে সাম্প্রদায়িক ধর্মাত্মক প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিসমূহ আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরোধিতা করেছিল, যারা আমাদের জাতীয়তাবাদের অন্যতম উৎস বাঙালি সংস্কৃতিকে কখনো অন্তর থেকে স্বীকার করে নেয় নি, সর্বদা যারা তাকে একটি বিজাতীয় হিন্দু সংস্কৃতি রূপেই দেখেছে সেই প্রতিক্রিয়াশীল প্রতিবিপ্লবী শক্তিসমূহই নিজেদের হীন স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে মিথ্যাচার, ইতিহাস বিকৃতিকরণ, ভণ্ডামি ও সন্ত্রাসের মাধ্যমে জাতীয় জীবনে সর্বব্যাপী ধ্বংস ও বিরোধের বীজ বপন করে চলেছে। এর বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান নিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রাম চালিয়ে বাংলাদেশকে একটি আধুনিক প্রগতিশীল রাষ্ট্ররূপে গড়ে তুলতে হবে, যেখানে ধর্ম হবে মানুষের জন্য, সর্বমানুষের কল্যাণের জন্য, যেখানে মানুষ হবে না ধর্মের নামে স্বার্থসিদ্ধির হাতিয়ার, মানুষ হবে না মৌলবাদী ধর্মাত্মকদের হাতের পুতুল। আমরা বাংলাদেশকে একটি যথার্থ অসাম্প্রদায়িক মানুষের দেশ হিসেবে দেখতে চাই। অসাম্প্রদায়িক মানুষ যান্ত্রিকভাবে ধর্মের আনুষ্ঠানিকতা পালনকে গুরুত্ব দেয় না, সে গুরুত্ব দেয় মানুষের ধর্মকে, যে ধর্মে মানুষের হৃদয়ই হচ্ছে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যে হৃদয় সম্পর্কে নজরুল বলেছেন

‘এইখানে এসে লুটাইয়া পড়ে সকল রাজমুকুট
এই হৃদয়ই সেই নীলাচল, কাশী, মথুরা, বৃন্দাবন,
বুদ্ধগয়া এ, জেরুজালেম এ, মদিনা, কাবাভবন,
মসজিদ এই, মন্দির এই, গির্জা এই হৃদয়।’

আমাদের মনে পড়ে টমাস পেইনের (১৭৩৭-১৮০৯) কথা। কত আগে তিনি লিখেছেন, ‘আমি বিশ্বাস করি অদ্বিতীয় ঈশ্বরে, তার বেশি কিছু নয়—আমি বিশ্বাস করি মানুষের সাম্যে, এবং বিশ্বাস করি যে ন্যায়বিচার, মমতা, দয়া দাক্ষিণ্য এবং আমাদের সঙ্গী মানুষদের সুখী করার প্রয়াসের মধ্যেই ধর্মীয় কর্তব্যসমূহ নিহিত—আমার হৃদয়ই আমার চার্চ।’

এটাই মানুষের ধর্ম। সত্যিকার ধর্ম। একজন মানুষ যখন তাঁর নিজস্ব সম্প্রদায়ভিত্তিক ধর্ম পালনের সঙ্গে সঙ্গে এই মানবধর্মও পালন করে তখনই ধর্ম হয়ে ওঠে মানুষের জন্য।

মানবধর্মকে উপেক্ষা করে শুধু সম্প্রদায়ভিত্তিক ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করলে মানুষ আর যথার্থ মানুষ হয়ে ওঠে না, তখন আর আমরা মানুষের জন্য ধর্মের কথা ভাবি না, ভাবি যে ধর্মের জন্যই বুঝি মানুষ। বর্তমান বাংলাদেশের দুঃসময়ে সাধারণ মানুষের মনের মধ্যে অসাম্প্রদায়িক চেতনা সুদৃঢ়ভাবে প্রোথিত করা অত্যাবশ্যক। যত দ্রুত ও স্পষ্টভাবে সে উপলব্ধি করবে যে মানুষের জন্যই ধর্ম, ধর্মের জন্য মানুষ নয়, দেশ তত দ্রুত রাষ্ট্রমুক্ত হবে।

মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িক শক্তিবৃদ্ধির রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত

বদরুদ্দীন উমর

একটি শ্রেণীবিভক্ত সমাজে শোষক ও শোষিত শ্রেণীর দ্বন্দ্বই হলো মৌলিক দ্বন্দ্ব। কিন্তু এই মৌলিক দ্বন্দ্ব ছাড়াও সমাজে আরও অনেক দ্বন্দ্ব দেখা যায়। মৌলিক দ্বন্দ্বের সঙ্গে অপরাপর দ্বন্দ্বের পার্থক্য এই যে, মৌলিক দ্বন্দ্ব যেখানে শ্রমজীবী জনগণ ও তাদের শোষকদের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব সেখানে অপরাপর দ্বন্দ্বগুলো হলো জনগণেরই বিভিন্ন অংশের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্বগুলি আসলে কোনো বৈরীমূলক বা শত্রুতামূলক দ্বন্দ্ব নয়। এগুলো হলো অবৈরীমূলক বা অশত্রুতামূলক এমন দ্বন্দ্ব, যেগুলো মীমাংসা সহজেই সম্ভব, কিন্তু যেগুলোকে শ্রমজীবী জনগণের শ্রেণীশত্রুরা জনগণের মধ্যে শত্রুতামূলক দ্বন্দ্বের পরিণত করার চেষ্টা করে এবং কার্যত অনেক ক্ষেত্রে সফলও হয়। ভাষাগত, জাতিগত, আঞ্চলিক ও সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব প্রকৃতপক্ষে জনগণের বিভিন্ন অংশের অশত্রুতামূলক দ্বন্দ্ব হলেও প্রায়ই শ্রমজীবী জনগণের শ্রেণীশত্রুরা এই সব দ্বন্দ্বকে অবলম্বন করে জনগণকে বিভক্ত করে এবং তাঁদেরকে আত্মঘাতী সংঘর্ষে লিপ্ত করে শ্রেণীসংগ্রাম থেকে বিরত রাখে।

বৃটিশ ভারতীয় উপমহাদেশে তৎকালীন সরকার এবং ভারতীয় শোষক শ্রেণীর রাজনৈতিক প্রতিনিধিরা—কংগ্রেস, মুসলিম লীগ, হিন্দু মহাসভা ইত্যাদি বুর্জোয়া রাজনৈতিক দলের নেতারা—এভাবেই সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্বকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করেছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত শ্রেণীদ্বন্দ্ব তো বটেই এমন কি জাতিগত, ভাষাগত, আঞ্চলিক ইত্যাদি দ্বন্দ্বকেও সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্বের অধীনস্থ করে ভারতকে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে দ্বিধাবিভক্ত করেছিলেন।

১৯৩০-এর দশক থেকে ভারতে তৎকালীন কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে শ্রেণীসংগ্রাম কিছুটা সংগঠিত হতে থাকলেও এবং চল্লিশের দশকের মাঝামাঝি সেটা কিছুটা শক্তি সঞ্চয় করলেও সাম্প্রদায়িক শক্তির বিকাশ ও বৃদ্ধি ছিলো তার তুলনায় অনেক বেশি। কাজেই ১৯৪৭ সালে রাজনীতি ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতা পরিণত হয়েছিলো নির্ধারণক শক্তিতে। সারা দেশে প্রগতিশীল রাজনীতির পিছিয়ে পড়া অবস্থা এবং দুর্বলতার পরিপ্রেক্ষিতেই সাম্প্রদায়িকতার এই অগ্রগতি সম্ভব হয়েছিলো।

কিন্তু শুধু বৃটিশ ভারতেই নয়, ১৯৪৭ সালের পরও যখন যেখানেই সাম্প্রদায়িকতার শক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে, সেখানেই দেখা যাবে প্রগতিশীল শক্তির অবক্ষয় ও দুর্বলতার কারণেই সেটা ঘটছে। ভারতে সাম্প্রদায়িকতার শক্তিবৃদ্ধিও এখন এ কারণেই ঘটছে।

এ প্রসঙ্গে মনে রাখা নরকার যে, সারা ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা কিছুদিন পরপর ঘটলেও পশ্চিমবঙ্গ, কেরালা, ত্রিপুরা ইত্যাদি 'কমিউনিস্ট' শাসিত রাজ্যগুলোতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঘটে নি। কোন সময়ে ছোট ছোট আকারে ঘটলেও অথবা সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা দেখা দিলেও সরকার ও ক্ষমতাসীন দলের দ্রুত হস্তক্ষেপের ফলে সেখানে পরিস্থিতি কোন সময়েই আয়ত্তের বাইরে যায় নি। কাজেই সত্তর দশকের শেষ থেকে বর্তমান সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামার আগে পর্যন্ত দেখা গেছে যে, দিল্লি, বিহার, উত্তর প্রদেশ, হিমাচল, পাঞ্জাব, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, গুজরাট, মহারাষ্ট্র ইত্যাদি রাজ্যে ঘনঘন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সত্ত্বেও উপরোক্ত 'কমিউনিস্ট' শাসিত রাজ্যগুলোতে তুলনামূলকভাবে প্রগতিশীল শক্তির আধিপত্যের কারণে সেগুলো সাম্প্রদায়িক দাঙ্গামুক্ত এলাকা হিসেবেই এতদিন বজায় থেকেছে। এই দাঙ্গামুক্ত রাজ্যগুলোর শাসক দলের কমিউনিস্ট হিসেবে যতই সীমাবদ্ধতা থাকুক, সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে তাদের অবস্থান খুব দৃঢ় থাকার কারণেই এই হাঙ্গামা পশ্চিমবঙ্গ, কেরালা, ত্রিপুরা রাজ্যে এতদিন দেখা যায় নি। অন্যদিক থেকে এ বিষয়টি বিবেচনা করলে বলা যেতে পারে যে, এইসব রাজ্যে সাধারণভাবে সাম্প্রদায়িক ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি অপেক্ষাকৃত দুর্বল হয়ে পড়ার ফলেই সেগুলোতে বামপন্থীদের ক্ষমতা দখল সম্ভব হয়েছিলো।

বর্তমানে উপরোক্ত তিনটি রাজ্যের পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটেছে। কেরালা ও ত্রিপুরাতে আগেই কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে ১৯৭৭ সাল থেকে একটানা সি.পি.এম নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় থাকলেও এখন যে সেখানকার রাজনীতি ক্ষেত্রে দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীলদের শক্তি বৃদ্ধি হয়েছে সেটা বর্তমান সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার সময় পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতি থেকেই বোঝা যায়। দাঙ্গা প্রতিরোধের ক্ষেত্রে সেখানকার জনগণের একটা বড়ো অংশের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা সত্ত্বেও একথা সত্য। তাই এবার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ কোন ব্যতিক্রম নয়, উপরন্তু যে সব রাজ্যে পরিস্থিতির বেশি অবনতি ঘটেছে পশ্চিমবঙ্গ হলো সেগুলোরই অন্যতম।

এই ঘটনা থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটেছে এবং ক্ষমতাসীন বামফ্রন্ট সরকারের রাজনৈতিক অবস্থান সেখানে নানা কারণে আগের তুলনায় অনেক দুর্বল হয়েছে। এই দুর্বলতার কারণেই সি. পি. এম. ও বামফ্রন্ট সরকার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা রোধের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করলেও দাঙ্গা নিয়ন্ত্রণ করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় নি। এর

জন্য তাদেরকে সমগ্র রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় এবং কলকাতাতে কড়াকড়িভাবে দীর্ঘকালীন সাস্থ্য আইন জারি করতে হয়েছে। পরিস্থিতির এই অবনতিকে শুধু সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতির অবনতি হিসেবে দেখলেই হবে না, এটাকে দেখতে হবে সেখানে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির সাধারণ অগ্রগতি এবং প্রগতিশীল শক্তির সাধারণ পশ্চাদপসরণ হিসেবে। এই পরিবর্তন যে পশ্চিমবঙ্গের পরবর্তী সাধারণ নির্বাচনেও প্রতিফলিত হবে তাতে সন্দেহ নেই।

ভারত ও পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কে এই আলোচনা দেশের বিদ্যমান পরিস্থিতি আলোচনার ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক বলেই এতক্ষণ এ আলোচনা করা হলো। আমাদের দেশেও এখন সাম্প্রদায়িক শক্তি যেভাবে মাথাচাড়া দিয়েছে সেটা এখানকার রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের ফলেই সম্ভব হয়েছে। এখানেও এটা হঠাৎ করে রাতারাতি হয় নি। ধারাবাহিকভাবে এদেশের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির ক্ষমতা বৃদ্ধির পরিণতি হিসেবেই এখন এই পরিস্থিতি এখানে দেখা দিয়েছে।

একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে যে, এরশাদের সামরিক স্বৈরতন্ত্র-বিরোধী আন্দোলনের সময় যেভাবে ও যাদের নেতৃত্বে সেই আন্দোলন পরিচালিত হয়েছে তাতে গণতন্ত্রের কোন প্রকৃত জয় হয় নি, গণতন্ত্র কোন প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো লাভ করে নি এবং গণতন্ত্রের ঝাণ্ডা উড়িয়ে স্বৈরতন্ত্র সকল মৌলিক দিক দিয়ে এদেশে এখনো সুপ্রতিষ্ঠিত আছে।

পরিস্থিতি এভাবে অপরিবর্তিত থাকায় অন্যতম প্রধান কারণ শুধু জনগণের সাধারণ পশ্চাৎপদতাই নয়, এদেশের যে শ্রেণীটির নেতৃত্বে রাজনৈতিক আন্দোলন নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয় সেই শ্রেণীটিরও প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক সংস্কৃতির নিদারুণ অভাব, তাদের চেতনায় প্রকৃত প্রগতিশীল ভাবনার অনুপস্থিতি। এ কারণে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে শিক্ষিত এবং এদেশের সাংস্কৃতিক জগতে সুপরিচিত ও গণ্যমান্য অধিকাংশ ব্যক্তির রাজনৈতিক ধ্যানধারণা অধশিক্ষিত ব্যক্তিদের মতোই। শুধু বড় বুর্জোয়া রাজনৈতিক দলগুলোতেই নয়, এমনকি বামপন্থী দলগুলোতেও যাদের প্রাধান্য তাদের মধ্যেও এ পরিস্থিতি প্রায় একই রকম।

এ কারণে দেশে রাজনৈতিক প্রচারের বিভিন্ন দিক যদি আমরা লক্ষ্য করি, পর্যালোচনা করি, তাহলে দেখা যাবে যে, এই প্রচারের ক্ষেত্রে জনগণের জন্য শিক্ষার কোন উল্লেখযোগ্য উপাদান নেই, জনগণের চিন্তাচেতনার মান উন্নয়নের কোন চেষ্টা নেই, প্রতিক্রিয়ার পরিবর্তে প্রগতির শক্তি বৃদ্ধির সাংস্কৃতিক ভিত্তি গঠনের লক্ষ্য একেবারেই অনুপস্থিত। এখানকার রাজনৈতিক প্রচার প্রচারণার ক্ষেত্রে যা প্রবলভাবে উপস্থিত সেটি হলো, নির্যাতনের বিরুদ্ধে আবেগময় প্রতিরোধ।

চিন্তা-বর্জিত আবেগের প্রাধান্য সমগ্র দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রচারের ক্ষেত্রে বজায় থাকায় শত্রুকে শারীরিকভাবে চিহ্নিত করা সম্ভব হলেও শত্রুর চরিত্র চিহ্নিত করা শুধু

সাধারণভাবে জনগণই নয়, এমন কি অনেক রাজনৈতিক কর্মীর পক্ষেও সম্ভব হয় না। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, শত্রুকে শারীরিকভাবে চিহ্নিত করা শত্রু সম্পর্কে চেতনার একেবারে প্রাথমিক স্তর, অনগ্রসর ও পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর মধ্যে চেতনা যে স্তরে থাকে সেই স্তর। কাজেই চেতনার এই স্তরে থেকে এমন কোন আন্দোলন সঠিকভাবে পরিচালনা করা সম্ভব নয় যার মাধ্যমে কোন মৌলিক অথবা উল্লেখযোগ্য আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন ঘটানো যায়। কারণ চেতনার এই স্তরে অটকে থেকে কোন আন্দোলন গতি ও শক্তি সঞ্চয় করে লক্ষ্যবস্তুকে আক্রমণ করলে তার দ্বারা কোন বিশেষ শত্রুকে শারীরিকভাবে হটিয়ে দেওয়া অথবা নিশ্চিহ্ন করা যেতে পারে কিন্তু যে আর্থ-সামাজিক ভিত্তিভূমির ওপর দাঁড়িয়ে, যে শোষণ ব্যবস্থার প্রতিনিধিরূপে সেই শত্রু শ্রমজীবী জনগণের বিরুদ্ধে ক্ষমতা ব্যবহার করে, সেই শোষণ ব্যবস্থার অবসান হয় না। এক্ষেত্রে যা ঘটে সেটা হলো, বিদ্যমান শোষণ ব্যবস্থার পরিচালক শারীরিকভাবে পরিবর্তন করে তার স্থলে অন্য এক পরিচালককে ক্ষমতাসীন করা। আমাদের দেশে এখনো পর্যন্ত যেসব আন্দোলন ও সংগ্রাম হয়েছে সেগুলোর মাধ্যমে এ কারণেই কোন মৌলিক পরিবর্তন সাধন সম্ভব হয় নি। এক নির্যাতকের পরিবর্তে আর এক নির্যাতকের আবির্ভাব ঘটেছে।

এখানে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উল্লেখ করা দরকার। শোষণ ও নির্যাতনের মধ্যে খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকলেও শোষণই হলো মূল ব্যাপার। শোষণ যখন ও যতখানি নির্বিঘ্নে হয় তখন ও ততখানি নির্যাতনের প্রয়োজন হয় না, অথবা তার মাত্রা কম থাকে। শোষণ যখন বাধাবিঘ্নের সম্মুখীন হয় তখনই প্রয়োজন হয় নির্যাতনের। বাধা যত বেশি হয়, নির্যাতনের মাত্রাও বৃদ্ধি হয় তত বেশি।

আমাদের দেশে আন্দোলনের ক্ষেত্রে এই দৃষ্টিভঙ্গীর অভাব প্রকটভাবে দেখা যায়। দক্ষিণপন্থী ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিসমূহ ও তাদের রাজনৈতিক দলগুলো শোষণের ব্যাপারটি খুব সতর্কতার সঙ্গে এড়িয়ে গিয়ে এবং জনগণের চোখের আড়ালে রেখে আন্দোলন চালাতে চেষ্টা করে। এদিক দিয়ে তাদের সাফল্যের একটা কারণ এই যে, শোষণের একটানা কষ্টে মানুষ অনেকটা অভ্যস্ত হলেও নির্যাতনের যন্ত্রণা অনেক বেশি। তাছাড়া নির্যাতনের মুখে মানুষের আবেগ যেভাবে উজ্জীবিত করা যায় সাধারণভাবে শোষণ আবেগকে সেভাবে উজ্জীবিত করতে পারে না। এ ব্যাপারে একটা বড়ো পার্থক্য দাঁড়ায় এই যে, শোষণকে বোঝার জন্য যেখানে সমগ্র শোষণ প্রক্রিয়াকে বোঝা দরকার, সেখানে নির্যাতনকে বোঝা যায় অনেক সরাসরি। এমন কি যে নির্যাতন করছে তাকে শারীরিকভাবেও চিহ্নিত করা যায়, লক্ষ্যবস্তু বা টার্গেটকে চোখের সামনে সহজেই দেখা যায়। পুলিশ, মিলিটারি, আমলা, কোন একনায়ক বা ডিক্টেটর, প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্রভৃতি নির্যাতককে সরাসরি চিহ্নিত করে এজন্যই আন্দোলনে সহজেই আবেগ সৃষ্টি ও গতি সঞ্চার করা সম্ভব হয়। কিন্তু এভাবে আন্দোলন দুর্বল গতি এবং বিরাট শক্তি অর্জন করলেও এবং

শারীরিকভাবে শত্রুকে অপসারণ করলেও শোষণ প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকে এবং শোষণকে অব্যাহত রাখার প্রয়োজনে নির্যাতনও জারী থাকে। শুধু এক নির্যাতকের স্থানে উদ্ভব ও আবির্ভাব ঘটে অন্য নির্যাতকের।

বামপন্থী ও বিপ্লবী নকশালবাড়ি আন্দোলনে জোতদার-মহাজন খতম থেকে শুরু করে এরশাদ হটাও আন্দোলনের পরিণতির মধ্যে এ কারণেই এদিক দিয়ে বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। অনেক ত্যাগ এবং রক্তদান সত্ত্বেও এ কারণে শত্রুর শারীরিক পরিবর্তন হলেও সমাজকে শ্রমজীবী জনগণের শত্রুমুক্ত করা সম্ভব হয় না।

সাম্প্রদায়িক শক্তি বৃদ্ধির রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত আলোচনা প্রসঙ্গে উপরোক্ত বিষয়গুলোর প্রাসঙ্গিকতার কারণেই সেগুলো এখানে উল্লেখ করা হলো। এই প্রাসঙ্গিকতা ঠিক কি ধরনের সেটা এখন দেখা যেতে পারে।

সাম্প্রদায়িক শক্তির উত্থান যে সাধারণভাবে সমাজে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বিকাশ ও বৃদ্ধির সঙ্গে সম্পর্কিত, এটা আগেও উল্লেখ করা হয়েছে। এক সম্প্রদায়ের সঙ্গে অন্য সম্প্রদায়ের দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে যখন তাদের পারস্পরিক সম্পর্ককে বৈরীমূলক বা শত্রুতামূলক করা হয়, তখন জনগণের দৃষ্টি মৌলিক আর্থ-সামাজিক সম্পর্কসমূহ বা শোষণ প্রক্রিয়া থেকে সরিয়ে রেখে তাদের চেতনাকে নিম্নস্তরে আটকে রাখা হয়। জনগণের চেতনাকে এভাবে নিচের স্তরে আটকে রাখার ব্যাপারে শোষণের বিষয়টি থেকে বিচ্ছিন্নভাবে নির্যাতনের বিরুদ্ধে আন্দোলন করার একটা ভূমিকা আছে। কারণ শুধু নির্যাতনের বিরুদ্ধে আন্দোলন করলে শোষণের ভিত্তি অটুট থাকে এবং সেই ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির নতুনভাবে শক্তি সঞ্চয় করে।

এই অবস্থাই এদেশে এরশাদ-বিরোধী আন্দোলনের পর সৃষ্টি হয়েছে। শুধু নির্যাতনকারী হিসেবে এরশাদকে আন্দোলনের লক্ষ্যবস্তু নির্ধারণ করে শেষ পর্যন্ত তাকে হটাবার জন্য যে এক দফা আন্দোলন হয়েছে সেটা আপাতদৃষ্টিতে স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে পরিচালিত হলেও, আসলে তা পরিচালিত হয়েছিলো একজন স্বৈরাচারীর বিরুদ্ধে। স্বৈরাচারী ও স্বৈরতন্ত্র এক জিনিস বা সমার্থক নয়। স্বৈরতন্ত্রের একটা নির্দিষ্ট আর্থ-সামাজিক ভিত্তি থাকে, উপরিকাঠামোতে সংস্কৃতি ক্ষেত্র থেকেও তার শক্তির একটা যোগান আসে। কাজেই এগুলোকে উপেক্ষা করে স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে সত্যিকার এবং অর্থবোধক কোন আন্দোলন সম্ভব নয়। একজন বিশেষ স্বৈরাচারী একটি স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থার পরিচালক মাত্র। কাজেই একজন স্বৈরাচারীর অপসারণ হলো শুধু স্বৈরতন্ত্রের একজন পরিচালকের অপসারণ, স্বৈরতন্ত্র উচ্ছেদ নয়। স্বৈরতন্ত্রের একজন পরিচালক অপসারিত হলেও স্বাভাবিক নিয়মে তার স্থলাভিষিক্ত হয় অন্য স্বৈরাচারী। বাংলাদেশে এরশাদ-বিরোধী আন্দোলন, তদ্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠা, ১৯৯১-এর সাধারণ নির্বাচন ইত্যাদির মাধ্যমে এটাই ঘটেছে। এর থেকে কোন বড় অথবা উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন উপরোক্ত রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে

হয় নি।

এখানে জনগণের ব্যাপক আন্দোলন ও নির্বাচনের বিষয়টি সংক্ষেপে উল্লেখ করা দরকার। আন্দোলনের সময়, বিশেষত তার চূড়ান্ত পর্যায়ে, দেখা যায় জনগণ ঐক্যবদ্ধভাবে বাঘের মতো শক্তিশালী হয়ে সাহসের সাথে শত্রুর মোকাবেলা করেন। এভাবেই তাঁরা শত্রুর মোকাবেলা করেছিলেন ১৯৫২ সালে, ১৯৬৯ সালে এবং ১৯৯০ সালে। এই বাঘের মতো অবাধ্য শক্তিকে কিভাবে নিয়ন্ত্রণে এনে এ দেশের বুর্জোয়া শ্রেণী জনগণকে বাধ্য ভেড়ার পালে পরিণত করে সেটা নির্বাচনকে তাদের স্বার্থে ব্যবহার করার মধ্যেই লক্ষ্য করা যায়। নির্বাচনকে এভাবে ব্যবহারের ক্ষেত্রে বুর্জোয়ারা এদেশে ক্রমশ অনেক দক্ষতা অর্জন করেছে। তাদের সুদক্ষ কৌশল তারা ১৯৯০-৯১ সালেও প্রয়োগ করেছে। কাজেই আমাদের যে জনগণ ১৯৯০ সালে বাঘের মতো স্বৈরাচারী এরশাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন, তাকেই তারা ১৯৯১ সালে নির্বাচনের মন্তু পড়িয়ে ভেড়ার পালে পরিণত করে নিজেদের শ্রেণীস্বার্থ উদ্ধার করেছে। একটি স্বৈরাচারী সরকারের স্থলে ক্ষমতাসীন করেছে অন্য একটি স্বৈরাচারী সরকার। গণতন্ত্রের পোশাকে এই স্বৈরাচারী সরকারের সঙ্গে এরশাদের সামরিক স্বৈরাচারী সরকারের কোন উল্লেখযোগ্য তফাত নেই। উভয়েই হলো, একই স্বৈরতান্ত্রিক আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার প্রতিনিধি ও পরিচালক।

কাজেই বিস্মিত হবার কিছু নেই যে, বর্তমান বিএনপি-র শাসন আমলে পূর্ববর্তী যে কোন আমলের মতো এদেশের সবধরনের রক্ষণশীল ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি সরকারী সাহায্য-সহযোগিতা পেয়ে নিজের ক্ষমতা বজায় রেখেছে। শুধু তাই নয়, বর্তমান আমলে গণতন্ত্রের নামে তারা যেভাবে স্বৈরতান্ত্রিক আর্থ-সামাজিক ভিত্তিকে টিকিয়ে রাখছে এবং পশ্চাৎপদ ও সাম্রাজ্যবাদের রপ্তানীকৃত সংস্কৃতির অবাধ পৃষ্ঠপোষকতা করছে, তাতে প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক শক্তি বেশি করে সংগঠিত হচ্ছে।

এই সংগঠিত প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির মধ্যে জামাতে ইসলামী সব থেকে মারাত্মক ও নিকৃষ্ট হলেও এর সহযোগী হিসেবে আছে বি.এন.পি ও তার সরকার এবং অন্যান্য প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়া রাজনৈতিক দল। সমষ্টিগতভাবেই এদের শক্তি বাঙলাদেশে এখন যেভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে তার কোন পূর্ব উদাহরণ আমাদের এই দেশে আর নেই।

এই রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতকে বাদ দিয়ে অথবা ও বিষয়টি বিবেচনা না করে যেমন ইসলামী মৌলবাদের বাঙলাদেশী সংস্করণ জামাতে ইসলামীর শক্তি বৃদ্ধিকে বোঝা যাবে না, তেমনি বাবরি মসজিদ ধ্বংসের ঘটনাকে কেন্দ্র করে সাম্প্রদায়িকতার নতুন উত্থানকেও বোঝা সম্ভব হবে না।

ব্রিটিশ ভারত অথবা পাকিস্তানেও এদেশে সাম্প্রদায়িকতার যে আর্থ-সামাজিক ভিত্তিভূমি ছিলো সেটা বাঙলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর কার্যত অপসারিত হয়েছে। এজন্য

এখানে সাম্প্রদায়িকতা জনগণের একটা অংশের চেতনায় অল্পবিস্তর টিকে থাকলেও তা এমন অবস্থায় নেই যাতে করে তাকে অবলম্বন করে কোন রাজনৈতিক দল আগের মতো সংগঠিত হতে পারে। সেটা সম্ভব নয় বলেই মুসলিম লীগের মতো সাম্প্রদায়িক দল এখন আর নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে কোন শক্তিশালী রাজনৈতিক ভূমিকা পালন করতে পারে না। তার দিন অনেক আগেই শেষ হয়েছে।

জামাতে ইসলামী কোন সাম্প্রদায়িক দল নয়। সাধারণভাবে মৌলবাদী হিসেবে পরিচিত এই দলটি সম্প্রতিশালী শোষক শ্রেণীসমূহের নিকৃষ্টতম রাজনৈতিক প্রতিনিধি। সে হিসেবে এর শ্রেণীচরিত্র যে কোন সাম্প্রদায়িক দলের থেকে অনেক বেশি স্পষ্ট। সাম্প্রদায়িক বিরোধিতার থেকে শ্রেণী-বিরোধিতার উদ্দেশ্যেই রাজনীতি ক্ষেত্রে এরা ধর্মের ব্যবহার করে থাকে। এ কারণে এদের প্রচার-প্রচারণা এবং আক্রমণের মূল লক্ষ্য হলো দেশের কমিউনিস্ট ও বামপন্থী নামে পরিচিত মহল এবং সামগ্রিকভাবে প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক শক্তিসমূহ। জামাতে ইসলামীর বিরোধিতার সময় এর চরিত্রের এই দিকটি বিশেষভাবে খেয়াল রাখা দরকার। এদিকে খেয়াল না রেখে কাজ করলে তার ফলে জোরদার আন্দোলন সত্ত্বেও তাকে সত্যিকার অর্থে আঘাত হানা এবং বিপর্যস্ত ও ধ্বংস করা সম্ভব নয়।

এই বিশেষ দিকটির প্রতি খেয়াল রেখে ধর্মীয় মৌলবাদী জামাতে ইসলামী ও সাম্প্রদায়িক শক্তিকে প্রতিরোধ ও নিশ্চিহ্ন করার আন্দোলন সংগঠিত করতে হলে সে আন্দোলনকে বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে পাকিস্তানী জাতীয়তাবাদের আন্দোলন হিসেবে দেখলে এবং সেই হিসেবে নীতি ও কৌশল নির্ধারণ করলে চলবে না। তার পরিবর্তে আন্দোলনের ক্ষেত্রে শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গি এবং শ্রেণী সংগ্রামের বিষয়টিকেই প্রাধান্যে আনতে হবে, যদিও এই আন্দোলনের অন্যান্য দিককে উপেক্ষা করা চলবে না। অর্থাৎ জনগণের ভাষাগত, জাতিগত, আঞ্চলিক, ধর্মীয় ইত্যাদি গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষাও এই আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হতে হবে।

বাংলাদেশে জামাতে ইসলামীর প্রতিক্রিয়াশীল তৎপরতার বিরোধিতা করতে দাঁড়িয়ে বুর্জোয়া দলগুলো তাকে মূলত বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিরোধী হিসেবেই উপস্থিত করেছে। এটা করতে গিয়ে তারা যে উগ্র বাঙালিপন্যার বহিঃপ্রকাশ ঘটচ্ছে তার চরিত্রও মূলত প্রতিক্রিয়াশীল।

বাংলাদেশ একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এখানে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ হিসেবে বাঙালিরাই ক্ষমতাসীন হয়েছে। এখানে বাঙালিত্ব খর্ব হওয়ার সম্ভাবনা যারা দেখে, তারা মূর্খের স্বর্গেই বাস করে। কারণ ইসলাম ধর্মের কথা বলার অর্থ বাঙালিত্বের অথবা কোন ধরনের জাতীয়তারই সরাসরি বিরোধিতা নয়। এ কারণে জামাতের নেতা গোলাম আজমের পরিচয় দিতে গিয়ে জামাতে ইসলামীর এখন তাকে 'ভাষা সৈনিক', 'মজলুম জননেতা', 'অধ্যাপক' হিসেবেই উপস্থিত করে।

এভাবেই তারা লিফলেট, পোস্টার ও দেয়াল লিখনের মাধ্যমে তাদের প্রচার কাজ চালায়। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, গোলাম আজমকে ইসলামের নেতা হিসেবে উপস্থাপিত করার থেকে এভাবে উপস্থিত করেই তারা বর্তমান জামাত-বিরোধী আন্দোলনে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করেছে। শুধু তাই নয়, তারা এখন বুদ্ধিজীবী হত্যাদি এবং ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় দিবস পালন করে বাঙালি জাতির পক্ষে নিজেদের মতো করে বক্তব্য প্রদান করেছে। এদিক দিয়ে বিচার করলে জামাতীরা কোন ক্রমেই বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিরোধী নয়। তারা হলো, বিশ্বব্যাপী জামাতে ইসলামীর মৌলবাদী আন্দোলনের বাঙালি সংস্করণ মাত্র। তাদের এই বাঙালি চরিত্র অস্বীকার করা বাস্তবতাকে অস্বীকার করার শামিল। কিন্তু এই বাস্তবতা অস্বীকার করেই বুর্জোয়া রাজনৈতিক দলগুলো জামাতে ইসলামীর বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছে। এই আন্দোলনে বাঙালি জাতীয়তাবাদ অর্থাৎ এক ধরনের উগ্র বাঙালি জাতীয়তাবাদকে অবলম্বন করেই অগ্রসর হতে চাইছে। জামাতে ইসলামীর সঙ্গে বাঙালি জাতীয়তাবাদের কোন মৌলিক বিরোধ নেই। সে বিরোধ মুসলিম লীগ শাসন আমলে সাম্প্রদায়িক কারণে থাকলেও এখনকার পরিস্থিতিতে আর নেই। তবে একথা সত্য যে, জামাতীরা উগ্র জাতীয়তাবাদী বাঙালি নয়। এদিক দিয়েই তাদের সঙ্গে অন্যান্য বাঙালি বুর্জোয়া রাজনৈতিক দলের পার্থক্য।

জামাতে ইসলামীর বিরোধিতা করতে দাঁড়িয়ে অন্যান্য বুর্জোয়া রাজনৈতিক দল উগ্র বাঙালি জাতীয়তাবাদের আশ্রয় গ্রহণ করার ফলে এই আন্দোলনের গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল চরিত্র অনেকাংশে বিলুপ্ত হচ্ছে। কারণ উগ্র জাতীয়তাবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা এবং ধর্মীয় মৌলবাদের মতোই এই প্রতিক্রিয়াশীল দৃষ্টিভঙ্গী ও মতবাদ। এদের উভয়ের চরিত্রই ফ্যাসিস্টসুলভ।

জামাতে ইসলামীর বিরুদ্ধে আন্দোলনে এইভাবে উগ্র বাঙালি জাতীয়তাবাদকে ব্যবহার করার ফলেই জামাতের বিরুদ্ধে আন্দোলন যেভাবে ও যতখানি ব্যাপকতা ও গভীরতা লাভ করবে দরকার ছিলো সে ব্যাপকতা ও গভীরতা এই আন্দোলন লাভ করছে না। এই ব্যাপকতা ও গভীরতা সারা দেশে শ্রমজীবী জনগণের—শ্রমিক, কৃষক, বিভিন্ন ধরনের গ্রামীণ ও শহুরে পেশাজীবীর—সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া সম্ভব নয়। শ্রমজীবী জনগণের স্বার্থের সঙ্গে উগ্র বাঙালি জাতীয়তাবাদের কোন সম্পর্ক নেই। সে সম্পর্ক আছে মধ্য শ্রেণীর এক সুবিধাভোগী অংশের যারা বাংলাদেশ রাষ্ট্রে বাঙালি হিসেবে পাকিস্তানি আমল থেকে এখন হাজার গুণ সুবিধা লাভ করে নিজেদের ধনসম্পদ সঞ্চয় ও বৃদ্ধি করেছে, লুটতরাজ করে কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি হস্তগত করেছে অথবা হস্তগত করার স্বপ্ন দেখছে।

জনগণের স্বার্থের সঙ্গে সম্পর্ক না থাকার কারণে উগ্র বাঙালি জাতীয়তাবাদ বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থায় শ্রমিক-কৃষকের কাছে কোন মতেই ফেরী করা সম্ভব নয়। এবং সেটা সম্ভব নয় বলেই প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির জামাতে ইসলামীর বিরুদ্ধে,

ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহারের বিরুদ্ধে, এমন কি সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে আন্দোলনকে শ্রমজীবী জনগণের মধ্যে বিস্তার ও সম্প্রসারণ করতে উৎসাহী নয়। এই আন্দোলনকে তারা নাগরিক আন্দোলন হিসেবে টিকিয়ে রাখতে শুধু আগ্রহী নয়, বদ্ধপরিকরও বটে।

সার্বভৌম বিদ্যমান এই রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতেই বর্তমান সাম্প্রদায়িকতার নতুন উত্থানকে বিচার করতে হবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে পুরো সমস্যাটিকে বিচার করলে দেখা যাবে যে, যেভাবে এখন আন্দোলন পরিচালিত হচ্ছে সেভাবে তা পরিচালিত হলে জামাতে ইসলামীকে প্রচণ্ডভাবে আঘাত হানা সম্ভব হবে না। এবং এর ফলে জামাতে ইসলামী যদি আঘাতপ্রাপ্ত ও ধ্বংসও হয়, তাহলেও তার স্থলে উগ্র বাঙালি জাতীয়তাবাদ এমনভাবে আবার এদেশে শক্তিশালী হবে, যাতে সে পরিণাম জনগণের জন্য সৃষ্টি করবে আর এক নির্যাতিতমূলক ও দুঃসহ পরিস্থিতি।

কাজেই বর্তমানে জামাতে ইসলামীর মতো ধর্মীয় মৌলবাদী শক্তি এবং সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে আন্দোলনকে যদি শ্রমজীবী জনগণের স্বার্থে পরিচালনা করে তাকে প্রকৃত প্রগতিশীল পরিণতির দিকে এগিয়ে নিতে হয় তাহলে জামাতে ইসলামীকে ও সাম্প্রদায়িক শক্তিকে বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিরোধী শক্তি হিসেবে দাঁড় করানোর চেষ্টা থেকে বিরত হয়ে তাকে জনগণের গণতান্ত্রিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থবিরোধী শক্তি হিসেবেই দাঁড় করাতে হবে, তার সঠিক পরিচয় এভাবেই জনগণের সামনে উপস্থিত এবং উদঘাটন করতে হবে। অর্থাৎ জামাতে ইসলামীর মতো ক্ষতিক্রিয়াশীল শক্তিকে পরাজিত করতে হলে প্রগতিশীল শক্তিকে জাগ্রত করেই সেটা করতে হবে। এভাবে আন্দোলন ও সংগ্রাম করা ছাড়া এ আন্দোলনের ক্ষেত্রে অন্য কোন বিকল্প নেই।

এ প্রসঙ্গে আবার একটি বিষয়েরও উল্লেখ করা দরকার। উগ্র বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রবক্তারা তাদের দৃষ্টিভঙ্গী ও মতবাদকে অনেক সময় সরাসরি ব্যক্ত না করে নিজেদেরকে স্বাধীনতার সপক্ষ শক্তি এবং জামাতে ইসলামীকে স্বাধীনতার বিপক্ষ শক্তি হিসেবে উপস্থিত করে থাকে। এটা এক চরম বিভ্রান্তিকর ব্যাপার। কারণ ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার বিপক্ষ শক্তি জামাতে ইসলামী স্বাধীনতার বিপক্ষে যেভাবে ছিল এখন আর তারা সে ভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা বিরোধী নয়। তারা বাংলাদেশে ইসলামের রাজত্ব কায়েম করার অর্থ বাংলাদেশকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করা নয়। সে কাজ করে এখন আর তাদের কোন লাভ নেই। এই ভূখণ্ডেই তারা বাঙালি ইসলামপন্থী হিসেবেই নিজেদের ক্ষমতা সংহত করতে চায় এবং সে হিসেবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা রক্ষায় তারাও আগ্রহী। কাজেই, বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার বিরুদ্ধে জামাতে ইসলামী এখন চক্রান্ত করছে এটা মনে করা কল্পনাকে আশ্রয় করে মতামত খাড়া করারই এক উদাহরণ মাত্র।

কিন্তু অন্য অর্থে জামাতে ইসলামী নিশ্চয়ই বাংলাদেশের স্বাধীনতা বিরোধী।

সেই বিরোধিতার মূলে আছে তাদের মৌলিক প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্র এবং সাম্রাজ্যবাদী ও মধ্যপ্রাচ্যের চরম প্রতিক্রিয়াশীল রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে এদের নিবিড় সম্পর্ক। এই চরিত্র ও সম্পর্কের কারণে তারা দেশকে বিক্রি করে নিজেদের দামসম্পদ বৃদ্ধি করতে এবং দেশের জনগণের সকল স্বার্থ জলোঞ্জলি দিয়ে বৈদেশিক শক্তিসমূহের খেদমত করতে নিযুক্ত।

এখানে লক্ষ্য করার বিষয় যে, এক্ষেত্রে জামাতে ইসলামীর মতো রাজনৈতিক দলই ব্যতিক্রম নয়। ক্ষমতাসীন বি.এন.পি. জাতীয় পার্টি, আওয়ামী লীগ ইত্যাদি বুর্জোয়া রাজনৈতিক দলগুলো যেভাবে বিশ্বব্যাঙ্ক, আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল, এশীয় উন্নয়ন ব্যাঙ্ক এবং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদসহ অসংখ্য বৈদেশিক প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির সঙ্গে সম্পর্কিত ও তাদের আচ্ছাবহ, তাতে বাংলাদেশের প্রকৃত স্বাধীনতার বিরোধী তারাও। এদিক দিয়ে জামাতে ইসলামীর সঙ্গে উপরোক্ত দলগুলোর কোন পার্থক্য নেই।

কিন্তু পার্থক্য না থাকা সত্ত্বেও জনগণের চেতনায় এই পার্থক্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই জামাতে ইসলামীর বিরোধিতা করতে দাঁড়িয়ে বুর্জোয়া রাজনৈতিক দলগুলো তাকে স্বাধীনতার বিপক্ষ শক্তি হিসেবে অহরহ প্রচার করছে। এই প্রচারের সময় তারা এমনভাবে বক্তব্য উপস্থিত করছে যাতে মনে হয় যে ১৯৭১ সালে তারা যেভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা বিরোধী ছিলো আজও সেভাবেই তারা বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরোধী। অথচ আসল ব্যাপার মোটেই তা নয়। ১৯৭১ সালে জামাতে ইসলামী ছিলো বাংলাদেশ নামে একটি নতুন স্বাধীন ও স্বতন্ত্র রাষ্ট্র সৃষ্টিরই বিরোধী। আজ সে রাষ্ট্র বাস্তবত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং জামাতে ইসলামী এই রাষ্ট্র কাঠামোর মধ্যেই রাজনীতি করছে। এই নতুন রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে থেকে স্বাধীনতার বিরোধিতা করা এবং ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরোধিতা করা মোটেই এক ব্যাপার নয়। অথচ এ দুইকে অভিন্নভাবেই বাংলাদেশে জামাত বিরোধী বুর্জোয়া রাজনৈতিক দলগুলো এখন উপস্থিত করছে। তাদের পক্ষে এটা স্বাভাবিক। প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির জন্য এছাড়া অন্য কোন পথ খোলা নেই।

কিন্তু প্রতিক্রিয়াশীলদের জন্য অন্য পথ খোলা না থাকলেও প্রগতিশীলদের জন্য সে পথ খোলা আছে। এই পথে অগ্রসর হয়ে বর্তমানের রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে শ্রমজীবী জনগণের মৌলিক দাবী-দাওয়াগুলোকে ভিত্তি করে রাজনৈতিক আন্দোলন ও সংগ্রাম সংগঠিত করাই হলো তাদের পথ। এই পথে অগ্রসর হলে একদিকে যেমন জামাতে ইসলামীর মতো চরম প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক শক্তির পরাজয় এবং উচ্ছেদ হবে, তেমনি জনগণের মুক্তির পথও প্রশস্ত হবে এবং ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ নামে যে যুদ্ধ হয়েছিলো সে যুদ্ধ তার সঠিক পরিণতি লাভ করবে।

মানবাত্মা কাঁদে ধর্মের প্রহারে

হায়াৎ মামুদ

প্রায় অর্ধশতাব্দী কাল পরে ভারতবর্ষীয় উপমহাদেশ ধর্মোন্মাদনার তীব্র হলাহল পান করে তাণ্ডব নৃত্যে নেমেছে। ১৯৫০ সালের পরে সারা উপমহাদেশ জুড়ে এত ভয়াবহ ও ব্যাপক ধর্মভিত্তিক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আর কখনো হয় নি! শান্তিই যেখানে সকল ধর্মের মূল গন্তব্যভূমি সেই ধর্মকে নিয়ে কত অশান্তি কত রক্তপাত ও মানুষের কত অবর্ণনীয় লাঞ্ছনা হতে পারে এ শতাব্দীর শেষ দশক তাও প্রত্যক্ষ করল। বৃহত্তর মানবপরিবারের মধ্যে বিভাজনপ্রক্রিয়া ক্ষুদ্রতার রক্তপথে শুরু হয়, একালবর্তী পরিবার যেমন ভাঙে সামান্যতম তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয়ে মনকষাকষি নিয়ে। সেই ক্ষুদ্রতা কখনও গোত্র নিয়ে, ভাষা নিয়ে, বর্ণবিচার (সে-বর্ণ গোত্রচর্ম কিংবা বংশকৌলিন্য যার ভিত্তিতেই হোক না কেন) নিয়ে, ধর্মবিশ্বাস নিয়ে। একেক জনগোষ্ঠীতে একেক রকম। কোনখানে কোনটি সংহতির ভিতরে চিড় ধরাবে, অনেক কালের মৈত্রীবন্ধনে ধৃত বিভিন্ন গোষ্ঠীকে যুদ্ধে নামাবে তার পরিপ্রেক্ষিত তৈরি হয়ে থাকে বিশেষ জনগোষ্ঠীর নিজস্ব ইতিহাসের গভীরে। এই শতাব্দীতে হিটলারের আর্য়শোণিত রক্ষায় ইহুদিনিধনযজ্ঞ থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত পৃথিবীতে যত সাম্প্রদায়িক সহিংসতা ঘটে যাচ্ছে তাতে প্রত্যক্ষ প্রমাণ মিলছে যে, ধর্মের ধ্বজা উড়িয়ে মানুষ, মানুষের হৃদয় ও বিবেক, মনুষ্যত্বকে যে-ভাবে গুঁড়িয়ে ফেলা যায় তেমন আর কোনো কিছু দিয়েই সম্ভব হয় না। যে-সমস্ত দেশ আন্তর্দেশিক বিচারে সন্দেহাতীতভাবে অগ্রবর্তী—জনসাধারণের উপার্জনক্ষমতায়, শিক্ষাদীক্ষায়, আধুনিক মননবৃত্তি ও জীবনধারা আত্মীকরণে অগ্রগামী তারা পর্যন্ত ধর্ম নিয়ে কী পরিমাণ হানাহানিতে লিপ্ত হতে পারে তার প্রমাণ ছড়িয়ে আছে আয়ারল্যান্ডে, বসনিয়ায়। শত শত বৎসর ধরে ধর্মই সংহতিবিধায়ক শক্তি হিসেবে সক্রিয় ছিল, মানবসভ্যতার বিকাশে অনুকূল শক্তি হিসেবে প্রেরণা যুগিয়ে এসেছে। বোঝাই যায়, মানুষের মনে ধর্মচেতনার (যদি তা কেবলই প্রাতিষ্ঠানিকও হয় তবুও) ব্যাপারটি বড়ো দূরযানী, অলক্ষ্যে, গোপনে কাজ করে চলে। সদ্যপ্রয়াত সোভিয়েত ইউনিয়নে ও পূর্ব-ইয়োরোপে ধর্মের পুনরুত্থান এর সাক্ষী। ধর্মের ক্ষমতা বা প্রভাব সম্বন্ধে তর্ক আজ সর্বাংশে নিষ্ফল। এখন বিশ্বয়বিমূঢ় চিন্তে অবলোকনের সময় এসেছে সভ্যতাদ্বংসের জন্য প্রতিকূল শক্তি হিসেবে ধর্ম কত দূর বৈনাশিক হতে পারে।

আমাদের উপমহাদেশে ধর্মের অবস্থান ও ভূমিকা যেমন প্রাচীন তেমনই জটিল। ভাগ৩৭এর সমুদয় জনসংখ্যা আদিত্তে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসংখ্যা এখনও মূলত প্রকৃতিপূজক, যেমন ছিল এককালে গ্রিস। হিন্দু ধর্ম এ অর্থে ‘ধর্ম’ নয় যে-অর্থে বৌদ্ধ, জেনা, ইহুদি ধর্ম, খ্রিস্টধর্ম ও ইসলামকে ‘ধর্ম’ বলা যায়। হিন্দু ধর্ম স্থানভিত্তিক জীবন প্রণালীর এক সহজবোধ্য নাম, গ্রিকদের দেওয়া অনেক পরবর্তীকালে। জীবন চর্চার অজস্র রকমফের এর আশ্রিত বলেই ‘হিন্দু’ বহু দেবদেবীপূজক হতে পারে, একেশ্বরবাদী হতে পারে, আবার নাস্তিকও হতে পারে। অন্য কোনো ‘ধর্মই এই স্থিতিস্থাপকতা নেই। এবং এই স্থিতিস্থাপক গুণাবলির জন্যই এর শোষণশক্তি, গ্রাসক্ষমতা অপ্রতিরোধ্য। বৌদ্ধ যুগেও পুরো উপমহাদেশ কখনও পুরোপুরি বৌদ্ধ হয় নি, ‘পাঁচশ’ বছরের মুসলিম রাজত্ব সমগ্র জনসাধারণকে ইসলামে ধর্মান্তরিত করতে পারে নি। দুশ বৎসরব্যাপী খ্রিস্টান ইংরেজদের শাসনও ভারতবর্ষকে খ্রিস্টধর্মাবলম্বী দেশে পরিণত করতে ব্যর্থ হয়েছে। ফলে এই উপমহাদেশ বহু ধর্ম, বহু মত ও পথের জীবনচর্চা, বহু ভাষা ও সংস্কৃতি সুদীর্ঘকাল ধরে পাশাপাশি অবস্থান করেছে। সমগ্র গ্রিস প্রকৃতিবাদী জীবনধারা ছেড়ে খ্রিস্টান হয়েছে। স্পেন খ্রিস্টান থেকে মুসলমান হয়েও ফের খ্রিস্টধর্মে ফিরে গেছে। ভারতে এ জাতীয় ব্যাপ্তিতে ধর্মান্তরীকরণ কখনও হয় নি, সম্ভবত এ দেশবাসীর প্রাচীন জীবনধারার ঐ গ্রাসধর্মিতার ফলেই এমনটি সম্ভব ছিল না। ফলে কোনো ধর্মই এখানে খাঁটি বা নির্ভেজাল থাকে নি। পারস্পরিক সহাবস্থানে সংমিশ্রণ ঘটেছে, পারস্পরিক অভিঘাতে যুগে যুগে এক ধর্মের প্রভাবলয়ে অন্য ধর্মও এসে গেছে। এই সহাবস্থান বা সংমিশ্রণ সর্বদা শান্তিপূর্ণভাবে হয়েছে এমন নয়। দুর্বলের ওপর পীড়ন সবলের স্বভাবধর্ম, এই অত্যাচারী স্বভাবের ওপরে উঠতে সাহায্য করে একমাত্র হৃদয়ধর্ম, সভ্যতাজ্ঞান ও মনুষ্যতাবোধ। যেখানে এ সবের ন্যূনতা সেখানে সবলের পেশীশক্তি জয়ী হয়। ভারতবর্ষ থেকে বৌদ্ধধর্ম প্রায় বিতাড়িত হয়েছে, অথচ এখানেই তার জন্ম। এমনতরো ঘটনা দুঃখজনক, অ-সভ্য, মর্মান্তিক—সবই ঠিক, তবু ঘটেছে। শুধুই ধর্মের বাইরের চেহারাকে প্রধান করে তুললে তার দানবীয় স্ব্ফীতির চাপে ভিতরে মনুষ্যধর্ম মরে যায়।

উপমহাদেশে হিন্দু-মুসলিম সমস্যা মুখ্যত রাজনৈতিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক, গৌণত ধর্মীয়। ইতিহাসের এক বিশেষ সময়ে ধর্মের প্রশ্নই মুখ্য ভূমিকা নিল এবং তার ভিত্তিতেই দেশ বিভক্ত হল। ভাবা গিয়েছিল, এতেই পরিত্রাণ মিলবে। পরিত্রাণ যে এত সহজে মেলে না তার প্রমাণ বাংলাদেশ। আরো প্রমাণ শিখ-হিন্দু মারণোৎসব, বছরের পর বছর।

অযোধ্যায় বাবরি মসজিদ বনাম রামমন্দির উপাখ্যান ধর্মের আবরণে রাজনীতি সংক্রমণের এক সাম্প্রতিকতম ঘটনামাত্র। পৃথিবীর পণ্ডিতবর্গ জানেন, রামের

কাহিনী অভ্যন্তরীণ বিতর্কিত ও জটিল একটি বিষয়। রাম ও রামায়ণের জন্মভূমি আদৌ ভারতবর্ষ কি না তা নিয়েও মতভেদ বর্তমান। বিষয়টি সমাজ-নৃত্বের আওতাভুক্ত। রামমন্দিরের গল্প খুব বেশি দিন আগে ভারতবর্ষে চালু হয়নি। ঘটনাটি যদি সত্যও হয় তাহলেও কিছু এসে যায় না; স্থাপত্য-বিশেষজ্ঞরা জানেন কত হিন্দু মন্দির, বৌদ্ধ মন্দির ও মসজিদে যৌথ স্মৃতিচিহ্ন রয়ে গেছে; মসজিদ ভেঙে মন্দির যেমন হয়েছে, তেমনি মন্দির ভেঙে মসজিদও কম হয় নি, আবার বৌদ্ধ উপাসনালয়ের ওপরে হিন্দু মন্দিরও কম ওঠেনি। ফলে ইতিহাসের কোন পর্বে কোন ধর্মের উপাসনাগৃহের ধর্গাস্তরীকরণ ঘটেছে সেই ঠিকুজি খোঁজা উন্মাদের পণ্ডশ্রম। অথচ এমন একটা হাস্যকর ‘আবিষ্কার’কে রাজনৈতিক স্বার্থে ধর্মের মোড়কে পরিবেশন করা ভারতবর্ষে শুধু সম্ভবই হল না, সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর বিশ্বাসযোগ্যতাও অর্জন করল এবং ভারতের ধর্মোদ্ধার জঙ্গী হিন্দুরা জেহাদ ঘোষণা করে বসল। উত্তরপ্রদেশ সরকার কেন্দ্রের সঙ্গে যে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তার তুলনা নেই, সর্বোচ্চ আদালতের রায় যেভাবে তারা অমান্য করেছে পৃথিবীর কোনো সভ্য সমাজে তা সম্ভব নয়। বাবরি মসজিদ ভাঙার এই একটি ঘটনায় ভারতের ইতিহাস যেভাবে লঙ্ঘিত হল, ‘গণতন্ত্রী’ ভারত বিশ্বের রাষ্ট্রপুঞ্জ যেভাবে হেয় হল, ‘ধর্মনিরপেক্ষ’ ভারত যেভাবে বুলিসর্বস্ব মিথ্যায় পরিণত হল সে সবের সম্মিলনে ভারতবর্ষ অনেকদিন যাবত পঙ্গু থাকবে, থাকতে বাধ্য।

৩

অযোধ্যায় বাবরি মসজিদ ক্ষতিসাধনকে কেন্দ্র করে ভারতবর্ষে প্রলয়ঙ্করী হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা বেধেছে। দাঙ্গা কখনও চিরদিন চলে না, এ দাঙ্গাও একদিন থামবে। ধর্মধ্বজী রাজনীতিকদের কোনো ক্ষয়ক্ষতি হবে না, যারা আগুনে ঝাঁপ দেওয়া পতঙ্গের মতো জ্বলবে পুড়বে মরবে তারা নিরীহ মানুষ। সংখ্যার তারতম্য থাকবে, কিন্তু মৃতের দলে শুধু মুসলমান থাকবে না, হিন্দুও থাকবে, পুরুষ ও নারী থাকবে, বৃদ্ধ ও শিশুও থাকবে। সব থিতুয়ে আসার পর দেখা যাবে দরিদ্র অশিক্ষিত অসংস্কৃত মানুষের কোনো লাভ হয় নি, স্বার্থ উদ্ধার হয় নি। রাজনীতির যূপকাঠে এরা বলি। ধর্মের বিপুল ক্ষমতা অন্ধ ও বধির, তার হৃদয় নেই। যারা তাকে ব্যবহার করে তাদের হৃদয় বন্ধ হলে ধর্ম তার ক্ষুধার বলি করে মানুষকেই।

ভারতের অন্যান্য ও ধর্মলেশহীন এই সহিংসতার প্রতিশোধ বা প্রতিষেধক হিসেবে বাংলাদেশেও আগুন জ্বলল। আগুনের দহনক্ষমতা আছে, কিন্তু না-জ্বালালে সে জ্বলতে পারে না। ভারতের উদাহরণে বাংলাদেশে আগুন জ্বালানো হল। এই নিষ্ঠুর সত্যকে কেউ খোলা চোখে না দেখতে চাইলে তিনি অন্ধ। আগুন যারা জ্বালান তারা ধর্মোদ্ধার সাম্প্রদায়িক শক্তি। কিন্তু বাংলাদেশের গ্রামেগঞ্জে যে নিরীহ খেটে-খাওয়া জীবনমুত সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায় তাদের ধন-মান-প্রাণ বিসর্জন দিল তারা

তো জানে যে দায়ী শুধু সাম্প্রদায়িক জামায়াত-শিবির চক্রই নয়, যারা তাদের বাঁচাতে পারত সেই রাষ্ট্রশক্তি তাদের বাঁচাল না, যারা সাম্প্রদায়িক নয় সেই গণতান্ত্রিক শক্তিও বাঁচাল না। অথচ এদের কেউ তো নয়ই, এমনকি বন্ধ উন্মাদও কখনও ভাববে না যে বাবরি মসজিদ ধ্বংসের পিছনে এদেশের হিন্দুদের বিন্দুতম ভূমিকা ছিল, কিংবা নৈতিক বা যৌক্তিক সমর্থন ছিল, কিংবা অন্তর্গত উল্লাস ছিল কোনো। বরং স্বাভাবিকভাবেই তারা ত্রাসে বিপন্নতার বোধে অর্ধমৃত হয়ে ছিল এই বিবেচনায় যে ভিনদেশী রাষ্ট্রের ঐ বর্বর ঘটনা নিঃসম্পর্কিত দূরত্বের ব্যবধান পেরিয়েও তাদের শক্তি দেবে। ন্যায় ও অন্যায় উভয়েরই বাইরে দাঁড়িয়ে যারা ধর্মের ধ্বজাবাহী অধার্মিকদের শক্তি মাথা পেতে নিতে বাধ্য হয় তাদের মতো অসহায় আর কে? এবং যারা শক্তি দেয় তাদের মতো হৃদয়হীন বিবেকবর্জিত কাণ্ডজ্ঞানহীন জন্মাদ আর কে?

কিন্তু বাংলাদেশে এমন কলঙ্কজনক ঘটনা ঘটবার পরিপ্রেক্ষিত ধীরে ধীরে অনেক দিন ধরে এখানে তৈরি হয়েছে। দু-এক বৎসরে নয়, গত ষোল-সতের বছর ধরে ইতিহাসের চাকা পিছন দিকে নিতে নিতে তাকে এই জায়গায় এনে ফেলেছি আমরা। এ সত্য উপলব্ধি করবার দিন এসেছে যে, ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে যে নতুন বাঙালীর অভ্যুদয় তার যাবতীয় গৌরব ও গর্বকে নস্যাৎ করার প্রক্রিয়া শুরু হয় একালের শ্রেষ্ঠ বাঙালী বঙ্গবন্ধুকে হত্যা ও সেইসঙ্গে গণতন্ত্রনিধনের মাধ্যমে। শেখ মুজিবের ত্রুটি ও দুর্বলতা ছিল অনেক, কিন্তু একমাত্র ঘির্বোধ ও নির্বিবেক মানুষ ছাড়া কেউ বলবে না যে তিনি হৃদয়বান সাহসী পুরুষ ছিলেন না বা তিনি দেশপ্রেমী ছিলেন না। এই মৃঢ় নির্দয় চক্রান্তপ্রবণ দেশে তিনি ও-রকম ছিলেন বলেই তাঁর ভয়াবহ অপমৃত্যু ঘটল। তাঁর হত্যার পর থেকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিরোধী যত ক্রিয়াকাণ্ড ক্রমান্বয়ে সংঘটিত হয়েছে তার অংশভাগ বিভিন্ন সময়ের রাষ্ট্রপরিচালকরাই শুধু নন, সেইসঙ্গে অন্যান্য রাজনৈতিক দলও। ধর্মধ্বজ দল হওয়া সত্ত্বেও জামায়াতে ইসলামকে ছাড়পত্র দিয়েছিলেন জিয়াউর রহমান, উল্টোপন্থী অন্য দলেরা তখন জামায়াতকে ভেবেছে গণতান্ত্রিক শক্তি। এরশাদের মুখের কথায় ফরমান জারি হয় যে রমজান মাসে শহরের ভোজনালয় বন্ধ, এবং সকলে তা বিনাতর্কে মেনে নেন, কোনো দলই তখন প্রতিবাদ করে বলে নি যে ঐ খেয়ালখুশি অবাস্তব, অযৌক্তিক, অনৈতিক। রাষ্ট্রধর্ম যখন ইসলাম করা হল তখনও ঐ ঘটনার নীতিজ্ঞানহীনতা নিয়ে কেউ কথা বলেন নি, অথচ বলা দরকার ছিল যে বহুধর্মীয় রাষ্ট্রে সংখ্যাগরিষ্ঠতার অজুহাতে কোনো বিশেষ একটি ধর্মকে ‘রাষ্ট্রধর্ম’ ঘোষণা করা ন্যায়বোধের পরিপন্থী। সংবিধান সংশোধন করে প্রারম্ভে মুসলমানের শাস্ত্রবচন উদ্ধৃত হল তখন একবারের জন্যও কেউ ন্যায়শাস্ত্রের যুক্তি দেখান নি যে এ দেশ স্বাধীন হয়েছে শুধু সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের অশ্রু ও শোণিতেই নয়, এর মাটিতে মিশে আছে সংখ্যালঘু হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টানদের আত্মত্যাগ ও বীরত্বের শত চিহ্ন। শত্রুসম্পত্তি আইন নিয়ে কারো যুক্তিবোধ প্রশ্ন তোলে না, কারো বিবেক মর্মাহত হয় না—হিন্দু

শত্রু হয় কী করে, সে তো এ মাটিরই সন্তান। সত্যের কাছে যাওয়া নয়, সত্যকে ভালবাসাও নয়, শুধুই নিজের স্বার্থ এবং লাভ-লোকসানের খতিয়ান কষতে কষতে একান্তরের বীর বাঙালী আজ কৃমিকীটে পরিণত হয়েছে।

১৯৯০ সালে যখন এরশাদ সরকারের ইচ্ছায় ও সহযোগিতায় সারা বাংলাদেশব্যাপী মন্দির ধ্বংসের উৎসব চলে তখনই প্রথম প্রত্যক্ষ করা গিয়েছিল বাঙালী মুসলমানদের হৃদয়ের পচন। ১৯৭১-এ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াইয়ের অভিজ্ঞতা যে সহমর্মিতা ও বন্ধুত্বের বন্ধন তৈরি করেছিল তার ফাটল প্রথম ধরা পড়ে তখনই, কারণ অদাস্তাবাজ সাধারণ মুসলমানের চোখে সেদিন বেদনাবোধ ছিল না, ছিল ঔদাসীণ্য। '৭৫ থেকে '৯০ কালপরিধির অবদান ছিল অন্তরের সেই নিঃসাড়তা। তখনই বোঝা গিয়েছিলো যে, একান্তরের স্মৃতির চক্ষু লজ্জা নকবুই ঘুচিয়ে দিল, অতঃপর ভারতের যাবতীয় সাম্প্রদায়িক অপকর্ম আমাদেরও লোভ ও লালসাকে উন্মথিত করে পাপের পঙ্কে ডোবাবে। ১৯৯২-এর এই পাপে একান্তরের পুণ্য সব ধুয়ে মুছে গেল।

৪

নির্দোষী নিরীহ দরিদ্র একটি মানবগোষ্ঠী স্বাধীন বাংলাদেশে অন্যায়ভাবে যে রকম নির্যাতিত হল তাতে এদেশের রাষ্ট্রশক্তির ওপরে ভরসা বা রাজনৈতিক দলগুলোর ওপরে আস্থা সজ্জন শুদ্ধশীল কোনো মানুষের ক্ষীর থাকবার কথা নয়। দাস্তাবাজদের তত দোষ নেই, যতখানি দোষ তাদের যারা দাস্তাকে প্রশ্রয় দেয় বা থামাতে ব্যর্থ হয়। দরিদ্র মানুষের লোভ অপ্রতিরোধ্য, অশিক্ষিত মানুষের বিবেক নির্বাক। সাম্প্রদায়িক সহিংসতায় যারা অংশ নিয়ে তারা দরিদ্র ও অশিক্ষিত। কিন্তু যারা উদ্বুদ্ধ করে তারা দরিদ্রও নয়, অশিক্ষিতও নয়; তারা দল গড়ে, দল ভাঙে, তারা রাজনীতি করে, তারা গদিতে বসে রাজ্য চালায় বা দেশ ডোবায়।

১৯৫০ সাল থেকে দাস্তা দেখে আসছি। ১৯৭১-এ হাত বিশ্বাস পুনরুদ্ধার করেছিলাম। সে বিশ্বাস আবার ছিনতাই হয়ে গেল। নিরীহ ও নিষ্পাপের শব ও সম্পত্তির ওপরে জীবনধারণের গ্লানি আর সহ্য হয় না।

এই মুহূর্তে আমার দুর্দমনীয় কামনা একটিই, মাত্র একটি : এদেশের সমস্ত সংখ্যালঘু হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান এ দেশ থেকে বিতাড়িত হোক, নতুবা যে পদ্ধতির আশ্রয় নিয়েছি সেই পদ্ধতিতে বিতাড়ন করি, এবং ভারতের বঙ্গভাষী যত মুসলমান যেখানে আছেন সকলকে উদ্বাস্ত নৃত্যে আহ্বান করি কিংবা আমাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার তোয়াক্কা না রেখে তাঁরা বিতাড়িত হয়ে এখানে চলে আসুন।

এতে দেশ তলিয়ে যাবে কি ভাসবে সে ভাবনা আমার নয়, অন্তত মানুষ বাঁচুক। এবং বিবেকের নিরন্তর দংশন, অপরাধবোধের ছালা এবং মনুষ্যত্বের অপমান থেকে আমার মতো একান্তই ছাপোষা শান্তিপ্রেমী সরল মুসলমান বাঙালী পরিত্রাণ পাক।

ধর্মরাষ্ট্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও রাষ্ট্রধর্ম

আনিসুজ্জামান

এই বক্তৃতার শিরোনামটি বেশ ভারি কিছু শোনাতেও কোনো তদ্বাকথার অবতারণা করে আমি আপনাদের ভারাক্রান্ত করব না। আমার সে অভিপ্রায় নেই, যোগ্যতাও নেই। ধর্ম ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক বিষয়ে আমাদের যে-অভিজ্ঞতা, আমি সে সম্বন্ধে কিছু বলব এবং তার পটভূমি সম্বন্ধে দু-চার কথা বলব। অনেকের মতো আমিও ইংরেজ আমলে জন্মেছি, পাকিস্তান আমলে বড় হয়েছি এবং বাংলাদেশ আমলে মরতে বসেছি। ইংরেজ আমলের মতো পাকিস্তানেরও গোড়ার দিকে রাষ্ট্রের সঙ্গে ধর্মের কোনো সম্পর্ক ছিল না ; তার পরে পাকিস্তান ইসলামী রাষ্ট্র হলো ; অতঃপর বাংলাদেশ করে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র গড়লাম ; তারপর ধর্মনিরপেক্ষতা বাদ দিলাম এবং তারও পরে রাষ্ট্রধর্ম করলাম। আমার মনে পড়ে, উনিশ শতকের দ্বিতীয়া ব্রাহ্মনেতা ও লেখক রাজনারায়ণ বসুর (১৮২৬-৯১) কথা। আত্মচরিত-এ (১৯০৯) তিনি লিখেছিলেন :

হিন্দু কলেজে পড়িবার সময় আমার ধর্মমতে পর পর কতগুলি পরিবর্তন হয়, কিন্তু উনিশ বৎসরের সময় পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সঙ্গে আলাপ হইলে যে আদি ব্রাহ্মসমাজের ব্রাহ্ম হই, তাহা এখনও আছি।...শোভালিয়ার র্যামজে-র 'সাইরাসেজ ট্রাভেলস' পড়িয়া প্রচলিত হিন্দুধর্মে আমার বিশ্বাস বিচলিত হয়। তৎপরে রামমোহন রায়ের...এবং চ্যানিঙ্গের গ্রন্থ পাঠ করিয়া ইউনিটারিয়ান খ্রীষ্টীয়ান হই, তৎপরে ঈশ্বর মুসলমান হই, পরিশেষে কলেজ ছাড়িবার অব্যবহিত পূর্বে হিউম পড়িয়া সংশয়বাদী হই। যে পুস্তক যখনই পাঠ করা যায় তখনই সেইরূপ হওয়া অবশ্য বালকতা বলিতে হইবে, আর তখন যথার্থই বালক ছিলাম।

ধর্ম ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক-বিষয়ে ঘন ঘন মত পরিবর্তন করে আমরাও বালকতার পরিচয় দিয়েছি কিনা, বলা যায় না। হয়তো রাষ্ট্রীয় জীবনে আমরা এখনো বালক রয়ে গেছি।

যে-দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তানের সৃষ্টি হয়েছিল, অনেকে সে-তত্ত্বের উদ্গাতা বলে জানেন স্যার সৈয়দ আহমদ খানকে (১৮১৭-৯৮)। তাঁর বহু বক্তব্য এ ধারণা সমর্থন করে, তবে উল্টো কথাও তিনি বলেছিলেন। ১৮৮৪ সালে স্যার সৈয়দ দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতা দেন। জানুয়ারি মাসে গুরদাসপুরে তিনি বলেন :

Remember that the words Hindu and Mahomedan are only meant for religious distinction—otherwise all persons, whether Hindu or Mahomedan or even Christians who reside in this country, are all in this particular respect belonging to one and the same nation.

ফেব্রুয়ারিতে লাহোরে তিনি বলেন :

With me it is not so much worth considering that their religious raiths but that we inhabit the same land and are subject to the rule of the same government. These are the grounds upon which I call both the races which inhabit India by the word 'Hindu' by which I mean that they are the inhabitants of Hindustan.

স্বধর্ম ও স্বদেশের মধ্যে যে-পার্থক্য এখানে করা হয়েছে, তা বিশেষ ভাবে বিবেচনার যোগ্য। ধর্ম সম্পর্কে স্যার সৈয়দের আরেকটি মৌলিক ধারণার সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক আছে কিনা, তাও ভেবে দেখা যেতে পারে। তিনি মনে করতেন যে, সকল নবীই মানবসমাজে অভিন্ন ধর্মবিশ্বাস (দীন) প্রচার করেছিলেন, কিন্তু তাঁরা প্রত্যেকেই নিজেদের কালোপযোগী ভিন্ন জীবনবিধান (শরীয়া) বয়ে নিয়ে এসেছিলেন। বিশ্বাস অপরিবর্তনীয় বা শাস্ত্রত; বিধান পরিবর্তনীয় ও ইহজাগতিক। পূর্বগামী নবীদের আনীত বহু আইন কুরআন শরীফ বাতিল করে দিয়েছে, কেননা ইতিহাসের অগ্রগতির পরিপ্রেক্ষিতে সেসব আইন প্রয়োগযোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছিল। স্যার সৈয়দ যে এভাবে ইহজাগতিক ও পারলৌকিককে আলাদা করে দেখতে পেরেছিলেন, এটি কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

স্যার সৈয়দ আহমদের পরবর্তী প্রজন্মের ভারতীয় মুসলমানদের সুযোগ্য প্রতিনিধি মনে করা হয় মওলানা মোহাম্মদ আলীকে (১৮৭৮-১৯৩১)। ইসলামের ঐক্য ও মুসলমানের স্বাভাবিক সম্পর্কে তাঁর বেশ কিছু বক্তব্য আছে। তবে ধর্মীয় অস্তিত্ব ও দেশগত পরিচয়কে তিনিও পৃথক করে দেখেছিলেন। তিনি ভারতবর্ষের জন্য একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার পক্ষপাতী ছিলেন : সে যুক্তরাষ্ট্র কেবল রাজনৈতিক নয়, ধর্মীয় যুক্তরাষ্ট্রও। প্রথম গোল টেবিল বৈঠকে তিনি বলেছিলেন :

Where God commands...I am a Muslim first, a Muslim second and a Muslim last and nothing but a Muslim...My first duty is to my maker, not to HM the king nor to my companion Dr Monje...But where India is concerned, where India's freedom is concerned, where the welfare of India is concerned, I am an Indian first, an Indian second, an Indian last and nothing but an Indian...I belong to two circles of equal size but which are not concentric. One is India and the other is the Muslim world...we belong to these circle...and we can leave neither.

সমাজ-রাজনীতি-সাংবাদিকতা-ধর্মতত্ত্বের ক্ষেত্রে অল্প বয়সে আত্মপ্রকাশ করে মওলানা আবুল কালাম আজাদ (১৮৮৮-১৯৫৮) গণ্য হয়েছিলেন মওলানা মোহাম্মদ আলীর সমসাময়িক একজন বিশিষ্ট নেতা ও চিন্তাবিদ বলে। ইসলামের বাইরে তিনি কিছুই ভাবতে চান নি এবং তাই এক সময়ে ধর্ম ও রাজনীতিক পৃথক করা মুসলমানের পক্ষে নীরব ধর্মদ্রোহিতার তুল্য জ্ঞান করেছিলেন। ১৯১২ সালে তিনি স্পষ্টই লিখেছিলেন যে, ইউরোপে জাতি শব্দ সহস্র হৃদয় স্পন্দিত করে, আর মুসলমানের হৃদয় যাতে স্পন্দিত হয়, তা হলো আল্লাহ বা ইসলাম শব্দ। খিলাফত-আন্দোলনের সময়ে তিনি খিলাফতের একটি নতুন তত্ত্ব উপস্থাপিত করেন এবং ভারতবর্ষে ইংরেজদের বিরুদ্ধে হিন্দুর সঙ্গে সহযোগিতা করা মুসলমানের কর্তব্য বলে স্থির করেন। পরে অসহযোগ আন্দোলনের কালে তিনি যে-তত্ত্ব উপনীত হন, তাতে তিনি আজীবন নিষ্ঠা ছিলেন। এই তত্ত্বের মূল তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন হজরত মুহম্মদের মদিনা চুক্তিতে, যাতে মুসলমান-অমুসলমান-নির্বিশেষে মদিনাবাসীকে উম্মা ওয়াহিতা বা একটিমাত্র সম্প্রদায় বলে অভিহিত করা হয়। এটিকে নজির হিসেবে ধরে নিয়ে তিনি ভারতের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছিলেন এবং এভাবে ইসলামের সর্বজনীন ব্রাতৃত্বের পাশাপাশি ভারতবাসীর অখণ্ড সত্তায় আত্মসম্মাপন করেছিলেন।

তবে ভারতীয় রাজনীতির ধারা এবং শাসনব্যবস্থা-সংস্কারের গতি ছিল দ্বিজাতিতত্ত্বের দিকে। একদিকে বাস্তব জীবন ও রাজনীতি হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসের ক্ষেত্রে অন্তরায় সৃষ্টি করেছিল। অন্যদিকে মর্লি-মিটো সংস্কারে মুসলমানের স্বতন্ত্র প্রতিনিধিত্বের যেকোনো ব্যবস্থা করা হয়, মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কারে তা ব্যাপকতা লাভ করে। স্বতন্ত্র নির্বাচন প্রথা স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের দাবির পোষকতা করেছিল।

১৯৪০ সালের লাহোর-প্রস্তাবে ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম ও পূর্ব অঞ্চলে দু'টি স্বাধীন সার্বভৌম ও স্বায়ত্তশাসিত রাষ্ট্রগঠনের দাবি জানানো হয়। পরে, ১৯৪৬ সালে এপ্রিল মাসে, দিল্লীতে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগ দলীয় আইনসভা-সদস্যদের সম্মেলনে দু'টি রাষ্ট্রের জায়গায় পাকিস্তান নামে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব গৃহীত হয়। লাহোর-প্রস্তাবে পাকিস্তান নামটি উল্লেখ করা হয়নি এবং ভাবী রাষ্ট্রের ধর্মীয় চরিত্র সম্পর্কেও কোনো আভাস দেওয়া হয়নি। ১৯৪৩ সালে মুসলিম লীগের দিল্লী অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে মুহম্মদ আলী জিন্নাহ (১৮৭৬-১৯৪৮) রাষ্ট্রের নাম-প্রসঙ্গে যা বলেন, তার সারমর্ম এই : লাহোর-প্রস্তাবে পাকিস্তান কথাটিই ব্যবহার করা হয় নি। হিন্দুরা এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করতে গিয়ে বলে যে, এতে পাকিস্তান চাওয়া হয়েছে। হিন্দুদের সংবাদপত্রের একাংশ এবং ব্রিটিশ পত্র-পত্রিকা পাকিস্তান কথাটা আমাদের উপর চাপিয়ে দিয়েছে। তবে আমি তাদের ধন্যবাদ দিই এজন্য যে, এর ফলে, অনেকগুলো শব্দের বদলে এই একটি

শব্দ ব্যবহারের সুযোগ তারা করে দিয়েছেন।

১৯৪৩ সালের মুসলিম লীগ অধিবেশনে আরো একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার ঘটে। অধিবেশন শুরু হবার আগে একদল প্রতিনিধি প্রস্তাব করেন যে, পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ সংবিধান কুরআনের ভিত্তিতে রচিত হবে বলে মুসলিম লীগকে ঘোষণা করতে হবে। বোম্বাইয়ের ড. আবদুল হামিদ কাজী এই অধিবেশনে উত্থাপনের জন্য একটি প্রস্তাবের খসড়াও প্রচার করেছিলেন। তাতে বলা হয়েছিল যে, পাকিস্তানের সংবিধান রচিত হবে হুকুমত-ই-ইলাহিয়ার—অর্থাৎ প্রথম চার খলিফার হাতে প্রণীত নীতিসমূহের ভিত্তিতে। কিন্তু প্রস্তাব উত্থাপনের সময় আসার আগেই সভাপতির ভাষণ প্রদত্ত হয় এবং তাতে এ-প্রসঙ্গে জিলাহ বলেন :

The Constitution of Pakistan can only be framed by the millat and the people. Prepare yourselves and see that you frame a Constitution to your heart's desire. There is a lot of misunderstanding. A lot of mischief is created. Is it going to be an Islamic Government ? Is it not begging the question ? Is it not a question of passing a vote of censure on yourself ? the Constitution and the Government will be what the people will decide.

এর পরে ড. কাজী তাঁর প্রস্তাব উত্থাপন করেন নি। তিনি খুশি হয়েছিলেন কিনা বলা মুশকিল। কেননা জিলাহর বক্তৃতায় একদিকে যেমন বলা হয়েছিল যে, পাকিস্তানের সরকার ইসলামী হবে না, এমন মনে করা আত্মনিন্দার শামিল, অন্যদিকে তেমনি বলা হয়েছিল যে, জনগণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই কেবল জনগণের অভিপ্রায়-অনুযায়ী সংবিধান রচনা করবে।

তবে মুসলিম লীগের অনেক নেতাই বিভিন্ন সময়ে এমন উক্তি করেছিলেন যে, পাকিস্তানের রাষ্ট্রব্যবস্থা হবে কুরআনের নির্দেশ-অনুপ। অনেকেই আবার এসব কথায় আত্মজ্ঞাপন করেন নি। জমিয়ত-আল-উলামায়ে হিন্দের সভাপতি মওলানা হুসেন আহমদ মদনী (১৮৭৯-১৯৫৭) জিলাহকে উদ্ভূত করে বলেছিলেন যে, পাকিস্তান যে ধর্মীয় রাষ্ট্র হবে না, জাগতিক রাষ্ট্র হবে, তা এঁদের কথা থেকেই বোঝা যাচ্ছে। জিলাহ এবং অন্যান্য মুসলিম নেতাকে তিনি ইসলাম সম্পর্কে কেবল অজ্ঞ নন, উদাসীন বলে অভিযুক্ত করেছিলেন এবং তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে এঁদের পক্ষে ১৯৩৭ সালের শরীয়া আইন সমর্থন না করার ও ১৯৩৯ সালের মুসলিম বিবাহবিচ্ছেদ আইন বিরোধিতা না করার দৃষ্টান্ত দিয়েছিলেন। জিলাহকে তিনি অভিহিত করেছিলে কাফেরে আজম বলে (কেউ কেউ বলেন, আহরার-নেতা মওলানা মজহার আলী আজহারের দুটি ছন্দোবদ্ধ চরণে প্রথম এই বিদ্রূপপূর্ণ উক্তি করা হয়) এবং মুসলিম লীগে যোগদান ইসলামবিরোধী কাজ বলে ফতোয়া দিয়েছিলেন। জামাতে ইসলামীর আমীর মওলানা সৈয়দ আবুল আলা মওদুদী (১৯০৩-৭৯) তো স্পষ্টই বলেছিলেন যে, জিলাহ থেকে শুরু করে মুসলিম লীগের

নিম্নপর্যায়ে কর্মীদের কারো দৃষ্টিভঙ্গি ইসলামসম্মত নয় এবং কোনো সমস্যাকে ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার ক্ষমতা তাঁদের নেই। জাতীয়তাবাদ—তা ভারতীয় মুসলিম জাতীয়তাবাদ হলেও—এবং গণতন্ত্রের ধারণা পাশ্চাত্য সংস্কৃতিজাত বলে তা তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। পাকিস্তান, তাঁর মতে, কাফেরানা রাষ্ট্র—যার নাম তিনি দিয়েছিলেন না-পাকিস্তান। অবশ্য উল্টো কথা বলার মতো আলেমও পাওয়া গিয়েছিল। ১৯৪৫ সালে প্রতিষ্ঠিত মুসলিম লীগের সমর্থক আলেমদের সংগঠন জমিয়ত-আল-উলামায়ে ইসলাম উপরিউক্ত সমালোচনার জবাবে বলেছিলেন যে, মুসলিম লীগে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন লোকের অভাব থাকলে তেমন লোকদের উচিত মুসলিম লীগে যোগ দিয়ে সে-অভাব দূর করা। তবেই অধার্মিক পাশ্চাত্যপন্থী নেতাদের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে পাকিস্তান ধার্মিক ব্যক্তিদের নেতৃত্বে শরীয়ার শাসন প্রবর্তনে সমর্থ হবে।

সুতরাং একথা নির্দিষ্ট বলা যায় যে, পাকিস্তান-প্রতিষ্ঠার আগে ভারতীয় মুসলমানদের স্বতন্ত্র আবাসভূমির দাবি সত্ত্বেও দেশটিতে ইসলামী শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার কোনো সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি ছিল না। মুসলমানেরা যাতে নিজের অভিপ্রায়-অনুযায়ী জীবন গঠন করতে পারেন, তার নিশ্চয়তা লাভই ছিল পাকিস্তানের লক্ষ্য। ১৯৪৬-এ রয়টারের প্রতিনিধিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে জিন্নাহ বলেন :

The new state would be a modern democratic state with sovereignty resting in the people and the members of the new nation having equal rights of citizenship regardless of their religion, caste or creed.

তাই এটা বিস্ময়কর নয় যে, পাকিস্তান গণপরিষদের উদ্বোধনী অধিবেশনে, ১৯৪৭ সালের ১১ আগস্টে, সভাপতির ভাষণে তিনি বলেছিলেন :

You are free to go to your mosques or any other place of worship in this State of Pakistan. You may belong to any religion or caste or creed that had nothing to do with the business of the State...you will find that in course of time Hindus would cease to be Hindus and Muslims would cease to be Muslims, not in the religious sense, because that is the personal faith of each individual, but in the political sense as citizens of the State.

জিন্নাহর এ-উক্তি কেবল ইসলামী রাষ্ট্রের স্বপ্নচট্টাদের ক্ষুণ্ণ করেনি, জি. এম. সৈয়দের মতো মুসলিম লীগ-বিরোধী নেতাকেও একথা বলতে প্ররোচিত করেছিল যে, এতে জিন্নাহর chastened mood-এর প্রকাশ ঘটেছে এবং লীগের এত কালের কর্মসূচী ও সংগ্রামের অন্তরালবর্তী মৌলিক নীতি বিসর্জন দেওয়া হয়েছে।

তবে জিন্নাহর অনুসারীরা অল্পকালের মধ্যেই তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গি পরিত্যাগ করেছিলেন। ১৯৪৯ সালে পাকিস্তান গণপরিষদে প্রধানমন্ত্রী লিয়াতর আলী খান পাকিস্তানে সংবিধান-সংক্রান্ত যে Objective Resolution উত্থাপন করেন, তাতে প্রথমেই রাষ্ট্রের—শুধু রাষ্ট্রের নয়, সমগ্র বিশ্বজগতের—সার্বভৌমত্ব বলা হয়েছে আল্লাহর এবং রাষ্ট্রকে যদিও স্বাধীন ও সার্বভৌম পাকিস্তান রাষ্ট্র বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে, তবু এই রাষ্ট্রের মুসলিম অধিবাসীরা যাতে কুরআন শরীফ ও সুন্নাহ বর্ণিত ইসলামের শিক্ষা ও আদ্যাকতা-অনুযায়ী ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনযাপন করতে পারেন, তবে নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে। ১৯৫০ সালের মূলনীতি কমিটির রিপোর্টেও এর প্রতিধ্বনি করা হয় এবং সেই সঙ্গে যোগ করা হয় যে, রাষ্ট্রপ্রধান হবেন একজন মুসলিম। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের একুশ দফা নির্বাচনী অঙ্গীকারের শীর্ষদেশেও লেখা হয়েছিল :

নীতি : কোরান ও সুন্নাহর মৌলিক নীতির খেলাফ কোন আইন প্রণয়ন করা হইবে না এবং ইসলামের সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে নাগরিকগণের জীবনধারণের ব্যবস্থা করা হইবে।*

১৯৫৫ সালে আওয়ামী মুসলিম লীগের নাম থেকে মুসলিম শব্দটি বাদ দেওয়া হয়। মওলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কীউঙ্গিল-সভায় এই নামান্তরের প্রস্তাব করেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী (১৮৯৩-১৯৬৩)। সভায় মওলানা ভাসানী বলেন যে, এই প্রস্তাব অনেকদিন ধরেই তাঁদের বিবেচনাধীন ছিল। তবে ভাষা-আন্দোলনের সময়ে মুসলিম লীগ স্বেচ্ছাক্রমে মিথ্যা প্রচার করে, তা স্মরণ করেই সংগঠন যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় না করে পর্যন্ত তাঁরা নাম বদলাবার ঝুঁকি নিতে চান নি। যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী ইশতেহারে এই নীতির সংযোজন অনুরূপ বিবেচনাপ্রসূত কিনা তা বলা যায় না। তবে মওলানা ভাসানী পরেও কুরআন ও সুন্নাহর সঙ্গে সংগতির কথা বলেছেন।

* এ-সম্পর্কে একটা শোনা কথা বলার লোভ সংবরণ করতে পারছি না। যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী ইশতেহার রচনার ভার পড়ে আবুল মনসুর আহমদের (১৮৯৮-১৯৭৯) উপরে। তিনি এর আগে আওয়ামী লীগের জন্য ৪২ দফায় একটি কর্মসূচী প্রণয়ন করেন। একুশে ফেব্রুয়ারির কথা মনে রেখে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর (১৮৮৫-১৯৭৯) সম্মতি নিয়ে ওই ৪২ দফা ছোট্টেছোট্টে এভাবে তিনি ২১ দফায় রূপ দেন। এ পর্যন্ত আবুল মনসুর আহমদ নিজেই লিখে গেছেন। তারপরের অংশই শোনা কথা। এই ২১ দফা মওলানা ভাসানীকে দেখালে তিনি নাকি কুরআন ও সুন্নাহর খেলাফ কোনো আইন তৈরি করা হবে না—এই অঙ্গীকার জুড়ে দিতে বলেন। আবুল মনসুর আহমদ ২১ দফা রাখতে চান বলে এটাকে কোনো দফা হিসেবে গণ্য না করে প্রথম দফার মাথায় “নীতি” বলে কথাগুলো যোগ করেন এবং “কুরআন ও সুন্নাহ”র জায়গায় “কুরআন ও সুন্নাহর

১৯৫৬ সালে যখন পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান গৃহীত হয়, তখন দেশকে ইসলামী প্রজাতন্ত্র বলে ঘোষণা করা হয়। গণপরিষদে পূর্ব বাংলার প্রতিনিধিদের অনেকে দেশের এই নামকরণের বিরোধিতা করেছিলেন। পূর্ব পাকিস্তান ব্যবস্থাপক সভায় স্বতন্ত্র নির্বাচন প্রথার পক্ষে প্রস্তাব উত্থাপিত হলে শেখ মুজিবুর রহমান (১৯২০-৭৫) যে-বক্তৃতা দিয়েছিলেন, তার অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃত্যোগ্য :

আমার এক বন্ধু বলেছিলেন যে, তারা মাইনরিটিদের সমানভাবে দেখবেন। আমি জিজ্ঞাসা করি, কিভাবে সমানভাবে দেখবেন—ইসলামিক রিপাবলিক নাম চেঞ্জ করে দিয়ে? ইসলামিক রিপাবলিক না হয়ে পাকিস্তান রিপাবলিক হোক, আমরা একথা নিয়ে ফাইট করেছিলাম। আমরা চেয়েছিলাম, রাজনীতিতে হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রীস্টান সব সমান হবে—সত্য এবং সাম্যের নীতির উপর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে।...স্যার, আমরা হেড অফ দি স্টেট মুসলমান করে দিলাম। ইসলামিক রিপাবলিক অফ পাকিস্তান নাম করলাম। এইভাবে দুই জাতি তো করেই দিলাম তার উপরেও যদি সেপারেট ইলেকশন হয় তাহলে কি হয়? দুই জাতির ভিত্তিতে আমাদের পাকিস্তান হয়েছে। এর পরও যদি আজকে আলোচনা করা হয় যে, পাকিস্তানে আমরা দুই জাতি, একটা হিন্দু আর একটা মুসলমান, তাহলে একটা প্রোভোকেশন দেয়া হয়। আজ যদি পূর্ব বাংলার এক কোটি হিন্দু বলে যে, আমাদের আলাদা জায়গা অর্থাৎ একটা হিন্দু স্টেট দিতে হবে, তাহলে কি হবে? পাকিস্তানের খাতিরে, পাকিস্তানের ইনসাফের খাতিরে, পাকিস্তান রাষ্ট্রের খাতিরে আমি আমার বন্ধুদের অনুরোধ করব তাঁরা যেন এই সেপারেট ইলেকটরেটের প্রস্তাব উত্থাপন করেন।

এই বক্তৃতায় যে-অসাম্প্রদায়িক মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে, তা বিকশিত হচ্ছিল অনেকদিন ধরে। বিশেষ করে, রাষ্ট্রভাষা-আন্দোলনের পর থেকে পূর্ব বাংলার রাজনীতিক্ষেত্রে অসাম্প্রদায়িক চেতনার প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। ভাষা-আন্দোলনের আগে পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগ ছিল দেশের একমাত্র সংগঠন যার দ্বার সকল সম্প্রদায়ের নাগরিকের জন্য উন্মুক্ত ছিল। ভাষা-আন্দোলনের পরে আমরা দেখি অসাম্প্রদায়িক ছাত্রসংগঠনরূপে ছাত্র ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠা, অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দল হিসেবে গণতন্ত্রী দলের আত্মপ্রকাশ, পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগে পরিণতি এবং দেশের এই অংশের প্রধান রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান আওয়ামী মুসলিম লীগের আওয়ামী লীগে রূপান্তর। ১৯৫৬ সালে পূর্ব পাকিস্তান ব্যবস্থাপক সভায় যুক্ত নির্বাচন প্রথার পক্ষে প্রস্তাবগ্রহণ এই ক্রমবর্ধমান অসাম্প্রদায়িক চেতনারই বহিঃপ্রকাশ।

১৯৫৬ সালে পাকিস্তান গণপরিষদে যুক্ত নির্বাচন বিল উত্থাপন করে শহীদ সোহরাওয়ার্দী একটি স্মরণীয় বক্তৃতা দিয়েছিলেন। তার অংশবিশেষ এ রকম :

It may appear strange to those who have not been able to adapt themselves to the change in political outlook resultant on the creation of Pakistan that I who was an advocate of the two-nation theory in undivided India, and whose contribution to the creation of Pakistan was perhaps not insignificant, and who belived in separate electorate in undivided India, should advocate joint electorate in Pakistan as a salutary constitutional principle...Separate electorate was a device to secure proper representation in the Legislatures for the Muslim minority ; it took something away from the majority population ; it was certainly never meant to be a device to safeguard the intersts of the majority population...

...The two-nation theory was advanced by the Muslims as a justification for the partition of India and the creation of a State made up of geographically contiguous units where the Muslims were numerically in a majority. Once the State was created, the two-nation theory lost its force even for the Muslims. If it is still persisted in, it will logically lead to the partition of Pakistan... The Muslims who were a nationality in undivided India, are now citizens in their own country Pakistan, in which every citizen, whatever may be his religion, is a member of the Pakistani nation. There is, thus a radical difference between the conception of the Millat-i-Islam which transcends geographical boundaries, and the conception of a Pakistani nation or qaum which has boundaries and has a peculiar entity which differentiates it from other nations. Circumstances thus have changed, and so must our political outlook change with the establishment of Pakistan.

গণপরিষদে কিন্তু এই প্রশ্নে আপসরফা হলো এভাবে যে, পূর্ব পাকিস্তানে হবে যুক্ত নির্বাচনপ্রথা আর পশ্চিম পাকিস্তানে থাকবে স্বতন্ত্র নির্বাচনপ্রথা।

পাকিস্তানের উভয় অংশের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য কতটা গড়ে উঠেছিল, তা এ থেকে সহজেই বোঝা যায়। তাই একদিকে ইসলামী প্রজাতন্ত্র, অন্যদিকে তার দুই অংশে দুরকম নির্বাচন প্রথা।

পাকিস্তানে পরবর্তী পনেরো বছরে অন্যান্য বিষয়ে বিরোধের মতো রাষ্ট্রজীবনে ধর্মীয় অনুশঙ্গ এবং অসাম্প্রদায়িকতার—কোনো কোনো ক্ষেত্রে বলা যায় ধর্মনিরপেক্ষতা বা ইহজাগতিকতার—বিরোধ তীব্র হয়েছে। ১৯৫৬ সালের সংবিধান বাতিল করে ১৯৬২ সালে দেশের দ্বিতীয় সংবিধান প্রবর্তিত হয়। রাষ্ট্রের নাম ফিরে আসে পাকিস্তান রাষ্ট্রে—অর্থাৎ নাম থেকে ইসলামী কথাটা বাদ যায়। তবে রাষ্ট্রের মূলনীতিতে কুরআন ও সুন্না এবং ইসলামী জীবনধারার কথা বলা হয় এবং তার জন্য ইসলামী আদর্শ-বিষয়ক একটি উপদেষ্টা-পরিষদ গঠনের বিধান রাখা

হয়। ১৯৬২ সালের সংবিধান রদ হয়ে যায় ১৯৬৯ সালে। জেনারেল ইয়াহিয়া খান যে Legal Framework Order জারি করেন, তাতে বলা হয় যে, নির্বাচনের পর যে জাতীয় সংসদ গঠিত হবে সে-সংসদের দ্বারা প্রণীতব্য সংবিধানে “Islamic ideology which is the basis for the creation of Pakistan” অটুট রাখতে হবে। এই কারণে ১৯৭০ সালে যেসব রাজনৈতিক দল নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল, কুরআন ও সুন্নার পরিপন্থী আইন-প্রণয়ন থেকে বিরত থাকার প্রতিশ্রুতি তাদের প্রত্যেককেই দিতে হয়েছিল।

জেনারেল আইউব খান ও জেনারেল ইয়াহিয়া খানের মতো সামরিক শাসক ও রাষ্ট্রপ্রধান সংবিধানের ইসলামী চরিত্র রাখতে আন্তরিকভাবে আগ্রহী ছিলেন, এ কথা বিশ্বাস করা শক্ত। কিন্তু রাজনৈতিক কারণে, ক্ষমতায় থাকার জন্য, সাধারণ মানুষকে ভোলাবার জন্য, তাঁদের প্রয়োজন ছিল রাষ্ট্রের সঙ্গে ধর্মের যোগ ঘটানোর। এ-প্রসঙ্গে পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি মুহম্মদ মুনীর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা বিবৃত করেছেন :

...When I was a member of Ayub's Cabinet in 1962 and the Political Parties Bill was under discussion a person moved an amendment to the bill proposing that no party would be formed the object of which was opposed to the 'Ideology of Pakistan'. On this Chaudhry Fazal Ilahi who was recently retired as President of Pakistan, rose from his seat and objected that then 'Ideology of Pakistan' shall have to be defined. On this the member who had moved the original amendment replied that the ideology of Pakistan was 'Islam', but nobody asked him the further question. "What is Islam?" The amendment to the bill was therefore passed as the member who supported the amendment was Maulvi Abdul Bari of Lyallpur who was a supporter of Ayub. Nobody can say anything to the contrary where Islam is mentioned.

Ayub was then in Karachi and I could not contact him. When he returned I mentioned to him the incident and he remarked, "What will the world say about it all".

বিচারপতি মুনীর যে বলেছেন—ইসলাম কী, এ-বিষয়ে কেউ আর প্রশ্ন করল না—তার একটা ইতিহাস আছে। পাঞ্জাবে ১৯৫৩ সালে আহমদীয়া-বিরোধী দাঙ্গা সম্পর্কে তদন্ত করার জন্য তাঁর নেতৃত্বে বিচারপতি কায়ানীকে নিয়ে যে-কোর্ট অফ ইনকোয়ারি গঠিত হয়, তাতে তাঁরা দেখতে পান যে, ইসলাম কী এবং মুসলমান কে, সে-বিষয়ে কোনো দুজন আলেম একমত হতে পারেন নি। কোনো কোনো আলেমের মতে, আল্লাহর আইন কুরআন ও সুন্নাহ পাওয়া যায় বলে ইসলামী রাষ্ট্রে কোনো ব্যক্তির বা সমষ্টির আইন-প্রণয়নের অধিকার নেই এবং আল্লাহর আইন ব্যাখ্যা করার অধিকার রয়েছে কেবল শাস্ত্রজ্ঞানীদের।

পাকিস্তানের শাসকেরা ধর্মের সঙ্গে রাষ্ট্রের সংযোগ ঘটিয়েছিলেন, কিন্তু দেশের দুই অংশের বিচ্ছেদ অনিবার্য করে তুলেছিলেন। এর আশু কারণ আমাদের অজানা নয়। তবে অনেকদিন ধরে যেসব কারণে দুই অংশের মতান্তর সৃষ্টি হচ্ছিল, ধর্ম ও রাষ্ট্রের সম্পর্কের বিষয়টি তার একটি বললে ভুল হবে না।

৩

অনেক স্বৈর, অশ্রু ও রক্তের বিনিময়ে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়। এদেশের রাষ্ট্রীয় চরিত্র যে ধর্মীয় হবে না, তার প্রথম আভাস পাওয়া যায় ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিলের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে। এতে বাংলাদেশকে সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্র বলে ঘোষণা করা হয়। বাংলাদেশ যে একটি ধর্মনিরপেক্ষ দেশ হবে, সে কথা মুক্তিযুদ্ধের কালে নেতারা বহুবার বলেছিলেন। শুধু প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ নন, অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এ. এইচ. এম. কামরুজ্জামান এবং এমন কি, পররাষ্ট্রমন্ত্রী খন্দকার মুশতাক আহমদের বক্তৃতায় বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় তিন নীতি—গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার—কথা একাধিকবার ঘোষিত হয়েছিল। পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যেদিন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি হিসেবে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন, সেদিন রেসকোর্সের জনসভায় বক্তৃতাদানকালে তিনি বলেছিলেন :

সকলে জেনে রাখুন, বাংলাদেশ এখন বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র এবং পাকিস্তানের স্থান চতুর্থ। ইন্দোনেশিয়া প্রথম ও ভারত তৃতীয়। বাংলাদেশ একটি আদর্শ রাষ্ট্র হবে। আর তার ভিত্তি বিশেষ কোন ধর্মীয় ভিত্তিক হবে না। রাষ্ট্রের ভিত্তি হবে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা। পরে তিনি আরও একটি নীতি যোগ করেন—জাতীয়তাবাদ। সেই চারটি মূলনীতিকে ভিত্তি করেই বাংলাদেশের সংবিধান রচিত হয়।

আগে বলেছি, ধর্মনিরপেক্ষতার ভাব শুরু হয়েছিল ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। তার একটা কারণ ছিল এই যে, রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলার দাবি উপেক্ষা করে যাঁরা উর্দু চাপিয়ে দিতে চেয়েছিল, তাঁরা ধূয়া তুলেছিলেন ধর্মের। পাকিস্তান মুসলমানের রাষ্ট্র, উর্দু মুসলমানের ভাষা; তাই উর্দু রাষ্ট্রভাষা হবে। বাংলা হিন্দুর ভাষা, ওতে ইসলাম সম্পর্কে যথেষ্ট লেখা হয়নি; তাই বাংলা পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হতে পারবে না। পাকিস্তানের শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমান ১৯৫১ সালে বলেছিলেন যে, জাতি হিসেবে মুসলমানের টিকে থাকার সংগ্রাম আর উর্দুকে জিইয়ে রাখার সংগ্রাম অভিন্ন। উর্দুর আধিপত্য প্রত্যাখ্যান করার সঙ্গে সঙ্গে দেশের মানুষ ধর্মের নামে শোষণ ও উৎপীড়ন এবং ধর্ম নিয়ে রাজনীতিকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। ভাষা-আন্দোলনের পরে অসাম্প্রদায়িক ছাত্র ও রাজনৈতিক সংগঠনের আত্মপ্রকাশ কিংবা প্রতিষ্ঠিত ছাত্র ও রাজনৈতিক দলের অসাম্প্রদায়িকীকরণ সম্ভবপর হয়েছিল

শুধু নয়, অনিবার্য হয়ে পড়েছিল। বাঙালি হতে হলে ও গণতন্ত্রী হতে হলে ধর্মনিরপেক্ষ না হয়ে উপায় নেই, এ কথা বুঝতে মানুষের দেরি হয়নি। ইসলামের নামে মানুষকে বিভ্রান্ত করার যে চেষ্টা দেশে চলছিল, সে সম্পর্কে সোহরাওয়ার্দীর পূর্বোন্নিখিত বক্তৃতায় খুব চমৎকার করে বলা হয়েছে।

It is so easy to mislead our people who are prepared to sacrifice everything in the way of Islam, to mislead them in the name of Islam. It is so easy to excite passion, so easy to kindle fires, so easy to destroy, so difficult to build, that I would beg of those who are utilising these controversy, for the sake of opposition, not to fan the flames of fanaticism and bigotry and hatred, but to pause and build Pakistan on the solid foundation of trust and unity between all the people inhabiting this beloved country of ours.

ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করার বিপদ সম্পর্কে পাকিস্তানের দিনগুলিতেই আমরা ক্রমশ অবহিত হয়েছি। তারপর ১৯৭১-এ এর মারাত্মক রূপ দেখলাম। ইসলাম রক্ষার নামে, মুসলিম রাষ্ট্রের নামে, কী অমানুষিক অত্যাচারই না হলো দেশের মানুষের উপর। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর এদেশী দোসররা ধর্মের নামে সকল বর্বরতার প্রতি সমর্থন জানালেন। ইসলাম ও পাকিস্তানকে অভিন্ন বলে দাবি করে তারা ঘোষণা করলেন যে, পাকিস্তানের বিরোধিতা মানেই ইসলামের বিরোধিতা। যেন পাকিস্তান—সৃষ্টির আগে ইসলামের কোনো অস্তিত্ব ছিল না। তারা প্রকাশ্যেই ঘোষণা করলেন যে, আল-বদর বাহিনী গঠন করা হয়েছে পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীকে সহায়তা করার জন্যে। স্বর্গের সেই সামরিক বাহিনীর ভরাডুবি হলো, তখন তাদের যোগসাজশে ক্রোধে উদ্ভূত আল-বদরেরা দেশের সেরা সন্তানদের হত্যা করে নিজেদের আদর্শবাদের পরিচয় রেখে গেল।

এই অভিজ্ঞতা ১৯৭২ সালে আমাদের মনে তাজা ছিল। তাই যে সংবিধান আমরা তখন রচনা করেছিলাম, তাতে একদিকে যেমন ধর্মনিরপেক্ষতা একটি মূল রাষ্ট্রীয় নীতি বলে গৃহীত হয়, অন্যদিকে তেমনি ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করার সুযোগ লোপ করে দেয়া হয় সংবিধানের ১২ অনুচ্ছেদে। তাতে বলা হয়, ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি বাস্তবায়নের জন্য জন্য সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িকতা, রাষ্ট্র কর্তৃক কোনো ধর্মকে রাজনৈতিক মর্যাদাবান, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মের অপব্যবহার এবং কোনো বিশেষ ধর্মাবলম্বীর প্রতি বৈষম্য বিলোপ করা হবে।

ধর্মনিরপেক্ষতা রাষ্ট্রীয় মূলনীতি বলে স্বীকৃত হলেও এর তাৎপর্য আমাদের সকলের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি—এমন কি, রাষ্ট্রপরিচালনার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের সকলের কাছেও নয়। ধর্মনিরপেক্ষতা শব্দটা ব্যবহৃত হচ্ছে সেকুলারিজমের বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে। অনেকে মনে করেন, ইহজাগতিকতা বললে কথাটা স্পষ্ট হতো। তা হয়তো হতো, তবে ধর্মনিরপেক্ষ বলায়ও ভুল হয় না। নিরপেক্ষ শব্দের

ব্যাপ্তিগত অর্থ অপেক্ষারহিত—ওতে কর্মসম্পর্কহীন, প্রয়োজনরহিত বা উদাসীন বোঝায়। আমরা যখন জোটনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বা দলনিরপেক্ষ ব্যক্তির কথা বলি, তখন নিরপেক্ষ শব্দের সেই দ্যোতনাই ধরা পড়ে। কোনো জোটের সঙ্গে যে-দেশের যোগ নেই, তা জোটনিরপেক্ষ দেশ; কোনো দলের সঙ্গে যে-ব্যক্তির সংস্রব নেই, তিনি দলনিরপেক্ষ লোক। তেমনি ধর্মের সঙ্গে যে রাষ্ট্রের সম্পর্ক নেই, তা ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে তাই বোঝায় রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের সঙ্গে ধর্মীয় বিষয়ের সংযোগহীনতা, ধর্মের সঙ্গে রাষ্ট্রের সংস্রবশূন্যতা, পারলৌকিক বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কহীন ইহজাগতিকতা। ধর্ম থাকবে নাগরিকের ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও আচরণের বিষয় হয়ে, রাষ্ট্র সকলকে নিজস্ব ধর্মপালনের স্বাধীনতা ও অধিকার দেবে, কিন্তু রাষ্ট্রের সঙ্গে কোনো ধর্মের সম্পর্ক থাকবে না।

তবে নিরপেক্ষতা শব্দের ব্যাপকতর প্রচলিত অর্থ পক্ষপাতহীনতা। তাই ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে অনেকেই ধরে দেন রাষ্ট্রে প্রচলিত বিভিন্ন ধর্ম ও সেসব ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে পক্ষপাতহীনতা। সংবিধানের ১২ অনুচ্ছেদের স্পষ্ট বিধান সত্ত্বেও ১৯৭২ সাল থেকে আমাদের প্রবণতা দেখা দিল রাষ্ট্র কর্তৃক সকল ধর্মকে রাজনৈতিক মর্যাদাদানের। তাই বেতারে, টেলিভিশনে, রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে—সর্বত্র কুরআন শরীফ, গীতা, বাইবেল ও ত্রিপিটক পাঠ হতে থাকল একসঙ্গে। ধর্মনিরপেক্ষতার পরিচয় এ নয়, এ হতে পারে সকল ধর্মের সমান মর্যাদালাভ। আমরা কথায় কথায় আরও ঘোষণা করতে লাগলাম, ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়। আর তা প্রমাণ করার জন্যই যেন বঙ্গভবনে বা গণভবনে মিলাদ পড়ানোও হলো।

ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে যাই বোঝাক না কেন, আমাদের মধ্যে কিছুসংখ্যক লোকের কাছে তা একবারেই গ্রহণযোগ্য ছিল না। তারা ইসলামী প্রজাতন্ত্র পাকিস্তানের ধারায় আস্থাবান, মুসলমান ও অমুসলমানকে ভিন্ন ভিন্ন জাতিরূপে দেখতে অত্যন্ত, সকল ধর্মের গ্রন্থ ও অনুসারীর সমান মর্যাদালাভ তাদের কাছে খুবই শোচনীয় ব্যাপার। ১৯৭৫ সালের পরে তাদের সুযোগ এলো। মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান (১৯৩৫-৮১) মুক্তিযুদ্ধবিরোধীদের ক্ষমতার অংশ দিলেন এবং সংবিধানের মূলনীতিতে পরিবর্তন আনলেন। ১৯৭৮ সালের ডিসেম্বরে দ্বিতীয় ঘোষণাপত্র আদেশ বলে সংবিধানের প্রস্তাবনার পূর্বে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম যুক্ত হলো, ধর্মনিরপেক্ষতার জায়গায় এলো “সর্বশক্তিমান আল্লাহের উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস” এবং সংবিধানের ১২ অনুচ্ছেদের উচ্ছেদ হয়ে গেল। ১২ অনুচ্ছেদের উচ্ছেদের ফলে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নতুন করে আমদানি হলো এবং মুক্তিযুদ্ধবিরোধী রাজনৈতিক দল ও ভাব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হলো। পরে সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে দ্বিতীয় ঘোষণাপত্র আদেশকে বৈধ রূপ দেওয়া হলো।

জিয়াউর রহমান যেমন আওয়ামী লীগের সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার জন্যে

ধর্মনিরপেক্ষতা বর্জন করেন, মনে হয়, জেনারেল এরশাদ তেমনি পূর্বগামীর কীর্তি কিংবা ধর্মভিত্তিক রাজনীতির সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে ১৯৮৮ সালে সংবিধানের অষ্টম সংশোধনীর মাধ্যমে ইসলামকে বাংলাদেশের রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণা করেন। সংশোধনীতে বলা হয় : “প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম, তবে অন্যান্য ধর্মও প্রজাতন্ত্রে শান্তিতে পালন করা যাইবে।” ইসলামের সঙ্গে অন্য ধর্মের কী বিপুল পার্থক্য করা হলো, সংশোধনীর ভাষা থেকেও তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এভাবে সংবিধানে সকল নাগরিককে যে-সমান অধিকার দেওয়া হয়েছিল এবং আইনের দৃষ্টিতে যে সমতার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, তা লঙ্ঘন করা হলো। কোনো অমুসলমানের পক্ষে সংবিধান রক্ষার এবং এর প্রতি অনুগত থাকার শপথ নেওয়ার অর্থ হয়ে দাঁড়ালো বিসমিল্লাহর প্রতি তার আনুগত্য-ঘোষণা।

রাষ্ট্রধর্ম-প্রবর্তনের বিরুদ্ধে যুক্তি প্রদর্শন করতে গিয়ে বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি কামালউদ্দিন হোসেন লিখেছেন :

বিধানটি রাষ্ট্রের ইসলাম ধর্মাবলম্বী ব্যতীত অন্যদের ধর্মের ভিত্তিতে বিভাজিত করেছে, যদিও তারা একই দেশের সমান সাংবিধানিক অধিকারের অধিকারী। প্রশ্ন থেকে যায়, ইসলাম কোনো একটি দেশের সে দেশের জনসংখ্যার সিংহভাগ মুসলমান হলেও—রাষ্ট্রধর্ম হতে পারে কি না? আবার একটি রাষ্ট্র সার্বভৌম ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম করতে পারে কি না?...

ইসলাম রাষ্ট্রধর্ম হলে, ইসলাম সে দেশের মুসলিমদের রাষ্ট্রীয় সার্বভৌম অধিকারের অধীন হয়ে যাচ্ছে। ইসলাম তার সর্বজনীনতা হারাচ্ছে। তার বিশ্বজনীনতা খর্ব হচ্ছে।...

...যদি ধর্মমত সার্বভৌম হয়ে থাকে, তবে রাষ্ট্রকে সেই মতের অধীন হয়ে চলতে হবে,...। ইসলামের মতো আপন নীতিমালাসম্পন্ন ধর্ম রাষ্ট্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে পারে না। আবার সার্বভৌম রাষ্ট্র ইসলামের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে পারে না। এর মীমাংসা হতে পারে রাজনীতি বা রাষ্ট্রনীতিকে ধর্ম থেকে পৃথক করা।

বিশেষ ধর্মের প্রতি রাষ্ট্রের পক্ষপাতের ফলে যে নাগরিকদের মধ্যে বিভেদ ও বৈষম্য সৃষ্টি করা হয়, একথা অনেকে মানতে চান না। তারা যুক্তরাজ্যের দৃষ্টান্ত টানেন। স্বাধীন ও সার্বভৌম জাতীয় রাষ্ট্রের উদ্ভবের পরে ইউরোপে ক্রমে ধর্ম ও রাষ্ট্রের—চার্চ ও স্টেটের—পৃথকীকরণ ঘটে এবং সকল নাগরিকের ইহলৌকিক কল্যাণসাধন রাষ্ট্রের দায়িত্ব বলে স্বীকৃত হয়। তা সত্ত্বেও ইউরোপের সব দেশে রাষ্ট্র ও ধর্ম পৃথক হয়নি। যুক্তরাজ্যের রাজা বা রানী চার্চ অফ ইংল্যান্ডের রক্ষাকর্তা—এই অর্থে অ্যাংলিকান চার্চের ধর্মই যুক্তরাজ্যের সরকারী ধর্ম। স্ক্যান্ডিনেভিয়ার একাধিক দেশ বা আয়ারল্যান্ড, ইতালি ও স্পেনেও রাষ্ট্র বিশেষ বিশেষ ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করে থাকে। অন্যদিকে ক্যাথলিক ধর্মের অসাধারণ প্রাধান্য সত্ত্বেও ফ্রান্স ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র, প্রোটেস্ট্যান্টদের গরিষ্ঠতা সত্ত্বেও মার্কিন

যুক্তরাষ্ট্র ধর্মনিরপেক্ষ দেশ—সরকারী কর্মে নিয়োগের ক্ষেত্রে ধর্মসংক্রান্ত বিষয়ে কোনো প্রার্থীকে জিজ্ঞাসা করা বা কর্মক্ষেত্রে ঈশ্বরের নামে শপথ নিতে বলা কিংবা শিক্ষাক্ষেত্রে বাধ্যতামূলকভাবে বাইবেল পাঠ বা প্রার্থনা করাও সংবিধানবিরোধী বলে সেদেশের সর্বোচ্চ আদালত স্থির করেছেন। ইসলামী রাষ্ট্রসংস্থার (ওআইসি) অর্ধেক সদস্যরাষ্ট্রেই রাষ্ট্রধর্ম বলে কিছু নেই। ইন্দোনেশিয়া, সংযুক্ত আরব আমীরাত বা সিরিয়ার মতো দেশ রাষ্ট্রধর্ম স্বীকার করে না। তুরস্ক কেবল ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র নয়, তার সংবিধানের যে-কটি ধারা কোনোভাবে সংশোধনযোগ্য নয়, ধর্মনিরপেক্ষতার ধারা তার একটি ; সেদেশে সম্পত্তির উত্তরাধিকার ও নারীর স্বাধীনতা-বিষয়ে ধর্মনিরপেক্ষ আইন প্রচলিত। সুতরাং কেবল উদাহরণ দিয়ে কোনো লাভ নেই। স্বদেশের অভিজ্ঞতা ও পরিস্থিতির ভিত্তিতেই এ করণীয় নির্ণয় করা আবশ্যিক। ফরাসী বিপ্লবের আদর্শ ফ্রান্সকে ধর্মনিরপেক্ষ থাকার প্রেরণা জুগিয়েছে ; আদি বসতিস্থাপনকারীদের ধর্মীয়ভাবে নিপীড়িত হওয়ার অভিজ্ঞতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে বিশেষ কোনো ধর্মের সঙ্গে যুক্ত হতে দেয়নি। ধর্মভিত্তিক রাজনীতির যে কুফল আমরা ভোগ করেছি, ধর্মের নামে যে শোষণ ও নিপীড়ন এখানে চলেছে, এবং বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠায় সকল সম্প্রদায়ের মানুষের মিলিত সংগ্রামের যে-ইতিহাস আমরা রচনা করেছি, তার ভিত্তিতে ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শগ্রহণই আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক ও সংগত ছিল।

৪

সামরিক শাসনের আওতায় ধর্মনিরপেক্ষতা উঠে গিয়েছিল-তার বিরুদ্ধে জনগণের পক্ষ থেকে কোনো প্রতিবাদ উত্থাপিত হয়নি। কিন্তু রাষ্ট্রধর্ম-বোষণার বিরুদ্ধে আন্দোলন হয়েছিল, যদিও তা বেশিদূর অগ্রসর হয়নি। আওয়ামী লীগ ও আট দলে তাদের সহযোগীরা, ওয়াকার্স পার্টি ও পাঁচ দলে তাদের সহযোগীরা, মহিলা-সংগঠন এবং অধিকাংশ সাংস্কৃতিক ও পেশাজীবী সংগঠন প্রতিবাদ করেছিলেন। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) চূপ করে থাকলেও ধর্মনিরপেক্ষতার উচ্ছেদ যে তাদেরই কীর্তি, তা তারা বেশ বুঝিয়ে দিয়েছিলেন।

১৯৯১ সালে সাধারণ নির্বাচনের সময়ে প্রচার চলল, আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এলে সংবিধান থেকে বিসমিল্লাহ উঠে যাবে। এ প্রচারণায় কাজ হয়েছিল। আওয়ামী লীগও ভয় পেয়ে আল্লাহ আকবর ধ্বনি তুলল, আবার ধর্মনিরপেক্ষতাও ছাড়তে পারল না। একটি পোস্টারে দেখেছিলাম, নৌকার ছবির নিচে নজরুল ইসলামের কবিতার উদ্ধৃতি : কাণ্ডারী এ তরীর পাকা মাঝিমাঝা/দাড়িমুখে সারিগান লা-শরিক আল্লাহ। আওয়ামী লীগই শুধু যে এই পরস্পরবিরোধী পথ অনুসরণ করে, তা নয়। বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির অফিসেও মিলাদ মাহফিল হয় এবং তাদের প্রার্থীর নির্বাচনী পোস্টার ও প্রচারপত্রে আল্লাহ আকবর যোগ করা হয়। সাধারণ নির্বাচনের

পরে ওয়া বাংলা ও খোদা হাফেজেরও যোগ কিছু বেড়েছে বলে মনে হয়।

ধর্মনিরপেক্ষবাদী যে ধর্মবিশ্বাসী হতে পারবেন না, তা নয় ; তবে রাজনীতিতে ধর্ম টেনে আনবেন না বলে তিনি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তিনি নামাজ পড়ুন, রোজা রাখুন, জাকাত দিন, হজ পালন করুন, মন্দিরে যান, চার্চে প্রার্থনা করুন, বৌদ্ধ-ধর্মসংঘের শরণ নিন, কিন্তু এই ধর্মবোধের সঙ্গে যেন রাজনীতির সংশ্লিষ্ট না ঘটান, এটাই তাঁর কাছে দাবি। এটাই যে তাঁর করণীয় তা তিনি নিজেই জানেন ভালো করে, তবে প্রতিপক্ষের অপপ্রচারে ভীত হয়ে যা করণীয়, তা তিনি করতে পারেন না। ভয় যে শুধু অপপ্রচারে, তা নয়। লোকে কী বলবে, তারও ভয় ; মনে সংশয়।

কী চায় জনসাধারণ? মনে রাখতে হবে যে, সংবিধান থেকে ধর্মনিরপেক্ষতার উচ্ছেদ কিংবা সংবিধানে রাষ্ট্রধর্মের সংযোগ জনসাধারণের দাবিতে হয়নি। শুধু ক্ষমতাসীনদের ইচ্ছায় এসব ঘটেছে। ১৯৯১ সালের সাধারণ নির্বাচনে প্রধান দুটি দলের মধ্যে তুলনা করলে দেখা যাবে, ধর্মনিরপেক্ষতা-বিরোধীদের (৩০.৮%) চেয়ে বেশি ভোট পেয়েছেন ধর্মনিরপেক্ষবাদীরা (৩৩.৮৭%)। তবে বিএনপি, জামাতে ইসলামী ও জাতীয় পার্টির প্রার্থীদের মোট প্রাপ্ত ভোটের (৫৪.৭৮%) হিসেবে বলতে হয় যে, ধর্মনিরপেক্ষতা-বিরোধীরা বেশি জনসমর্থন লাভ করেছেন। ওদিকে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-সংসদের নির্বাচনের ফলাফল দেখলে স্পষ্টই মনে হয়, রাষ্ট্রধর্মের পক্ষে না হলেও তরুণদের বেশির ভাগ ধর্মনিরপেক্ষতার পক্ষে নয়।

এ-অবস্থায় ধর্মনিরপেক্ষবাদীর কর্তব্য কী? তিনি কি তাকিয়ে থাকবেন জনগণের অভিপ্রায় বোঝার জন্যে? তিনি কি চালিত হবেন তাদের সাময়িক মনোভাবের দ্বারা? নাকি নেতৃত্ব দিয়ে তাদের নিয়ে যাবেন তাঁর বিশ্বাস-অনুযায়ী মঙ্গল ও কল্যাণের পথে? পাকিস্তানের দ্বিজাতিতন্ত্রের আবহাওয়ায় যারা সাহস করে বলেছিলেন, এ তত্ত্ব ভুল, অন্তত অপ্রয়োজনীয়, তাদের দৃষ্টান্ত কি পথ দেখাবে না? ১৯৪৮-এ যারা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন, তাদের পক্ষে সেদিন জনসমর্থন ছিল না, তবু বিশ্বাস-অনুযায়ী তারা অগ্রসর হয়েছিলেন-এ উদাহরণ কি অনুকরণীয় হবে না? মুক্তিযুদ্ধের চেতনা কি ব্যর্থ হয়ে যাবে।

ইসলামী প্রজাতন্ত্র পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় কাঠামো থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সেই রাষ্ট্রের তাত্ত্বিক প্রভাব থেকে আমরা মুক্ত হতে পারি নি। ধর্মরাষ্ট্রে প্রত্যাবর্তনের ইচ্ছা গোপনে লালন করে যারা আপাতত রাষ্ট্রধর্ম প্রতিষ্ঠা করেছেন, তারা নিশ্চয়ই ভবিষ্যতের আশার পথ চেয়ে আছেন। তবে ধর্ম নিয়ে রাজনীতির পরিণাম যে কত ভয়াবহ হতে পারে, তা নিশ্চয় তাদেরও অজানা নয়। সেই অভিজ্ঞতা থেকেই একদিন এদেশের জনপ্রতিনিধিরা চেয়েছিলেন, ধর্ম ব্যক্তিগত জীবনের বিষয় হয়ে থাক, রাষ্ট্রের সঙ্গে তার সংশ্লিষ্ট ঘটিকে কাজ নেই—তাতে রাষ্ট্র ও ধর্ম দুইই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই বোধ যার আছে, তাকেই বলতে হবে আমরা ধর্মনিরপেক্ষতায় ফিরে যাবো, যেমন ফিরে গিয়েছি সংসদীয় গণতন্ত্রে।

আমার চোখে ধর্ম

বেবী ইসলাম

[ধর্ম নিয়ে এ যাবৎকাল পৃথিবীর বিখ্যাত দার্শনিকগণ কোটি কোটি বাক্য বলেছেন। ধর্মের উদ্ভব, প্রচার এবং বিস্তার সম্পর্কে এখনও বলে চলেছেন। মানুষ এবং মানুষের সমাজের যদিই অস্তিত্ব থাকবে, তদিনে ধর্মের পক্ষে বিপক্ষে আলোচনাও থাকবে। আমি যেহেতু কোন দার্শনিক নই, নই কোন পণ্ডিত ব্যক্তি, দর্শনের এক পাতাও পড়িনি কখনও, জন্মসূত্রে সমাজে প্রচলিত একটি ধর্মের উত্তরাধিকারী, পেশায় চলচ্চিত্র শিল্পের একজন ক্ষুদ্র কারিগর, নিজস্ব অনুভূতিতে এই আটবৃটি বছর বয়সে মস্তিষ্কে ও হৃদয়ে ধর্মের যে ছাপ প্রোথিত হয়েছে এই লেখায় তারই প্রতিবিশ্ব রচিত হবে।]

১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে কোলকাতা শহরে আমার মা ছিলেন কোলকাতা কর্পোরেশনের ফ্রীপ্রাইমারী স্কুলের একজন শিক্ষয়িত্রী। বাড়িতে বাসায় আমি এবং মা বসবাস করতাম। বাসা বদলের জন্য নতুন বাড়িওয়ালার সঙ্গে কথা পাকাপাকি করে পরদিন গেলাম অগ্রিম টাকা নিয়ে এগ্রিমেন্ট করার জন্য, বাড়িওলা যেই মাত্র শুনলেন আমার মার নাম মোতাহারুন নেসা, সেইমাত্র দুহাত জোড় করে কপালে ঠেকালেন, বললেন, “মাফ করবেন, আমি হিন্দু ছাড়া কাউকে ঘর ভাড়া দেব না।”

১৯৯৫ খ্রীষ্টাব্দ। ঢাকা শহর। আমার সামনের বাড়ি খালি হল। বাড়ির মালিক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত পদার্থ বিদ্যার অধ্যাপক বৈজ্ঞানিক। আমার পরিচিত ভদ্রলোক ভাড়া নেবার জন্য আমার কাছে এলেন, সঙ্গে করে নিয়ে গেলাম। কথা হল, বাড়িওলা যখনই জানলেন ভদ্রলোক হিন্দু, কোন রকম দ্বিধা না করে বললেন, “আমি বুড়ো মানুষ নামাজ রোজা করি, মাথার ওপর হিন্দুকে ভাড়া দেব না।”

১৯৩৫-এ যা ছিল, ১৯৯৫তেও তাই। সময় বদলেছে, স্থান বদলেছে, কিন্তু বদলায়নি সম্প্রদায়ের প্রতি সম্প্রদায়ের ঘৃণা, বিদ্বেষ। ধর্ম কি? বস্তু ও জীবের আচরণ। যেমন আগুনের ধর্ম পোড়ানো। পানির ধর্ম ভেজানো। বায়ুর ধর্ম প্রবাহ, উদ্ভিদের ধর্ম মাটি ভেদ করে ওঠা। জীবের ধর্ম বেঁচে থাকা। কীট-পতঙ্গ থেকে মানুষ বেঁচে থাকার জন্য অবিরাম প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। সংগ্রাম করে চলেছে প্রকৃতির বিরুদ্ধে। প্রথমে ছিল একক সংগ্রাম, পরবর্তীকালে মানুষ হলো যুথ-বন্ধ। যৌথ

সংগ্রাম জন্ম নিল সমাজের। সমাজে সৃষ্ট হলো কিছু রীতিনীতি। বিধি, বিধান। বিধির প্রণেতা। সমাজের বুদ্ধিমান ব্যক্তি। সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক জীবনে নানাবিধ জটিলতার সৃষ্টি হলো। জটিলতার দূরীকরণ, সামাজিক শৃঙ্খলা স্থাপনের জন্য মনুষ্যসৃষ্ট বিধি বিধান কার্যকর অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। তখনই অতিবুদ্ধিমান ব্যক্তি ন্যায়ালয় সমষ্টির সমাজে নিয়ে আসেন শাস্তি এবং শাস্তির বিধি বিধান। ইহকালের কৃতকর্মের জন্য পরকালের প্রাপ্তি। পুরস্কার এবং শাস্তি। সামাজিক বিধি রূপান্তরিত হয়ে গেল অলৌকিক বিধানে। শাস্তির আইন, শাস্তির বিচার। না মেনে উপায় কি। সমাজের দুর্বল এবং নির্বোধশ্রেণী সবসময় এরা সংখ্যায় বেশি, মেনে নিল শাস্তিকে, পরকালকে নির্দিধায়। মানুষের সংখ্যা বাড়ল, বিভিন্ন অঞ্চলে বসতি গড়ে উঠলো। গ্রাম, রাজ্য, দেশ। এক এক সভ্যতায় এলেন একজন প্রেরিত পুরুষ। প্রাকৃতিক পরিবেশ, সামাজিক রীতিনীতির সাথে খাপ খাইয়ে প্রচার করলেন মানুষের জন্য নির্দিষ্ট আচরণবিধি। তাই হয়ে গেল ধর্ম। পৃথিবীর পূর্বে, পশ্চিমে, উত্তরে দক্ষিণে একই জিনিস ভিন্ন নামে মানুষ গ্রহণ করল। দজল্যাফোরাতেবের অববাহিকা থেকে ভূমধ্য সাগরের পূর্ব তীর পর্যন্ত সভ্যতার আদি বিকাশ ভূমি হওয়ায় প্রেরিত পুরুষদের সংখ্যাধিক্য এখানেই বেশি।

মুসা, ইসা, মোহাম্মদ, জরথুষ্ট্র, বুদ্ধ, মহাবীর, নানক, চৈতন্য, কনফুসিয়াস, লাওচে, সবাই মানুষের মঙ্গলের জন্য তাঁদের চিন্তা চেতনা অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়েছেন। কেউ ঈশ্বর বা শাস্তিকে গভীরভাবে আঁকড়ে ধরেছেন কেউ তাকে এড়িয়ে গেছেন। কিন্তু সবাই একই কথা বলেছেন। মানুষকে ভালবাস। কেউ বলেনি ঘৃণা করতে। আধুনিক পৃথিবীর কালস্রোত একটা নতুন ধর্মের প্রবর্তক।

সব ধর্মই যদি মানুষের মঙ্গলের কথা বলে তাহলে বর্তমান পৃথিবীতে ধর্মে ধর্মে এই ঘৃণা বিদ্বেষ লড়াই কেন? কেন চলেছিল বছরের পর বছর খ্রীস্টানদের ক্রুসেড, মুসলমানদের জেহাদ। আবার মুসলমানদের শিয়া সুন্নীর লড়াই। ভারতবর্ষে বিভিন্ন জাতি, বিভিন্ন ধর্মকে নিজের বুকে আশ্রয় দিয়েছে, লালন করেছে, বিকশিত হয়েছে এক অনন্য সাধারণ সভ্যতা সংস্কৃতির।

যুগ যুগ ধরে হিন্দু-মুসলমান শিখ পারসীক জৈন, শাক্ত, বৈষ্ণব পাশাপাশি বাস করেছে একজন আরেকজনের সঙ্গে স্বাধীনভাবে ধর্ম আচরণ করেছে, অংশগ্রহণ করেছে। রাজ্য রাজ্য যুদ্ধ হয়েছে, বদল হয়েছে রাজ্য, সাধারণ মানুষ কিন্তু বদলায়নি। তারা একইসঙ্গে আযান দিয়েছে মসজিদে, ঘণ্টা বাজিয়েছে মন্দিরে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বুদ্ধের ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রবল প্রতিকূলতা সত্ত্বেও বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার কিছুতেই রোধকরা যাচ্ছিল না, তখনই ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রবক্তরা স্লোগান দিলেন বুদ্ধদেব তাদেরই একজন অবতার। পৌরাণিক নবম অবতার হিসাবে বুদ্ধদেবের স্বীকৃতি মিলল। অর্থাৎ মেনে নেয়াটা বোকামি নয় বাস্তবকে স্বীকার করা।

চৈতন্যদেব, ইসলামের সাম্যবাদ অর্থাৎ একই সঙ্গে সবমানুষ শাস্তির আরাধনা

করতে পারে কোন বিভেদ নেই, এই সার বিষয়টুকু গ্রহণ করে প্রচার করেছিলেন বৈষ্ণবধর্ম। কোন আচার নেই, কোন সংস্কার নেই, কোন পূজা নেই, শুধু নাম কীর্তন। যার ভাল লেগেছে গ্রহণ করেছে, ভাললাগে নাই যার, গ্রহণ করেনি। তাই বলে চৈতন্যদেবের মতবাদকে বাতিল বলে উড়িয়ে দেন নি। অথচ অর্থনৈতিক রাজনৈতিক কারণে ধর্ম যখন স্বার্থান্ধ মানুষের হাতে ব্যবহৃত হতে লাগলো তখনই ধর্ম তার ধর্ম হারালো। অতীতে পুরোহিত, রাজা। বর্তমানে সমাজপতি তথা রাজনৈতিক নেতাদের হাতে ধর্ম হচ্ছে সবচেয়ে প্রিয় বস্তু, যাকে যখন যেমন ইচ্ছা আকৃতি দেওয়া যায়। আর সেই খেলার আনন্ড দিচ্ছে সমস্ত পৃথিবীর নিরীহ এবং ধর্মবিশ্বাসী মনুষ্য সন্তানগণ।

যে ধর্ম এসেছিল মানুষকে ভালবাসার আহ্বান জানিয়ে সেই ধর্ম টিকে থাকবে যতদিন মানুষ থাকবে, সমাজ থাকবে, পৃথিবী থাকবে। যদিও বার বার কলুষিত হচ্ছে স্বার্থান্ধ তথাকথিত মানুষদের হাতে, তবুও বলছি ধর্ম আছে, ধর্ম থাকবে, হয়তো ঈশ্বর থাকবে না। মানুষ থাকবে, থাকবে মানুষেরই ধর্ম।

শুধু বিগ্রহের মাথায় ফুল চড়ানো ও পাঁচবার মাথাঠোকা ধর্ম নয়।

AMARBOL.COM

ধর্ম ও সংস্কৃতি

বুলবন ওসমান

ধর্ম কি? ধর্মের সঙ্গে সংস্কৃতির কি যোগাযোগ? ধর্ম কি কারণে সৃষ্টি হলো? এ-সব প্রশ্নকে কেন্দ্র করেই আমরা যাত্রা করতে চাই।

ধর্ম সম্বন্ধে সমাজতত্ত্ববিদ সামনার ও কালারের মতামত, “আদিকাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত ইতিহাসে ধর্ম মোটেই একটা নৈতিকতার ব্যাপার নয়, বরং অনুষ্ঠান রীতি পালন, এবং উৎসব...” লোক জীবনধারার ওপর জোর দেবার কারণেই তাঁরা ধর্মকে এই দৃষ্টিতে দেখেছেন।

লোয়ি তাঁর ‘আদিম ধর্ম’ পুস্তকে বলেছেন, ধর্ম হলো “বাস্তবের অসাধারণ ভীতিপ্রদ অবস্থা থেকে রক্ষা পাবার জন্যে একটি স্বতঃস্ফূর্ত মানসিক চেতনা”—এ ক্ষেত্রে লোয়ি ধর্মকে বিচার করেছেন পুরোপুরি ঐতিহাসিক দিক থেকে। আদিম মানুষ বিরুদ্ধ পরিবেশে প্রতিটি প্রাকৃতিক ক্ষমতাকে ভয় পেত : যেমন ঝড়-বৃষ্টি-বিদ্যুৎ, বন্যা, রৌদ্রদাহ, শৈত্য এমনি সব ক্ষমতাকে বিপুল শক্তির মনে করে মানুষ করুণা ভিক্ষা করত, এ থেকেই ধর্মবোধের জন্ম।

ফ্রেজার বলেছেন, “ধর্ম হলো মানুষের চেয়ে উন্নত ধরনের ক্ষমতা সম্বন্ধে বিশ্বাস যা মানুষ ও প্রাকৃতিক ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রিত করছে।” তিনি আরো বলেছেন যে ধর্ম হলো মোটামুটি এই সব প্রাকৃতিক ক্ষমতাকে প্রসন্ন করার প্রচেষ্টা।

সমাজতত্ত্ববিদ এমিল ডুখাইম বলেছেন, ধর্ম হলো “বিশ্বাস এবং অনুষ্ঠানের একটি বিশিষ্ট পদ্ধতি, অর্থাৎ কিছু জিনিস পবিত্র মনে করা হচ্ছে এবং ‘কিছু জিনিসকে করা হচ্ছে নিষিদ্ধ।’ তাঁর মতে ধর্মকে কখনো একটি সংগঠন থেকে পৃথক করে দেখা যায় না, যেমন ‘গীর্জা’। গীর্জা, ছাড়া খৃষ্টধর্মের অস্তিত্ব কোথায়? তাই তিনি বলেছেন, ধর্ম “মূলতঃই একটি যৌথ ব্যাপার”। একটি সামাজিক ও সমাজতাত্ত্বিক উপাদান।

ধর্ম যে সামাজিক ব্যাপার এ সম্বন্ধে আজকে আর দ্বিমত নেই। কিন্তু ধর্মের সংজ্ঞা কি ভাবে দেবে? ই. বি. টাইলর ধর্ম সম্বন্ধে বলেছেন, “অতিপ্রাকৃত ক্ষমতায় বিশ্বাস।”

ধর্ম সম্বন্ধে এমনি আরো অনেক সংজ্ঞা জড় করা যায়। কিন্তু উপরোক্ত সব সংজ্ঞা থেকে আমরা যে কয়েকটা জিনিস পাচ্ছি তা হলো : এক, অতি-প্রাকৃত শক্তি সম্বন্ধে বিশ্বাস ; দুই, এই বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে একটি অনুষ্ঠানের ধারা ; তিন, এই বিশ্বাস ও অনুষ্ঠান করা হচ্ছে অতি-প্রাকৃত ক্ষমতার অনুগ্রহ লাভের জন্যে। সুতরাং আমরা সহজেই সংজ্ঞা দাঁড় করাতে পারি, ধর্ম হলো অতি-প্রাকৃত শক্তিতে বিশ্বাস এবং তার

অনুগ্রহলাভের জন্য অনুষ্ঠানের ধারা। অবশ্য বৌদ্ধ ধর্ম একমাত্র ব্যতিক্রম যেখানে অতিলৌকিক ক্ষমতার অস্তিত্ব কল্পনা করা হচ্ছে না।

প্রতিটি ধর্মবিশ্বাসকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠান একটি বিশিষ্ট রূপ লাভ করে। সমাজ ও সংস্কৃতির উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে এই অনুষ্ঠান ভিত্তি করে নতুন নতুন উপাদান যুক্ত হয়।

ধর্মের সংজ্ঞা দেবার পর প্রশ্ন আসে ধর্ম কোন সাংস্কৃতিক পরিবেশ উদ্ভূত? ধর্মের সঙ্গে সংস্কৃতির কি যোগাযোগ? এর উত্তরে ধর্ম যখন উদ্ভূত হয় তৎকালীন সমাজ-কাঠামো সম্বন্ধে পরিচিত হওয়া দরকার। সমাজ-কাঠামো নির্ভর করে উৎপাদন পদ্ধতির ওপর। আদিম সমাজে বিশেষ করে পুরাতন প্রস্তর যুগে মানুষ যখন মাত্র পশুশিকার পর্বে প্রবেশ করেছে তখন তার একমাত্র উৎপাদন ব্যবস্থা হলো পশু-শিকার। মানুষ তখন ছোট ছোট দলবদ্ধ হয়ে গুহায় বাস করত। এই সময় এই সমাজকাঠামোকে কেন্দ্র করে যে অতি-কাঠামো গড়ে ওঠে যাকে আমরা বলছি সংস্কৃতি—তার মধ্যে ধর্মের কোন অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়নি, বরং আমরা দেখি যাদু বিশ্বাস আর কিছু নয়, প্রাকৃতিক ক্ষমতা বা অর্থনীতিক ব্যবস্থার নকল তোলা। গুহাচিত্রের পেছনেও আমরা এই একই মানসিকতার পরিচয় পাই। পশু শিকারের চিত্র তৎকালীন মানুষের আশা পূরণের প্রতিফলন। অর্থাৎ তাদের বিশ্বাস রেখার মাধ্যমে যে বাইসনের চিত্র আঁকা হচ্ছে তার ফলে উক্ত প্রাণী মায়াজালে বাঁধা পড়ে যাচ্ছে, সুতরাং তাকে শিকার করা সহজ হবে। এখানে আমরা যে মানসিক চিত্র পাচ্ছি তার সংগে ধর্মের কোন মিল নেই। যদিও এই গুহাচিত্রগুলো ছিল ধর্মীয় বস্তুর মতই পবিত্র।

এই আর্থনীতিক কাঠামোয় মানুষ-প্রকৃতিকে ব্যাপকভাবে না হোক মোটামুটি পাঠ করতে শুরু করেছে। তখনো সমাজ-জীবন সুষ্ঠু কাঠামো লাভ না করায় অন্য কোন চিন্তা-ভাবনা দানা বাঁধেনি। ক্রমশ পশুশিকার থেকে মানুষ যখন কৃষিবিদ্যা লাভ করে তখন তার চিন্তার ক্ষেত্রেও পরিবর্তন ঘটে। প্রাকৃতিক ক্ষমতার ওপর মানুষকে নির্ভর করতে হচ্ছে। বিশেষ করে বৃষ্টির জল চাষবাসের অন্যতম উপাদান। মানুষ প্রথমে বৃষ্টির নকল তুলে বৃষ্টিকে আহ্বান জানাত। অনেকটা সেই গুহাচিত্রের বাইসনকে আহত করে আঁকার মতই। ক্রমশ মানুষ যখন এই প্রক্রিয়ার বিফলতা সম্বন্ধে সজাগ হতে থাকে তার দৃষ্টি নিগূঢ়ভাবে নিবদ্ধ হয় প্রাকৃতিক সব শক্তির ওপর। কোনভাবেই যাদুবিদ্যার জোরে যখন এদের সম্ভুত করা যাচ্ছে না। মানুষ নতুন প্রক্রিয়ার জন্ম দিতে থাকে। এই নতুন প্রক্রিয়াই হোলো ধর্ম, সুতরাং সমাজ কাঠামো সংস্কৃতির অন্যান্য সব উপাদানের মত ধর্মেরও জন্মের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

সমাজ-কাঠামোকে কেন্দ্র করে যেমন ধর্মের সৃষ্টি হচ্ছে তেমনি সৃষ্টি হচ্ছে সংস্কৃতির অন্যান্য অংশ। নৈতিকতা, শিল্প, রাজনীতি, জ্ঞান-বিজ্ঞান সবই ধর্মের সঙ্গে চলছে। আর যেহেতু সামাজিক প্রক্রিয়া এক পদ্ধতি থেকে আর এক পদ্ধতিতে

উত্তরিত হয় এবং যার সম্বন্ধতা বিদ্যমান, ফলে পূর্ব কাঠামোজাত সংস্কৃতির অনেকটাই টিকে থাকে। নতুন সমাজ কাঠামোর অনুকূল নয় সংস্কৃতির এমন অংশ ছাড়াই হয়ে যায়। আবার অনেক অপ্রয়োজনীয় অংশও টিকে থাকে। এইভাবে দেখা গেছে কৃষি উৎপাদন কেন্দ্রিক সংস্কৃতিতে সৃষ্ট ধর্ম শিল্পভিত্তিক সমাজেও টিকে আছে। যদিও অনেক সমাজে এর অবস্থান অনেকটা শিথিল।

ধর্মের সঙ্গে নৈতিকতার সম্পর্ক প্রগাঢ়। কারণ প্রতিটি সমাজ-ব্যবস্থার নৈতিকতা বিদ্যমান। আর ধর্ম একটা নৈতিক ব্যবস্থার মধ্যেই সৃষ্টি হয়েছে, সুতরাং সেই বিশেষ সমাজের নৈতিকতার প্রচুর উপাদান ধর্ম আপন দেহে ধারণ করে বেড়ে ওঠে। ধর্মের তাই কোন স্বাধীন সত্তা নেই, সংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদানকে গ্রহণ করে তার উদ্ভব।

ধর্মের মধ্যে সংস্কৃতির বিভিন্ন কাঠামোর অংশ জায়গা করে নেয়, যেমন ইসলামে অন্যতম ধর্মীয় কর্তব্য হলো জাকাৎ। জাকাৎ দেবার মাধ্যমে একজন মুসলমানের বিশ্বাস ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভ করবে। কিন্তু জাকাৎ মূলত আর্থনীতিক ব্যবস্থার একটি অঙ্গ। সামাজিকভাবে আয়কর গ্রহণের একটি ধারা সহজেই এর মধ্যে লক্ষণীয়, যদিও ইসলাম ধর্মের এটি অন্যতম প্রধান উপাদান। একটি রাষ্ট্র চালাতে গেলে সরকার ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা জনসাধারণের দেওয়া কর নির্ভর। এই কর ব্যবস্থার সঙ্গে ধর্মীয় অনুশাসন যুক্ত হয়ে ব্যাপারটাকে আরো দৃঢ়তা দান করেছে। যেহেতু তৎকালীন সমাজে ধর্মের প্রভাব ছিল প্রবল তাই এই ব্যবস্থা, যেখানে বর্তমান বিংশ শতাব্দীতে সাংস্কৃতিক ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রভাবে ধর্মকে রাজনীতি-নিরপেক্ষ করা হচ্ছে। পূর্বে ধর্ম মূলতই ছিল সামাজিক বন্ধনের অন্যতম প্রধান উপাদান, আজকে ধর্ম সেই গুরুত্ব হারিয়েছে। ধর্ম ক্রমশঃ গিয়ে দাঁড়াচ্ছে ব্যক্তিক মূল্যবোধ ও সাংস্কৃতিক আচরণে। অনেকের জীবনে ধর্মীয় বিশ্বাস একেবারেই অনুপস্থিত। ধর্মীয় উৎসবেও তাদের উপস্থিতি দেখা যায় না। সুতরাং সাংস্কৃতিক পরিবেশের পরিবর্তনের সঙ্গে ধর্মীয় প্রভাব যে কি বিপুল পরিমাণে উন হতে পারে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। অবশ্য সাংস্কৃতিক কাঠামোর সঙ্গে সমাজ-কাঠামোও দেখার প্রয়োজন। যে সমাজ কাঠামোয় ধর্মের উদ্ভব আজ সেই কাঠামোও বিপুলভাবে পরিবর্তিত। আজ আর শুধু গণতান্ত্রিক কাঠামো নয় সারা বিশ্বে সমাজতান্ত্রিক কাঠামোও দিন দিন প্রবল হয়ে উঠছে। যে সরল কৃষি-কর্ম ভিত্তিক সমাজকাঠামোয় ধর্মের জন্ম সেই কাঠামোকে আজকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। সুতরাং ধর্মের সেই পবিত্র ও আদি রূপও আজ না পাওয়া স্বাভাবিক।

ধর্মের উৎপত্তি সম্বন্ধে আমরা সমাজ-কাঠামো ধরে আলোচনা করেছি। জ্ঞানের খাতিরে অন্যান্য যে সব অনুমান আছে তার আলোচনা প্রয়োজন। এ ব্যাপারে আমরা তিনটি ধারার সাক্ষাৎ পাই। প্রথম, বোধিমূলক ধারণা। ব্যক্তিগত মতামতই এ-ক্ষেত্রে প্রধান। এই ধারায় আমরা প্রধানভাবে পাচ্ছি ই. বি. টাইলর ও হার্বার্ট স্পেনসারকে। ধর্মের প্রাথমিক রূপ এঁরা ধরেছেন সর্বপ্রাণবাদ বা অ্যানিমিজম। যে-সব

আদিবাসীদের তাঁরা পাঠ করেছেন তাদের মধ্যে সর্বপ্রাণবাদ ছিল প্রধান। এই বিশ্বাসের মূল হলো প্রকৃতির প্রতিটি জিনিসকে জীবন্ত মনে করা। জীবন্ত যখন তাদের একটা ইচ্ছা-অনিচ্ছা আছে। মেঘ-বৃষ্টি-বজ্র, পাথর, গাছ-পালা সব কিছুকেই জীবন্ত মনে করা আর সেই সঙ্গে আরোপ করা মানবিক গুণে। এই সব প্রাকৃতিক ক্ষমতাকে ব্যক্তিত্ব আরোপ করে ইচ্ছা, দ্বেষ-বিদ্বেষ এইসব গুণে করা হতো গুণান্বিত। সুতরাং মানুষের জাগতিক চাহিদা মেটানোর উপায় হিসেবে এই সব ক্ষমতাকে সন্তুষ্ট করা একটা পবিত্র কর্ম ছাড়া আর কি হতে পারে।

আদি মানব আরো কিছু ব্যাপার লক্ষ্য করে ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেছে, যেমন, স্বপ্ন। স্বপ্ন তার কাছে একটা অতিপ্রাকৃত ক্ষমতার কারসাজি। কিছু প্রাকৃতিক ব্যাপার আছে, যেমন, প্রতিধ্বনি, দিব্যস্বপ্ন, নিশির ডাক ইত্যাদি—এ-সবই এক একটা রহস্যের রাজ্য। আর সবচেয়ে রহস্যময় ও ভীতিজনক ঘটনা হলো মৃত্যু। দেহ জীবনের আধার। মৃত্যু অর্থ দেহ থেকে জীবনের পলায়ন। তাই দেহ ও আত্মা। এই দুই বিভাগ প্রতিটি ধর্মেরই অন্যতম প্রধান প্রতিপাদ্য। জীবন অবসানে দেহ পঞ্চভূতে মিশে যায়। আদিবাসীরা এটা ভালো করেই খেয়াল করেছে এবং তাই প্রাণ-চাঞ্চল্যের নাম দিয়েছে আত্মা। এই আত্মারও পূজা শুরু হয়, যাতে আত্মা তাদের সাহায্য করে।

দ্বিতীয় পর্যায়ে আমরা ফ্রয়ডীয় মতবাদ তুলে ধরতে পারি। ফ্রয়ডের মতে আদিযুগে মানুষ যখন যুথবদ্ধ হয়ে বাস করত তখন পিতার সমস্ত মহিলাদের উপর কর্তৃত্ব করত। তাই তার ছেলেরা যৌন-ইচ্ছাজনিত কারণে পিতৃহত্যা লিপ্ত হতো। এই হত্যাকাণ্ডের পর স্বপ্নে হয়ত তারা পিতাকে দেখত। পিতার আত্মা যাতে সন্তুষ্ট হয় তাই তারা গোরস্তানকে পূজা করতে শুরু করে। ফ্রয়ডের মতে মানব সমাজে প্রথম পূজা স্থান হলো পূর্বপুরুষের কবর।

পল র্যাডিনেরও মত, আবেগজনিত কারণেই ধর্মের উৎপত্তি। তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, ‘কি সেই কারণ যার জন্যে মানুষ অতিলৌকিক ক্ষমতার জন্ম দিয়েছে?’ এর উত্তরে বলেছেন যে আর্থনীতিক নিরাপত্তার অভাব, ঝগড়া-ক্ষুব্ধ বিরূপ পরিবেশ, মানুষের দুর্বল হাতিয়ার এবং মানুষ তখন প্রায় স্বপ্নের রাজ্যে বাস করেছে, জগৎ সম্বন্ধে তার জ্ঞান নগণ্য, ভীষণ সীমিত—তাই নিজেকে একটি বৃহৎ ক্ষমতার হাতে ছেড়ে দিয়ে সহজ হতে চেয়েছে, চেয়েছে মানসিক উত্তেজনার নিরসন।

তৃতীয় দলে আছেন জর্জ সিমেল ও এমিল ডুখাইম। এঁদের মতে ধর্ম পুরোপুরিই সামাজিক জিনিস, দলগত জীবনে পারস্পরিক সহযোগ থেকে এর উদ্ভব। যৌথ জীবন না হলে ধর্মের উদ্ভব হতো না।

জর্জ সিমেল যৌথ জীবনের উপস্থিতি স্বীকার করেও মনস্তাত্ত্বিক দিকটিকে বড় করে দেখেছেন। তিনি বলেন, “আমি বিশ্বাস করি না যে ধর্মীয় অনুভূতি এবং বোধ কেবল ধর্মের মধ্যমই প্রকাশ পায়.....।” তারপর তিনি দেখিয়েছেন উৎসর্জন, মহিমাধ্বনন ও

ঐকান্তিকতা ইত্যাদি গুণ যেমন আছে ধর্মের মধ্যে, তেমনি আছে সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও। প্রথমত এই সব গুণ সামাজিক, পরবর্তী পর্যায়ে গেছে ধর্মে।

এমিল ডুখাইম ধর্মের উদ্ভব সম্বন্ধে সমাজের ওপর সবচেয়ে বেশি জোর দিয়েছেন। তাঁর মতে ধর্মের সৃষ্টি হয়েছে সমাজের সংহতি বজায় রাখার জন্যে। তিনি ধর্মের সংজ্ঞায় দেখিয়েছেন ধর্মের মধ্যে কিছু জিনিস হচ্ছে পবিত্র। এই পবিত্র জিনিসকে মেনে চলা অর্থ সামাজিক সংহতি বজায় রাখা। ঠিক এই সূত্রে তিনি তুলে ধরেছেন টোটেম বিশ্বাস। আদিবাসী দল মনে করছে তারা বিশেষ কোন প্রাণী বা উদ্ভিদ থেকে জন্ম নিয়েছে, তাই সেই চিহ্নকে তাদের পূর্বপুরুষ মনে করে পূজো করে এবং এভাবেই গোষ্ঠীসংহতি বজায় রাখছে। টোটেম-বিশ্বাসকে ধর্মবিশ্বাস বলা চলে না। এটা যাদু-বিশ্বাসের আওতাভুক্ত। অবশ্য এই টোটেম বিশ্বাসের মধ্যেই ধর্মের বীজ সুপ্ত ছিল। টোটেমকে পূজো করা থেকেই ক্রমশ ধর্মীয় পদ্ধতির উদ্ভব।

ধর্মের আদিরূপের আছে দুটি পর্যায়। প্রথম, সর্বপ্রাণবাদ বা এ্যানিমিজম এবং এরই সমান্তরাল দ্বিতীয়টি হলো, জীবন্তবাদ বা এ্যানিম্যাটিজম।

সর্বপ্রাণবাদ সম্পর্কে প্রথম উল্লেখ করেন অগাস্ট কঁৎ। অবশ্য ইংরেজ নৃতাত্ত্বিক স্যার জন লুবক এ-সম্বন্ধে একটি বিস্তারিত পঠন চালান। তাঁর মতে আদিবাসীরা প্রাকৃতিক শক্তিতে ব্যক্তিত্ব আরোপ করত। কারণ তারা মনে করত এ-সব জিনিস জীবন্ত। মানুষের সঙ্গে যেমন মানুষের সম্পর্ক, তেমনি অতিপ্রাকৃত ক্ষমতার সঙ্গেও যোগাযোগ স্থাপন করে। লুবক আরো বলেন, আদিবাসীরা মৃত পূর্বপুরুষের মধ্যেও একটা প্রচণ্ড ক্ষমতা কল্পনা করে। তাই তারা শুরু করে ভূত পূজো।

হার্বাট স্পেনসরও এই সর্বপ্রাণবাদের নমুনা তুলে ধরেন। তাঁর মতে ভূতের ভয়ের মধ্যেই ছিল ধর্মের বীজ লুকান। পূর্বপুরুষের ভূতকে খুশী করার জন্যে মানুষ পূজো দিতে শুরু করে। কারণ এই ভূত তাদের বিভিন্ন কাজে সাহায্য করবে। এমন কি স্পেনসার আরো ধারণা করেন যে, যে-সব পূর্বপুরুষ জীবিতকালে প্রচুর দৈহিক ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছে তাকে লোকে দেবতা বলতে শুরু করে এবং মনে করে তার ভূত খুবই শক্তিশালী। এইভাবে দেব দেবীর জন্ম।

যদিও টাইলর ও স্পেনসারের এই সর্বপ্রাণবাদ সবাই স্বীকার করে, কিন্তু এটাই যে ধর্মের প্রাথমিক রূপ তা অনেক নৃতাত্ত্বিক মনে করেন না। প্রায় সব আদিবাসীদের মধ্যেই এই সর্বপ্রাণবাদ ও ভূত পূজো আছে, কিন্তু মনে হয় তা যেন ধর্মের বেশ উন্নত অবস্থা। আরো আদিম অবস্থায় ধর্ম হয়ত এ-রকম ছিল না। আদিম অবস্থায় যা ছিল তার ওপরেই যেন এই সব বিশ্বাস বেড়ে উঠেছে।

জীবন্তবাদ বা এ্যানিম্যাটিজম সম্বন্ধে আমাদের তথ্য দান করেন বৃটিশ নৃতত্ত্ববিদ ম্যারেট। তাঁর মতে সর্বপ্রাণবাদের চেয়ে ধর্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রে আরো একটা প্রাচীন পর্যায় আছে। এই নির্ব্যক্তিক ক্ষমতাকে বলা হচ্ছে ‘মানা’। এই পদটি নৃতত্ত্ববিদ কডরিংটন প্রথম ব্যবহার করেন। ম্যারেট এই ‘মানা’ বিশ্বাসের নাম দিয়েছেন

অ্যানিম্যাটিজম বা জীবন্তবাদ। ‘মানা’ এই শব্দটি মেলানেশিয়ানদের। তারা এমন একটা ক্ষমতা বা শক্তি কল্পনা করেছে যা মানুষ, প্রাণী বা কোন বস্তুর মধ্যে প্রযুক্ত হয়। আদিবাসীদের মধ্যে এই ধারণা প্রায় সার্বজনীন। এক এক গোত্র এই ধারণা বিভিন্নভাবে ব্যবহার করে, তবে মোটামুটি একটা অদ্ভুত ক্ষমতাকে তুলে ধরা হয়। এই ক্ষমতাকেই নৃতত্ত্ববিদ লোয়ি বর্ণনা দিয়েছেন এক ধরনের “তরল বিদ্যুতের” মত যা ব্যক্তি বা বস্তুর মধ্যে অনুপ্রবেশ করতে পারে বা একটা থেকে আর একটায় সরে যেতে পারে।

সর্বপ্রাণবাদ ও জীবন্তবাদ মোটামুটি সব আদিবাসীদের মধ্যেই দেখা যায় এবং সব ধর্মেরই প্রায় প্রাথমিক পর্যায়। জীবন্তবাদকে সর্বপ্রাণবাদের চেয়ে পুরোনো বলে ম্যারেট বর্ণনা করলেও অনেক নৃতত্ত্ববিদ কোনটাকেই কোনটা থেকে উদ্ভূত বা পুরোনো বলে মনে করছেন না, তাঁদের অভিমত এরা সহ-অবস্থান করেছে এবং বিরাজ করেছে সব ধর্মেরই পটভূমিতে। যদিও মাত্রাগতভাবে কোনোটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। মোটামুটি এ-কথা বলা যায় যে, ‘মানা’ ধারণাকে সর্বপ্রাণবাদের পরিপূরক হিসেবে রাখতে হবে।

আদিম ধর্ম মানুষের সংস্কৃতির সর্ব স্তরে জড়িত ছিল। এমন অনুষ্ঠান ছিল না যা ধর্মীয় প্রভাবমুক্ত ছিল, যদিও আর্থনীতিক ব্যবস্থা ধর্মকে প্রবল ভাবে নিয়ন্ত্রিত করে। ধর্ম সৃষ্টি হবার পর আর্থনীতিক ক্রিয়াকর্মের সঙ্গেও তার যুক্ত হওয়া স্বাভাবিক। নতুন একটা দোকান দিতে গেলে মুসলিম সম্প্রদায়ে মিলাদ পড়ানো অনুষ্ঠান হিসেবে প্রায় সার্বজনীন।

কাঠামোগতভাবে ধর্মের প্রয়োজনীয়তা আজ বিপুল-ভাবে পরিবর্তিত। তার কর্ম ও পটভূমি সবই গেছে বদলে। ইউরো-আমেরিকায় বর্তমানে ধর্মের ওপর গবেষণা করে যে ফল দেখা গেছে তা থেকে জানা যায় আজ গীর্জা একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে ধর্ম প্রচার ছাড়াও প্রায় আরো তেত্রিশ প্রকার সামাজিক কর্ম করে থাকে। তা-ছাড়া যুক্তিবাদী বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর জন্যে ধর্ম প্রভাব মুক্ত মানুষও আজ কম নয়। হিসাব নিলে সারা বিশ্বে ধর্ম প্রভাবমুক্ত মানুষের সংখ্যা খুব একটা কম হবে না। এর পেছনে প্রযুক্তিবিদ্যা ও বিজ্ঞানের অবদান বিশেষভাবে ক্রিয়াশীল। বিজ্ঞান মানুষকে যত বেশি যুক্তি-নির্ভর করেছে মানুষ ততই ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও প্রথা থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। তার মানসকে ধর্মীয় দর্শন তেমন করে আর নাড়া দিতে পারছে না। তবু ধর্মের টিকে থাকার পেছনে এর রীতি-প্রথাগত দিকটাই বড়।

শ্রেণীবিভক্ত সমাজে ধর্ম সব সময়ই প্রতিক্রিয়াশীল ভূমিকা গ্রহণ করেছে। শোষিতরা ব্যর্থ হয়ে আশ্রয় নিয়েছে ধর্মে, আর শোষকরা ধর্মকে ব্যবহার করেছে শোষণের অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে। সংস্কৃতির বিভিন্ন পর্যায়ে ধর্মের এমনিই বিভিন্ন রূপ। সংস্কৃতি ছাড়া ধর্মের স্বাধীন কোন সত্তা নেই।

মূল স্রোতে ধাবমান

নূরুর রহমান

এ রচনাটি যখন পত্রস্থ হবে, তা পড়ে কেউ গালি দিন বা প্রশংসা করুন, তার প্রত্যাশা আমি করি না, কারণ মানুষ যা বিশ্বাস করে বা সত্য বলে জানে তা কোন না কোন ভাবে প্রকাশ করা মানুষের স্বাভাবিক অধিকার। একেই বলে চিন্তার স্বাধীনতা। এই চিন্তার স্বাধীনতা যে দেশে নেই সে দেশে কোন রকমের সত্যিকারের স্বাধীনতা আছে বলে আমি মনে করি না। তবে সেই চিন্তার ফসল হতে হবে মানব কল্যাণমূলক এবং সৃষ্টির মঙ্গল হবে এটাই যেন থাকে সেই চিন্তার মূল সূর।

আমি যে বিষয়টি নিয়ে আমার চিন্তার ফসল প্রকাশ করতে যাচ্ছি, তা কোন দেশ কালের মধ্যে গণ্ডিবদ্ধ নয়, তা আন্তর্জাতিক এবং কালের গণ্ডির বাইরে। এই পৃথিবীতে একটি বিষয় আছে, যার কোন ভৌগোলিক সীমাবদ্ধতা নেই যেমন—এই পৃথিবীর সমস্ত প্রজাতি একটা নিয়মের মধ্যে চলে, তবে সব প্রজাতি সেই নিয়মটা তারা আকারে প্রকারে প্রকাশ করতে পারলেও বিভিন্ন প্রজাতির বিভিন্ন ভাষার কারণে এক প্রজাতির ভাষা অন্য প্রজাতি বুঝতে পারে না। তবে অনেক মহাজ্ঞানী ব্যক্তি কোন কোন প্রজাতির প্রকাশ শুধি দেখে তার নিজস্ব ভাষায় তার নিজ প্রজাতির নিকট তা প্রকাশ করে গেছেন। আমি সেদিকে না গিয়ে আমার নিজ প্রজাতি যে মানুষ, সেই মানুষের কতগুলি নিয়ম কানুন সম্বন্ধেই আমার কথা সীমাবদ্ধ রাখব। সেই নিয়ম-কানুনগুলির একটি প্রধান মাধ্যম হল ধর্মীয় নিয়ম কানুন বা ধর্ম।

এই বিশ্বে যত মানুষ আছে তারা কোন না কোন ভাবে একটি নিয়মের মধ্যে চলে, যার নাম দিয়েছেন তারা ধর্ম। কেউ বলেছেন এই নিয়মগুলি বা বিধানগুলি আমাদের স্রষ্টা আমাদের জন্য পাঠিয়েছেন। কেউ বলেছেন এগুলি আমাদের দেবতারা আমাদের জন্য তৈরি করেছেন। কেউ বলেছেন আমাদের ধর্মীয় নেতারা আমাদের জন্য এই বিধানগুলি দিয়ে গেছেন ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই সব পাঠানো বিধান, বলা বিধান, শুনা বিধান এবং লেখা বিধানগুলিই এক পর্যায়ে এসে “ধর্ম” নামে আত্মপ্রকাশ করে। সত্যি বলতে কি, এই পৃথিবীর এমন কোন মানুষ নেই যে কোন না কোন ধর্মের অর্থাৎ বিধানের মধ্যে আবদ্ধ নয়। এমন কি যারা স্রষ্টায় বিশ্বাসী নয়, তারাও কোন বিধান বা নিয়মের মধ্যেই চলে। হয়তো বা তারা ঐ বিধান বা নিয়মকে ধর্ম বলতে চায় না। কারণ প্রচলিত ধর্মগুলি অলৌকিকত্ব ও সাম্প্রদায়িক দোষে দুষ্ট। তাদের ধর্মবিশ্বাস অন্য রকম। এর পক্ষে বিপক্ষে অনেক কথা বলা যায়। আমি সেদিকে যাব না, ঐ সব পাঠানো বিধান, শুনা বিধান, কিংবা লেখা বিধানগুলি এক পর্যায়ে এসে গ্রন্থাকারে মানুষের কাছে প্রকাশ

হয়েছে যা ধর্মগ্রন্থ নামে পরিচিত।

এই ধর্মগ্রন্থগুলির যে যেটায় বিশ্বাসী, সেই বিশ্বাসীদের নিয়ে এক একটি সম্প্রদায় গড়ে উঠেছে। যেমন মুসলমান, হিন্দু, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, ইহুদি ইত্যাদি। এ রকম হাজারো রকম বিশ্বাসী বা সম্প্রদায় আছে। এর মধ্যেও আছে আবার বহু রকম ভাগ, সেই বিতর্কেও যাব না।

উক্ত ধর্মগ্রন্থগুলি স্রষ্টা প্রদত্ত বলে যাদের বিশ্বাস, তাদের কথা হল, এগুলি অপরিবর্তনীয়। যেমন মুসলমানদের কোরান, খৃষ্টানদের বাইবেল, ইহুদিতে তৌরাত, এগুলি নাকি স্বয়ং স্রষ্টা তার প্রেরিত পুরুষদের মাধ্যমে যুগে যুগে মানুষের জন্য অবশ্যি পালনীয় বলে পাঠিয়েছেন।

আবার কতগুলি গ্রন্থ শত শত বছরে ঐ বিশ্বাসীদের কথিত ভাষায় মুনিঋষিগণ মানুষের জন্য ঐ গুলি রচনা করে গেছেন। যেমন বেদ, গীতা, ত্রিপিটক ইত্যাদি। যা হিন্দু বৌদ্ধগণ মানেন বা বিশ্বাস করেন। ঐ গ্রন্থগুলির প্রকাশকাল যদিও বিভিন্ন সময়ে, যুগে যুগে। তবুও অনেক জায়গায় এগুলির বেশ মিল আছে, আবার গরমিলও অনেক এবং স্ববিরোধিতায় ভরপুর। তবে একটা জায়গায় এত মিল যে প্রত্যেক গ্রন্থই বলে যে এইটাই সর্বশ্রেষ্ঠ বিধান ও পূর্ণাঙ্গ।

আমার মনে হয়, এই পৃথিবীতে ধর্ম নিয়ে যত যুদ্ধ, দাঙ্গা, খুন খারাবি, হানাহানি হয়েছে তা এই শ্রেষ্ঠত্ব নিয়েই। যে কোন গ্রন্থের অনুসারীরা নিজেদেরটাকে শ্রেষ্ঠ বললে অন্য গ্রন্থগুলিকে মুখ ফুটে আর নিকৃষ্ট বলার প্রয়োজন পড়ে না।

কোন কোন গ্রন্থের অনুসারীরা আর একটু আগবাড়িয়ে বলে যে আমাদের গ্রন্থ আসার পরে আগের গুলি বাতিল। ধর্মগ্রন্থগুলির কার্যকারীতা স্থগিত হয়ে গেছে। কাজেই ঐ গুলির আর প্রয়োজন নেই। বর্তমানে যারা নিজেরটা ছাড়া ঐ সব গ্রন্থের অনুসারী তারা ভুলপথে আছে, তখন আর যায় কোথায়? এক গ্রন্থের অনুসারীরা আরেক গ্রন্থের অনুসারীদের মসজিদ ভাঙ্গে, তার প্রতিশোধ হিসাবে অন্যেরা মন্দির ভাঙ্গে। চলতে থাকে ভাঙ্গাভাঙ্গির পালা। প্রত্যেক দলেই কিছু উগ্র এবং স্বার্থান্বেষী লোক থাকে, তারা মানুষের দুর্বল অনুভূতিতে সুড়সুড়ি দিয়ে উস্কানী দেয়, ফলে মসজিদ মন্দির ভাঙ্গাভাঙ্গির মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে একে অপরের জীবন নাশে লিপ্ত হয়, তার নজির তো আমাদের চোখের সামনে ভুরি ভুরি। শুধু মসজিদ ভেঙ্গে মন্দির ভেঙ্গেই থামে না। গির্জা পেগোডার ভক্তদেরও মাঝে মাঝে হামলা করে, তার প্রতিশোধ আবার আসে অন্য ভাবে, অন্য দেশে।

যে দেশে শিক্ষার হার কম এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন লোক বেশি ও গরীব, সেই দেশে বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বেই এই সব ঘটনা ঘটে সবচেয়ে বেশি। প্রচলিত এই সব ধর্ম নিয়ে শিক্ষিত দেশে এত বাড়াবাড়ি নেই। এক সময় ছিল। যখন তারাও অশিক্ষিত ছিল। তাদের দেশেও অনেক মহাজ্ঞানীদেরকে তারা জেলে দিয়েছে, পুড়িয়ে মেরেছে। তাদের একমাত্র অপরাধ তারা সত্য কথা বলতেন বা এমন কিছু আবিষ্কার

করে ছিঁদেন যে সেই আবিষ্কার তাদের ধর্মগ্রন্থের বিপরীত হয়ে গিয়েছিল। অথচ সেই আবিষ্কারের সুফল আজ সারা বিশ্বের মানুষ ভোগ করছে এবং সেই নিয়মাবলী দ্বারা মানব কল্যাণ তথা সৃষ্টির কল্যাণের জন্য বহু কিছু আবিষ্কার হচ্ছে এবং আরো হ'ল, হতে থাকবে।

বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থের অনুসারীদের আরেকটি জায়গায় খুব মিল দেখা যায়। তা এ বিশ্বে মানব কল্যাণের জন্য যত কিছু নিত্য নতুন আবিষ্কার হয়, প্রথম দিকে তারা এর বিরোধিতা করে, অবিশ্বাস করে, মানুষকেও অবিশ্বাস করতে বলে। পরে যখন দেখে যে সেই আবিষ্কার মানুষ গ্রহণ করেছে, এবং সুফল ভোগ করছে (যেমন টি, ভি, মাইক, চাঁদে যাওয়া) তখন সেই সব বিভিন্ন গ্রন্থের অনুসারীরা যার যার গ্রন্থের প্রশংসা করে আর বলে এতো আমাদের ধর্মগ্রন্থেই আছে। শুধু আছে বলেই শান্ত হয় না। এই আবিষ্কারের সঙ্গে সম্পর্ক থাক আর নাই যাক যার যার ধর্মগ্রন্থ থেকে দূচারণানা শ্লোক ঐ সব ভাষায় আবৃত্তি করে প্রচার করতে থাকে তাই শুনে সাধারণ মানুষ বিভ্রান্ত হয়, কি জানি হলেও হতে পারে, কারণ দিনরাত যারা ধর্মগ্রন্থগুলি পড়ে, তারা যখন বলছে তখন তো আর মিথ্যা হতে পরে না। অথচ এই কথাটা তাদেরকে কেউ জিজ্ঞাসা করে না যে, দিন রাত আপনারা যারা গ্রন্থগুলি অধ্যয়ন করেন তার তো কেউ আবিষ্কারটি করতে পারলেন না। যারা আবিষ্কারটি করেছেন তারা তো দাবীদারদের কারো ধর্মগ্রন্থ পড়ে আবিষ্কার করেছেন বলে বলেন নাই। তা ছাড়া সকল ধর্মগ্রন্থের অনুসারীরাই যখন যার যার ধর্মগ্রন্থে আছে বলে দাবী করে তখন কোন গ্রন্থ থেকে নিয়ে আবিষ্কারটি করলেন তা তো পরিষ্কার হলো না। আর আপনাদের প্রত্যেকের ধর্মগ্রন্থেই যদি এত জ্ঞান বিজ্ঞানের কথা থাকে, যেগুলি পড়লেই চাঁদে যাওয়া যায়, রকেট, প্লেন, গাড়ি, টেলিভিশন, রেডিও ইত্যাদি তৈরি করা যায়। অর্থাৎ মানুষের প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিস এমনকি মানব কল্যাণের সমস্ত আইন কানুন পর্যন্ত জানতে বা বুঝতে পারা যায়, তবে তো পৃথিবীর সমস্ত স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থগুলি বাধ্যতামূলকভাবে পাঠ্য করে দিলেই হয়। অথচ বিশ্ব যারা চালায়, অর্থাৎ প্রশাসন থেকে শুরু করে জীবন রক্ষাকারী ঔষধ পর্যন্ত যত কিছুর আবিষ্কার যারাই করেছেন, তারা স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়েই লেখা পড়া করেছেন এবং জ্ঞানী গুণী বিজ্ঞানীদের সাহচর্যে থেকে বা গবেষণা করেই আমাদের প্রয়োজনীয় নিত্য নতুন চাহিদা মিটিয়ে চলেছেন।

যে এই ধর্মগ্রন্থের অনুসারী সে সেই ধর্মগ্রন্থের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখার জন্যই ধর্মগ্রন্থে যা নাই, তাও বানিয়ে বানিয়ে বলে, কারণ তারা আত্মগরিমায় ভোগে, পরে যখন দেখে যে হয় হয় অমুক ধর্মের লোকটি এত বড় একটি আবিষ্কার করে ফেললো সে তো আমাদের ধর্ম মানে না, তখন সাধারণ মানুষকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য বলে যে আপনাদের জন্য সুখবর, ঐ যে অমুকে বড় আবিষ্কারটি করেছে, সে তো আমাদের ধর্ম গ্রহণ করেছে। সাধারণ মানুষ যাচাই বাছাই না করেই নিজ ধর্মের

প্রতি দুর্বলতা হেতু তাই বিশ্বাস করে বসে।

জ্ঞানীগুণী লোকেরা সত্য কথা বলতে গিয়ে মানব কল্যাণের কাজ করতে গিয়ে অজ্ঞদের দ্বারা অত্যাচারিত হয়েছেন, নিহত হয়েছেন, বাড়িঘর থেকে বিতাড়িত হয়েছেন। কিন্তু কোন জ্ঞানীগুণী লোক কখনো কোন অজ্ঞ লোককে হত্যা করেননি বা অত্যাচার করেননি, বরং ক্ষমাই করেছেন, ক্ষমা করাই তো জ্ঞানী লোকদের স্বভাব। অজ্ঞ বলেই তো তাদের হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে হয়ে যায় পশু এবং সত্য বলতে কি, সমস্ত কুশিক্ষা এবং কুসংস্কারই হচ্ছে প্রগতির এবং সব রকমের উন্নতির সবচেয়ে বড় অন্তরায়।

ধর্মগ্রন্থগুলি সবচেয়ে প্রথম যে শর্ত তা হলো বিশ্বাস। ঐ সব গ্রন্থে যা লেখা আছে, কোন রকম দাঁড়ি কমাও অদল বদল করা যাবে না, এবং সেই অবস্থায় তা বিশ্বাস করতে হবে এবং মানতে হবে। সেই মানা মানতে গিয়ে এবং মানাতে গিয়ে কত মানুষকে যে অযথা জীবন দিতে হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই।

ধরুন কোন গ্রন্থের অনুসারীরা এক সময় ধর্মের নামে বিধবাদেরকে জোর করে স্বামীর সাথে সহ-মরণে অর্থাৎ জ্বলন্ত চিতায় উঠতে বাধ্য করতো। এই ভয়াবহ নৃশংসতা দেখে একজন মহামানবের প্রাণ কেঁদে উঠলো, তার নাম রাজা রামমোহন রায়। তিনি তদানীন্তন ভারতের শাসক বৃটিশ রাজের সহায়তায় ঐ অমানবিক সতীদাহ প্রথা রদ করেন। এর জন্য তাকে তার স্বজাতির দ্বারা কম অত্যাচারিত হতে হয়নি। সতীদাহ বাতিলের পরে ধর্মের নামে আরেকটি কুসংস্কার ছিল বিধবা বিবাহ সংক্রান্ত। তখনকার সময়ে ৬ হতে ১০ বছরের মধ্যে মেয়েদের বিয়ে হত, এটাও ছিল ধর্মের বিধান। কোনদিন স্বামীর মরে যায়নি, এমন সময় খবর এল স্বামী মারা গেছে, সেই অবস্থায় ধর্মের নামে তাদেরকে জোর করে স্বামীর চিতার আগুনে পুড়িয়ে মারা হত। পূর্বে উল্লেখিত সতীদাহ প্রথা বাতিল হওয়ার পর ঐ বাল্য বিধবাদের হল আরেক বিপদ, ধর্মের বিধান অনুযায়ী এদের আর বিয়ে হতে পারবে না।

এই বিপদে এগিয়ে এলেন বাংলার আরেক মহামানব ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তাঁর প্রাণ বিদ্রোহ করল ঐ ধর্মীয় বিধানের বিরুদ্ধে, তিনি এর সংস্কারে ব্রতী হলেন এবং বহু বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত জয়ী হলেন এবং বিধবা বিবাহের প্রচলন করে প্রথমেই নিজের ছেলের সাথে এক বিধবার বিয়ে দিলেন।

সত্যি কথা বলতে কি, আরো কিছু ধর্ম গ্রন্থে নারীদের উপর এ রকম অমানবিক হত্যার বিধান আছে, যে গুলি নিয়ে আলোচনা করতে গেলে নিজেরই হত্যা হয়ে যাওয়ার আশংকা। এমনি সত্য কথা বলতে গিয়ে বহু লোক ভিটেমাটি ছাড়া হয়ে জীবনের ভয়ে খোলামেলাভাবে চলতে পারে না। তাদের পক্ষে ভয়ে মানুষ কথা বলে না, কিন্তু কথা না বললেও তাদের নাম মানুষের মনে শ্রদ্ধার সাথেই নেওয়া হয়। আর যারা অত্যাচার করে তাদেরকে মানুষ ঘৃণাই করে।

আরেকটি জায়গায় বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থের মধ্যে বেশ মিল দেখা যায়। তা হলো নারী পুরুষে ঐশ্বর্য। সব কিছুতেই নারীর জন্য এক রকম আইন, আর পুরুষের বেলায় আরেক রকম। তার জবাবে তারা বলেন যে স্রষ্টাই নারী পুরুষকে দুই রকমভাবে সৃষ্টি করেছেন। এটা যে কত বড় হাস্যকর যুক্তি, দুই একটি উদাহরণ দিলেই তা পরিষ্কার বোঝা যাবে।

প্রকৃতিগতভাবে অর্থাৎ আকারে প্রকারে নারী এবং পুরুষ দুই রকম, এক কথা ঠিক, কিন্তু পৃথিবীর সব পুরুষের আকার প্রকার কি এক? মোটেই না। কেউ লম্বা, কেউ খাটো, কেউ চিকন, কেউ মোটা, কেউ কালো, কেউ শ্যাম বা ফর্সা, এক কথায় এক পুরুষের সাথে অন্য পুরুষের আকার প্রকারে কোন মিল নেই। এই অমিলও যেমন একটি শারীরিক প্রকৃতিগত নিয়ম, এই পৃথিবীর সমস্ত জীব জগতেই নারী পুরুষের এই অমিল রয়েছে।

কিন্তু এই কাঠামোগত শারীরিক অমিল ছাড়া আর সমস্ত বিষয়ে নারী পুরুষে কোন ভেদাভেদ নেই। যেমন পুরুষে যা খায়, নারীও তাই খায়। পুরুষে এবং নারীর একই গ্রুপের রক্ত একজন আরেকজনকে দিলে একে অপরের রক্ত দ্বারা বাঁচতে পারে। পুরুষের জ্বর, কলেরা বসন্ত যক্ষ্মা ইত্যাদি রোগ হলে যে ঔষধে চিকিৎসা হয় নারীরও ঐ সব রোগ হলে সেই একই ঔষধে চিকিৎসা হয়। বেশি উদাহরণ না দিয়ে একটি কথাই বলা চলে যে, শরীরের আকৃতি ও প্রকৃতিগত অমিল ছাড়া আর সব বিষয়েই নারী পুরুষ কারো চেয়ে কেউ কোন দিক দিয়ে কম নয়।

এ বিষয়ে আমার এক বন্ধুর সাথে একদিনের আপোষে ঝগড়ার বিষয়টি উল্লেখ করার লোভ সামলাতে পারছি না। কথায় কথায় আমি বললাম যে, মেয়েরা আজকাল পুরুষের শৃঙ্খল ভেঙে দিচ্ছে। এসে অফিস, আদালত, প্লেন চালানো থেকে যুদ্ধ ক্ষেত্র পর্যন্ত বিচরণ করছে। তাদেরকে এতকাল বিভিন্ন বিধানের দোহাই দিয়ে ঘরে আবদ্ধ করে রাখা হয়েছিল বলেই তারা প্রায় পঙ্গু হতে চলেছিল, তারাও যে ইচ্ছা করলে পুরুষের করণীয় সব কাজই করতে পারে, তা কিন্তু নারীরা প্রমাণ করেছে। আগামীতে আরো করবে। এতদিন ঘরে আবদ্ধ না থাকলে তারা আরো বেশি কর্মক্ষমতা দেখাতে পারতো। তার প্রমাণ বিদেশের মহিলারা, কারণ সেখানে পুরুষের শৃঙ্খল তারা আগেই ভেঙেছে। আমাদের দেশের পাহাড়ী মেয়েরা যে কাজ একজনে করতে পারে, আমাদের সমতলের তিনজন পুরুষও সে কাজ করতে পারে না, আমার বন্ধুর কিন্তু কথাগুলি পছন্দ হচ্ছিল না। কিন্তু যুক্তি সহকারে জোরালো কোন বক্তব্যও দিতে পারছিল না সে। এতক্ষণ আমি পুরুষরা মেয়েদের চেয়ে কম যোগ্য তা বলিনি। পুরুষের চেয়ে মেয়েরা কোন অংশে কম নয় তাই বলেছি। শেষ মুহূর্তে তর্কের খাতিরে যেই বলেছি যে, এই পৃথিবীর একজন মহিলা যা পারে, সারা বিশ্বের পুরুষ একত্রিত হলেও তা পারবে না, কাজটি হল, একটি মহিলা গর্ভধারণ করে একটি সন্তান প্রসব করতে পারে, সারা পৃথিবীর পুরুষ একত্রিত হলেও একটি

গর্ভধারণ করে সন্তান প্রসব করতে পারবে না। তখনই আমার বন্ধুটি বলে বসলেন যে সারা বিশ্বের মহিলারা একত্রিত হলেও একটি পুরুষের শুক্রকীট ছাড়া একটি গর্ভধারণ বা সন্তান প্রসব করতে পারবে না। সাথে সাথে আমি তার কথা মেনে নিয়ে বললাম যে, এসো বন্ধু কবির কথায় চলে যাই। এই পৃথিবীতে যাহা কিছু সুন্দর, অর্ধেক তার গড়িয়াছে নারী অর্ধেক তার নর। কেউ কাউকে ছাড়া যখন কোন কিছুই সৃষ্টি হয় না, পুরুষ বা নারী সন্তান জন্ম দিতেও যখন নারী পুরুষের মিলন দরকার হয়, একা কেউ কিছু পারে না। শুধু মানুষ নয়, সমস্ত জীব জগতের বেলায়ও এইটিই প্রকৃতির নিয়ম। একই খাওয়া পরা, একই রক্ত, একই চাহিদা, একই চিকিৎসা সবই যখন এক রকম তখন পাওনাদেনার বিষয়ে এই বৈষম্য কেন? মানুষের মাঝে যে বা যারা বা যে গ্রন্থ বৈষম্য সৃষ্টি করে বা শৃঙ্খল পরিণে রাখতে চায়, তা মানুষ কতদিন মানবে? মানবে যে না, তার প্রমাণ তো হাতে নাতেই পাওয়া যাচ্ছে। নিজ নিজ ধর্মের অনুসারীদের না হয় চোখ রাঙ্গিয়ে আরো কিছু দিন মানিয়ে নেওয়া যাবে। কিন্তু এক ধর্ম গ্রন্থের অনুসারী সম্প্রদায়তো আরেক সম্প্রদায়ের ধর্মগ্রন্থ মানে না।

বর্তমানে এই পৃথিবীতে প্রায় ছ'শো কোটি লোকের বসবাস, ধর্মে যারা অবিশ্বাস করে তাদের কথা না হয় বাদ দেওয়া গেল, যারা ধর্মে বিশ্বাসী, তারাও তো এক ধর্মের লোক, আরেক ধর্মেরটা মানে না। ঠিক তেমনি করে নিজের ধর্মেরটা মানি, অন্যেরটা মানি না, এমনি করে মানি আর মানি না করতে করতে সবই তো না মানার দলে পড়ে যায়। যারা মানির দলে আছে, তারাও নিজ নিজ ধর্মগ্রন্থ অনুযায়ী কত জনে চলে? এই ভাবে পৃথিবীর সকল সম্প্রদায়ের সকল ধর্মগ্রন্থের সঠিক ভাবে মেনে চলার লোক প্রত্যেক সম্প্রদায়ে কত পার্সেন্ট হবে? তার সাথে একদম না মানার দলের লোক যোগ দিলে ছ'শো কোটি লোকের মধ্যে, মানার দলের লোক কত কোটি হবে? চিন্তা করলে শরীর কিন্তু শিউরে ওঠে। কারণ ধর্ম ছাড়া অর্থাৎ বিধি-বিধান ছাড়া মানুষ চললে যে পৃথিবীর শৃঙ্খলা ভেঙ্গে পড়বে। সমাজে হানাহানি মারামারি শুরু হয়ে সমাজ ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়বে। এই পৃথিবীর সব কিছুই তো একটা নিয়মের মধ্যে অর্থাৎ ধর্মের মধ্যে চলে, তা হলে সমস্ত প্রজাতির মধ্যে মানুষতো ব্যতিক্রম হতে পারে না। তারা কেন নিয়মের মধ্যে থাকবে না। তারা কেন ধর্ম মানবে না? ধর্ম তারা অবশ্যই মানবে, তবে সেই ধর্মটা কোন ধর্ম?

আসলে মানুষ নিয়মের মধ্যে থাকতে চায়। কিন্তু না থাকার কারণ পৃথিবীতে এত ধর্ম যে কোনটা তারা মানবে? বলা যেতে পারে, যেটা শ্রেষ্ঠ সেটাই মানা হোক। কিন্তু সকল ধর্মের লোকই তো বলে আমাদেরটাই শ্রেষ্ঠ। কিন্তু কথা হল সবগুলি তো আর এক সাথে শ্রেষ্ঠ হতে পারে না। যার যারটা শ্রেষ্ঠ বলে বিশ্বাস করে বলেই তো সে সেই ধর্মে আছে। যে কোন একটাকে শ্রেষ্ঠ বলে মেনে নিলে তো সকলে এক ধর্মই চলে আসতো। পৃথিবীতে কোন অশান্তিই থাকতো না। সকল ধর্মের নেতারা বলে যে আমাদেরটা মানলেই পৃথিবীতে শান্তি নেমে আসবে।

প্রশ্ন উঠতে পারে, আপনাদের জ্ঞান নাই? কোনটা শ্রেষ্ঠ বোঝেন না? সাধারণ মানুষ তো আর সবকিছু বোঝে না, বুঝতে গেলে আবার ভাষার প্রশ্ন আসে, এক এক গ্রন্থ আবার একএক ভাষায় লেখা। যে ধর্ম প্রবর্তক যে ভাষাভাষী ছিলেন, সেই ভাষায়ই সেই গ্রন্থ লেখা। তাও আবার অনেক গ্রন্থ তাদের মধ্যে তথাকথিত নিচু জাতির লোকদের পড়তে দেওয়া হত না, পড়া তো দূরের কথা, সেই ভাষাটি শিখলেও তথাকথিত উঁচু বর্ণের লোকেরা নিচু বর্ণের উপর বর্বরতম অত্যাচার করতো। ঐ সব গ্রন্থে আবার কাউকে উঁচু কাউকে নিচু বর্ণ বলা হয়েছে। আবার কোন কোন গ্রন্থ ভাষান্তরিত করা মহা পাপ বলে ধর্ম নেতারা বলতেন। আজো তথা কথিত ধর্ম নেতাদের ভয়ে পৃথিবীর সব ধর্মগ্রন্থগুলি ভাষান্তরিত করা সম্ভব হয়নি। যে সমস্ত ভাষায় ভাষান্তরিত হয়েছে, সেখানেও ধর্ম নেতাদের নানা রকম ভয় ভীতি দেখানো আজো থামে নাই। ক্ষমতা থাকলে যারা ভাষান্তরিত করেছেন, তাদেরকে ফাঁসি দিত, পারে না বলে পরকালের ভয় দেখায়। অন্য ভাষায় পড়লে শ্রুতি অসঙ্গুষ্ট হয় বলে প্রচার করে এবং পরকালে পুরস্কার কম পাবে বলে জানায়।

এমনিতেই তো বিভিন্ন ধর্ম গ্রন্থগুলির মধ্যে বিভিন্ন মত ও পথের অভাব নাই। কোনটা বলে উত্তর মেরুতে চলতে, কোনটা বলে দক্ষিণ মেরুতে চলতে, কোনটায় সেটা অবশ্য করণীয়, অন্যটায় সেটা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। কোনটায় যেটা সবচেয়ে উত্তম, অন্যটায় সেটা সবচেয়ে নিকৃষ্ট, ঠিক এমনি ভাবে খাওয়ার বেলা চলার বেলা, প্রায় সব বিষয়ে একটা আরেকটার বিপরীতমুখী। মিল শুধু ধর্ম নেতাদের স্বার্থের বেলায়। সেখানে একটাই কথা, খালি তাদেরকে দাও, দাও, দাও, তাহলেই পরকালে স্বর্গের গেট তোমাদের জন্য খোলা। আর এক জায়গায় বেশি মিল, সেটা হল চোখ বুজিয়া ধর্মগুলি মানিয়া যাও। কোন রকম প্রশ্ন করো না। প্রশ্ন করলেই পরকালে তোমার জন্য স্বর্গের গেট বন্ধ। তোমাদের বুঝবার দরকার নাই, যা বোঝার ধর্ম নেতারা বুঝলেই চলবে। তোমার কেবল চোখ বুজে মেনে যাও। পরকালে স্বর্গের গেট বন্ধ করা হলে দুঃখ থাকতো না। ইহকালে কত রকম বিশেষ নামে যে তোমাকে ভূষিত করবে তার ইয়াস্তা নাই। নিজেরা আইন হাতে তুলে নেওয়ার চেষ্টা করবে। না পারলে সরকারের কাছে প্রশ্নকারীর ফাঁসি দাবী করবে। আরো কত কি?

যেখানে শিক্ষিতের হার কম সেখানে ধর্মাসক্ততা বেশি। যেখানে শিক্ষিতের সংখ্যা বেশি সেখানে ধর্মাসক্ততা কম। ধর্ম নিয়ে মারামারি খুনাখুনি নেই। উপাসনালয় ভাঙ্গাভাঙ্গিও নাই। প্রশ্ন হল কোনটা শ্রেষ্ঠ? শ্রুতি প্রদত্ত বলে যে গুলি নিশ্চাস, সেগুলি সম্বন্ধে প্রশ্ন করাও ধৃষ্টতা। অথচ সেগুলিও কিন্তু কোনটার সাথে কোনটার মিল নাই। একই শ্রুতির গ্রন্থ তো এক রকম হওয়ারই কথা। সেখানে দেখা যাচ্ছে, যে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন যুগ অবতারের মাধ্যমে বিভিন্ন সময়ের প্রেক্ষিতে বিভিন্ন কথা বা বিধান দেওয়া হয়েছে। যোহেতু সময় এবং প্রেক্ষাপট অনুযায়ী শ্রুতি নিজেও স্থান, কাল এবং প্রেক্ষাপটকে স্বীকার করে নিয়েছেন বলেই আমার মনে হয়। যদি তা না করতেন,

তবে পৃথিবীর আদিতেই এক ডজন অবতার এবং একটা কিছু বিধান দিয়ে পাঠিয়ে দিতেন। তা তো করেন নি।

তাহলে ধর্ম নেতারা কি করে বলেন যে, যে কোন দেশে যে কোন প্রেক্ষাপটে, স্থান, কাল, পাত্র ভেদে একই বিধান চলবে, এবং এর কোন দাঁড়ি, কমা পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করা চলবে না। এক রকম জামা কাপড় পরতে হবে। সে সমস্ত খাদ্যদ্রব্য খেতে বলা হয়েছে, তাই খেতে হবে। যা নিষেধ করা হয়েছে, তা খাওয়া চলবে না। এক কথায় থাকা, খাওয়া, সমাজ ব্যবস্থা, প্রশাসন চলা, বলা, সব দেশে সব কালে এক রকম হতে হবে। এও কি সম্ভব?

শীতপ্রধান দেশে আর গ্রীষ্মপ্রধান দেশে কি এক রকম পোশাক হতে পারে? আমরা এক দেশেই শীতের দিনে যে পোশাক পরি, গরমের দিনে কি তা পরি? মোটেই না। শীত প্রধান দেশে যা খাওয়া যায় না খেয়ে হজম করা যায়, গরম দেশে কি তা খেয়ে হজম করা যায়? এক দেশের চলাক্রমায় যা সভ্যতা, অন্য দেশে তা অসভ্যতা। যার কারণে একই স্রষ্টার বিভিন্ন বিধানে যাওয়া, পরা। সামাজিক ব্যবস্থা সব কিছুই বিভিন্ন রকমের। অথচ বেশির ভাগ ধর্ম ভক্তদের জন্মস্থান কিন্তু মধ্যপ্রাচ্যে, তাদের কিন্তু মিল থাকার সম্ভাবনা ছিল বেশি। অথচ কেন যে হল না তা কে কার কাছ থেকে প্রশ্ন করে জেনে নেবে? কেই বা উত্তর দেবে? উত্তর একটাই পাওয়া যায়, ইহা স্রষ্টার খুশি।

পৃথিবীর এত দেশ থাকতে সবাই মধ্যপ্রাচ্যে জন্ম গ্রহণ করলেন কেন? এটাও স্রষ্টার খুশি। সবই যেখানে তার ইচ্ছা ঋষিখুশি, সেখানে জ্ঞান চর্চা করা বা জ্ঞানের দ্বারা কোন কিছু অন্বেষণ করাও ত্রুটিপরাধ। তাহলে জ্ঞান চর্চা করতে বলা হয় কেন? যে কোন জ্ঞানী মাত্রই কেঁপি কিছুকে চুলচেরা বিশ্লেষণ না করে কোন কিছুই বিশ্বাস করার কথা নয়। অথচ সব ধর্মের মূল কথাই হল, কোন রকম প্রশ্ন না করেই দেখা না দেখা সমস্ত কথাকে বিশ্বাস করতে হবে এবং গ্ৰহণ মানতে হবে।

কণা হল যে নদীতে লাধ দেওয়া হয়, সেই নদীতে চর পড়ে শুকিয়ে যায়। অথবা বর্ষার পানি জাতীয় আগাছা জন্মায়। আর যে নদীর স্রোত চালু থাকে, সেই নদীর পানি ভাল থাকে। তাহলে এ প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে, বিধান মানুষকে আটপেপুটে বেঁধে ফেলে, সেই বিধান মানুষের জন্য মঙ্গলজনক কি না? যে গুরুগলি মুনি ঋষিগণ বা দেবতাদের তৈরি করেছেন বলে বলা হয় সে বিষয়ে সামান্য আলোকপাত করা যেতে পারে। এই গুরুগুলির বিবরণ ও বক্তব্যের ধরনও প্রায় পূর্ববর্তি গুরুগুলির মতই। তারাও নাবী করে গিয়ে গুরুগুলিই সভ্য। এর উপরে কোন সত্য নাই। এর বিধি বিধানগুলিও অবশ্য মানবীয় বা মানলে নির্দোষ নবক বাস। আর মানলে স্বর্গ বাস এবং অপার সুখ ও শান্তি। এই ভদ্রভেদও এবং পরজগতেও। কথাবার্তাগুলি বেশির ভাগই আজও। অর্থাৎ যা পৃথিবীতে কোনদিন দেখা যাবে না বা যায় নাই। আগামীতেও যা ঘটবে কোন ভঙ্গন নাই। তা বিশ্বাস করা এবং দেশে দেশীতে বিশ্বাস অবশ্যই রাখতে হবে। দেবতাদের ব্যক্তি

চরিত্রের যেসব আজগুবি কাহিনী ধর্মবেত্তারা বর্ণনা করেন, তা এতই অশ্রীল ও কদাচারপূর্ণ যে তারপরও তাকেই তাদের লীলা হিসাবে মানতে হবে এবং ঐ লীলাকারীরাই ঐ গ্রন্থের অনুসারীদের আরাধ্য দেবতা এবং আদর্শ। তাদের আদর্শ বিনা প্রশ্নে মেনে চলার নামই তাদের ধর্ম। স্রষ্টা প্রদত্ত গ্রন্থগুলির অবতরণ যেমন সবই প্রায় মধ্য প্রাচ্যে, ঠিক তেমনি দেবতা ও মুনি ঋষিদের রচিত গ্রন্থগুলি প্রায় সবই প্রকাশ হয়েছে ওদানীন্তন অভিজ্ঞ ভারতবর্ষে, চীনের কিছু অংশে ও শ্রীলংকায়। এক কথায় প্রচলিত সব ধর্মের সূতিকাগার একমাত্র এশিয়ায়। এর কারণ এ ব্যাখ্যা কোন ধর্ম নেতাই কিন্তু দিয়ে যেতে পারেন নি। কোন কোন ধর্ম নেতা বলেন যে অনুন্নত এলাকায় ধর্ম এসেই এলাকা উন্নত হয়েছে। দুর্মুখরা বলে যে ধর্মের কারণেই এলাকাগুলি জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, অর্থে অনুন্নত রয়ে গেছে। কারণ বিভিন্ন ধর্ম বিশ্বাসীরা ক্রমের চেয়ে ধর্মকে বেশি প্রাধান্য দেয়। এবং যারা বেশি বেশি ধর্মের কাজ করবে, তাদের কেউ স্রষ্টা অথবা দেবতারা এই দুনিয়ায় এবং পরকালে সব রকমের উন্নতি দিয়ে দিবে। আর যারা ধর্ম করবে না তাদের কপালে এই দুনিয়ায় সামান্য কিছু ছিটেফোঁটা সুযোগ-টুযোগ জুটলেও পরজন্মে তাদের জন্য শুধু দুঃখ ও কষ্ট, শুধু কষ্ট। সেই না দেখা কষ্টের বর্ণনা যে কি বীভৎস তা শুনলেও ভিরমি খেতে হয়, আবার সুখের যে বর্ণনা দেন, তাও এত লোভনীয় যে মনে হয় সব কিছু ছেড়ে দিয়ে কতক্ষণ সেখানে গিয়ে ঐগুলি ভোগ করব।

পরকালে ঐ সমস্ত সুখ এবং দুঃখের বর্ণনা এমনভাবে দেওয়া হয়, যা প্রায় সব ধর্মগ্রন্থে একই রকম। ধর্ম প্রচারকেরা যেভাবে বর্ণনা করেন তাতে মনে হয় যেন তারা কতবার সেই সব জায়গা ঘুরে এসেছেন। এই ঘুরে আসার বিষয়ে কোন গ্রন্থের অনুসারীরা পিছিয়ে থাকতে নারাজ। কারণ মূল ধর্ম বেত্তাদের প্রায় সকলেই পরকালের সেই সুখ এবং দুঃখ ভোগের জায়গাগুলি দেখে এসেছেন এবং দেখে এ সে যে বর্ণনাগুলি যার যার অনুসারীদের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। বর্তমান কালের ধর্ম প্রচারকেরা তা থেকেই আবার তিলকে তাল করে যার যার সময়ের লোকদের কাছে প্রচার করেন। এই প্রচারের ভঙ্গি যে কত ভাবে বাজারে চালু আছে তার শেষ নাই।

ঐ সমস্ত ঘটনাগুলি এতই চমকপ্রদ যে পৃথিবীর সমস্ত কাগজ, কালি শেষ হয়ে যাবে, কিন্তু তার বর্ণনা শেষ হবে না। সেই সবার ফিরিস্তি দেওয়ার ক্ষমতাও আমার নাই।

কথাগুলি মনে হলে মাঝে মাঝে বোবা হয়ে বসে থাকি, কলম চালাব কি? নিজেরই হাত পা ঠাণ্ডা মেরে যাওয়ার যোগাড় হয়।

এই অবস্থায়ও কলম কেন ধরলাম, তাও বুঝি না, শুধু বিভিন্ন ধর্মের বাড়াবাড়ির কারণে এবং তার তাপ নিজের এবং নিজের দেশবাসীর গায়ে লাগার কারণেই এই বিষয়টির উপর লেখার প্রয়োজন অনুভব করেছি। ব্যাস, ধৃষ্টতা এইটুকু। আমি কেবল বুঝি-

শোনরে মানুষ ভাই, সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই।

বিরুদ্ধ শ্রোতের যাত্রী

সৈকত চৌধুরী

বৃদ্ধ গুঁর দু'হাত দিয়ে আমার কপালের দু'পাশের শিরাগুলো চেপে ধরলেন।

সকাল থেকে মাথা ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছি। আমার আবার সাইনাসের সমস্যা আছে। কিছুদিন পর পর হঠাৎ করে মাথা ব্যথা শুরু হয়। ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলে যায় মাথা ব্যথা সারে না। সময় যতই যেতে থাকে মাথার যন্ত্রণা ততই তীব্র হয়ে ওঠে। ঘুমোতে পারলে শান্তি। অনেক সময় একটু গাঢ় ঘুমের পর মাথা ব্যথা আপনা থেকেই সেরে যায়। দুপুরের পর খানিকটা ঘুম হয়েছে। কিন্তু মাথা ব্যথা কমছে না। মনসংযোগ অন্যত্র সরাবার উদ্দেশ্যে গোসল করলাম। তাতেও লাভ হোলো না। এখন আমার সামনে কড়া করে বানানো এসপ্রেনসো কফির ধুমায়িত পেয়ালা। কফির পেয়ালায় চুমুক দিয়েছি। ইমাম সাহেব ঢুকলেন। শ্রীললাম, মাথার যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছি। কথা বলতে পারবো না। সেই সকাল থেকে এই অবস্থা। কথাবার্তা বন্ধ। খাওয়াদাওয়ায় অরুচি। লেখার টেবিলে পড়ার টেবিল অগোছালো। মনে হচ্ছে চিন্তাশক্তি কমে গেছে। মন খুবই বিক্ষিপ্ত। একদমে কথাগুলো বলে হাঁপিয়ে ওঠলাম। বৃদ্ধ বললেন, কফি পান আপাতত বন্ধ রাখুন। তারপর দু'হাত দিয়ে আমার কপালের দু'পাশের শিরাগুলো চেপে ধরলেন। চোখ বন্ধ করে কী যেন পড়ছেন। মস্ত্র না দোয়া কে জানে! বৃদ্ধের গা থেকে ভুর ভুর আতরের গন্ধ বেরুচ্ছে। মুহূর্তের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেললাম। হুশ ফিরলো ঘাড়ের ওপর মস্ত্র এক থাবড়া খেয়ে। বৃদ্ধ শ্মিত হেসে বললেন, এবার গা ঝাড়া দিয়ে পাঁচ মিনিট বাইরে থেকে বেড়িয়ে আসুন। সব ঠিক হয়ে যাবে। আল্লাহ এবং তার কালামের ওপর ভরসা রাখুন।

আমি হকচকিয়ে গেলাম। বললাম, আল্লাহকে এখানে টেনে আনার দরকার কী? আল্লাহ, আল্লাহর জায়গায় থাকুক। দয়া করে তাকে আমার বসার ঘরে ডেকে আনবেন না। ইমাম সাহেবের চোখে অদ্ভুত একটা আলো খেলে গেলো। সারা মুখে প্রশান্তির আবীর ছড়িয়ে বললেন, অনুগ্রহ করে ঐশ্বরিক কোনো ব্যাপার নিয়ে ঠাট্টা করবেন না। আমি কোরানে পাক থেকে কয়েকটি আয়াত পড়ে ফুঁ দিয়ে দিলাম। আপনার মাথা ব্যথা সেরে যাবে।

ইমাম সাহেব দৃপ্তপদে বেরিয়ে গেলেন। কতোক্ষণ কিম মেরে পড়ে ছিলাম, মনে নেই। সম্মিত ফিরে পেতেই খেয়াল করলাম, সারাদিনের মাথা ব্যথার যন্ত্রণা যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গ্যাছে। আমি দ্বিতীয়বারের মতো হকচকিয়ে গেলাম। ঘটনাটা

কী! ওট করে মাথা ব্যথা সেরে গেলো কেন? ঐশ্বরিক বাণীর এমনই ক্ষমতা যে আমার শারীরিক কষ্ট মুহূর্তেই দূর করে দিতে পারে? আমি যুক্তিবাদী মানুষ। আমি যে কোনো একজনের কথা শুনে চট করে প্রভাবিত হতে পারি না। নাহ, মাথা ব্যথা সেরে যাওয়ার ব্যাপারটিকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে ব্যাখ্যা না করা অবধি আমার শান্তি নেই।

বৃদ্ধ আরাম করে সোফায় বসলেন। বললাম, সেদিন আপনি চলে যাবার কিছুক্ষণ পর আমার মাথা ব্যথা সেরে গিয়েছিলো। বৃদ্ধ হাসলেন। বললাম, তাই বলে আপনি কখনোই ভাববেন না যে কোরানের ঐশী ক্ষমতাবলে তা সম্ভব হয়েছিলো। চকিতে বৃদ্ধের ঠোঁট থেকে হাসি মিলিয়ে গেলো। জানতে চাইলেন, তাহলে কীভাবে আপনার মাথা ব্যথা মিলিয়ে গেলো? কোনো ওষুধ সেবন করেছিলেন কী?

বললাম, না। কোনো ওষুধ সেবন করার প্রয়োজন হয়নি। দরকার ছিলো আপনার হাতের স্পর্শের। আর যখন আপনার হাত আমার কপাল স্পর্শ করেছিলো, ঠিক তখন রোগের উপশম ঘটে গিয়েছিলো। গোটা ব্যাপারটিই ঘটেছে সম্মোহিত অবস্থায়। সেদিন আমার কষ্ট দেখে যখন আপনি আমার কপালের দু'পাশ চেপে ধরলেন। আমার অবচেতন মন তখন সচেতন মনের কাছে তার পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলো। আপনি আমার অনেক দিনের চেনা মানুষ। ঘনিষ্ঠজন। কাজেই সচেতন মন অবচেতন মনকে জানিয়ে দিয়েছিলো যে আপনি আমার জন্য ভালো কিছু করতে যাচ্ছেন। কাজেই সতর্ক হবার বদলে সজাগ থাক, যাতে যে কাজটি বৃদ্ধ করতে চাচ্ছেন তা যেন সর্বলভবে অতি দ্রুত ঘটতে পারে। আমার অবচেতন মনে তখন মাথা ব্যথার বীল বাতি জ্বলছিলো। আপনি আমার কপালের দু'পাশ চেপে ধরার সঙ্গে সঙ্গে স্পন্দ করে লাফাতে থাকা শিরা দু'টো কয়েক মুহূর্তের জন্য ছন্দ হারিয়ে ফেলেছিলো। জাগ্রত অবস্থায় আমাদের মস্তিষ্কের কম্পন মাত্র সেকেন্ডে ১৪ থেকে ২১ সাইকেল। যার নাম বিটা লেভেল। ওই অবস্থায় আমাদের সচেতন মন বা মস্তিষ্কের বাম গোলার্ধ আমাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করে। শরীর শিথিল করে আরামের অবস্থায় ভারমুক্ত মস্তিষ্কের কম্পন মাত্রা কমে আলফা লেভেল অর্থাৎ সেকেন্ডে ৭ থেকে ১৪ সাইকেলে নেমে আসে। চাপমুক্ত ওই অবস্থায় আমাদের ডান মস্তিষ্ক সচল হয়ে ওঠে। তখন বাম মস্তিষ্কের সাথে ডান মস্তিষ্কের বা অবচেতন মনের ভাবের আদান-প্রদান শুরু হয়ে যায়। আর ওই দু'টি গোলার্ধ যখন একত্রে কাজ করতে শুরু করে অমনি আমরা এক মহাশক্তিশালী ক্ষমতার অধিকারী হয়ে যাই। কারণ আমাদের মস্তিষ্কের বাম অংশ বা সচেতন মনের বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে আস্থাহীনতা কিংবা নেতিবাচক। কিন্তু মস্তিষ্কের কম্পনমাত্রা সেকেন্ডে ১০ সাইকেলে পৌঁছালে ডান মস্তিষ্কের নেতিবাচক মনোভাব আর বজায় থাকে না। ওই অবস্থায় আমরা আমাদের প্রয়োজন অনুযায়ী অটোমেটিক নার্ভাস সিস্টেমের মাধ্যমে দেহের অভ্যন্তরীণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এবং গ্রন্থিসমূহের ওপর প্রত্যক্ষ

প্রভাব খাটাতে পারি। রাশিয়ান মনস্তত্ত্ববিদকে প্ল্যাটোগভের 'সাইকোলজি এ্যাজ উই মে লাইক ইট' বইয়ের পঁয়ত্রিশ পৃষ্ঠায় একটি হাতের ছাপচিত্র রয়েছে-হাতের ওপর একটা ফোসকা। সম্মোহিত অবস্থায় ওই হাতের ওপর একটি ধাতব মুদ্রা ঠেসে ধরে শুধু বলা হয়েছিলো, ওটা প্রচণ্ড গরম। সাথে সাথে সেই জায়গায়টায় ফোসকা উঠে গেলো।

ইমাম সাহেবকে বললাম, আপনি যখন আমার কপালে দু'পাশের শিরাগুলো চেপে ধরেছিলেন, তখন আমার মস্তিষ্কের উত্তেজনা কমে সেকেন্ডে ৭ থেকে ১৪ সাইকেল মাত্রায় নেমে এসেছিলো। আর ঠিক ওই মুহূর্তে আমি সম্মোহনের গভীরতম স্তরে (SOMNABULISTIC) পৌঁছে আমার মাথার তীব্র যন্ত্রণা সারিয়ে তোলার জন্য ডান মস্তিষ্ক বা অবচেতন মনকে নির্দেশ দিয়েছিলাম। তার ফলশ্রুতিতে কিছু সময় পরে আমার মাথার যন্ত্রণার নিরাময় ঘটে গিয়েছিলো। সেদিন কোনো অলৌকিক ব্যাপার ঘটেনি। এবং আপনার কোরানের ঐশী কালামও আমার যন্ত্রণার উপশম ঘটায়নি। তাছাড়া, আমি বুঝতেই পারছি না কেন আপনি কোরানকে ঐশী গ্রন্থ বলছেন? কোরান তো কোনো ঐশী গ্রন্থ নয়।

কোরানকে ঐশী গ্রন্থ বলায় আমি হকচকিয়ে গিয়েছিলাম। আর কোরান কোনো ঐশী গ্রন্থ নয় শুনে ইমাম সাহেব পাথর হয়ে গেলেন। বিস্ময়িত চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, এ আপনি কী বললেন, আপনি তো একজন মুসলমান? আমি ইমাম সাহেবের দিকে তাকিয়ে দৃপ্তকণ্ঠে বললাম, আপনি ভুল করছেন। আমি একজন যুক্তিবাদী মানুষ।

বৃদ্ধের মুখে কথা জড়িয়ে গেলো। ততোলাতে ততোলাতে বললেন, কোরান ঐশী গ্রন্থ নয় কেন? বললাম, প্রথমে আপনিই বলুন, কেন আপনি কোরানকে ঐশী গ্রন্থ বলছেন।

এতোক্ষণে ইমাম সাহেব স্বাভাবিক হয়ে এলেন। বললেন, 'আমি মুসাকে কিতাব দিয়েছি, অতএব আপনি (মুহাম্মদ) কোরান প্রাপ্তির বিষয়ে কোনো সন্দেহ করবেন না।' (সূরা সেজদাহ।। আয়াত : ২৩)। ইমাম সাহেব আমার দিকে তাকিয়ে গাঢ় কণ্ঠে আবৃত্তি করলেন, 'এই কিতাব পরাক্রমশালী আল্লাহ পক্ষ থেকে অবতীর্ণ।' (সূরা আল আহকাফ।। আয়াত : ২)। আমি ইমাম সাহেবের দিকে তাকালাম। ওঁর মুখ দিয়ে আবারো বেরিয়ে এলো কোরানের বাণী। 'নিশ্চয়ই এই কোরান একজন সম্মানিত রাসুলের আনীত। এটা বিশ্বপালনকর্তার কাছ থেকে অবতীর্ণ।' (সূরা আল-হাক্কাকাহ।। আয়াত : ৪০ এবং ৪৩)।

ইমাম সাহেব তৃপ্তির হাসি হেসে আমার দিকে প্রশ্নবাণ নিক্ষেপ করলেন। বললেন, কোরানের ঐশী মর্যাদায় আপনার বিশ্বাস আছে কি? আমি বললাম, আপনি কোরান থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, 'কোরান একটি ঐশী গ্রন্থ।' আমিও কোরান দিয়েই প্রমাণ করবো, 'কোরান কোনো ঐশী গ্রন্থ নয়।'

একশতাব্দী, কোরান খুলুন এবং প্রথম সূরাটি অর্থাৎ সূরা ফাতিহা পাঠ করুন। খুব বেশি না। প্রথম চারটি আয়াত শুরু করুন। ইমাম সাহেব দরাজ গলায় বলে উঠলেন, '(১) যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ তা 'আলার যিনি সকল সৃষ্টি জগতের পালনকর্তা। (২) যিনি নিতান্ত মেহেরবান ও দয়ালু। (৩) যিনি বিচার দিনের মালিক। (৪) আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং শুধুমাত্র তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি।' ইমাম সাহেব থামলেন। বললাম, কোনো বৈপরীত্য কিংবা ব্যাকরণগত ত্রুটি লক্ষ্য করছেন কী? ইমাম সাহেব জবাব দিলেন না। আমি বললাম, ভালো করে খেয়াল করুন, প্রথম তিনটি আয়াত নিরপেক্ষ বক্তব্যের আকারে পরিবেশিত হয়েছে। বোঝা যাচ্ছে বক্তব্যগুলো আল্লাহর জবানিতে লিপিবদ্ধ হয়েছে। কিন্তু গোলমাল ঘটেছে চতুর্থ আয়াতের বেলায়। যখন বলা হচ্ছে, 'আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি.....'। এক কাজ করুন, পরের আয়াতটিও লক্ষ্য করুন। '(৫) আমাদেরকে সরলপথ দেখাও।' সম্প্রতিঃ ই বোঝা যাচ্ছে ৪ নম্বর এবং ৫ নম্বর আয়াত দু'টি মানুষের। আল্লাহ যখন কোরানে বারবার দাবি করছেন, তিনি সর্বজ্ঞ। তাহলে তিনি তো আর ব্যাকরণে ভুল করতে পারেন না।

বৃদ্ধ স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। বললাম এবার আসুন, সূরা আল-নিসায়। '(১১) আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে আদেশ করেন! একজন পুরুষের অংশ দু'জন নারীর অংশের সমান। অতঃপর যদি শুধু নারীই হয় দু'য়ের অধিক, তবে তাদের জন্য ওই মালের তিন ভাগের দুই ভাগ যা তাগ করে মরে এবং যদি একজনই হয়, তবে তার জন্য অর্ধেক। মৃতের পিতা-মাতার মধ্য থেকে প্রত্যেকের জন্য তাজা সম্পত্তির ছয় ভাগের একভাগ। যদি মৃতের পুত্র থাকে। যদি পুত্র না থাকে এবং পিতা-মাতাই উত্তরাধিকারী হয়, তবে মা পাবে তিন ভাগের এক ভাগ। অতঃপর যদি মৃতের কয়েকজন ভাই থাকে, তবে তার মা পাবে ছয় ভাগের এক ভাগ ও ছিয়তের পর, যা করে মরেছে কিংবা ঋণ পরিশোধের পর। তোমাদের পিতা ও পুত্রের মধ্যে কে তোমাদের জন্য অধিক উপকারী তোমরা জানো না। এটা আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত অংশ, নিশ্চয়, আল্লাহ সর্বজ্ঞ, রহস্যবিদ। (১২) আর তোমাদের হবে অর্ধেক সম্পত্তি, যা ছেড়ে যায় তোমাদের স্ত্রীরা যদি তাদের কোনো সন্তান না থাকে। যদি তাদের সন্তান থাকে, তবে তোমাদের হবে এক চতুর্থাংশ ওই সম্পত্তির, যা তারা ছেড়ে যায়, ও ছিয়তের পর, যা তারা করে এবং ঋণ পরিশোধের পর। স্ত্রীদের জন্য এক—চতুর্থাংশ হবে ওই সম্পত্তির, যা তোমরা ছেড়ে যাও যদি তোমাদের কোনো সন্তান না থাকে। আর যদি তোমাদের সন্তান থাকে, তবে তাদের জন্য হবে ওই সম্পত্তির আট ভাগের এক ভাগ, যা তোমরা ছেড়ে যাও ও ছিয়তের পর, যা তোমরা কর এবং ঋণ পরিশোধের পর। যে পুরুষের, তাজা সম্পত্তি, তার যদি পিতা—পুত্র কিংবা স্ত্রী না থাকে এবং ওই মৃতের এক ভাই কিংবা এক বোন থাকে, তবে উভয়ের প্রত্যেকে ছয় ভাগের এক

ভাগ পাবে। আর যদি ততোধিক থাকে, তবে তারা এক-তৃতীয়াংশ অংশীদার হবে অহ্মিয়তের পর, যা করা হয় এবং ঋণের পর এমতাবস্থায় যে, অপরের ক্ষতি না করে। এ বিধান আল্লাহর। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সহনশীল।’

পূর্বেই বলেছি সর্বজ্ঞ, রহস্যবিদ আল্লাহ তো আর ভুল করতে পারেন না। তবে মানুষ ভুল করতে পারে। যার নজির কোরানের আয়াতে রয়েছে। মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি উত্তরাধিকারের মধ্যে বণ্টন করার কোরানীয় বা আল্লাহর এই বিধানকে ‘ফরায়েজ নীতি’ বলা হয়। একটু হিসাব কমলেই দেখবেন বণ্টন ব্যবস্থায় কোরানের ওই ফরায়েজ বিধান ভুল। যেমন, কোনো মৃত ব্যক্তির যদি মা, বাবা, দুই মেয়ে ও

এক স্ত্রী থাকে তবে মা $\frac{1}{6}$ বাবা $\frac{1}{6}$ দুই মেয়ে $\frac{2}{3}$ এবং স্ত্রীকে $\frac{1}{6}$ অংশ ভাগ করে দিতে হয়। কিন্তু মা-বাবা এবং দুই মেয়েকে সম্পত্তি বণ্টন করার পর স্ত্রীর জন্য কোনো সম্পত্তিই থাকে না। আর যদি স্ত্রীকে দিতে হয়, তাহলে মোট সম্পত্তিকে

অংকের নিয়মে ‘১’ ধরলে সেটা $1\frac{1}{6}$ ভাগ হয়ে যায়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে কোরানে আল্লাহ বারবার দাবি করছেন, তিনি সর্বজ্ঞ। এমনকি সূরা নিসার ১১ ও ১২ দু’টো আয়াতের বেলায়ও সেই দাবির উল্লেখ রয়েছে। তাহলে আল্লাহ কেন একটা সরল অংকের সমাধান করতে পারলেন না। যা পেরেছিলেন হযরত আলী (রাঃ)। তিনি

যে গাণিতিক নিয়মে সম্পত্তি বণ্টন ব্যবস্থা করেছিলেন, সেটা এরকম ; মা $\frac{1}{6}$ বাবা $\frac{1}{6}$ দুই মেয়ে $\frac{2}{3}$ এবং স্ত্রী $\frac{1}{6}$ । প্রথম চারটি রাশিকে সমান হরবিশিষ্ট করলে মা $\frac{8}{24}$

বাবা $\frac{8}{24}$ দুই মেয়ে $\frac{16}{24}$ এবং স্ত্রী পায় $\frac{4}{24}$ ভাগ। যোগফল $\frac{28}{24}$ । যা কোরানের বিধান। কিন্তু তাতে অংক মিলে না। হযরত আলী (রাঃ) যেখানে হর ছিলো ২৪ এবং যেহেতু লব হয়ে যায় ২৭ সেখানে লবকেও ২৭ মূল সংখ্যা ধরে ওই সমস্যার

সমাধান করেন। তাতে বণ্টন ব্যবস্থা এরকম হয়ে যায় ; মা $\frac{8}{27}$ বাবা $\frac{8}{27}$ দুই মেয়ে

$\frac{16}{27}$ এবং স্ত্রী $\frac{4}{27}$ অংশ = ১। মুসলিম আইনে কোরানোর ভুল সম্পত্তি ব্যবস্থার বদলে হযরত আলীর (রাঃ) তৈরি নিয়ম অনুযায়ী মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি বণ্টন ব্যবস্থা এখন সমস্ত মুসলিম দেশে কার্যকর হচ্ছে।

এবার আসুন সূরা আদ দোখান-এ। ‘(৩৮) আমি নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু ক্রীড়াচ্ছলে সৃষ্টি করিনি ; (৩৯) আমি এগুলো যথাযথ উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছি।’ আল্লাহ কোরানে দাবি করেন, তিনি সর্বজ্ঞ। তিনি

সর্বাকৃৎ এণ্ডাচ্ছলে সৃষ্টি না যথাযথ উদ্দেশে সৃষ্টি করেছেন, তাও-বলেছেন। অথচ তিনি সামান্য মানবদেহ সম্পর্কেও ভালো জানেন না। সর্বজ্ঞ আল্লাহ জানেন না, আমাদের শরীরের ইনটেস্টাইন (INTESTINE) বা অস্ত্রের একটি অংশ হলো ভার্মিফর্ম আপেনডিকস (VERMIFORM APPENDIX)। এটি একটি ভেস্টিজিয়াল অর্গান (VESTIGIAL ORGAN)। যেটি আমাদের কোনো কাজে লাগে না। বরং যে সমস্ত খাদ্য হজম হয় না সে সমস্ত টুকরোগুলি আপেনডিকসের মুখে আটকে যায়। এর ফলে ব্যাকটেরিয়া একটি উষ্ণ বদ্ধ স্থান পায় এবং ক্রমশ বর্ধিত হয়ে ব্যাথা সৃষ্টি করে ও ফুলে যায়। এর ফলে বমির ভাব কিংবা ডায়রিয়া হতে পারে। এবং কেউ আপেনডিসাইটিসে আক্রান্ত হলে চিকিৎসক সেটি কেটে ফেলে দেয়। আল্লাহ সর্বজ্ঞ হলে এসব তার জানা থাকার কথা। কিন্তু মানুষ হলে এতোকিছু না জানা তেমন দোষের কিছু নয়।

আরেকটি ব্যাপার খেয়াল করুন, পাপের শাস্তি কিংবা পুণ্যের ফল হিসেবে কোরানের বর্ণনা কীরকম 'অতএব যারা কাফের, তাদের জন্য আগুনের পোশাক তৈরি করা হয়েছে। তাদের মাথার ওপর ফুটন্ত পানি ঢেলে দেয়া হবে। ফলে তাদের পেটে যা আছে, তা এবং চামড়া গলে বের হয়ে যাবে। তাদের জন্য আছে লোহার হাতুড়ি তারা যখনই যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ হয়ে জাহান্নাম হতে বের হতে চাইবে, তখনই তাদেরকে তাতে ফিরিয়ে দেয়া হবে, বলা হবে; দহনশাস্তি আন্বাদন করো। নিশ্চয় যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদের দাখিল করবেন উদ্যানসমূহে, যার তলদেশ দিয়ে নিষ্করণীসমূহ প্রবাহিত হবে।' (সূরা: হজ্জ ১১। আয়াত : ১৯-২৩)

'আগুন তাদের মুখমণ্ডল দগ্ধ করবে এবং তারা তাতে বীভৎস আকার ধারণ করবে'।

(সূরা আল-মু' মিনুন ১১। আয়াত : ১০৪)।

এছাড়া সূরা আল মায়দাহ, আত-তাওবাহ, ইউনুস, ইবরাহীম, হিজর, নাহল, কাহ্ফ, হোয়া-হা, এবং আন-নূর সহ অসংখ্য সূরায় পাপের শাস্তি হিসেবে আগুনে পোড়ানো এবং তৃষ্ণা নিবারণে দুর্গন্ধময় রক্ত, পুজ এবং পুণ্যের ফল হিসেবে বিভিন্ন সুস্বাদু ফলমূল, সুমিষ্ট পানীয় এবং শীতল ছায়াময় উদ্যানের কথা বলা হয়েছে। তাহলেই বুঝুন, এসব বর্ণনাও মানবীয়। এবং সেসব বর্ণনা ভৌগোলিক জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা থেকে উদ্ভূত। সাধারণ মানুষ যখন কোনো তুলনা উপমা কিংবা প্রতীক ব্যবহার করে, তখন তারা তাদের অভিজ্ঞতালব্ধ পরিচিত জগত থেকেই গ্রহণ করে। রাশিয়ানদের কথাই ধরুন। তাদের প্রিয় খাবারের তালিকায় শসা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি খাদ্য। প্রায় প্রতিটি রাশান পরিবারে অতিথি আপ্যায়নে পানির সঙ্গে শসা খেতে দেয়া হয়। তাই বিশ্ববিখ্যাত রাশান ঔপন্যাসিক এবং নাট্যকার আন্তন চেখভ এক সুন্দরী রমণীর রূপের বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেছিলেন, 'তুমি খুবই সুন্দর।

ভোমাকে দেখলেই আমার লবণ ছিটানো শসার কথা মনে পড়ে।' বুঝুন অবস্থাটা। আত্মন চেখভের মতো কোরানের প্রবর্তকও তার পরিচিত গণ্ডি ও জগত থেকে তুলনা এবং উপমার উপকরণগুলো সংগ্রহ করেছিলেন। কোরান নাজিল হয়েছে আরবের মরু প্রান্তরে। যেখানে সূর্যের প্রচণ্ড দাবদাহ। চারদিক রুক্ষ, প্রাণহীন। পানীয় জল অতি মহার্ঘ বস্তু। যেখানে সবুজের তৃষ্ণা, স্বাদু পানীয় জলের আকাঙ্ক্ষা অমূলক নয়। একটু ছায়াময়, শীতলময় জীবনের আকৃতি সেখানে প্রকট হবে, এটাই স্বাভাবিক। আরার আগুনময় তাপের অসহ্য যন্ত্রণা থেকে মুক্তি চাওয়া, খেজুর জাতীয় একমাত্র ফলের বদলে বহুবর্ণ সুস্বাদু ফলমূলের লোভ সংগত। আর কোরানে এগুলোকেই ব্যবহার করা হয়েছে বিশ্বাসী এবং অবিশ্বাসীদের প্ররোচিত ও ভয় দেখানোর জন্য। আল্লাহ যদি ভৌগোলিক জ্ঞান থাকতো তাহলে কোরানে থাকতো শীত, তুষার ঝড়, কিংবা আগ্নেয়গিরির ভয়ানক উৎসারণের কথা। শাস্তি হিসেবে চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্লেগ কিংবা মরণ ব্যাধি এইডসের কথা। পরমাণু বিজ্ঞানের তথ্য জানা থাকলে 'পুনরুত্থান দিবসের' তুলনা করা হতো হাইড্রোজেন বোমা, কিংবা হিরোশিমা এবং নাগাসাকি পুড়িয়ে দেয়া আণবিক বোমার তীব্রতার সাথে। অথচ কোরানে এসবের উল্লেখ নেই।

বরং শাস্তি হিসেবে এসেছে কণ্টকিত বৃক্ষের ঝাড়, গনগনে সূর্যের তাপ, আকণ্ঠ তৃষ্ণার যন্ত্রণা। আর লোভ দেখানো হয়েছে ছায়াময় শীতলময় উদ্যান, সুস্বাদু পানীয়ের নহর, নির্ঝরনী কিংবা ঝরণা, আনন্দলোনো তরুণী, শরাবান তহরা (গদ), নানা রকমের ফলমূল ইত্যাদি দিয়ে। আল্লাহ সীমাবদ্ধ ক্ষমতার অধিকারী এটা কোরান স্বীকার করে না। কিন্তু মানুষের সীমাবদ্ধতা রয়েছে জ্ঞানব ক্ষেত্রে। ১৪০০ বছর পূর্বে কোনো মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয় আণবিক বোমা কিংবা এইডসের ভয়াবহতা সম্পর্কে আগেভাগে জানা। কোরানকে ঐশ্বরিক মানা যেতো যদি তাতে ওইসবের নিখুঁত বর্ণনা থাকতো। এখন প্রশ্ন জাগতে পারে, তাহলে মুসলমানরা কোরানকে মেনে চলছে কেন? এর উত্তর দু'টি। প্রথমত, মানুষের অনিবার্য পরিণতি হচ্ছে মৃত্যু। আর মানুষ এখনো নিশ্চিত নয়, তার মৃত্যুর পর আদৌ কী ঘটবে। অথচ কোরান বলেছে পুনরুত্থান ঘটবে। এবং পাপ ও পুণ্যের হিসাব নিকাশ শেষ করে জাহান্নাম কিংবা জান্নাতে চিরস্থায়ীভাবে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এখন মৃত্যুর পরেও মানুষের আরো একটা জীবন থাকবে জেনে সবাই অস্থির হয়ে পড়েছে। দ্বিতীয়ত বিশ্বজুড়ে সিংহভাগ মানুষের খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা ও বাসস্থান অর্জনে সীমাহীন দারিদ্র্য। দরিদ্র যন্ত্রণাকাতর মানুষ ধর্মের ঐশী প্রাপ্তির আশায় জীবন অতিবাহিত করে। আর সম্পদশালী শ্রেণী ধর্মকে ব্যবহার করে যাতে অসহায় গরিব সিংহভাগ মানুষ গুলো তাদের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে। ইসলাম ধর্মকে নিয়ে এ ব্যাপারটি খুব সুচারুভাবে সম্পন্ন করেছেন তৃতীয় খলিফা সুচতুর ধনাঢ্য ব্যবসায়ী এবং ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হযরত মুহাম্মদের জামাতা হযরত ওসমান।

ওসমানের রাজত্বকালে বিভিন্ন ভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কোরানের বাণীগুলোকে একত্রিত করে সংকলিত করা হয়। ওসমানের রাজনৈতিক দূরদর্শীতার কারণে এবং ধর্মকে ভবিষ্যতে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করার জন্য কোরান যে শাণাধিকতায় অবতীর্ণ হয়েছিলো, তার পরিবর্তন সাধন করা হয়। কোরানের প্রথম নির্দেশ ছিলো, ‘পড়ো। পড়ো, তোমার সেই প্রভুর নামে।’ ওসমান দেখলেন, এতো মহা যন্ত্রণা হোলো। সব মানুষ যদি দলবেঁধে পড়শোনা শুরু করে, তাহলে সমাজের অধিপতিদের শাসন ও শোষণ ব্যাহত হতে বাধ্য। তাই তিনি নিপীড়িতকে আরো পীড়ন করতে, অসহায়কে আরো দুস্থ করতে কোরান শুরু করেন সূরা ফাতিহা দিয়ে। যে সূরাটি বিশ্বপালন কর্তা আল্লাহ তায়ালা সাড়ম্বর মহিমা প্রকাশ করছে। এতে করে কোরানের সামগ্রিক অর্থদ্যোতনা ও জীবনবোধের আমূল পরিবর্তন ঘটে যায়। আর এভাবেই হযরত ওসমান ইসলাম ধর্মকে রাজনীতির অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। যার ফলে এখন বিশ্বের দেশে দেশে ইসলাম ধর্ম মানবাধিকারের মর্যাদাকে পুরোমাত্রায় ভুলুষ্ঠিত করে মনুষ্যত্ব ও বিবেকের জন্য ভয়ানক এক শৃংখল ও প্রতিপক্ষ রূপে আবির্ভূত হয়েছে যা ইসলাম ধর্মের মূল চেতনা ও বোধের পরিপন্থী।

তাই আজ সবাইকে ওইসব মানবতা বিরোধী কার্যকলাপের দিকে নজর রেখে কোরানের ব্যাখ্যার ব্যাপারে যুক্তিবাদী হতে হবেন কারণ, জলে মানুষ ডুবে যায়, এ তথ্য আমাদের সবার জানা। আবার পানিতে মানুষ ডোবে না, এটাও সত্য। কিন্তু সবাই সেটা জানে না। জর্ডান এবং ইসরায়েল-এর মাঝখানে একটি বিস্ময়কর হ্রদ রয়েছে। যার নাম ডেড সী। ওই ডেড সী-র জলে কাউকে হাত-পা বেঁধে ফেলে দিলেও ডুবে না। এখন এই নাটকটিকে যদি কেউ এরকম ব্যাখ্যা করে যে এখানে মানুষ ডোবে না কারণ আল্লাহ এই জলকে জান্নাত থেকে পাঠিয়েছেন। তাহলে কেমন হয়? কিংবা ধরা যাক, পৃথিবীর কোনো মানুষ ৫ তলা থেকে মাটিতে লাফিয়ে নামতে পারে। তাহলে সেই মানুষটি কিন্তু চাঁদের ৩০ তলা থেকেও লাফিয়ে পড়তে পারবে। এবং পৃথিবীতে ৫ তলা থেকে লাফিয়ে পড়বে টপ করে অথচ চাঁদের ৩০ তলা থেকে লাফিয়ে পড়ার সময় মনে হবে যেন গড়িয়ে গড়িয়ে নেমে আসছে। এখন কেউ যদি বলে আল্লাহ পৃথিবীর তুলনায় চাঁদকে বিশেষ সৌন্দর্যমণ্ডিত করে তৈরি করেছেন এবং সেই সৌন্দর্যের প্রতি সম্মান দেখাতে আল্লাহ ওইরকম ব্যবস্থা সৃষ্টি করে রেখেছেন। তাহলে কেমন হয়? যে জানে না, একরকম জলে মানুষ ডোবে অথচ অন্যরকম পানিতে মানুষ না ডোবার কারণটা কী এবং পৃথিবীর ৫ তলা থেকে লাফিয়ে পড়া গেলে চাঁদের ৩০ তলা থেকেও কীভাবে একজন মানুষ লাফিয়ে পড়তে পারে, তার কাছে ওই জাতীয় ব্যাখ্যা বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে। কিন্তু কোনো প্রকৃত যুক্তিবাদী মানুষ তা মানতে পারে না।

পৃথিবীর তাবৎ যুক্তিবাদী মানুষ কোনো একটি সমস্যায় পড়লে প্রথমে

প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করে আনুমানিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। এবং এরও পরে পরীক্ষার পরিকল্পনা, পরীক্ষা গ্রহণ, আনুমানিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ, বর্জন ও সংশোধন শেষে নতুন আনুমানিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। অরপর আবার পর্যবেক্ষণ শেষে ফলাফল বিশ্লেষণ করে পুনরায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এখন এভাবে যুক্তিগ্রাহ্য পথে আমূল বিশ্লেষণ শেষে দেখা যায়, যে জলে মানুষ ডোবে সেই পানির আপেক্ষিক ঘনত্ব আর যে জলে মানুষ ডোবে না সেই পানির আপেক্ষিক ঘনত্ব সমান নয়। সাধারণ পানির আপেক্ষিক ঘনত্ব ৪ থেকে ৬ ভাগ এবং যে জলে মানুষ ডোবে না সেই জলের আপেক্ষিক ঘনত্ব শতকরা ২৫ ভাগ। আবার পৃথিবীতে যে সর্বোচ্চ ৫ তলা থেকে যে লাফিয়ে পড়তে পারে সে কীভাবে চাঁদের বুকে ৩০ তলা থেকে স্বচ্ছন্দে লাফিয়ে নামে? এর কারণ পৃথিবী ও চাঁদের মাধ্যাকর্ষণ বল। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ বল চাঁদের তুলনায় ৬ গুণ বেশি বলেই ইমাম সাহেব তীব্র আতঙ্কে অস্থির হয়ে বললেন, তাহলে কোরানের কী হবে? আমাদের কী হবে? আমরা কোথায় যাচ্ছি? বললাম, কোরান কোরানের জায়গায় থাকুক। আমরা বরং আমাদের জন্য থাকি। ইসলাম নয় কোরানও নয়, মনুষ্যত্বই হোক মানুষের ধর্ম। আমরা যদি মনুষ্যত্বই অর্জন করে ফেলি তাহলে 'কোথায় যাচ্ছি' নিয়ে আর দুর্ভাবনার জন্ম হবে না। আর হ্যাঁ সর্বাধুনিক কোরান ধর্মগ্রন্থটিই যখন ঐশী গ্রন্থ নয় তখন পৃথিবীর অপরপর ধর্মগ্রন্থগুলিও ঐশী নয়। ওসব নিয়ে আরেকদিন কথা বলা যাবে। তাছাড়া কোরানের ব্যাখ্যা এতো স্বল্প পরিসরে শেষ করা সম্ভব নয়। যা হোক, আজ অনেক হয়েছে। চলুন, এখন আমরা আজকের মতো আলোচনা বন্ধ রাখি।

ধর্মচেতনা ও ঈশ্বর-বিশ্বাস

ওয়াহিদ রেজা

পর্ব-১

আদিম বা আদম মানব গোষ্ঠীর প্রারম্ভিক যুগে পৃথিবীতে না ছিল কোনো ঈশ্বর, না ছিলো কোনো ধর্মের অস্তিত্ব। মানুষের মন থেকেই ধর্মের জন্ম, ঈশ্বর নামক অদৃশ্য, অলীক ব্যক্তির গর্ভপাত। তারপরও মানুষ তার অ-মানুষ স্তর থেকে মানুষের অবস্থায় বিবর্তিত হওয়ার কালে কেন বা কি করে ধার্মিক হয়ে উঠলো এবং আজ পর্যন্তই বা কেন ধর্মবিশ্বাসকে আগলে রেখেছে, কোন নিয়মে বা কোন্ প্রয়োজনে মানুষ তার আদিম জীবনের স্থূল ধর্মীয় ধারণাকে পরবর্তী যুগে উচ্চতর মার্জিত রূপ দান করেছে এ প্রশ্নের সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত উত্তরটিতে যে কথাগুলো উঠে আসে, তা হলো-সম্প্রদায়ের আধিপত্য বিস্তার ও ধর্মীয় চেতনার ধোঁয়ার অস্পষ্টতায় ক্ষমতার লিপ্সা। অর্থাৎ প্রভুত্ব। ধর্মীয় মৌলবাদের রাজত্ব। অরাজকতা। মানবতার অবমূল্যায়ন। মানুষের স্বাধিকার হরণের একছত্র শোষণ।

আজ ঐতিহাসিকভাবে একথা প্রমাণিত সত্য যে, প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত কোনো ধর্মই রক্তপাতহীন প্রতিষ্ঠা লাভ করেনি। সব ধর্মেরই প্রাতিষ্ঠানিকতার পবিত্র (!) হাতে লেগে রয়েছে লক্ষ লক্ষ মানুষের রক্তের দাগ। ধর্ম তার এই তথাকথিত অগ্রগতির সঙ্গে নিজের যথার্থতা নিরূপণের জন্য অতীন্দ্রিয় সত্তার অস্তিত্ব প্রমাণের চেষ্টা করে। যা বাস্তবিক অর্থে একটি ভুয়া প্রচেষ্টা। এই অতীন্দ্রিয় সত্তার সমর্থন ব্যতীত ধর্ম স্বপ্নের অর্থহীন শিল্পকলায় বা একটি সুন্দর মায়ায় পর্যবসিত হয়। বিজ্ঞত বিশ্বজগতের অন্তর্নিহিত সত্তার সঙ্গে রয়েছে ধর্মবোধের চির বৈরিতা। আজ বিজ্ঞান ও বস্তুবাদী দর্শনের ক্রমউৎকর্ষকালে মানুষের মৌলিক মেধা, মনন, ও জ্ঞানচর্চা যখন প্রতি পদে পদে সকল রকম কুসংস্কার ও অন্ধত্বের কালো পর্দা ছিঁড়ে ছিঁড়ে বিশ্বমানবতার সার্বজনীন উষার আলোমুখি ধাবমান তখন ধর্মের অন্তঃসারশূন্যতা ও ধর্মবোধের অযথার্থতা যে আগামী একদিন প্রমাণিত হবেই এব্যাপারে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না। তখন ধ্বংস হয়ে যাবে ধর্মের ভীতিকর অলীক ঈশ্বরতত্ত্ব। ধুলায় মিলিয়ে যাবে ধর্মীয় লোভ ও বিভীষিকার তথাকথিত স্বর্গ-নরকের পরলৌকিক বাগাড়ম্বর।

মানুষের জ্ঞান বিকাশের প্রাথমিক স্তরটি ছিলো ভয়, সংশয়, দ্বিধা, দ্বন্দ্বের অধ্যায়। প্রাকৃতিক বিবর্তন, আলোড়ন, দুর্যোগ ইত্যাদি এসবের মূল কারণ। তৎকালীন সময়,

অর্থাৎ প্রাগৈতিহাসিক যুগে এ সমস্ত প্রাকৃতিক কার্যবিধির যথোপযুক্ত ব্যাখ্যা-
হীনতারই একমাত্র কারণ, অবলম্বন বা ধারণাই মানব মস্তিষ্ককে বাধ্য করেছে
অতীন্দ্রিয় বা অলৌকিক নামক ভুয়া সংশয়ের কাছে আত্মসমর্পণে। যার ধারাবাহিক
অনিবার্য ফলশ্রুতি হলো ধর্মচেতনা। আর এই ধর্মচেতনাই হয়ে দাঁড়িয়েছে পরবর্তী
উন্নত মানুষের মৌলিক উন্নতির প্রধান অন্তরায়। পুরাকালে এই মতের সমর্থক
ছিলেন এপিকিউরীয় (Epicurean) দার্শনিকগণ এবং ল্যাটিন কবি লুক্রেটিয়াস
(Lucretius)। তাঁরা ধর্মবিশ্বাসকে কুসংস্কারের যমজভাই বিবেচনা করতেন।
পেট্রোনিয়াসের (Petronius) বিখ্যাত একটি পংক্তিতে এই মতের সংক্ষিপ্তসার
পাওয়া যায়। *Primus in orbe deos facit timor* (প্রাথমিকভাবে ঈশ্বরের প্রতি
আনুগত্য ভয় থেকে এসেছে)। আধুনিককালে হিউম (Hume) ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপের
উৎস হিসেবে ভয়ের উপরই বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। অবশ্য সেই সঙ্গে
তিনি আরো একটি কথা যোগ করে দিয়েছেন—ঈশ্বরের প্রতি ভয়, তাঁর সদৃশ্য
লাভের রূপ পরিগ্রহ করে। আধুনিককালে অনেক বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানী, যেমন রিবট
(Reibot) এই ‘ভীতির মতবাদ’কে সমর্থন করেন। আদিম অবস্থায় ধর্মে ভয়ের যে
একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিলো তাতে কোনো সন্দেহ নেই। একটি রহস্যময় শক্তিতে
বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত ধর্মচেতনা। ধর্মীয় মনোভাব হলো অধিকতর শক্তিশালী
কোনো অদৃশ্য ব্যক্তির কাছে সর্বনয় আত্মসমর্পণ—একেশ্বরবাদী ধর্ম বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের
অনন্ত শক্তিকে একজন ব্যক্তি হিসেবে চিত্তা করে। আর সেই অদৃশ্য ব্যক্তিটিই হলেন
ঈশ্বর বা আল্লাহ। এটি অবশ্য উন্নত ধর্মচেতনার আধুনিক পরিণতি। প্রাথমিক স্তরে
আদি টোটেম ছিলো তার প্রতীক। রবার্টসন স্মিথ (W. Robertson Smith) এই
মত দৃঢ়তার সঙ্গে সমর্থন করেন। তাঁর বহু পরিচিত একটি অনুচ্ছেদ এখানে উদ্ধৃত
হলো, ‘আদিম মানুষেরা অসংখ্য বিপদের দ্বারা নিজেদের পরিবেষ্টিত বলে মনে
করতো, সঠিকভাবে তারা বিপদটা কি জানতো না ; কিন্তু অদৃশ্য কোনো ব্যক্তির
রহস্যময় শক্তিই যে বিপদের (প্রাকৃতিক দুর্যোগ) কারণ এমন একটা উপলব্ধি বা
ধারণা তাদের মধ্যে জন্ম লাভ করে। এবং এই উপলব্ধি থেকে তারা বুঝতে শেখে
যে সেই অদৃশ্য ব্যক্তি মানুষের চেয়েও অধিকতর শক্তিশালী’ (W. R. Smith,
The Religion of Semites, P. 55) মূলত এই প্রাচীন উপলব্ধি বা ধারণা
থেকেই ঈশ্বর ও ধর্মচেতনার আদি অঙ্কুরের বিকাশ। ধর্মবোধের আদি অবস্থা থেকে
আধুনিক ধর্মচেতনা ভয়-ভীতি প্রদর্শনের ভূমিকা যে লুপ্ত হয়ে যায়নি তার পরিষ্কার
দৃষ্টান্ত হলো বাইবেল ও কোরান। ওল্ড টেস্টামেন্টের জনপ্রিয় নীতি হচ্ছে, ‘প্রভুর
প্রতি ভয়ই হলো জ্ঞানলাভের সূচনা’ (eg Ps. exi. 10. Prov. ix. 10) এবং নিউ
টেস্টামেন্টে মানুষকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে এই বলে, ‘ঈশ্বরকে স্বীকার করে
নিয়ে উপাসনা করো কিন্তু ঈশ্বর হিসেবে তাঁকে ভয় ও শ্রদ্ধা করো’ (Heb. xii—28
Moffatt—এর অনুবাদ)। ভয় + শ্রদ্ধা ? না মনোবিজ্ঞান আজ এ কথাটি প্রমাণ করে

দিয়েছে যে, ভয় থেকে কখনো প্রকৃত শ্রদ্ধাবোধ জন্মাতে পারে না। তবে বাইবেলের চেয়ে কোরান ভয় প্রদর্শনে অত্যধিক তীক্ষ্ণ ও শাণিত। কোরানের আল্লাহ চক্ষু রাঙিয়ে পাতায় পাতায় ভয়-ভীতির তর্জনী উঁচিয়ে রেখেছেন মানুষের প্রতি! তিনি একদিকে নিজেকে পরম দয়ালু ও অনাদিকে চরম নিষ্ঠুর দাবি করেন। কিন্তু প্রকৃত দয়ালু যে কখনো নিষ্ঠুর হতে পারেন না এর বিশদ ব্যাখ্যার কী কোনো প্রয়োজন আছে?

ধর্মচেতনার সঙ্গে বুদ্ধির সম্পর্কের চেয়ে অন্ধ আবেগ, অনুভূতির সম্পর্ক যে দাঁড়ানোর এতে কোনো সন্দেহ নেই। আর এর পেছনের মূল ভিত্তিটি হলো-বিশ্বাস। আর বিশ্বাস হচ্ছে প্রশ্নহীন, যুক্তিহীন, বুদ্ধি-বিবেচনাহীন একটি বিষয়। জগৎ যেভাবে দৃশ্যমান ঠিক সেইভাবে ধর্মীয় চেতনা জগতকে গ্রহণ করে না। ধর্ম ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের বাইরে একটি অফুরন্ত, অপার্থিব শক্তির অস্তিত্ব অনুমান করে। অতীন্দ্রিয় জগতের প্রতি ধর্মের যতোটা আস্থা রয়েছে পরিদৃশ্যমান জগতের প্রতি ততোটা নেই (এটা প্রমাণ করতে বেশি দূর দৌড়ানোর কোনো প্রয়োজন নেই, আজকের ধর্মীয় মৌলবাদী রাজনৈতিক সংগঠনগুলোর কথাবার্তা, কার্যকলাপ লক্ষ্য করলেই এর সত্যতা পাওয়া যাবে)। ধর্ম বিশ্বাস করতে শেখায় সেই অতীন্দ্রিয় আর্থিক জগত যা মানুষের সকল প্রত্যাশা পূরণ করতে সমর্থ। এটা সম্পূর্ণই একটি ভ্রান্ত বিশ্বাস। আর এই ভ্রান্ত বিশ্বাসকে অবলম্বন করেই জগতে বিচরণ করেছে অধিকাংশ মানুষ। এবং এই ভ্রান্ত বিশ্বাসকে পূজি করেই ধর্মীয় স্বাধিকারগণ যুগ যুগ ধরে মানুষকে ধর্মচেতনার আজগুবি অতীন্দ্রিয় জগতের লোভ প্রদর্শন করে বিপথগামী করেছে, অর্থাৎ মানুষের মৌলিক বিকাশ ও সমসংসার স্বতঃস্ফূর্ত বহিঃপ্রকাশকে রুদ্ধ করে রেখেছে, কল্পনাপ্রবণ এইসব চিত্তবিন্দুর অভিজ্ঞতা নিরপেক্ষ আরোহমূলক ধর্মীয় ব্যাখ্যাকে অকারণ বাগাড়ম্বরপূর্ণ ভণ্ডামি বলে যেতে পারে। প্লেটোর সম্পর্কে জুবান্ট যেমন অভিমত প্রকাশ করেছিলেন তার অনুকরণে মাথু আর্নল্ড শেনির সম্পর্কে বর্ণনা দিয়েছিলেন এই বলে যে, 'এক সুন্দর কিছু নিম্নলিখিত দেবদূত। সে তার দ্যুতিময় পাখা মহাশূন্যে বৃথাই আন্দোলন করেছিলেন'। বাক্যটি একটি 'গুলট পালট করে আমরা কল্পনাপ্রবণ ধর্মীয় ভাববাদী ও পাণ্ডাদের সম্পর্কেও প্রয়োগ করতে পারি। তারাও তাদের পাখা (ধর্ম প্রতিষ্ঠা পাবার আগেই) মেলে দিয়েছিলেন কল্পনারাজ্যের মহাশূন্যে। সেখানে কোনো বায়ুমণ্ডল নেই। যদিও থাকে তা এতটাই লঘু যে কেউ তাতে পাখা উড়ে যেতে পারে না। এই কল্পনার সঙ্গে ঐতিহাসিক রুড বাস্তবের কোনো মিল নেই।

কোম্তে (Comte) তাঁর 'Religion of Humanity' গ্রন্থে বলেছেন, 'ধর্ম হলো মানুষের মস্তিষ্ক প্রসূত একটি কৃত্রিম সৃষ্টি'। কিন্তু এই কৃত্রিমতা যে ক্রমাগতই মানুষের চেতনা ও মননে ব্যাব্যয় এক অকৃত্রিমতার রূপ লাভ করেছে এ কথা অস্বীকার করা যাবে না। ধর্ম তাই এক ধরনের অতীন্দ্রিয় বিশেষ অভিজ্ঞতা প্রতিটি ধার্মিকের কাছে।

আর ধার্মিক মাত্রই বিশ্বাসী। আর বিশ্বাস মাত্রই প্রশ্ন-যুক্তি-নতুন আকাংক্ষাহীন বিষয়। বিজ্ঞান বুদ্ধিভিত্তিক। বিজ্ঞান প্রশ্ন-যুক্তি-কৌতূহল-আকাংক্ষার সমন্বয়। কিন্তু ধর্মীয় অভিজ্ঞতায় বুদ্ধির ভূমিকা গৌণ। প্রশ্ন-যুক্তি নিষিদ্ধ। ধর্মের সঙ্গে বুদ্ধি অপেক্ষা অনুভূতির সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর। ধর্ম অপার্থিব শক্তিতে বিশ্বাসী। সে অপার্থিব শক্তির সাহায্য প্রার্থনা করে। এবং বুদ্ধিনিরপেক্ষ অনুভূতির সাহায্যে ধর্ম পরম সত্তাকে উপলব্ধি করতে চায়। এর কোনোটিই বিজ্ঞানের কাজ নয়। এর কোনটিকেই বিজ্ঞান সমর্থন করে না। তাই ধর্মকে এখন অবশ্যই বিজ্ঞান ও বস্তুবাদী দর্শনের আলোচ্য বিষয় হওয়া উচিত।

‘মানুষের ইতিহাস হলো প্রকৃতপক্ষে ধর্মের ইতিহাস’। মানব সভ্যতার মূলের দিক থেকে বিচার করলে ম্যাক্সমুলারের (Max Muller) এই উক্তিতে খুব একটা অতিশয়োক্তি নেই। কারণ এমন কোনো আদিম মানব গোষ্ঠী বা সমাজ ছিলো না যেখানে অজ্ঞতা থেকে ধর্মের ধারণা প্রথম সৃষ্টি লাভ করেনি। অবশ্য আজকের সুসংগঠিত, প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মমতের সঙ্গে আদিম ধর্মমতের পার্থক্য ছিলো অনেক। ধর্মের প্রথম উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের প্রশ্নটি ঐতিহাসিক ও মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে সতর্কভাবে পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন। আর তারপরই ধর্মের স্বরূপ ও কার্যাবলী ব্যাখ্যা করা সম্ভব। কিন্তু এধরনের একটি সীমিত রচনায় তার বিশদ আলোচনা অসম্ভব। এখানে কেবল মানুষের প্রাচীন ধর্মবোধ থেকে বর্তমান ধর্মবোধের উন্নত অবস্থা লাভের একটি সংক্ষিপ্তসার টানা যেতে পারে যা আসলে কোনোভাবেই পূর্ণাঙ্গ নয়। ‘ধর্ম একটি অত্যন্ত জটিল বিষয়। একে কোনো একটিমাত্র সামাজিক রীতির বৃদ্ধি বা বিস্তৃতির সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায় না। যতাই আদিম রূপের হোক না কেন উপাসনাকে কোনো একটিমাত্র চিন্তার বা একটিমাত্র আবেগের প্রকাশ বলা যায় না। বরং ধর্ম হলো (মানব সভ্যতার ক্রম বিবর্তনশীল ধারার বহু বহু পূর্বের) অনেকগুলো জটিল ও শক্তিশালী চিন্তার সৃষ্টি’ (M. Jastrow, The Study of Religion, P. 185)।

মানুষের মনেই ধর্মের জন্ম। জ্ঞানের উষালগ্নে মানুষের জীবনের উপর ব্যাখ্যাহীন প্রাকৃতিক শক্তিগুলোর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রয়েছে। এই শক্তির অস্তিত্ব অনুমানের ফলে মানুষের মনে যে আবেগ জন্মেছিলো তার থেকেই ধর্মচেতনার উৎপত্তি হয়েছে। কিন্তু প্রাচীন যুগের মতো আজকের স্বঘোষিত উন্নত ধর্মগুলোও ভয়-ভীতি প্রদর্শন করে মানুষের বিশ্বাসের প্রশ্নে অলীক জগতের হাতছানি দেয়; ঈশ্বর, দেব-দেবী, জীন, ফেরেশতা, স্বর্গ, নরকের গল্পো শোনায়ে, আত্মা অমরত্বের লোভ দেখিয়ে উর্বর মানব মস্তিষ্কের বিকলাঙ্গতা ঘটায়। সালোমন রেইনখ (Salomon Reinach) ধর্মের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, ‘আমি এইভাবে ধর্মের সংজ্ঞা দিতে চাই—আমাদের কর্মদক্ষতার স্বাধীন প্রকাশকে বাধাদান করে যে সমস্ত দ্বিধা-দ্বন্দ্ব তার সমষ্টিকেই ধর্ম বলে’ (Salomon Reinach Orpheus [E. Tr.

109] P. 3)। এ কথা অনস্বীকার্য যে অযৌক্তিক বিধি-নিষেধ প্রগতির পরিপন্থী। খ্রীষ্টধর্ম এবং ইসলামধর্ম উভয়ই প্রগতির পরিপন্থী। তারপরও এদুটি ধর্মের ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ আজ এতোটা স্ফীত কেন? এর জবাব খুঁজতে যাবার আগে ধর্মের ইতিহাস একটা নিরবচ্ছিন্ন প্রগতির ইতিহাস এরকম অনুমান করা থেকে বিরত হতে হবে, পরিবর্তে শোষণ, প্রভুত্ব, ক্ষমতালোলুপতার ধারাবাহিক ইতিহাসের কথাটি মাথায় রাখতে হবে। কারণ অনেক পুনরাবৃত্তি, অবক্ষয়, অসভ্যতা ও কুসংস্কারের জটিল আবর্তনের কাহিনী রয়েছে ধর্মের ইতিহাসে। যুগে যুগে প্রগতি যখন এক জায়গায় বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে অন্যত্র তখন সে পরিবর্তনের পথে বিকশিত হয়ে নতুন পথ আবিষ্কার করে নিয়েছে। ঐতিহাসিক ভাবে চিহ্নিত ধর্মের আদিম যুগের ফেটিশবাদ (Fetishism) কোনো ভাবেই প্রগতি নয়। এটা প্রত্যাবর্তন বা পশ্চাৎগতির নিদর্শন। Fetish কথাটি এসেছে পর্তুগীজ Feitico শব্দ থেকে। Feitico শব্দের অর্থ হলো মুগ্ধ হওয়া বা বিস্মিত হওয়া। আবার Feitico এসেছে ল্যাটিন Factitius শব্দ থেকে। Factitius শব্দের অর্থ হচ্ছে কৃত্রিম। অবশ্য মধ্যযুগীয় ল্যাটিনে এই শব্দটির অর্থ ছিলো-ঐন্দ্রজালিক। পশ্চিম আফ্রিকার আদিবাসীদের উপাস্য-বস্তুকে উল্লেখ করার জন্য পঞ্চদশ শতকের পর্তুগীজ নাবিকেরা এই শব্দটি ব্যবহার করতো। ফেটিশ একটি জড় পদার্থ। আত্মা বা রহস্যময় শক্তির এটি আবাসস্থল। অন্তত কিছু সময়ের জন্য এই বস্তুটির উপর আত্মা ভর করে বলে বিশ্বাস করা হতো। সেই জড় বস্তুটিকে উপাসনা করা হতো এবং সৌভাগ্য লাভের চেষ্টা হতো। প্রাকৃতিক বস্তু হিশেবে ফেটিশের নিজস্ব কোনো মূল্য ছিলো না। যে আত্মা তাতে বসবাস করে বা এসে অবস্থান করে সেই আত্মার গুণে মূল্যায়ন হতো ফেটিশের। হয়তো কোনো অদ্ভুত-দর্শন প্রাকৃতিক জিনিস, যেমন অস্বাভাবিক একটা পাথর কিংবা লাঠি, অথবা হাড় বা নখ প্রথম মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করতো। তারা ভাবতো হয়তো এখানে অপার্থিব কোনো শক্তি থাকতে পারে। এই ভাবনা থেকে তারা উপাসনা করতে শুরু করে।

ফেটিশের কাছে উৎসর্গ ও প্রার্থনা করা হতো। কিন্তু যদি দেখা যেতো তাতে কোনো লাভ হচ্ছে না তখন বুঝিয়ে-সুঝিয়ে আকাংক্ষিত বস্তুটি চাওয়া হতো। তাতেও না পাওয়া গেলে আদেশ করা হতো। কিন্তু তারপরও যদি আকাংক্ষিত বস্তুটি পাওয়া না যেতো তখন শুরু হতো গালাগালি। এমন কি চাবুকও মারা হতো ফেটিশকে। কিন্তু যদি তাও ব্যর্থ হতো তখন ধরে নেওয়া হতো জিনিসটিকে ছেড়ে আত্মা চলে গেছে। প্রয়োগবাদের আদিমতম রূপটি সম্ভবত এখানে প্রকাশ পেয়েছে। একটা ফেটিশ থেকে যতোক্ষণ কাজ পাওয়া যায় ততোক্ষণ সে পবিত্র। নইলে দাও আঁস্তাকুড়ে ছুঁড়ে। অবশ্য এর ফলে ফেটিশকদের সমাপ্তি ঘটছে না। একটা ফেটিশ গেলে নতুন আরেকটা বস্তুকে ফেটিশ হিশেবে গ্রহণ করা হতো। স্পষ্টতঃ ফেটিশবাদ অত্যন্ত অনুল্লত মানের ধর্ম। ফেটিশ একটি ব্যক্তিগত দেবতা। অসভ্যরা নিজেদের

নির্দেশে তাকে কাজ করতে বাধ্য করতো। এই ধারণা ব্যক্তিগত এবং খামখেয়ালী চিন্তার এক প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

এবার আরো একটি ধর্মীয় মানের অধোগতির বিষয় বলা যেতে পারে। ফেটিশবাদের মতো বহু আত্মা উপাসনাবাদও (Polydoemonism) ধর্মীয় মানের অধোগতির নিদর্শন। সমগ্র চরাচর অসংখ্য আত্মায় পরিব্যাপ্ত। মানুষ প্রতি মুহূর্তে নিজেদের সুবিধা বা অসুবিধার জন্য তাদের উপস্থিতি বুঝতে পারে। স্বপ্ন থেকে যে এই ধারণার উৎপত্তি হয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আদিম মানুষের কাছে স্বপ্নের অভিজ্ঞতা জাগ্রত অবস্থার অভিজ্ঞতার মতোই বাস্তব ছিলো। তারা আত্মাকে নিজেদের অজ্ঞাত ও অস্পষ্ট প্রতিরূপ বলে ভাবতো। ঘুমের সময় আত্মা দেহ ছেড়ে ঘুরে বেড়ায় আবার জেগে ওঠার আগে দেহে ফিরে আসে—এই ভাবে তারা স্বপ্নের ব্যাখ্যা করতো। স্বপ্ন এবং মৃত্যুর মধ্যে পার্থক্য হলো স্বপ্নে আত্মা ফিরে আসে কিন্তু মৃত্যু হলে আত্মা আর দেহে ফিরে আসে না অথবা বলা যেতে পারে আত্মা দেহে না ফিরে এলে মৃত্যু হয়। আদিম মানুষ নিজের আত্মার মতো তার চারপাশের জীব ও জড় সব কিছুর মধ্যে আত্মার অস্তিত্ব কল্পনা করতো।

ফেটিশ শ্রেণীকে বাদ দিয়ে জগতের এই অসংখ্য আত্মাকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। প্রথমত, নদী, পর্বত, সমুদ্র, গাছ, পাথর, পাখি, সাপ প্রভৃতি প্রাকৃতিক জিনিসের আত্মার কল্পনা। এসবের নির্বাচিত আত্মাগুলোকে আদিম মানুষেরা নিজেদের থেকে শক্তিশালী মনে করতো। অন্তত এদের অনিষ্ট করার ক্ষমতা যে বেশি সেটা তারা বিশ্বাস করতো। দ্বিতীয় শ্রেণীর আত্মা হলো মৃত মানুষের আত্মা। মৃত্যুর পর আত্মা বেঁচে থাকে এরকম অলীক ধারণা যে অসভ্য মানুষদের মধ্যে ছিলো (আজও অনেকের মধ্যেই আছে) তাতে কোনো সন্দেহ নেই। মৃত্যুর ফলে আত্মার ভালো বা মন্দ করার ক্ষমতা যথেষ্ট বৃদ্ধি পায় বলে তারা বিশ্বাস করতো। পূর্বপুরুষদের উপাসনা সকল অসভ্য সমাজে প্রভূত বিস্তৃতি লাভ করেছিলো। তৃতীয় শ্রেণীতে রয়েছে বিশাল প্রাকৃতিক (সৌর কেন্দ্রিক) বস্তুগুলোর আত্মাকে একটি স্বতন্ত্র শ্রেণীভুক্তিকরণ। যেমন আকাশ, সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্ররাজি একসময় মানুষের উপাস্য হয়ে উঠেছিলো। মানুষের ধারণা যখন কিছুটা উন্নত হয়েছিলো তখন তাদের মনোযোগ গেলো এই বিশাল প্রাকৃতিক জিনিসগুলো সম্পর্কে। এন্ড্রু ল্যাঙ্গে (Andrew Lange) তাঁর Making of Religion গ্রন্থে বলেছেন, ‘সর্বপ্রাণবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে অসভ্য মানুষেরা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে অসংখ্য আত্মার অস্তিত্ব কল্পনা করলেও তারা সংজ্ঞার সাহায্যে একজন পিতার বা সবকিছুর স্রষ্টার কল্পনা করতো। তিনি আদি। অন্যান্য সাধারণ আত্মা অপেক্ষা তাঁর স্থান উর্ধ্বে। সেই আত্মার পরিপ্রেক্ষিতে তারা আর নিজেদের আত্মা বলে মনে করতে পারতো না।’ ল্যাঙ্গে এতোদূর পর্যন্ত বলেছেন যে, ‘অসভ্যদের মধ্যে অনেকে খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীদের মতোই একেশ্বরবাদী ছিলো। তাদেরও একজন পরমেশ্বর ছিলেন’ (Andrew Lange :

The Making of Religion, P. 167)। একথা হয়তো সত্য যে সমস্ত কিছুর অসম্পন্ন পশ্চাৎপটে একজন পরমেশ্বরের ধারণা অসভ্যদের মধ্যে একেবারে অপরিচিত ছিলো না। সর্বপ্রাণবাদে বিশ্বাসী আদিম মানুষ অনুভব করতো যে শত্রুভাবাপন্ন অসংখ্য আত্মার দয়ার উপর নির্ভর করে তাদের বাঁচতে হয়। তাই তারা সেই আত্মাদের সম্ভ্রষ্ট করার চেষ্টা করতো। আত্মার সংখ্যা যতো বেড়ে যেতো তাদের সম্পর্কে ভয়ও ততো বাড়তো। এভাবেই ধর্মে ভয়ের ভূমিকা প্রাধান্য পেয়েছে। অসভ্য মানুষের ধর্মে ভয়ই প্রধান এবং ত্রুটি অসংখ্য।

এদের এইসব অজস্র ত্রুটি এবং স্থূলতা, ছেলেমানুষী এবং অজ্ঞতা থাকার পরও বলা যায় সভ্য মানুষের আত্মার ধারণা অসভ্যদের আত্মার ধারণারই সংস্কৃত রূপ। টাইলর (E. B. Tylor) তাঁর Primitive Culture গ্রন্থের প্রথম খণ্ড শেষ করেছেন এই কথা বলে ‘আত্মা সম্পর্কিত মতবাদ (সর্বপ্রাণবাদ) ধর্মের দার্শনিক পদ্ধতির একটি প্রধান অংশ। বর্বরদের ফেটিশ উপাসনা এবং সুসভ্য খ্রীষ্টানদের উপাসনার মধ্যে মানসিক সংযোগের যে অবিচ্ছিন্ন ধারাটি রয়েছে তা এই মতবাদের ফলেই সম্ভব হয়েছে। যে বিভেদ বিশ্বের সকল বৃহৎ ধর্মমতগুলোকে পৃথক করে রেখেছে সেই ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার সুগভীর পার্থক্যের তুলনায় সর্বপ্রাণবাদ এবং জড়বাদের পার্থক্য অনেক বাহ্যিক।’

গোষ্ঠীর রীতি-নীতির প্রতি আনুগত্য থেকে নৈতিক চেতনা বিকশিত হয়েছে। মূলত টোটেমবাদ থেকে এর ধারাবাহিকতার শুরু। গোষ্ঠীর প্রতি আনুগত্য থেকে যেমন প্রশ্রয় পেয়েছে রক্ষণশীলতা, তেমনি আত্মিক বিশ্বাসের একটি পরিবেশও সৃষ্টি হয়েছে। অনেক সময় কোনো সাধারণ শত্রুর ভয়ে ছোট ছোট গোষ্ঠীগুলো একত্রিত হতো। আবার কখনো কোনো শক্তিশালী গোষ্ঠী দুর্বলতর গোষ্ঠীগুলোকে জয় করে একটি বৃহৎ জনসমষ্টিতে পরিণত হতো। তার ফলে মানুষের মানসিক দিগন্তের বিস্তৃতি ঘটে এবং তার জীবনবোধ হয় গভীরতর। সামাজিক সংগঠনের ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মীয় চিন্তা-ভাবনায়ও বিরাট পরিবর্তন দেখা দেয়। সে সময় থেকেই বহু আত্মবাদ বহু ঈশ্বরবাদে রূপান্তরিত হয়। আগে যে বহু আত্মার উপাসনা হতো সেই আত্মাগুলোকে কোনোমতে দেবতা বলা যায় না। তাদের কোনো ইতিহাস ছিলো না, ব্যক্তিগত চরিত্র ছিলো না, এমন কি একটা নামও ছিলো না। প্রাকৃতিক সেই আত্মাগুলোই ক্রমশ আধুনিকীকরণে মনুষ্য গুণসম্পন্ন হয়ে উঠলো। কল্পনা করা হলো, মানুষের মতো তাঁদেরও ভালোলাগা মন্দলাগা রয়েছে, আবেগ উচ্ছ্বাস আছে, তাঁদের আহ্বান করা যায়, এবং তাঁদের এক একটি নামও রয়েছে। এর অর্থ এই ধরা যাবে না যে, এরপর নদী, গাছ, আগুন, মেঘ, আকাশ প্রভৃতিতে যে সব আত্মা বসবাস করতো তাদের ধারণা শেষ হয়ে গেলো। বরং পূর্বে যেসব স্বর্গীয় দেবতাদের পূজা করা হতো না তারাই এসে আত্মার স্থান দখল করে বসলো। প্রকৃত ঘটনাটা কিন্তু অন্য রকম। নতুন কোনো স্বর্গীয় ঈশ্বর তখনো হাজির হয়নি।

তাঁর উপস্থিতির আগেই ওইসব প্রাকৃতিক আত্মাগুলো ক্রমশ দেবত্বের মর্যাদা পেতে থাকে। কল্পনা শুরু হয় দেবতার স্বর্গবাসী। তারপরও প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের আদিম সম্পর্কটি একেবারে মুছে গেলো না। অবশ্য ধীরে ধীরে দেবতাদের সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্ক কমে আসতে লাগলো। দেবতার ক্রমশ নৈতিক ও মানবিক গুণসম্পন্ন হয়ে উঠলেন। তারা একেক জন প্রধান হয়ে উঠলেন রাষ্ট্র ও ব্যক্তিজীবনের বিভিন্ন বিভাগে। যেমন যুদ্ধের দেবতা, ভালবাসার দেবতা, কৃষি, শিল্প ও সৌভাগ্যের, ঝড়-ঝঞ্ঝার আলাদা আলাদা করে দেবতা কল্পিত হলো। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় বৈদিক ‘অগ্নি’ আগুনের দেবতা, পারস্যের ‘আহুরা’ আলোর দেবতা, ব্যাবিলনের ‘মার্দুক’ এবং মিশরের ‘রা’ হলেন সূর্যদেবতা, গ্রীসের ‘জিউস’ এবং ল্যাটিন ‘জুপিটার’ স্বর্গের দেবতা, জার্মানির ‘ওডিন’ এবং বৈদিক ‘ইন্দ্র’ ঝড়ের দেবতা। এই সব ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক বুন্যিাদের উপর আশ্রয় করে ধর্মীয় কল্পনার জাল বুনে দেবতাদের ব্যক্তিত্বের রূপরেখা প্রদান করা হয়েছে।

প্রাকৃতিক আত্মায় মানবত্ব আরোপ করার ফলেই যে সকল দেবতার সৃষ্টি হয়েছে এই ধারণা ঠিক নয়। মানুষের ধর্মানুষ্ঠান পদ্ধতির মধ্য থেকে এবং উৎসর্গ ও প্রার্থনার দ্বারাও অনেক দেবতার সৃষ্টি হয়েছে। এই ধরনের জাতীয় দেবতাদের মধ্যে আছেন, যেমন ভারতীয় ব্রহ্মা, মিশরের ওশিরিস, গ্রীসের অ্যাপোলো, ল্যাটিন মার্স, বৈদিক বরুণ ও বিষ্ণু, হিব্রু জিহোভা প্রভৃতি। একবার যখন এঁদের ব্যক্তিগত গুণ আরোপ করা হলো তখনই তাঁদের মরজগতের উল্লেখ, একটা অর্ধেক বাস্তব ও অর্ধেক আত্মিক জগতে স্থাপন করার মানসিক প্রসঙ্গতা দেখা দিলো। সেই জগতে দেব-দেবীদের নিয়ে একটি সমাজের কল্পনা করা হলো। আসলে ধর্ম বুদ্ধিধর্মী হওয়ার আগে থেকেই কল্পনা ও আবেগপ্রধান। ধর্ম হলো একরকমের অনুভূতি এবং সেই সঙ্গে চিন্তা ও ইচ্ছার সংমিশ্রণ। যথেষ্ট কল্পনা অপরিণত চিন্তার প্রকাশ।

জাতীয়ভাবে ধর্ম-বিকাশের ক্ষেত্রে দুটি গুরুত্বপূর্ণ গতিভঙ্গি রয়েছে। প্রথমটি দেবতাদের উপর নৈতিক গুণ আরোপ, অন্যটি একেশ্বরবাদ অভিমুখি যাত্রা। দেবতাদের উপর নৈতিক গুণারোপের ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক বস্তুর আত্মা সম্পর্কিত ব্যাপারটি বাদ দিতে হবে। কারণ এর কোনো নৈতিক আলোচনা হতে পারে না। কিন্তু যখন আত্মার ধারণা প্রাকৃতিক বস্তুর আওতা ছাড়িয়ে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের উল্লেখ মোটামুটি একটি অতীন্দ্রিয় জগতে স্থাপিত হলো এবং আত্মাকে মনুষ্যরূপে কল্পনা করা হলো, অন্তত আত্মাকে মনুষ্যগুণসম্পন্ন বলে মনে করা হলো, আর তখনই প্রশস্ত হয়ে গেলো দেবতাদের মঙ্গলময় ও ন্যায়বান বলে ধারণা করার পথ। এরপর ক্রমশ দেবতার মানুষের আদর্শ এবং নৈতিক অভিভাবক হয়ে উঠলেন। ধারণা প্রতিষ্ঠিত হলো তিনি সংকে পুরস্কৃত করেন এবং অসংকে শাস্তি দেন। তারপর থেকে দেবতাদের নৈতিক জগতের ধারক ও বাহকরূপে কল্পনা করা হতে থাকে। হফডিং (Hoffding) বলেছেন, ‘প্রাকৃত ধর্ম থেকে নৈতিক ধর্মে উত্তরণকে ধর্মের ইতিহাসে

একটা গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হিশেবে যে গণ্য করা হয়তো তা যথার্থ। বহু ঈশ্বরবাদী ধারণার একেশ্বরবাদে পরিবর্তিত হওয়ার ঘটনা অপেক্ষা এই পরিবর্তন অধিকতর তাৎপর্যপূর্ণ (H. Hoffding, The Philosophy of Religion, 1906, P. 326)।

এভাবে দেবতাদের নৈতিক গুণারোপ করার কালে এক একজন দেবতা এক একটি গুণের প্রতীক হয়ে ওঠেন। বিভিন্ন জাতির কাহিনীতেই এর উদাহরণ পাওয়া যায়। যেমন-ইন্দ্র (বেদ), মার্স (ল্যাটিন), থব (টিউটানিক), প্রভৃতি দেবতার হয়ে উঠলেন বিশেষ করে সৌন্দর্যের প্রতীক। বরুণ (বেদ) ও ওশিরিস (মিশরীয়) হলেন ন্যায় বিচারের দেবতা। পল্লস এ্যাথেনী (গ্রীক) প্রজ্ঞার দেবী, হেসিটা (গ্রীক) সত্য ও গার্হস্থ্য আদর্শের দেবী, জরথুষ্ট্র ধর্মের প্রধান দেবতা আত্মা মাজদা হলেন অন্ধকার ও মন্দের শত্রু-আলোক ও মঙ্গলের দেবতা। জিউস (গ্রীক) হলেন অমঙ্গলের শত্রু এবং বিশ্বে নৈতিকতার পরিচালক। খ্রীষ্টপূর্ব ধর্মে ওল্ড টেস্টামেন্টেই দেবতাদের সম্পর্কে নৈতিক ধারণা সর্বোৎকৃষ্ট অবস্থায় পৌঁছেছিলো।

একেশ্বরবাদে অগ্রগতির ক্ষেত্রে জাতীয় ধর্মে কালক্রমে অনেক দেবতার মধ্যে কোনো একটি দেবতাকে বেশি করে প্রশংসা করার একটি প্রবণতা দেখা যায়। মানুষের সামাজিক জীবনের উপমার সাহায্যে দেবতাদের পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করা হতো। পৃথিবীর সমাজে একজন রাজা থাকেন, অতএব দেবতাদের সমাজেও একজন রাজা থাকা স্বাভাবিক। এরপর আর অন্য দেবতাদের সমান ক্ষমতাসম্পন্ন থাকা সম্ভব হয় না। স্বর্গে একজন প্রধান দেবতার নেতৃত্বে অন্যান্য দেবতাদের প্রাধান্য অনুসারে ক্রমপূর্ণরূপে সাজানো হলো। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, গ্রীকের লোকেরা বিশ্বাস করতো দেবতাদের এবং সকল মানুষের পিতা হলেন জিউস। রোমানদের মতে জুপিটার প্রধান। ব্যাবিলনে মাদুর্ক, আসিরিয়ায় অসুর এবং প্রাচীন চীনধর্মে তায়েন (স্বর্গ) এবং সাংতি (দেবতাদের প্রধান) কে প্রধান বলে মনে করা হতো। পৃথিবীর সব জায়গায়, সকল জাতীয় ধর্মে দেবতাদের একটি রাজ্য কল্পনা করার প্রবণতা দেখা যায়। এই ধরনের বিশ্বাসকে দেবতাদের রাজতন্ত্রবাদ (Monarchianism) বলা যেতে পারে। ম্যাক্সমুলার যাকে একদেব প্রাধান্যবাদ (Henothedism) বলেছেন তার মধ্যেও এই এক দেবতার প্রাধান্যের নিদর্শন পাওয়া যায়।

অন্য আরো একভাবে বহুর ধারণা 'একে' বিলীন হয়ে গিয়েছিলো। চিন্তনের সহায়তায় সকল দেবতাকে এক ঈশ্বরের বহুরূপে প্রকাশ বলে সিদ্ধান্ত করার একটি প্রবণতা লক্ষ করা যায়। বহু দেবতার অস্তিত্ব স্বীকার করেও একেশ্বরের ধারণা যে লাভ করা সম্ভব তার প্রমাণ প্রাচীন মিশর। প্রাচীন মিশরে সূর্যদেবতাকে সকল দেবতার আত্মরূপে বর্ণনা করা হয়েছে, যেমন- আমিই স্বর্গ ও মর্ত্যের স্রষ্টা,... আমিই সকল দেবতার প্রাণ... আমিই সকালের চেপেরা (Chepera), দুপুরের রা (Ra)

এবং সঙ্খ্যার ৎমু (Tmu)।' ভারতেও অনেক বৈদিক মন্ত্রের মধ্যে এই প্রবণতার নিদর্শন পাওয়া যায়। তার মধ্যে বহু পরিচিত মন্ত্রটি হলো, 'ওগো অগ্নি, তুমি যখন জন্মগ্রহণ করো তখন বরুণ, যখন নিহত হও তখন মিত্র, তুমিই সকল দেবতা।' তিনি এক। মুনিরাই তাঁকে ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, অগ্নি প্রভৃতি বিভিন্ন নামে অভিহিত করেছেন। পরবর্তীকালে, উপনিষদের যুগে এই প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। ব্রহ্ম বা পরমসত্তা এক। পার্থিব জগতের এই বহুত্বের ধারণা ভ্রমজ্ঞান বা মায়া। বহুর মধ্য দিয়েই 'এক' নিজে প্রকাশ করেছে। বহু দেবতার ধারণা ও অন্যান্য সব কিছুর মতো এক সত্তার ধারণায় রূপান্তরিত হয়েছে। ভারতবর্ষে এই একেশ্বরবাদ ব্যবহারিক প্রয়োজনে বহু ঈশ্বরের উপাসনা স্বীকার করে নিয়েছে। গ্রীসে এই প্রবণতার বিকাশ হয়েছিল প্রধানতঃ জেনোফেরিস (Zenophanes), পারমেনিডিস (Permanides) এবং স্টয়িক (Stoics) দার্শনিকদের প্রভাবে। গ্রীসে মানবরূপী বহু ঈশ্বরের ধারণার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে জেনোফেনিস এক পরম ঐক্যের ধারণায় উপনীত হয়েছিলেন। ইন্ডিয়াজ কল্লনার দ্বারা সেই 'এক' কে কখনো জানা সম্ভব নয়। সর্বেশ্বরবাদীদের মতো স্টয়িক দার্শনিকগণও ঈশ্বরকে ব্রহ্মাণ্ডের আত্মা হিসেবে এবং বিশ্বচরাচরের অন্তর্ভুক্তি কারণ হিসেবে কল্পনা করেছিলেন।

ধর্মের একেশ্বরবাদের পূর্ণ প্রকাশ ঘটেছিল ইস্রায়েলে। পৌত্তলিক ধর্মগুলোতে অতি অল্প সংখ্যক ভাববাদীর অন্তর্দৃষ্টিতে একেশ্বরবাদী ধারণা কখনো কখনো প্রকাশ পেয়েছে, কিন্তু কখনোই এটি জনগণের ধর্ম হতে উঠতে পারেনি। পারস্যের জরথুষ্ট্র (Zarathustra) একেশ্বরবাদের কাছাকাছি এসেছিলেন, কিন্তু তিনি ব্যক্তিগতভাবে যে সব দেবতাদের নির্বাসিত করেছিলেন, জেন্দ আভেষ্টায় (Zend Avesta) তাঁর উত্তরাধিকারীরা সেই সব দেবতাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। ইস্রায়েলের সূচনায়ও প্রকৃত অর্থে একেশ্বরবাদের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। সেখানে জাতীয় জীবনের সূচনায় কেবল শিক্ষক এবং নেতাই জিহোভা (Yehovah)-কে একমাত্র দেবতা বলে স্বীকার করতেন। কিন্তু অন্যান্য জাতীয় দেবতাদের অস্তিত্বকে তখনো অস্বীকার করা হয় নি। যেমন মোয়াবাইট (Moabites) জাতির দেবতা ছিলেন ক্যামোস (Chammosh), অ্যামোনাইটদের (Ammonites) দেবতার নাম ছিলো মোলক (Moloch), জিদোনীয়দের (Zidonians) দেবতা ছিলেন বাল (Baal) প্রভৃতি। তথাপি জিহোভাই ছিলেন প্রধান বা একমাত্র দেবতা, যে দেবতাকে ইজরায়েলের মানুষ উপাসনা করতো। জিহোভা ছিলেন তাদের একমাত্র ধর্মীয় আকর্ষণ। ধর্মীয় যা কিছু অভিজ্ঞতা বা যা কিছু আদর্শ তারা লাভ করতো, সব কিছুই তারা পেতো জিহোভার কাছ থেকে। অন্য দেবতার উপাসনা রাজদ্রোহ হিসেবে গণ্য হতো। তার মানে এই নয় যে সমস্ত লোক অন্য দেবতাদের অস্তিত্ব অস্বীকার করতো। কিন্তু তারপরও তাদের কাছে জিহোভাই ছিলেন ইস্রায়েলের একমাত্র দেবতা। একে ঠিক একেশ্বরবাদ বলা যায় না। বরং একে দেবতা উপাসনা বলা যেতে

পারে। অ্যামোসের (Amos) সময় থেকে ইস্রায়েলের জননায়কদের মধ্যে উপলব্ধি হতে শুরু করে যে জিহোভার ঈশ্বরিক এবং নৈতিক রাজত্ব এতোদূর বিস্তৃত যে তাঁকে কেবল ইস্রায়েলের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা সম্ভব নয়। তাঁর রাজত্ব রয়েছে সমগ্র বিশ্ব জুড়ে। অন্য কোনো দেবতার স্থান আর সেখানে নেই। এই জিহোভারই পরিবর্তিত রূপ ইসলামের আল্লাহ।

হঠাৎ করে ধর্মের বিশ্বজনীনতা প্রাপ্তি ঘটেনি। এর পেছনে ছিলো যথেষ্ট প্রস্তুতি। কিছু কিছু জাতীয় ধর্মে তৎকালীন সময় এই ধরনের প্রবণতা দেখা দিয়েছিলো। গ্রীস ও রোমান জগতে খ্রীস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে তৃতীয় শতাব্দী পর্যন্ত যে রহস্যময় ধর্ম বিস্তৃতি লাভ করেছিলো তার মধ্যে বিশ্বজনীনতার লক্ষণ ছিলো সুস্পষ্ট। ইস্রায়েলে খ্রীস্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দী থেকে ষষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত ভাববাদীগণ বিশ্বজনীন ধর্মের শিক্ষা দিয়েছিলেন। রোমান এবং গ্রীসে জাতীয় দেবতাদের উপাসনা করা হতো প্রাচীন পদ্ধতিতে। ইস্রায়েলে এ্যামোস, ইশা (Isaiah) এবং দ্বিতীয় ইশার শিক্ষায় জাতীয় ধর্মানুষ্ঠান অপেক্ষা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং অন্তরের বিশ্বাস বড় হয়ে উঠেছিলো। জেরেমিয়া (Jeremiah) যখন ঘোষণা করেছিলেন, ঈশ্বর তাঁর শিষ্যদের নিয়ে 'নতুন ধর্মশালা' গড়ে তুলতে বলেছেন, তখনই ধর্মের ইতিহাসে 'আদর্শের বৃহত্তম এবং নবতম মূল্যায়ন' হয়েছিল বলা যায়। 'আমি আমার আইন তাদের অন্তঃকরণে স্থাপন করবো, এবং তা তাদের হৃদয়ে লিপিবদ্ধ করে দেবো' (Jer. xxxi 31-34)।

ঈশ্বর ও মানুষের সম্পর্ক যদি আত্মকৃত্য ও নৈতিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে যারাই সেই শর্ত পালন করবে তাদের সকলের জন্য ধর্মের দুয়ার থাকবে উন্মুক্ত। জেরেমিয়া অবশ্য ঠিক এই ধরনের কোনো সিদ্ধান্ত করেন নি। কারণ তখনো তাঁর চিন্তা ইস্রায়েলের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলো। তবে তাঁর 'নতুন ধর্মশালা'র ধারণার মধ্যে এরকম সিদ্ধান্তের একটি প্রচ্ছন্নতা ছিলো। একই সঙ্গে ইস্রায়েলে আরো একটি ধারণার সৃষ্টি হয়েছিলো যে, জিহোভা কেবল ইস্রায়েলের নন, তিনি সমগ্র বিশ্বের একমাত্র ঈশ্বর। এই বিশ্বাসকে একেশ্বরবাদ বলা যেতে পারে। তিনি সমগ্র ইস্রায়েলের মানুষের যেমন বিচার করবেন তেমনি আরব, মিশর, ব্যাবিলনের মানুষেরও বিচার করবেন। পরবর্তীকালে ইহুদীরা ধর্মীয় এই ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গিকে সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করায় জুডাবাদ ক্রমশ একটি সংকীর্ণ বিশেষ মতবাদে প্রত্যাবর্তন করে। এইভাবে ইস্রায়েলের ধর্ম বিশ্বজনীন খ্রীষ্টধর্মের বুনিয়াদ গড়ে দিলেও নিজে জাতীয় ধর্মই থেকে যায়। তবে এ কথা সত্যি যে, সমস্ত শ্রেণী ও জাতির বাধা ভেঙে সকল মানুষকে পরিত্রাণের প্রথম পথ দেখিয়েছিলেন বৌদ্ধধর্ম। যেমন খ্রীষ্টধর্মের আবির্ভাব হয়েছিল জুডাবাদ থেকে, তেমনি ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং সংস্কার সাধন করে উৎপত্তি হয়েছিলো বৌদ্ধধর্মের। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম এক স্বতন্ত্র শ্রেণীর ধর্ম। এই ধর্মে আছে অত্যন্ত শ্রমসিদ্ধ ধর্মীয় অনুষ্ঠান, কৃচ্ছ্রতা সাধন এবং সর্বেশ্বরবাদী

দূর কল্পনা।

বৌদ্ধধর্ম ধর্মীয় ক্রমবিকাশের ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী ঘটনা। লক্ষণীয় বিষয় হলো এই ধর্মে পাপ থেকে পরিত্রাণের কথা চিন্তা করা হয়নি। দুঃখ কষ্টের হাত থেকে পরিত্রাণ লাভের কথা বলা হয়েছে মাত্র। যখন সকল আবেগ ও আকাংক্ষা, এমন কি বাঁচার আকাংক্ষাও লোপ পাবে, তখনই মানুষ নির্বাণ লাভ করতে পারবে। নির্বাণ হলো সম্পূর্ণ নিষ্পৃহ এক শান্তির অবস্থা। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের আত্মা সম্পর্কিত অনেক ধারণাকে গৌতম বুদ্ধ অস্বীকার করেছেন। ব্রাহ্মণ্য ধর্মে আত্মা দ্রব্য হিসেবে স্বীকৃত। কিন্তু বুদ্ধদেব তাও স্বীকার করেননি। তাঁর মতে তথাকথিত আত্মা মায়া মাত্র। মানুষ কতোগুলো কামনা-বাসনার সমষ্টি ছাড়া আর কিছু নয়। মানুষ যা করে তার মধ্য দিয়েই তার মনুষ্যত্বের প্রকাশ ঘটে। কর্মযোগই প্রকৃত সত্য। নীতিগতভাবে বুদ্ধ নাস্তিক ছিলেন না। কিন্তু তিনি দেবতাদের অস্বীকার করেছেন। ব্রাহ্মণ্য দর্শনের ব্রহ্ম সম্পর্কে তাঁর কোনো আগ্রহ ছিলো না। মানুষকে ভবচক্র থেকে মুক্ত করার কোনো সাহায্য দেবতারা করতে পারেন না। কারণ দেবতা মানেই তথাকথিত কল্লিত একটি বিষয়। বুদ্ধ দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন, ‘মুক্তির জন্য মানুষকে নিজেরই চেষ্টা করতে হবে। কোনো দৈব সাহায্য সে পাবে না। প্রার্থনা একটা অন্তঃসারশূন্য ব্যাপার। উপাসনা নিরর্থক।’ বৌদ্ধধর্মকে অনেকে ধর্ম বলেই স্বীকার করতে রাজী নন। কারণ এই ধর্মে কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠান নেই। মোক্ষ লাভের ক্ষেত্রে দেবতাদের কোনো ভূমিকা নেই। বুদ্ধদেব স্বয়ং তাঁর শিষ্যদের উপাসনা থেকে বিরত থাকার উপদেশ দিয়েছেন। অথচ যে মতবাদ তিনি অগ্রাহ্য করেছিলেন ধর্ম হিসেবে বৌদ্ধধর্ম বর্তমানে সেই মতবাদের উপরই প্রতিষ্ঠিত।

কালানুক্রমিকভাবে খ্রীস্টপূর্ব হতে দ্বিতীয় বিশ্বজনীন ধর্ম। মূল থেকেই এ ধর্মটি পুরোপুরি মিথ্যাশ্রয়ী (অবশ্য মিথ্যার অবলম্বন ছাড়া কোনো ধর্মের অস্তিত্বই স্বীকার্য নয়)। একটি জারজ, অবৈধ সন্তানকে কেন্দ্র করে, সমস্ত সাধারণ ঘটনার অসাধারণ রূপায়ণের নাম হচ্ছে-খ্রীস্টধর্ম। সেন্ট পল এর মতো ধুরন্ধর, মিথ্যাবাদী, বজ্জাত লোকের আবির্ভাব না ঘটলে খ্রীস্টধর্মের বিশ্বজনীনতার প্রশ্ন ছিলো অবাস্তব। অত্যন্ত মিথ্যাবাদী, চতুর, দুর্ধর্ষ, গুণ্ডা-প্রকৃতির লোক ছিলেন পল। যীশু নিজে কোনো ধর্ম দিয়ে যায়নি, এবং সবচেয়ে মজার ঘটনা হচ্ছে ক্রুশেও মৃত্যু ঘটেনি তাঁর। আজ ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিকভাবে এ কথা প্রমাণিত সত্য। এমন কি ৪ : ১৫৭ বচনে কোরানও একথা স্বীকার করে যে, ক্রুশে যীশুর মৃত্যু হয়নি। তারপরও উক্ত ধর্মের অধিকাংশ মানুষ একথা বিশ্বাস করে আবেগান্বিত হন যে, যীশু সশরীরে স্বর্গে চলে গেছেন এবং অদ্যাবধি তিনি ঈশ্বরের দক্ষিণে অবস্থান করছেন এবং বিশ্ব ধ্বংস প্রাপ্তির সময়, অর্থাৎ কেয়ামতের পূর্বে আবার তিনি সশরীরে পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করবেন। ইসলামী দর্শনে এমন একটি গাঁজাখুরি মতবাদের প্রশয় লাভ ঘটেছে প্রারম্ভিককালে ইসলামে ধর্মাস্তরিত খ্রীস্টানদের অন্ধ-কু বিশ্বাস থেকে। এ ব্যাপারে আমার যীশু

সম্পর্কিত গবেষণামূলক (যীশু শুয়ে আছেন ভারতে) গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে খ্রীস্টধর্মের উল্লেখযোগ্য পার্থক্য থাকলেও উভয়ের মধ্যে অনেক সাদৃশ্যও রয়েছে।

৩৪বারির যে অমানবিক রক্তপাতে ইসলাম প্রথম সমাজের অশিক্ষিত, দুর্বল, নিম্নশ্রেণীর মানুষের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করেছিলো তারচেয়ে ও নির্দয় ও বীভৎস কায়দায় প্রতিষ্ঠার পথে অগ্রসর হয়েছে ভগ্ন পলের সৃষ্ট খ্রীস্টধর্মের পাণ্ডারা। তাঁরা গ্রন্থে মৃত্যু না হওয়ার পর আতঙ্কজনক, পলায়মান যীশুর কাল্পনিক গল্প প্রচার করে, জোর-জবরদস্তি আইন করে, তৎকালীন সমাজের বিজ্ঞানমনস্ক মানুষদের সমাজে একঘরে করে, তাঁদের বইপত্র, পাণ্ডুলিপি পুড়িয়ে, যীশুর ‘হোলি স্প্রীট’ এর ভুয়া ধোঁয়া তুলে ‘খ্রীষ্টধর্মের দর্শন’ প্রতিষ্ঠা করেছে।

এর প্রায় ছয়শ বছর পর একই কায়দায় ইসলামের আবির্ভাব। অত্যন্ত ধৈর্যহীন, অসহিষ্ণু এই ধর্ম হলো তরুণতম বিশ্বজনীন ধর্ম। অন্য দুটি বিশ্বজনীন ধর্ম অপেক্ষা ইসলাম প্রকৃতিতে অনেক কম সর্বজনীন। যুগের পর যুগ ধরে এই ধর্ম মূল সীমেটিক (Semetic) এবং এমন কি আরবীয় চরিত্রটি পালন করে এসেছে। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক এবং জাতীয় বৈচিত্র্যকে গ্রহণ করার মতো স্বচ্ছতা, প্রসারতা এই ধর্মের নেই। ইসলাম অত্যন্ত গোঁড়া ধর্ম। স্থিতিশীল ধর্ম। আরবীয় স্টাইলের বাইরে এর কোনো নড়াচড়া নেই। কোনো রকম পরিবর্তন এই ধর্মে স্বীকৃত নয়। এমন কি আচার অনুষ্ঠানের খুঁটিনাটি গুলিও অপরিবর্তনযোগ্য। নতুনের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানের যে সুযোগ খ্রীষ্টধর্মে রয়েছে, ইসলামে তা নেই।

কোরানের একটি জোর-জবরদস্তিও ইসলাম পরিবর্তনের অনুমোদন করে না। অথচ ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, মুসলমানরা আজ যে কোরানকে একেবারে অপরিবর্তিত ঐশ্বরিক গ্রন্থ হিসেবে বিবেচনা করে, প্রথম দিকে, গ্রন্থনকালে এর ব্যাপক পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা হয়েছে। ইসলামের প্রথম খলিফা আবু বকরের সময় কোরানের প্রথম লিপিবদ্ধ পাণ্ডুলিপিগুলো তৃতীয় খলিফা ওসমানের সময় আগুনে পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে। প্রথম অবস্থায় কোরানের সাত প্রকার সংস্করণ লিপিবদ্ধ করা হয়েছিলো। এগুলো ছিলো প্রথম দুটি মদীনায়, তৃতীয়টি মক্কায়, চতুর্থটি কুফা নগরে, পঞ্চমটি বসরায়, ষষ্ঠটি সিরিয়ায় এবং সপ্তমটি এমনই কদর্য ছিলো যে, সেটাকে সামান্য সংস্করণ হিসেবে লিপিকারগণ সেটির স্থানের নামই উল্লেখ করেননি। সেই সাতটি লিপিবদ্ধ কোরানে এমন অনেক বিষয়াদি ছিলো ‘যা পাঠে মানুষ বিপথগামী হইবে’ এই বিবেচনায় সেগুলোকে পুড়িয়ে নষ্ট করে নতুনভাবে সংকলিত করা হয় ‘ঐশীগ্রন্থ’ নামক আজকের কোরানকে। এরকম রুক্ষ কথা শুনে অধিকাংশ মুসলমানই অতৃপ্ত হতে পারেন, কিন্তু পারেন না ঐতিহাসিক সত্যকে হাওয়ায় মিলিয়ে দিতে। গোঁড়া ইসলামপন্থীরা এতোই অসহিষ্ণু ও ধর্মাত্মক যে এরা সুস্থিরভাবে ধর্মীয় কোনো ব্যাপারকেই বিবেচনায় নিতে অক্ষমতা প্রকাশ

করে, অথচ নিজেরা ইসলামী বিধি-বিধান, নিয়ম-কানুন একজনও সঠিক, সুষ্ঠুভাবে পালন করে না, কিন্তু নিজেদেরকে 'মুসলমান' বলে আত্মপরিচয় দিতে তৃপ্তি বোধ করে।

৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে মোহাম্মদের মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুকালে কোরান গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ ছিলো না। তাঁর মৃত্যুর পরের বছরই ওমরের পরামর্শে প্রথম খলিফা আবু বকর কোরান গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করার জন্য জনৈক যায়েদ ইবনে সাবেতকে প্রধান করে ১০ জনের একটি কমিটি গঠন করেন। এ ব্যাপারে ভাই গিরিশ চন্দ্র সেন তাঁর অনূদিত কোরানের বঙ্গানুবাদের ভূমিকায় লিখেছেন,...'জয়দ নামক জনৈক মদীনাবাসী পণ্ডিত উৎসাহের সহিত এই সংগ্রহকার্যে প্রবৃত্ত হইয়া বহু পরিশ্রমে নানা স্থান হইতে খর্জুর-পত্রে লিখিত, শ্বেত প্রস্তরে খোদিত এবং মানুষের বক্ষে চিত্রিত আয়াত সকল সংগ্রহ করেন। এই সংগৃহীত বচন সকল প্রথমত আমীর আবু বকরের নিকট ছিল, পরে তাঁহার মৃত্যুকালে হফসা নাম্নী হজরতের পত্নীর নিকটে গচ্ছিত থাকে। নেতৃবর ওমর ফারুক যাবজ্জীবন এই গ্রন্থকেই মান্য করিয়া চলিয়া ছিলেন। তাঁরা মৃত্যুর পর আমীর ওসমানের সময় নানা স্থানে ইহার প্রতিলিপি বিস্তৃত হইয়াছিল বটে, কিন্তু সে সমস্ত পরস্পর এত বিভিন্নরূপে লিখিত হইয়াছিল যে, তাহার জন্য মোসলমান মণ্ডলীর-মধ্যে ভয়ানক বিবাদ আরম্ভ হইল। ইহাতে ওসমান পুনরায় সেই জয়াদের দ্বারা কোরআন সংগ্রহ করিয়া তাহাই সমস্ত মোসলমানকে মান্য করিতে বাধ্য করেন। তিনি এই নূতন গ্রন্থের বহু খণ্ড প্রতিলিপি করাইয়া সমস্ত প্রধান নগরে প্রেরণ পূর্বক পূর্বলিখিত সমস্ত কোরআন অগ্নিতে দগ্ধ করাইয়া ফেলেন' (ভাই গিরিশ চন্দ্র সেন অনূদিত 'কোরআন শরীফ' এর ২য় সংস্করণের ভূমিকা, পৃঃ ১১-১২, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা)। এ বিষয়টি সম্প্রতি বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত মোহাম্মদ মতিওর রহমানের 'ঐতিহাসিক অভিধান' গ্রন্থেও উল্লেখিত আছে।

আবু বকর থেকে ওসমান পর্যন্ত কোরানের প্রথম পর্বে লিখিত সংস্করণগুলোর সময়কাল ছিল ১৯ বছর। ৬৫১ খ্রীষ্টাব্দে ওসমান আবু বকরের সময়কার যায়েদ কর্তৃক কোরানের প্রথম লিপিবদ্ধ সংস্করণগুলো পুড়িয়ে ফেলেন। এবং পরবর্তিতে ওসমান সেই যায়েদ ইবনে সাবেতকেই আবার নতুন করে কোরানকে লিপিবদ্ধ করার কাজে মনোনিবেশ করেন। এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, গিরিশ চন্দ্র তাঁর ভূমিকাতে ১২ পৃষ্ঠার টিকায় কোরান সংগ্রহকারী বলে 'জয়দ' নামের যার কথা উল্লেখ করেছেন, তিনি তাঁকেই মোহাম্মদের ক্রীতদাস-পরে ধর্মপুত্র যায়েদ বিবেচনা করেছেন, এ তথ্য সঠিক নয়। কারণ মোহাম্মদের মৃত্যুর তিন বৎসর আগে তাঁর ধর্মপুত্র যায়েদ সিরিয়ার সন্নিহিত রোমান-শাসক শোহারাবিলের সৈন্যদের হাতে নিহত হন, এবং যায়েদের মৃত্যুর পর তাঁর বিধবা স্ত্রী জয়নবকে মোহাম্মদ বিবাহ করেন। অতএব কোরান লিপিবদ্ধ কাজে নেতৃত্বদানকারী যায়েদ

এবং মোহনাদের ধর্মপুত্র যাকেই কিভাবে অভিন্ন ব্যক্তি হন?

ইসলাম ধর্মে আরবের মুসলমান এবং ধর্মান্তরিত মুসলমানদের মধ্যে প্রভেদ রয়েছে। পৃথিবীর অন্যান্য আলোচিত ধর্মমতগুলির পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে ইসলাম ধর্মে বিশেষ কোনো অভিনবত্ব দেখা যায় না। ইসলাম ধর্ম হলো জুডাবাদের (ইহুদীদের) বিশেষ কয়েকটি দিক, এবং অধঃপতিত খ্রীষ্টধর্মের (খ্রীষ্টানদের) কিছু দ্রুত জ্ঞানের সংমিশ্রণ। খ্রীষ্টধর্মের ঈশ্বরের ধারণার থেকে ইসলামের ধারণা যে শ্রেষ্ঠ এবং ইসলাম ধর্মেই বৌদ্ধিক এবং সামাজিক প্রগতি যে অধিকতর হয়েছে এটিকে প্রতিপন্ন করার জন্যে জ্ঞান অপেক্ষা, বল ও ক্ষমতার প্রয়োগ করতে হয়েছে বেশি। আজ থেকে প্রায় ছয়শ বছর আগে ইবন বতুতা তাঁর 'রেহলা' গ্রন্থে লিখেছেন,...'যেদিন থেকে আরবরা তলোয়ার হাতে নিয়েছে সেদিন থেকেই অন্য জাতিরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ শুরু করেছে।' এই ধর্মের আল্লাহ সম্পূর্ণরূপে অতিবর্তী। একজন প্রাচ্য দেশীয় এক নায়ককে খুব বড় করে দেখলে যেমন হয় ইসলাম ধর্মের আল্লাহ তেমনি স্বেচ্ছাচারী, দায়িত্বজ্ঞানহীন, এবং স্বৈরশাসকরূপী প্রভু। কথায় কথায় চোখরাঙানো হচ্ছে তাঁর বড় কাজ। তিনি স্বর্গের সুলতান। কিন্তু তাঁকে দেখাও যায় না, বোঝাও যায় না, অথচ মানুষ তাঁর দান, একান্তরূপে তাঁর সম্পত্তি! এবং বিশ্বের সকল কিছু তাঁর ইচ্ছায় নিয়ন্ত্রিত! ইসলামের আল্লাহর গুণের মধ্যে কোনো প্রেম বা পবিত্রতার স্থান নেই, আছে কেবল ধর্মক আঁর হুমকি, সঙ্গে পরকাল বিষয়ক ইন্দ্রিয় সুখ-ভাগের লোভনীয় ইঙ্গিত। আল্লাহগোড়াই ইসলাম প্রগতি-পরিপন্থী।

পর্ব-২

'ঈশ্বর মানুষ সৃষ্টি করেছেন' এই তত্ত্বটির মধ্যেই রয়েছে ধর্মের সবচেয়ে বড় ফাঁকি। আদমের উৎপত্তি কাল থেকে বাইবেলের হিসেব অনুযায়ী আব্রাহাম জন্মগ্রহণ করেছিলেন আদমের ১৯৪৮ বছর পর। এবং আব্রাহামের জন্ম থেকে যীশুর আবির্ভাব ঘটেছিলো ১৮৫২ বছর পরে। অর্থাৎ আদম থেকে যীশুর সময়ের ব্যবধান ৩৮০০ বছর। বাইবেলে বিশ্বসৃষ্টির সময়কাল যেমন স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, তেমনি পৃথিবীতে কবে মানুষের আবির্ভাব হয়েছিলো তাও নির্দিষ্টভাবে বলে দেওয়া হয়েছে। আজকের ১৯৯৭ সনকে ভিত্তি হিসেবে ধরে নিলে ওই হিসেব অনুসারে দেখা যায় আজ থেকে মাত্র ৫৭৯৩ অথবা—৯৪ বছর আগে (যীশুর জন্মের ৩/৪ বছর পর থেকে খ্রীষ্টীয় সন গণনা শুরু হয়, সেই হিসেবে) বিশ্বসৃষ্টির সূচনা ঘটেছিলো। আর মানুষ সৃষ্টি হয়েছিলো, অর্থাৎ প্রথম মানব আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে—এর মাত্র দিন কয়েক পরেই। বাইবেলের এই সৃষ্টি তত্ত্বকে ইসলাম সমর্থন করে। কিন্তু এই সৃষ্টিতত্ত্ব আজ বৈজ্ঞানিক ভাবে প্রমাণিত মিথ্যে।

এখন থেকে প্রায় ২৫০০০ বছর আগে বিশুদ্ধ আধুনিক মানুষ ক্রোম্যাগনন্ মানুষ

বা Homo Sapiens)-এর উদ্ভব। তার আগে পর্যন্ত বহু হাজার বছর ধরে নিয়ানডার্থাল (Neanderthal) মানুষ পৃথিবীর নানা প্রান্তে টিকে ছিলো। তারা ছিলো শিকারী, গুহায় বসবাস করতো। পরিবার গঠনের প্রাথমিক প্রয়াস তাদের মধ্যেই লক্ষ করা গেছে। তাদের মস্তিষ্ক আধুনিক মানুষের মতো উন্নত ও জটিল না হলেও পূর্ববর্তী যে কোনো মানব প্রজাতির চেয়ে বিকশিত ছিলো। এবং এর সাহায্যে তারা দৈনন্দিন জীবনের অন্যান্য নানা কিছু মতো, জীবনের রহস্য ও মৃত্যুর পরবর্তী অবস্থা সম্পর্কে জানার চেষ্টা করা অথবা এ ব্যাপারে চিন্তা করতে পারার প্রচেষ্টায় তারা সফল হতে পেরেছিলো বলেই মনে হয়। কারণ মাটি খুঁড়ে তাদের কবরের গুহা ও গহ্বর থেকে এমন প্রমাণ পাওয়া গেছে যা থেকে স্পষ্ট ধারণা করা যায় যে, মৃত্যুর পরেও যাতে মৃতব্যক্তির কোনো অসুবিধা না হয় তার জন্য দৈনন্দিন প্রয়োজনের কিছু দ্রব্যাদি শবের সঙ্গে রেখে দেওয়ার পদ্ধতি তারা অনুসরণ করতো। মৃত শরীরকে নষ্ট না করে বা অবহেলায় ফেলে না রেখে কবর দেওয়ার ব্যাপারটিও ছিলো অভিনব ও যুগান্তকারী একটি আবিষ্কার। আর এভাবেই মৃত্যু-পরবর্তী 'প্রাণ' বা প্রাণের কারণ হিসেবে 'আত্মা' জাতীয় কোনো একটি কিছুর সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা যে তারা ধীরে ধীরে শুরু করেছিলো তা বোঝা যায়।

মানুষের লিখিত ইতিহাসের বয়স মাত্র ৫০০০ বছর। ৭/৮ হাজার বছর ধরে সে ধাতু ব্যবহার করছে। তার আগে লক্ষ লক্ষ বছর আদিম মানুষ পাথরই ব্যবহার করতো, তখন তাদের ধর্মচেতনাও ছিলো অনুক্রম ভাবে আদিম। কিন্তু ধর্মের প্রাথমিক উপাদান ৪০/৫০ হাজার বছর আগে নিয়ানডার্থাল মানুষের চেতনাতেই উদ্ভাসিত হয়। সম্ভবত তারাই প্রথম আত্মা, অলৌকিক শক্তি, অতীন্দ্রিয় শক্তি ইত্যাদি ধারণার ভিত্তি সৃষ্টি করে। আত্মার আদিম ধারণাই হাজার হাজার বছর পল্লবিত হয়েছে ওই আদিম মানুষের মনে। আর সেটাই বহু সহস্র যুগ নিয়ানডার্থাল থেকে বিভিন্ন গোষ্ঠী ও শ্রেণীর বংশ পরম্পরার ধারাবাহিকতায় ক্রম বিবর্তনের ফলে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা, তথা প্রাণের সৃষ্টিকর্তা ও সমস্ত আত্মার উৎস-স্বরূপ এক পরমশক্তি বা পরমেশ্বরের ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। পৃথিবীতে ধর্মগুলোর সৃষ্টি হয়েছে বড় জোর বিগত ২ থেকে ৪ হাজার বছরের মধ্যে। এখনো অঙ্গি পাওয়া বৈজ্ঞানিক তথ্যের ভিত্তিতে এটি জানা গেছে, মানুষের মনে ধর্মবিশ্বাস সৃষ্টি হয়েছিলো এখনকার মানুষের পূর্বসূরী নিয়ানডার্থাল মানুষের আমলে-যারা পৃথিবীতে ছিলো এখন থেকে প্রায় আড়াই লক্ষ থেকে ৪০/৫০ হাজার বছর আগে Mousterian Period, Pleistocene epoch-এর একটি অংশ। তখন শাসক-শাসিত শ্রেণীবিভাগ ছিলো না। মানুষ নিছক তার অনুসন্ধিৎসার ফলে, অজ্ঞতা ও অসহায়তার কারণে তার 'উন্নত' কল্পনাশক্তির সাহায্যে তথাকথিত আদি ধর্মের সৃষ্টি করেছে। তখনকার পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে এটি ছিলো একটি উন্নততর বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া। ধর্মকে শাসকশ্রেণীর অপব্যবহারের কাজ, যা ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি হয়েছে, সেটা

অনেক অনেক পরের ব্যাপার। নিয়ানডার্থাল মানুষের আগের স্তর অর্থাৎ পিথেকানথ্রোপাস (Pithecanthropus erectus) বা সিনানথ্রোপাসদের (Sinanthropus Pekinensis) মধ্যে ধর্মাচরণের কোনো নিদর্শন পাওয়া যায়নি। তখনকার মানুষের মস্তিষ্ক তথা চিন্তা করার ক্ষমতা এতোটা উন্নত ছিলো না, যার সাহায্যে ধর্ম ও অতিপ্রাকৃতিক শক্তি জাতীয় উন্নততর চিন্তা করা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যেতো। মানুষকে তখন স্থূল জৈবিক প্রয়োজনেই প্রকৃতির প্রতিকূল অবস্থা ও জীব-জন্তুদের সঙ্গে নিরন্তর সংগ্রাম করে টিকে থাকতে হয়েছে। নিতান্তই ব্যবহারিক প্রয়োজনে তাদের চেতনা ব্যতিব্যস্ত ছিলো। প্রাণ ও প্রকৃতির রহস্য উন্মোচন করা সম্ভব হয় নি। কিন্তু হাজার হাজার বছরের অস্তিত্বের মাধ্যমে তাদের মস্তিষ্ক ধীরে ধীরে বিকশিত হয়েছে, জীবনযাত্রা রূপান্তরিত হয়েছে, পথ পরিষ্কার হয়েছে নিয়ানডার্থালদের সৃষ্টির। ধর্ম আলোচনার প্রসঙ্গে নিয়ানডার্থাল মানুষের আগেকার ঐ অবস্থাকে বিজ্ঞানীরা বলেন প্রাকধর্মীয় অবস্থা (Pre-religion Stage)। এরপর উদ্ভব হয় নিয়ানডার্থাল মানুষদের, পৃথিবীতে তখন চতুর্থ হিমযুগ চলছে। ১৮৫৬ সালে জার্মানির ডুসেলডর্ফের কাছে নিয়ান্ডার উপত্যকায় পাওয়া গেলো এই ধরনের ভিন্নতর ও উন্নততর মানুষের অসম্পূর্ণ কঙ্কাল। তার আগে জিব্রাল্টারেও অবশ্য এ ধরনের একটি কঙ্কাল পাওয়া যায়। পরে ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, ইতালী, স্পেন, রাশিয়া, পোল্যান্ড, ক্রিমিয়া, এশিয়া মাইনর, প্যালেস্টাইন, সিরিয়া, ইরাক, উত্তর আরবের মরুভূমি অঞ্চল, উত্তর আফ্রিকা, চীন ইত্যাদি বহু অঞ্চলে, এ ধরনের মানুষের কঙ্কাল, কবর ও অন্যান্য নানা নিদর্শন পাওয়া গেছে।

ক্রোম্যাগন মানুষের মতো বুদ্ধিমান মানুষের অস্তিত্বের পর্যাপ্ত ও সঠিক প্রমাণ বিজ্ঞানের হাতে এখন মজুত আছে। আজ এ সব তথ্য-প্রমাণের ভিত্তিতেই একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাবের কাল ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত গল্প-কথার প্রথম আদম সৃষ্টির সময়কালের চেয়েও অনেক-অনেক বেশি প্রাচীন। মজার ব্যাপার হলো এই মানুষ সম্পর্কে বাইবেলেই রয়েছে উল্টোপাল্টা, স্ববিরোধী কথাবার্তা। অস্ট্রেলিয়ার ‘র্যাশনালিস্ট এসোসিয়েশন অব নিউ সাউথ ওয়েলস’ বাইবেল থেকে এমন পরস্পরবিরোধী বহু উদাহরণ প্রকাশ করেছেন। এখানে কেবল মাত্র মানুষ সম্পর্কিত বাইবেলের ৬টি স্ববিরোধী উক্তি উল্লেখ করা হলো—

১. মানুষ সৃষ্টি হওয়ার আগে গাছ এলো (জেনেসিস ১ : ১১-১২) মানুষ তৈরি হওয়ার পর গাছ সৃষ্টি হলো (জেনেসিস ১ : ৭-৯)
২. জন্তু জানোয়ারদের পরে মানুষ সৃষ্টি হলো (জেনেসিস ১ : ২৫-২৬) জন্তু জানোয়ারদের আগে মানুষ সৃষ্টি হলো (জেনেসিস ২ : ১৮-২০)

৩. আদম জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাওয়ার দিনই মরবে (জেনেসিস ২ : ১৭) আদম ৯৩০ বছর বেঁচেছিল (জেনেসিস ৫ : ৫)
৪. ঈশ্বর মানুষকে লোভ দেখান না (জেমস ১ : ১৩) ঈশ্বর মানুষকে লোভ দেখান (জেনেসিস ২২ : ১/২ স্যামুয়েল ২৪ : ১)
৫. কোনো মানুষ ঈশ্বরকে দেখেনি বা দেখতে পারেনা (জন ১ : ১৮/১ টিম ৬ : ১৬) অনেকের কাছেই তিনি দেখা দিয়েছেন (জেনেসিস ২৬ : ২/ এক্সোডাস ২৪ : ৯-১০, ৩৩ : ২২-২৩)
৬. কেউই ঈশ্বরের মুখ দর্শন করার পর বেঁচে থাকতে পারে না (এক্সোডাস ৩৩ : ২০) জেকব ও মুসা দু'জনেই ঈশ্বরকে মুখোমুখি দেখেছেন কিন্তু মরেন নি (জেনেসিস ৩২ : ৩০ এক্সোডাস ৩৩ : ১১)

বাইবেলের আরো যে বিখ্যাত অপবৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাটি মিথ্যে প্রতিপন্ন হয়েছে তা হলো পৃথিবী সম্পর্কিত তত্ত্ব। বাইবেল ও কোরানের ভাষ্য অনুযায়ী পৃথিবী স্থির। কিন্তু আমরা এখন নিশ্চিত, পৃথিবী স্থির নয়। সে ঘুরছে। আজ থেকে চারশ বছর আগে খ্রীষ্টধর্মের পাণ্ডা-পুরুতগণ ব্রুনোকে ক্রুশে বেঁধে জীবন্ত পুড়িয়ে মেরেছিলেন কেবলমাত্র এই অপরাধের জন্য যে, তিনি এরিস্টটলের তত্ত্বকে অস্বীকার করে কোপার্নিকাসের (The Revolution of the Heavenly Bodies)—গ্রন্থের মতবাদকে সমর্থন করে বলেছিলেন, সূর্য নয়, এই পৃথিবীটাই ঘুরছে সূর্যের চারপাশে। এটা ছিলো বাইবেলে বর্ণিত পৃথিবীতত্ত্বের সম্পূর্ণ বিপরীত বা বিরোধী মতবাদ।

এখানে এ বিষয়ে একটি কথা বলে নেওয়া অত্যন্ত জরুরী যে, কোপার্নিকাসেরও দু'হাজার বছর আগে মানব সভ্যতার কিছু কিছু সম্প্রদায়ের মধ্যে এ ধারণা প্রতিষ্ঠিত ছিলো যে, পৃথিবী বৃত্তাকার, সে একটি গ্রহ এবং ঘূর্ণায়মান। আয়োনিয় সভ্যতার কথা এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গ্রীক সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাসকে তিনটি সুস্পষ্ট স্তরে ভাগ করা চলে-আয়োনিয়, এথেনীয় ও হেলেনীয় যুগ। এ তিনের মধ্যে বিজ্ঞান ও বস্তুবাদের চরম উৎকর্ষের দাবি রাখে আয়োনিয় সভ্যতা। আয়োনিয় যুগ খ্রীস্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে খ্রীস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর শুরু পর্যন্ত বিস্তৃত ছিলো। আয়োনিয় সভ্যতাতেই প্রথম ঘটেছিলো বস্তুবাদের উন্মেষ। খ্রীস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে আয়োনিয়ার মাইলেটাস ছিলো গ্রীক জগতের বাণিজ্যের শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র এবং সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ অঞ্চল। এখানে এসময় জ্ঞান-বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব বিকাশ ঘটে। যাকে অনেক ভাববাদী ঐতিহাসিকগণ অলৌকিক বলে

অভিভাব করেছেন। কিন্তু গভীরভাবে বিচার করলে দেখা যাবে আয়োনিয়ার যে প্রাতিভার প্রকাশ ঘটেছিলো তা অলৌকিক কিছু তো নয়ই, আকস্মিকও নয়। গ্রীক সভ্যতা ছিলো পূর্বাগামী প্রাচ্য সভ্যতার অনুবৃত্তি। গ্রীক বৈজ্ঞানিক তৎপরতার ভিত্তি দীর্ঘকাল ধরে রচিত হয়েছিলো মিশর ও ব্যাবিলনিয়ার। ভৌগোলিকভাবেও মাইলেটাস ছিলো প্রাচীন সভ্যতাগুলোর নিকটবর্তী। মিশরের মাঝে জলপথে এবং ব্যাবিলনের সঙ্গে স্থলপথে এর যোগাযোগ ছিলো। বস্তুতঃ গ্রীক ঐতিহ্য ও দার্শনিকগণ যে প্রাচ্য সভ্যতার কেন্দ্রগুলো ভ্রমণ করতেন তা নিশ্চিত ধারণা করার সম্ভব কারণ আছে। আর এই আয়োনিয়াতেই তিনশ' বছর আগে হোমার যে দর্শনীয় সংস্কারহীন মুক্ত চিন্তাধারার সৃষ্টি করেছিলেন, তা আয়োনিয় বিজ্ঞানের উৎপত্তি ভাবগত পটভূমি হিসেবে কাজ করেছিলো। আয়োনিয়াতে যে বিজ্ঞান ভূমিষ্ঠ হয়েছিলো, সে বিজ্ঞান হলো, অধ্যাপক বেঞ্জামিন ফ্যারিংটনের ভাষায়—‘একটি বিজ্ঞানমনস্ক নবীন জাতির স্বাভাবিক কর্মতৎপরতা, একটা বলিষ্ঠ মানবতাবোধ এবং একটা বিশ্বজনীন সংস্কৃতির মিলিত ফল।’ আয়োনিয় যুগ বিজ্ঞান ও দর্শনের ইতিহাসে মানুষের এক গৌরবময় অধ্যায়। আয়োনিয় দর্শন ছিলো বস্তুবাদী দর্শন।

কিন্তু আয়োনিয়দের এই বিজ্ঞানচর্চার মুক্ত পরিবেশ স্থায়ী হয়নি। আজ থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে আয়োনিয় সভ্যতা বিলুপ্ত ঘটে। পারসিক আক্রমণে আয়োনিয়ায় রাজনৈতিক ও সামাজিক গোলাযোগ দেখা দেয়। এর ফলে সেখানকার বৈজ্ঞানিক দার্শনিক পণ্ডিতগণ বাস্তুহারা হয়ে পড়েন। মানব সভ্যতার জ্ঞান-বিজ্ঞানচর্চায় সবচেয়ে উজ্জ্বল সভ্যতা আয়োনিয়া হয়ে পড়ে মৃত!

জ্যোতির্বিজ্ঞানে আয়োনিয়রা ২৬০০ বছর আগেই এমন উন্নতি সাধন করেছিলো যা আজ ভাবলে বিস্ময়ে হতবাক হতে হয়। আজ আমরা মানুষেরা পৃথিবী নামক শ্যামল গ্রহে বসে চাঁদ এবং মঙ্গলকে বসবাসের উপযোগী করে গড়ে তোলার যে পরিকল্পনা করছি, যে স্বপ্ন দেখছি, সেই মানুষেরা তাদের জ্ঞানের সংগ্রাম শুরু করেছিলো লক্ষ বছর আগে। তারপরও তথাকথিত ঈশ্বর, দেবতাদের প্রভাবকে এড়িয়ে, একটি সাধারণ নিয়মের মাধ্যমে পদার্থ ও বিশ্বকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা প্রথম হয়েছিলো আয়োনিয়াতে-থেলিস, অ্যানাক্সিম্যান্ডার, অ্যানাক্সিমেনিস, হিরাক্লিটাস, পিথাগোরাস, ডেমোক্রিটাস, এমপিডক্লাস, অ্যানাক্সাগোরাসের মতো বিজ্ঞানীদের হাতে। তাঁরা বলেছিলেন সবকিছু পরমাণু দিয়ে তৈরি, মানব প্রজাতি বা অন্যান্য প্রাণীদের উদ্ভব ঘটেছে খুবই সরল অবস্থা থেকে, এ কোনো ঈশ্বর বা দেবতাদের কারসাজি নয়, পৃথিবী শুধুই একটি গ্রহ যা সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘোরে আর নক্ষত্রেরা অনেক দূরে। তারাই ছিলেন সভ্যতার, উন্নতির এবং মানবিকতার প্রথম পথিক, তাঁরা ছিলেন কৃষকের, নাবিকের, তাঁতীদের সন্তান। এঁদের হাতে ছাব্বিশশো বছর আগে বিজ্ঞানের জন্ম হয়েছিলো। তারপরেও তাদের ধ্বংস হয়ে যেতে হয়েছে কোনো

ধারাবাহিকতা না রেখে। এর শত বছর পরে অনেকটা একই ভাবে, তবে আরো সুসংগঠিত চিন্তা আর কসমোপলিটন স্বপ্ন নিয়ে জেগে উঠেছিলো ভূমধ্যসাগরের তীরে আলেক্সান্দ্রিয়া। তাঁরা পৃথিবীর পরিধি পরিমাপ করেছিলেন, স্টীম ইঞ্জিন উদ্ভাবন করেছিলেন। এখানে কাজ করেছিলেন ইরাটোস্থেনিস, ইউক্লিড, আর্কিমিডিস, অ্যারিস্টোকার্স, হাইপেশিয়াস মতো মহাকাশের প্রতিভারা। এখানেই গড়ে উঠেছিলো বিশ্বের সর্ববৃহৎ গ্রন্থাগার। কিন্তু তাদেরকেও ধ্বংস হয়ে যেতে হয়েছিলো রাজনৈতিক ও ধর্মীয় উন্মাদনার করালগ্রাসে কোনো ধারাবাহিকতা না রেখে। পর্যায়ক্রমে রোমান, খ্রীস্ট ও ইসলাম ধর্মের বর্বররা তাদের ধর্মীয় উন্মাদনায় পুড়িয়ে দিয়েছে আলেক্সান্দ্রিয়া গ্রন্থাগারের হাতে লেখা পাঁচ লক্ষাধিক বই। এর ফলে নেমে এসেছিলো মধ্যযুগীয় অন্ধকার, আমরা পিছিয়ে গিয়েছিলাম দেড় হাজার বছর। আলেক্সান্দ্রিয়া গ্রন্থাগারে ব্যাবিলনের এক ধর্মযাজকের লেখা একটি গ্রন্থে ওল্ড টেস্টামেন্টে উল্লেখিত সময়পঞ্জির চেয়ে শতগুণ পুরাতন সময়ের ইতিহাস ছিলো- প্রায় ৪ লক্ষ ৩২ হাজার বছর পূর্বের। কী লেখা ছিলো সেই গ্রন্থে? এই প্রশ্নের উত্তরকে পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছে ধর্মীয় সাম্রাজ্যবাদের বর্বর পাণ্ডা-পুরুতগণ। তারপর অনেক অনেক যুগ পেরিয়ে এসে কোপার্নিকাস, কেপলার, গ্যালিলিওর মতো পণ্ডিতদের অনেক কিছুই পুনঃআবিষ্কার করতে হয়েছিলো।

কোপার্নিকাসের পুনঃআবিষ্কারকেই ব্রুনো সান্তোরীকতার সঙ্গে প্রচার করেছিলেন, নিকোলাস কোপার্নিকাস নিজে যা করতে পারেন নি ধর্মীয় গুণ্ডাদের ভয়ে। আর সেটাই করেছিলেন বিজ্ঞানের নির্ভুল সত্য প্রচারের নির্ভীক সৈনিক এবং প্রথম শহীদ জিওর্দানো ব্রুনো। এটাই ছিলো তাঁর অপরাধ। এ জনাই তাঁকে ধর্মীয় উন্মাদরা ইতালীর পিয়ম্বো নগরে দীর্ঘ আট বছর বন্দি করে রেখেছিলেন এমন একটি ঘরে যার ছাদ ছিলো সীসে দিয়ে তৈরি। গরমের সময় ঘরটি হয়ে উঠতো প্রায় অগ্নিময় আর শীতকালে বরফের মতো হিমশীতল। বিচারের সময় ব্রুনো ধর্মযাজকদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন ‘শান্তির কথা শুনে আমি যতোটা ভয় পেয়েছি তারচেয়েও অনেক বেশি ভয় পেয়েছে তোমরা’। ১৬ জন প্রধান ধর্মযাজক তাঁর মৃত্যুদণ্ড রায়ের ঘোষণায় বলেন, ‘পবিত্র গীর্জার আদেশে পাপী ব্যক্তির একবিন্দু রক্তও নষ্ট না করে প্রাণদণ্ড কার্যকর করতে হবে’। ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারিতে রোমে ব্রুনোর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয় তাঁকে ক্রুশে বেঁধে, প্রকাশ্য দিবালোকে, অগ্নিদগ্ধ করে!

ব্রুনো কোপার্নিকাসের চিন্তাকে আরো প্রসারিত করেছিলেন। ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন, কতোগুলো গ্রহ সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘুরছে, পৃথিবীও সেই গ্রহগুলোর একটা। আরো অনেক গ্রহ আবিষ্কৃত হবে এটাই সৌরজগৎ। দূরের নক্ষত্রগুলোও এক একটি সূর্যের মতো, তাদেরও অনেকেরই আছে গ্রহ কিংবা গ্রহমণ্ডলী। শুধু পৃথিবীই নয়, সূর্যও ঘুরছে তার আপন মেরুতে। এই বিশ্ব অসীম। এর কেন্দ্রে বা প্রান্তে কিছু আছে এ কথা বলা অর্থহীন।

পৃথিবী যে স্থির নয়, সে যে ঘুরছে, এ কথা আজ বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত সত্য। কোরানের মতবাদই বিজ্ঞানে সঠিক প্রমাণিত হয়েছে। মিথ্যে হয়ে গেছে বাইবেলের গমান। এতো গেলো ইসলাম পূর্ব বাইবেলের মিথ্যাচার। কিন্তু ইসলাম, মাত্র ১৪০০ বছরের নির্ভুল, আধুনিক (!) ধর্ম? সে বাইবেলের একই ভুলকে কী করে প্রশ্রয় দেয়? ইসলামের আল্লাহ যদি জ্ঞানে-বিজ্ঞানে সর্বজ্ঞানের জ্ঞানীই হন তাহলে তিনি কী করে বাইবেলের মিথ্যে বর্ণনাকে সমর্থন করতে পারেন? কোরানের ২৭ : ৬১ ও ৩০ : ২৫ পঙক্তিতে স্পষ্ট উল্লেখ আছে, পৃথিবী স্থির।

১৯৯০-এ কলকাতার মল্লিক ব্রাদার্স থেকে প্রকাশিত জনৈক মুহম্মদ নূরুল ইসলাম তাঁর 'পৃথিবী নয় সূর্য ঘোরে' নামক গ্রন্থে কোরানের ১১টি সুরার ১২টি পঙক্তি দ্বারা জোরজবরদস্তি প্রমাণ করতে চেয়েছেন-পৃথিবী অনড়, স্থির। তাঁর মতে পৃথিবী যদি সত্যি সত্যি ঘুরতো তাহলে আমরা সমস্ত জীবজন্তু উড়ে উড়ে হটকে পড়ে ছিন্নভিন্ন হয়ে যেতাম, আর গাছপালা-দালান-কোঠা পাহাড়-পর্বত সব ভেঙেচূড়ে তছনছ হয়ে যেতো! তাঁর এই অপবৈজ্ঞানিক ধারণাকে আজ কোনো বিজ্ঞানমনস্ক মানুষের পক্ষেই মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। একে ধর্মীয় অন্ধত্বের উন্মাদনা ছাড়া অন্য কিছু ভাবা যায় না। এসমস্ত উন্মাদদের গাঁজাখুরি অপব্যর্থ, এবং বাইবেল, কোরানের পৃথিবীর অনড়ত্বকে মিথ্যে প্রমাণিত করে আমাদের শ্যামল পৃথিবী নামক গ্রহটি ঘুরেই চলেছে সেকেন্ডে সূর্যের চারিদিকে ১৬ মাইল বেগে। আর সূর্য অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহকে নিয়ে ছুটে চলেছে আন্তঃনাক্ষত্রিক শূন্যতা মধ্য দিয়ে সেকেন্ডে ৪২ মাইল গতিতে। এবং এইভাবে পুরো মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সিকে একবার ঘুরে আসছে ২৫ কোটি বছরে। কি স্বপ্নের মতো এই বিজ্ঞান, অথচ শ্রদ্ধা বাস্তব এবং সত্য। আর কি চকমকে সত্যের মতো মানুষের এই ধর্মচেতনা ও ঈশ্বর-বিশ্বাস, যা আসলেই অবাস্তব ও অলীক।

AMARBOL.COM

সরস্বতী ও শিক্ষা

সুকুমারী ভট্টাচার্য

দেশের জনসাধারণকে পুরোপুরি কৃষ্ণিগত করবার একটা দীর্ঘকালীন কর্মসূচী হল শিক্ষাব্যবস্থায় কিছু গভীর ও ব্যাপক পরিবর্তন প্রবর্তন করা, যাতে পরবর্তী প্রজন্মগুলি কতগুলো ভ্রান্ত ধারণা আত্মসাৎ করে। এই ধারণাগুলি কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত সরকারের অনুকূলে বলে সরকার স্থায়িত্ব পেতে পারে এবং সাধারণ মানুষের মন চিন্তারহিত ও যান্ত্রিক হয়ে ওঠে, যাতে যন্ত্র সরকারেরই স্বার্থ সিদ্ধি করে চলে। এ ধরনের চেষ্টা নাৎসি জার্মানিতে, ফ্যাসিস্ত ইতালিতে করা হয়েছিল। গত কয়েক বছর ধরে ভারতবর্ষে এ চেষ্টা চলছে। মুশকিল দুটো—প্রথমত, দেশবাসীর খুব নগণ্য ভগ্নাংশ মাত্র শিক্ষিত, ফলে ঐ শিক্ষার প্রভাবের সরাসরিভাবে আক্রান্ত হবে সামান্য কিছু লোক। দ্বিতীয়ত একটা ইংরেজি কথা আছে : কিছু মানুষকে কিছু কালের জন্য ধোঁকা দেওয়া যায়, সব মানুষকে চিরকালের জন্য ধোঁকা দেওয়া যায় না ; ফলে মানুষকে পুরোপুরি যন্ত্রে পরিণত করা যায় না বলেই, কিছু ব্যতিক্রমী মানুষ বরাবরই প্রশ্ন করবে, অস্বীকার করবে, প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ করবে।

তবু চেষ্টার শেষ নেই। নতুন শিক্ষানীতি প্রবর্তনের জন্য বহু আয়োজন চলছে, নিজেদের খেয়ালখুশিতে পাঠ্যবই রচনা করা হচ্ছে। এখনো গণতন্ত্রের যেটুকু শক্তি অব্যাহত আছে তার ফলে ‘শিব ঠাকুরের আপন দেশ’ উত্তরপ্রদেশেই সেখানকার সরকারের আপত্তিতে নবম ও দশম শ্রেণীর চারটি পাঠ্যপুস্তক তুলে নেওয়া হয়েছে, কারণ, ন্যাশনাল সিন্ডিকেট কমিটি বলেছিল, এগুলিতে ‘আপত্তিজনক বিষয়’ অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল ; এর মধ্যে দু’টি ইতিহাসের বই, দু’টি গণিতের। এন সি ই আর টি ১৯৯৬ সালে ৬০০০ স্কুল পরিদর্শন করে। এগুলিতে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ১২,০০,০০০ এবং শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা ৪০,০০০। সমীক্ষার আপত্তির কারণ হল, ‘(এই স্কুলগুলির পাঠ্যগ্রন্থ) তরুণ মনে জ্ঞান ও সংস্কৃতি সঞ্চার করার নামে সঙ্কীর্ণতা ও ধর্মীয় গোঁড়ামি সঞ্চারিত করার উদ্দেশ্যেই রচিত।’ (...designed to promote bigotry and religious fanaticism in the name of inculcating knowledge and culture in the young minds.) ‘বিদ্যাভারতী’ নামে সরকার স্বীকৃত যে বিদ্যালয়গুলি চলে সেগুলির জেনারেল সেক্রেটারি দীননাথ বাট্রার হিসাব মতে, এ সংস্থার অধীনে ১৪,০০০ স্কুল নার্সারি, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের, এগুলির

ছাত্র সংখ্যা ১৮ লক্ষ, মিজোরাম ছাড়া অন্য প্রদেশগুলিতে এ স্কুলগুলির শিক্ষক সংখ্যা ৮০,০০০। এদের অধীনে ৬০টি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়, এছাড়াও ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের ২৫টি অন্য শিক্ষায়তন ; জয়পুর ও আহমদনগরে দু'টি শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। কেন্দ্রীয় মধ্যশিক্ষা পর্যদের অনুমোদিত ৫০০০ প্রতিষ্ঠান, বাকি ৫০০০ অনুমোদন পায়নি। এগুলির অধিকাংশই বি জে পি শাসিত রাজ্যে। এসব বিদ্যালয়ে সাধারণ পাঠ্যবই ছাড়াও একটি 'বীজ পাঠ' (core curriculum) অবশ্যপাঠ্য—এর মধ্যে আছে ব্যায়াম, যোগ, সঙ্গীত, সংস্কৃত, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা, সংস্কৃতি জ্ঞান। এর মধ্যে ব্যায়াম ও যোগ স্বাস্থ্যকর, বাকিগুলি সম্বন্ধে নানা সংশয়, পরে আলোচনা করছি। 'সংস্কৃতি জ্ঞান' ও 'সংস্কৃতি জ্ঞান প্রশ্নোত্তরী' নিরীক্ষা করে এন সি ই আর টি'র অভিমত দিয়েছেন ;—এতে তথ্যবিকৃতি আছে।

এতে আছে ১৫২৮ থেকে ১৯১৪ সালের মধ্যে বাবরি মসজিদের স্থানে অবস্থিত রামমন্দির ৭৭ বার আক্রান্ত হয়েছে। সাড়ে তিন লক্ষ হিন্দুভক্ত প্রাণ দিয়েছে মন্দির রক্ষার জন্য। এর সবটাই গাঁজাখুরি, তা সকলেরই এমনকী লেখকেরও অজানা নয়। আরও আছে—১৯৯০ সালে ২ নভেম্বর বাবরি মসজিদ ভাঙার অভিযান পুলিশ ব্যর্থ করে, ঐ দিনটি তাই 'কালো দিন'। ৬ই ডিসেম্বর ১৯৯২ 'উজ্জ্বল দিন' নিশ্চয়ই? নতুন চমকপ্রদ খবরও আছে : ভারত ভাগ হয়েছিল খ্রীষ্টানদের ষড়যন্ত্রে! এই সবই ছাত্রদের মুখস্থ করতে হয়। ক্রমে তাদের মন এ ধরনের ভ্রান্ত বিশ্বাসে লালিত হয়ে, সত্য ও তথ্য থেকে দূরে সরে যায়।

সারা দেশে বিদ্যাভারতীর পাঠ্যক্রম একই। যদিও স্কুলগুলির ভিন্ন ভিন্ন নাম, অঞ্চলের পরিবেশ অনুযায়ী। গোলওয়ালকর ১৯৪৬ সালে কুরুক্ষেত্রে 'গীতা সিনিয়র স্কুল' স্থাপন করেন ; ইচ্ছে ছিল, ঐরকম আরও স্কুল করার, কিন্তু '৪৮ সালে গান্ধী হত্যার পর রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘ বেআইনি হয়ে যাওয়ায় সেগুলো আর হয়ে উঠল না।

১৯৫৬ সালে গোরখপুরে 'সরস্বতী বিদ্যামন্দির' স্থাপিত হয়, পরে ক্রমান্বয়ে ইতস্তত নানা অঞ্চলে এই ধরনের স্কুল চক্রবৃদ্ধিহারে বেড়ে উঠতে থাকে, বেশির ভাগই অনুন্নত অঞ্চলে ও জনগোষ্ঠী প্রধান এলাকায়। এই স্কুলগুলিই হিন্দুত্ব শিক্ষার ঘাঁটি। 'কালচার অ্যান্ড সিভিলাইজেশন্ অব দ্য মোংল পিরিয়ড'-নামক পাঠ্যগ্রন্থ থেকে বাবরের উদারনীতির ওপরে একটি পুরো পরিচ্ছেদ ছেঁটে দিয়েছে সঙ্ঘ। রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘের বই 'Vision of Action' বলে যৈ, খ্রীষ্টানরা এই সব পশ্চাৎপদ ও জনগোষ্ঠী-প্রধান এলাকায় বেশি সক্রিয়, তাই এসব অঞ্চলেই সঙ্ঘের ঘাঁটি হওয়া দরকার।

খ্রীষ্টান, মুসলিম ও কম্যুনিষ্ট—সঙ্ঘ পরিবারের এই তিনটিই প্রধান শত্রু। কাজেই এই ত্রিপুরদহনের উদ্যোগ এদের সমস্ত ক্রিয়াকলাপে সূনিয়ন্ত্রিত। তাই

কমিউনিস্ট-প্রধান কেরলের কালেক্টেটে প্রথমে ১০ হেক্টর জমিতে ও ক্রমে ক্রমে ১৭৪ হেক্টর জমিতে ১২০টি ‘সরস্বতী শিশু বিদ্যালয়’ স্থাপিত হয়। এগুলিতে চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত পড়ানো হয়। বাকিগুলো ‘ভারতীয় বিদ্যানিকেতন’ সেগুলিতে সপ্তম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত পড়ানো হয়। কেরলের চারটি জেলায় ৭টি স্কুল; যেহেতু এসব অঞ্চলে খ্রীস্টান ও মুসলমানরাই সংখ্যায় বেশি তাই এ স্কুলগুলিতে ইংরেজি মাধ্যমে CBSE পাঠ্যক্রমই পড়ানো হয়; বাকিগুলোতে মালয়ালম মাধ্যমে রাজ্যের নির্দিষ্ট পাঠ্যক্রম অনুসরণে এগুলিতে চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত পড়ানো হয়। এসব স্কুলের শতকরা নব্বই জন শিক্ষিকাকেই পাঁচ মাস ধরে একটা পাঠ নিতে হয় : ভারতীয় ঐতিহ্য, সংস্কৃতি এবং ‘হিন্দু শিক্ষাপ্রণালী’তে। এসব স্কুলে ক্লাস শুরু হয় সরস্বতীবন্দনা দিয়ে। আগে যে ‘বীজ পাঠ’-এর কথা বলা হয়েছে তার প্রয়োগের জন্যে এসব শিক্ষায় কোন ছাত্র কতটা এগোল তার দৈনিক হিসাব স্কুলে রাখা হয়। স্কুলগুলি রাজ্য সরকার দ্বারা অনুমোদিত নয়, এখানকার ছাত্ররা রাজ্য পরিচালিত স্কুলে বা CBSE’র স্কুলে প্রাইভেট ছাত্র হিসাবে পরীক্ষা দেয়। বিদ্যানিকেতনের মোট ১৩০০ শিক্ষিকার প্রায় সকলেই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সদস্য।

তামিলনাড়ুতে সরাসরি ‘বিদ্যাভারতী’ স্কুল কমই আছে; সেখানে বেশিরভাগ স্কুলই স্বয়ম্ভর (Autonomous) অস্থির (Trust) অধীন; আর আছে ‘তামিল কলবি কাজাগম’ বা ‘বিবেকানন্দ বিদ্যালয়’। কোথাও কোথাও অঞ্চলের প্রধান জাতি স্কুল তৈরি করে। দ্রাবিড় প্রভাবে কোনো কোনো অঞ্চলে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের শক্তি দুর্বল, না হলে হিন্দু দেবমূর্তি ও পূজা পদ্ধতি পুরোপুরিই আছে; লক্ষ্মী, সরস্বতী ও গণেশের মূর্তি বহু স্কুলে দেখা যায়-এগুলির পূজাও হয়। স্কুলে ধর্মীয় বা ধর্মগন্ধী উৎসবই প্রধান—কৃষ্ণজয়ন্তী, বিনায়ক চতুর্থী, দীপাবলী, পোসল ও শিবাজি জন্মোৎসব এর মধ্যে প্রধান। অন্যান্য স্কুলে রাধাকৃষ্ণনের জন্মতিথি ৫ই সেপ্টেম্বরে শিশুদিবস পালিত হয়, এসব স্কুলে হয় কৃষ্ণ জয়ন্তীতে। তামিল ভাষায় রচিত ‘গুরু’ গোলওয়ালকারের জীবনী সপ্তম শ্রেণীতে অবশ্য পাঠ্য। এধরনের স্কুলগুলির ওপরে কর্তৃত্ব করে কন্যাকুমারিকার ‘বিবেকানন্দ কেন্দ্র’, সেখানে শিক্ষকদের জন্যে ‘শিশু বাটিকা ক্যাম্প’ হয়। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের উৎসাহের কেন্দ্রস্থল হল প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি, যেখানে অপরিণত মনের শিশুরা আসে, তখনই হিন্দুত্বে দীক্ষা দেবার মাহেন্দ্র লগ্ন। এবং একাজটি সঙ্ঘ সর্বপ্রয়াসে করে থাকে।

ওড়িশা শহরে ও আধাশহরে সঙ্ঘ বহু ‘সরস্বতী শিশুমন্দির’ স্থাপন করেছে, এগুলিতে ছাত্রদের মাইনে নামমাত্র, শিক্ষার মান অপেক্ষাকৃত উন্নত। স্কুলের শিক্ষকরা ছাত্রছাত্রীদের মা-বাবার কাছে মাসে অন্তত একবার যান। ওড়িশার স্কুলগুলিতে রাজ্য সরকারের পাঠ্যক্রম মেনে চলতে হয়, ফলে সঙ্ঘনীতির অনুপ্রবেশের অবকাশ কম, তাই এদের পত্রিকা ‘রাষ্ট্রদীপ’ ডাকযোগে সব মা-বাবার কাছে যায়। ১৯৬৯ সালেই সঙ্ঘ ‘ভারতীয় শিক্ষণ মণ্ডল’ নামে শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

তৈরি করে প্রথম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত নৈতিক শিক্ষার পাঠক্রম প্রণয়ন করে রাজ্য সরকারের অনুমোদন পাবার চেষ্টা করেছিল। পায়নি। ১৯৭৭-এ যখন জনতা পার্টি ক্ষমতা পেল তখন, শিক্ষামন্ত্রী সমাবেশে সরকার অনুমোদন পাবার আশা চেষ্টা করেছিল, পায়নি, তাই এ শিক্ষাক্রম ওদের নিজেদের স্কুলের মধ্যেই নিবদ্ধ রইল তখন তৈরি হল ‘বিদ্যাতারতী’গুলি যেগুলি পাঠক্রমের তদারক করে ও সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠানগুলির কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করে।

ছাত্রপাঠ্য নিরূপণে ‘কল্প’ নামে নতুন একটি প্রণালী চালু আছে সঙ্ঘপরিবারের পরিচালিত স্কুলগুলিতে। যার ফলে বাধ্যতামূলক অনুষ্ঠান হিসেবে উদ্‌যাপিত হয় রক্ষাবন্ধন, গুরুদক্ষিণা, রামনবমী, দশেরা এবং হেগড়েওয়ার ও শ্যামাপ্রসাদের জন্ম ও মৃত্যুতিথি। এসব স্কুলে দিনের পাঠ আরম্ভের আগেই ‘বন্দে মাতরম্’ এবং সরস্বতীবন্দনা হয়, পরে সরস্বতী মূর্তিকে প্রণাম করা আবশ্যিক। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কোনো কোনো স্কুলে এসবের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ হতে সেগুলিতে আর এসব আবশ্যিক রইল না।

রাজস্থানে স্কুলপাঠ্য ভূগোলের মানচিত্রে পাকিস্তান, বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটান, তিব্বত এবং ব্রহ্মদেশের কিছু অংশ ভারতবর্ষের অন্তর্গত হিসেবে দেখানো হয়েছে, এদেশের নাম ‘পুণ্যভূমি ভারত’। রাজস্থানের ইতিহাসের পাঠ্যগ্রন্থে বলা হয়েছে ইরানের প্রথম অধিবাসীরা ভারতীয় ছিল, বলা হয়েছে চীনদেশে সভ্যতার প্রথম দীপ জ্বালায় ভারতবর্ষ। এদের পাঠ্যগ্রন্থের, প্রশ্নোত্তরীতে আছে ‘রামজন্মভূমিতে প্রথম কোন মুসলিম লুঠ করে?’ ‘এখানে কতবার লুণ্ঠন হয়েছিল?’ উত্তর : ৭৭ বার। ২২-২৩ অক্টোবরের সমাবেশে এখানে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর প্রস্তাব ছিল স্নাতক স্তর পর্যন্ত সংস্কৃত অবশ্যপাঠ্য করতে হবে—সর্বস্তরে বিদ্যাপ্রতিষ্ঠানে সরস্বতীবন্দনা অবশ্য করণীয় হবে—ধর্মবিশ্বাস ও সম্প্রদায় ভেদ নির্বিচারে।

প্রথমত, স্নাতকোত্তর স্তর পর্যন্ত সংস্কৃত অবশ্যপাঠ্য হওয়ার অর্থ বিজ্ঞান, ডাক্তারি, ইঞ্জিনিয়ারিং ইত্যাদি সমস্ত বিষয়ের ছাত্রকে সংস্কৃত পড়তে হবে। কেন? হিন্দু সংস্কৃতি জানবার জন্যে। এটা কী তা নিয়ে মতভেদের প্রচুর অবকাশ আছে, এটা জানা অত্যাবশ্যক কিনা সে নিয়েও। তাছাড়া তার জন্যে সংস্কৃত পড়তে হবে কেন? মাতৃভাষাতেও পড়া যায়। সরস্বতী হিন্দু দেবী। কিন্তু হিন্দুর উপাস্য (সব হিন্দু মূর্তি উপাসনায় বিশ্বাসী নয়) মুসলমান, খ্রীস্টান, শিখ, বৌদ্ধের কাছে সরস্বতী হয় বিমূর্ত কল্পনামাত্র নয় মাটি, পাথর বা ধাতুর পুতুলমাত্র। তাছাড়া এইসব ধর্মে মূর্তি উপাসনা নিষিদ্ধ, সেক্ষেত্রে সরস্বতী বন্দনা তাদের ওপরে চাপিয়ে দেওয়া, বর্বর জুলুম (গণতান্ত্রিক সংবিধানে প্রত্যেক ভারতবাসীর অধিকার আছে আপন মত বা বিশ্বাস অনুসারে জীবন যাপন করবার, অতএব এ জুলুম সংবিধানে স্বীকৃত স্বাধীনতা অপহরণের চেষ্টা এবং সর্বতোভাবে বে-আইনি।

এছাড়া প্রস্তাব আছে, যেসব স্কুল দশ বছর বা তার বেশি চলছে সেগুলি আপনাপনাই সরকারি অনুমোদন পাবে ; এখানে উল্লেখ্য যে তাহলে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সম্বন্ধে বহু বিদ্যালয় এভাবে অনুমোদন পেয়ে যাবে। প্রাথমিক শিক্ষার স্তরে হিন্দু সংস্কৃতির শিক্ষা দিতে হবে ; আবার প্রশ্ন ওঠে, হিন্দু সংস্কৃতিই বিশেষভাবে কেন শেখানো হবে ভারতবর্ষের ভাবী নাগরিককে ? তাকে তো জানতে হবে একটি সংমিশ্র সংস্কৃতিকে যার সংমিশ্রণে নিহিত আছে তার গৌরব এবং ঐশ্বর্য। ছাত্রীদের পাঠ্যসূচীতে গৃহকর্মে শিক্ষা একটি আবশ্যিক বিষয় হবে। কেন ? সে ভাবী গৃহিণী বলে ? ভাবী গৃহকর্তার শিক্ষণীয় কিছু নেই ? বর্তমান শতকে গৃহকর্ম শুধু নারী-শিক্ষণীয় বা করণীয় হবে কেন ? বামপন্থীরা, কংগ্রেস, টি ডি পি, আর জে ডি ও আকালীরা এতে আপত্তি করেন এবং এগুলির মধ্যে অনেকগুলিই বিজেপির সঙ্গে রাষ্ট্রশক্তির অংশভাক্। এমনকী অটলবিহারী বাজপেয়ীও শিক্ষার এই গৈরিকীকরণে সম্মত ছিলেন না। অজ্ঞের শিক্ষামন্ত্রী শ্রীমতী প্রতিভা ভারতী 'জনগণমনে'র বদলে সরস্বতীবন্দনা স্থান দিতে আপত্তি করেন। এই ধর্মীয় জুলুমবাজির প্রতিবাদে পশ্চিমবঙ্গ, কেরল, ত্রিপুরা শুধু নয়, অন্ধ্র, মধ্যপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, কর্ণাটক ইত্যাদি বিভিন্ন প্রদেশের মোট পনেরোটি রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রীরা সরব প্রতিবাদে সভা ছেড়ে চলে যান। ফলে ওদের প্রস্তাবের বেশি বিষাক্ত অংশগুলি আলোচিত হবে না, কেবলমাত্র প্রথম কুড়িটি ধারা আলোচিত হবে এমন আশ্বাস দিয়ে আদবানি আপস করতে চান। ২১ থেকে বাকি ধারাগুলি উপস্থাপনের ভার ছিল কলকাতার এক ব্যবসায়ী আর ডি চিৎলাঙ্গিয়ার, যাঁর সঙ্গে সঙ্ঘের ঘনিষ্ঠতা সুবিদিত।

যে প্রস্তাবগুলি বাতিল হয়ে যায় তার মধ্যে হল, শিক্ষার সব স্তরে শিক্ষা বিষয়ের শতকরা দশ থেকে পঁচিশ শতাংশ হবে ভারতীয় সংস্কৃতির অপরিহার্য অংশ বিষয়ে শিক্ষা ; তৃতীয় থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত সংস্কৃত অবশ্য পাঠ্য ; সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন ; সব স্কুলের সর্বস্তরে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা আবশ্যিক করা ; উচ্চশিক্ষার সকল পাঠ্যক্রমে ও প্রতিষ্ঠানে ভারতীয় দর্শন পাঠ আবশ্যিক। সর্বনিম্ন থেকে সর্বোচ্চ স্তরে শিক্ষা হবে 'ভারতীয়, জাতীয় এবং আধ্যাত্মিক'। কারিগরি বিদ্যাসম্মেত সকল পাঠ্যক্রমে ভারতীয় সংস্কৃতির পাঠ দিতে হবে। এগুলি যে শিক্ষার মান উন্নয়নে, নাগরিকের চেতনাবিস্তারে কিছুমাত্র সহায়তা করবে না তা সহজেই বোঝা যায় ; উপরন্তু অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদেরও সংস্কৃতিবোধ নিজস্ব দর্শন প্রস্থান নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে স্বতন্ত্র বোধ আছে যা ব্রাহ্মণ্যতার থেকে পৃথক এ ব্যাপারটা সম্বন্ধে এসব প্রস্তাবকরা আদৌ অবহিত নন। এ কোন ধরনের সংকীর্ণ আত্মকেন্দ্রিক নাগরিক গড়তে উদ্যত এরা ?

আই সি এইচ আর এবং আই সি এস এস আর, ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞানে গবেষণায় ভারতের সর্বোচ্চমানের দুটি প্রতিষ্ঠানে প্রতিষ্ঠিত পণ্ডিত-গবেষকদের

সরিয়ে অখ্যাত ও অল্পপরিচিত ‘গবেষক’ এনে বসানো হচ্ছে ; এঁদের একমাত্র করণীয় হল, শিক্ষা ও গবেষণার মান নামিয়ে এনে প্রতিষ্ঠান দুটিকে হিন্দু-ধর্ম-বাণিজ্যকেন্দ্রে পরিণত করা। এইসব নবাগতরা আসছেন প্রধানত উত্তরপ্রদেশ ও গুজরাট থেকে, এঁদের বিশেষ যোগ্যতা হল রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। উত্তরপ্রদেশে সঙ্ঘপরিচালিত বহু শিশুমন্দির, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের, প্রতিষ্ঠিত হয়েছে দূর-দূরান্তের গ্রামেও ; গুজরাটেও এ ধরনের স্কুল চালু আছে অনেক জায়গায়। গুজরাট সরকারের একটি বিজ্ঞপ্তি ২৮/৮/৯৮ তারিখের (Gr No. UMS 1295/emr/63/g-1) তপশিলি জাতি ও গোষ্ঠীর ছাত্রছাত্রীর স্কুলে প্রবেশের জন্যে যে সংরক্ষণ বিধান ছিল তা সম্পূর্ণ নাকচ করে দিয়েছে, প্রত্যেক স্কুলকে ছাত্রছাত্রীদের মাইনে ঠিক করবার স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। ছাত্রীদের শিক্ষা যেখানে অবৈতনিক ছিল সেখানে স্কুলগুলিকে অধিকার দেওয়া হয়েছে ইচ্ছামত তাদের বেতন ধার্য করবার (“Each school is free to charge fees for girl students”)। বলা বাহুল্য, বাড়ির মোয়াদের অবৈতনিক শিক্ষা হলেও অধিকাংশ পরিবারই স্কুলে পাঠাত না, বেতন দিতে হলে তো একেবারেই পাঠাবে না ; আর তপশিলি জাতি ও গোষ্ঠীর শিক্ষার সুযোগ একেবারেই ছিল না, সংরক্ষণে কিছু সম্ভাবনা ছিল তাদের লেখাপড়া শেখার, সংরক্ষণ তুলে দিলে সে সম্ভাবনাও ক্ষীণতর হয়ে গেল। শিক্ষক নিয়োগের জন্যে শিক্ষা বিভাগ থেকে ‘আপত্তি নেই’ এই মর্মে একটি চিঠি দরকার হত এতদিন, এই বিজ্ঞপ্তিতে সেটি তুলে দেওয়া হল, ফলে অনুল্লতমানের শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়েও সঙ্ঘপরিবারের লোকেরা শিক্ষক হয়ে আসছে, এতে ছাত্রছাত্রীদের সমূহ ক্ষতি হতে চলেছে। স্বজন-পোষণের মতই এ দুর্নীতি এবং এর প্রভাব সুদূরবিজ্ঞাত, প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে। বিভাগীয় আয়-ব্যয় তদন্ত (audit) উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে, ফলে শিক্ষকরা যে বেতন পান তার চেয়ে বেশি অঙ্কে সই করতে হচ্ছে, এও দুর্নীতির আর একটি ক্ষেত্র। শিক্ষা পুরোপুরি বাণিজ্য হয়ে উঠল এবং সমাজের নিম্নবর্ণের মানুষের বঞ্চিত কায়ম হল।

১৪ই নভেম্বরের স্টেটসম্যানের সংবাদে প্রকাশ সিমলার ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব অ্যাডভান্সড স্টাডিজ-এ রাধাকৃষ্ণ স্মারক বক্তৃতা দেবার জন্যে নোবেল বিজয়ী অধ্যাপক অমর্ত্য সেনকে আমন্ত্রণ করা হয়েছিল, তিনি সে আমন্ত্রণ গ্রহণও করেছিলেন। সহসা কর্তৃপক্ষের মত পরিবর্তন হল, বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিত-বক্তার পরিবর্তে বক্তৃতাটি দিতে বলা হল মুঃলীমনোহর জোশীকে, সঙ্ঘ-সমর্থিত সরকারের শিক্ষামন্ত্রী হওয়া ছাড়া সারস্বত জগতে যাঁর আর কোনো পরিচয় নেই ; ভারতবর্ষের বাইরে যাঁর নামও ‘বিজ্ঞানী’ হিসেবে কেউ জানে না। এই বক্তৃতা আগে দিয়েছেন প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ কে এন রাজ, বিখ্যাত দার্শনিক সাইমন ব্র্যাকবার্ন, লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রীকের অধ্যাপক রিচার্ড সেরাবজি, খ্যাতনামা বিজ্ঞানী এম জি কে মেনন, এঁরা। অর্থাৎ বক্তৃতাটি বিশেষজ্ঞতার সঙ্গে এতকাল

বিজড়িত ছিল। এবার তার জাত গেল। সিমলার ঐ প্রতিষ্ঠানটির বর্তমান পরিচালক জি সি পাণ্ডের সঙ্ঘের সঙ্গে সম্পর্ক সুবিদিত ; সংস্থার বর্তমান ক্রিয়াকলাপও তাই প্রমাণ করে।

এই ধারায় বিদ্যাচর্চার মধ্যে একটি বিশেষ স্থান ইতিহাসের। ভবিষ্যৎ হিন্দুরাষ্ট্র গড়বার নিরিখ তৈরি করবার জন্যে হিন্দুর গৌরবোজ্জ্বল অতীত দরকার ; ইতিহাস যেখানে ভিন্নরকম সাক্ষ্য দেয় সেখানে ইতিহাসকেই ঢেলে সাজাতে হবে ; ছাত্রছাত্রীদের সেই নির্জলা মিথ্যা গলাধঃকরণ করতে হবে, তবেই তারা সে মিথ্যার ভিত্তিতে সরকার-অভিপ্রেত কর্মকাণ্ডে আশানুরূপ ভূমিকা পালন করবে। তাই বিজেপি-চালিত স্কুলগুলির ইতিহাস পাঠ্যগ্রন্থে লেখা হয় বাবরি মসজিদের নিচে রামমন্দির ছিল। প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখনন ভিন্ন সাক্ষ্য দেয়। ১৯৬৯-৮০ প্রত্ন উৎখননেও পণ্ডিতেরা রামমন্দিরের চিহ্নমাত্র খুঁজে পাননি, বরং বাবরি মসজিদ নির্মাণের আগের চারশ বছরে ঐখানে মুসলিম বসবাসের চিহ্নই পেয়েছেন। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের স্বনিযুক্ত ঐতিহাসিক যিনি মসজিদ ভাঙার সময়ে করসেবক ছিলেন, তিনি দাবি করেন যে ভাঙার পরে পাঁচটি কামেরায় মসজিদের ভগ্নভূপে বিস্তর হিন্দু শিল্পের অবশিষ্টাংশ পেয়েছেন ; ক্যামেরাগুলো থেকে সম্পূর্ণ ফাঁকা ফিল্মই বেরিয়েছিল। তখন তিনি বলেন ঐ খণ্ডগুলো 'রামকথাকুঞ্জে' আছে, সেখানে যা প্রাচীন হিন্দু প্রত্নবস্তু পাওয়া গেছে সেগুলি সবই মসজিদ ধ্বংসের বহু আগেকার ; তাই অতবড় ধ্বংসকার্যের কোনো আঁচড়ও কোনোটিতে দেখা যায়নি।

ঐতিহাসিক প্রত্নতাত্ত্বিক বিখ্যাত একে নারায়ণ ও বি বি লাল বলেন, মসজিদের নিচে কোনো হিন্দু প্রত্নবস্তু তো পাওয়া যায়ইনি বরং ১১শ শতক থেকে ১৫শ শতক পর্যন্ত কালের বহু মুসলিম গৃহস্থালীর চিহ্ন পাওয়া গেছে, তার থেকে বোঝা যায়, মসজিদ নির্মাণের চারশ বছর আগে থেকেই ঐ অঞ্চলে ক্রমাগত মুসলিম বসবাস ছিল। তথাপি বিজেপি স্কুলের পাঠ্যগ্রন্থে ওখানে রামমন্দিরের কথাই লেখা থাকছে। ছাত্ররা পড়ছে, মনে রাখছে এবং ভুল শিখছে। অন্তত একটা গোটা প্রজন্মকে এই মিথ্যার মধ্যে লালন করা হচ্ছে ; ঐতিহাসিক সত্যের জায়গা নিয়েছে হিন্দুত্বের অনুকূলে মিথ্যা।

সঙ্ঘ পরিচালিত 'সরস্বতী শিশু মন্দিরে'র চতুর্থশ্রেণীর ইতিহাসের পাঠ্যবই হল 'গৌরব গাথা'। এতে সমগ্র ভারতবর্ষের ইতিহাসকে দেখানো হয়েছে, আলেকজান্ডার থেকে শুরু করে একের পর এক বিদেশী আক্রমণের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের দেশরক্ষার সংগ্রাম হিসেবে। এতে আছে মহম্মদ ঘোরীকে পৃথ্বীরাজ হত্যা করেন, কুতুবমিনার নির্মাণ করেন সমুদ্র গুপ্ত, এটি আদিতে নাকি বিষ্ণুস্তম্ভ ছিল। মুহম্মদ তুঘলক নাকি দিল্লি থেকে দেবগিরিতে রাজধানী সরিয়ে নেন হিন্দুদের ভয়ে! দেবগিরিতে হিন্দু ছিল না? পুরো দিল্লির সুলতান রাজের ইতিহাস নাকি এমন এক

বিদেশী রাজতন্ত্র যার বিরুদ্ধে হিন্দুরা ক্রমাগত যুদ্ধ করেছিল! পঞ্চম শ্রেণীর ইতিহাস পাঠ্যগ্রন্থের নাম 'ইতিহাস গা রহা হৈ', এতে আছে 'মুসলিমরা এদেশে একহাতে কোরান ও অন্য হাতে তলোয়ার নিয়ে এসেছিল; অগণ্য হিন্দুকে বলপ্রয়োগের দ্বারা ধর্মান্তরিত করা হয়েছিল তরবারির। এর বিরুদ্ধে একটি সুদীর্ঘ ধর্মযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়, তাতে ধর্মের জন্যে অসংখ্য হিন্দু আত্মত্যাগ করেছিল। যদিও 'আমরা একটির পর একটি যুদ্ধে জিতে যাচ্ছিলাম।' 'আমরা বিদেশীদের এখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে দিইনি। যদিও ধর্মান্তরিত ভাইদের আর ফিরে পাইনি।' অশোকের শিলালিপি শুধুমাত্র ব্রাহ্মী (লেখা আছে Brahri) লিপিতে এবং কেবলমাত্র প্রাকৃত-সংস্কৃতে রচিত (লেখা আছে Pakti Sanskrit) হয়েছিল; অথচ অন্য বহু লিপি, এমনকী গ্রীক ও আরামাইক লিপিতে ও অন্য ভাষাতেও তাঁর শিলালিপি পাওয়া যায়, যায় না শুধু সংস্কৃতে!

‘ঐ হাজার বছরের মধ্যে লক্ষ লক্ষ বিদেশী আক্রমণকারী এদেশে এসেছিল...কিন্তু তাদের সকলকেই পরাজয়ের অপমান সহ্যেতে হয়েছে...যখন আমরা বিচ্ছিন্ন ছিলাম তখন কে বিদেশী শত্রু কে মিত্র, বুঝতে পারিনি, তখন তাদের আমরা ‘হজম’ করতে পারিনি, যারা কোনো চাপে বাধ্য হয়ে আমাদের থেকে পৃথক হয়েছিল তাদেরও ‘হজম’ করতে পারিনি। আজকে এইসব লোক হল মোগল, পাঠান আর খ্রীস্টান।’ এই বছরেরই (১৯৯৮) এপ্রিল মাসে এক বিদ্বৎ সমাবেশে উত্তর প্রদেশের শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ‘ভারতবর্ষের কাছে যা কিছু অত্যন্ত প্রাচীন বর্তমান জগতে তাই হল আধুনিকতম।’ আরও বলেন, ‘অতীতকালে ভারতবর্ষ বিজ্ঞান ও গণিতে যে বিদ্যা আয়ত্ত করেছিল তা এখনো পৃথিবীর কোনো দেশ আয়ত্ত করতে পারেনি।’ শুনলে মনে হয় বাতুলের প্রলাপ।

এ কেমন শিক্ষা? পৃথিবীর সাত আট হাজার বছরের যে ইতিহাস জানা গেছে তার মধ্যে বিজ্ঞানে মানুষের কোনো উন্নতি ঘটেনি? প্রাচীন ভারতবর্ষ দুহাজার বছর আগে বিজ্ঞানেও শেষ কথা বলে গেছে? এরা মনে করে, লেখে, বলে এবং প্রচার করে ভারতীয় আর্থ সভ্যতা পৃথিবীর উন্নততম এবং প্রাচীনতম সভ্যতা। প্রথমত যেখানে বীজগণিতের চর্চা বহুকাল আগেই স্থগিত হয়ে গিয়েছিল সেখানে উন্নততর বিজ্ঞানের চর্চা হওয়া সম্ভবই ছিল না। বর্তমান জগতে জীববিদ্যা, ভেষজ, রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, উন্নত গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, কম্পিউটার কারিগরি এসবে যতটা উন্নতি হয়েছে সবই প্রাচীন ভারতে ছিল বলা কোন ধরনের অন্ধ মূর্খতা?

প্রাচীন ভারতবর্ষ বিজ্ঞানেও বেশ কিছু স্মরণীয় কীর্তি স্থাপন করেছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু তার পরে একসময়ে সে চর্চা থেমে যায় ও থেমে থাকে। আরব দেশে আরও পরেও উন্নত বিজ্ঞান চর্চা হয়েছিল কিন্তু একটা সময়ে সেটা থেমে যায়। ঊনবিংশ শতকের ভারতবর্ষে ইংরেজরা তাদের উন্নততর বিজ্ঞানচর্চা এখানে নিয়ে আসে, তখন বীজগণিতের উন্নত চর্চার দ্বারা পদার্থবিদ্যার প্রচুর

অগ্রগতি ঘটেছে এবং বিমান তৈরি হয়েছে ঐ উন্নত পদার্থবিদ্যা ও রসায়নের সাহায্যে, যেদুটি ঐ উন্নতির স্তরে না থাকার ফলে প্রাচীন ভারতে বিমান থাকা একেবারেই অসম্ভব ছিল। রামায়ণের পুষ্পক রথ থেকে যাঁরা প্রাচীন ভারতে বিমানের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে চান তাঁদের মূর্খ বললে কম বলা হয়। উত্তরপ্রদেশে এদের ও অন্যান্য কিছু স্কুলে ছাত্রদের বেদের গণিত বাধ্যতামূলকভাবে পড়তে হয় এবং শিখতে হয়। এই গণিতই পৃথিবীর তাবৎ গণিতের জননী। বিশেষজ্ঞের যা পথ্য ঐ কিশোর ছাত্রের অপথ্য, যথোপযুক্ত পুষ্টি তাতে মেলে না।

বেদ পাঠশালা, যজ্ঞ, গোহত্যানিবারণ, বন্দেমাতরম্, ভুল তথ্য পরিবেশন ছাড়াও গোলওয়ালকর, শ্যামাপ্রসাদ ও অন্যান্য কিছু কিছু সাম্প্রদায়িক নেতার জীবনীপাঠ স্কুলের কোনো কোনো শ্রেণীতে এরা বাধ্যতামূলক করেছে। সাহিত্যের পাঠের মধ্যেও হিন্দুত্বের বিস্তার অনুপ্রবেশ ঘটেছে। ভূগোলের ক্ষেত্রে এরা ভারতবর্ষের যে মানচিত্র রাজস্থানের পাঠ্যগ্রন্থে ছাপিয়েছে তাতে পাকিস্তান, বাংলাদেশ, নেপাল, ভূটান, তিব্বত ও ব্রহ্মদেশের কিছু অংশ সবই পূণ্যভূমি ভারতের অন্তর্গত বলে দেখানো হয়েছে। এটি কারাদণ্ডযোগ্য অপরাধ; ইচ্ছাপূর্বক এই মানচিত্র দেখে যারা ভূগোল শিখতে বাধ্য হচ্ছে তারা তথ্যে বঞ্চিত হচ্ছে, তথ্যের নামে বিকৃতি সেবন করতে বাধ্য হচ্ছে। এতে ক্ষতি আমার দেশের ভারী প্রজন্মের। দেশের বাইরে এই জ্ঞান নিয়ে গেলে শুধু উপহাসিত নয় নির্বোধ বুলেও প্রতিপন্ন হবে এরা।

বিজ্ঞানে এরা শেখে—বর্তমানে বিজ্ঞানের যে উন্নতি ঘটেছে পাশ্চাত্যে, তার সবারই সূত্র ছিল প্রাচীন আর্য শিক্ষায়। এমনকী এরা বলে প্রাচীন ভারতে এরোপ্লেনও ছিল, নইলে পুষ্পকরথের কথা মহাকাব্য, পুরাণে রইল কী করে? মূর্খেরা কি জানে না যে মানুষের কল্পনাশক্তি বলে একটা ক্ষমতা আছে, তাই যেহেতু পৃথিবীতে মৎস্যও আছে কন্যাও আছে তাই মৎস্যকন্যার কল্পনা করা সম্ভব হয়েছে। ঠিক তেমনই উঁচু পাহাড়ের চূড়ায় উঠে নিচের পৃথিবীকে যেমন দেখায় পুষ্পকরথের ইচ্ছাপূর্বক কল্পনায় ঠিক তেমনই বর্ণনা করা সম্ভব হয়েছে। বিজ্ঞানের বর্তমান অগ্রগতির মূলে যে বীজগণিত, ভারতবর্ষে বহু শতাব্দী আগেই তার চর্চা স্থগিত হয়ে গিয়েছিল বলেই একটা সময়ের পরে আর পদার্থবিদ্যার অগ্রগতি সম্ভব হয়নি। ফলে এরোপ্লেন তৈরি করা একেবারেই সম্ভব ছিল না। গণিতে, বিজ্ঞানে ভারতবর্ষ আরবদেশ থেকে প্রচুর ঋণ গ্রহণ করেছিল, গ্রীস থেকেও জ্ঞান মননের বহু উপাদান পেয়েছিল, এদের কোনো পাঠ্যগ্রন্থে তার কোনো উল্লেখ থাকে না। এরা এতই অজ্ঞ যে জানে না, সত্যিকার বুদ্ধিমান জাতই অন্যদের কাছ থেকে শ্রেয়তর জ্ঞান গ্রহণ করতে পারে, নির্বোধ জাত পারে না। চিকিৎসা, রসায়ন, ধাতুবিদ্যা, ভাস্কর্য, স্থাপত্য, চারুকলা, কারুবিদ্যাতে ভারতবর্ষ যথেষ্ট উন্নত ছিল, দর্শনচিন্তাতেও—এগুলি যথার্থই গর্বের বস্তু। কিন্তু তাতে এদের মন ভরে না। এদের বলতেই হয়, সর্ববিদ্যাতেই ভারতবর্ষ শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছিল। এই অতিলোভেই এদের তাঁতি নষ্ট

হল ; পণ্ডিতমহলে এরা বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করতে পারল না, সঙ্গে সঙ্গে মিথ্যা বিকৃত ইতিহাস শিখিয়ে নিজের দেশের ছেলেমেয়েদের মূর্খ করে রাখল, এর দায় কত পুরুষ ধরে চলবে তা কে জানে।

এর ওপর এদের নতুন বাহানা হল দেশে অনেক সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে। এছাড়া এদের স্থাপিত স্কুলগুলিতে সংস্কৃত আবশ্যিক পাঠ্য। সংস্কৃত প্রাচীন ভারতের একটি গৌরব ; বিপুল, বিচিত্র ও সমৃদ্ধ এর সাহিত্য, বহু চিন্তা গবেষণা ও মননের ফসল এ ভাষায় সমৃদ্ধ। এসব সত্য হলেও সংস্কৃতকে স্কুল কলেজে সব ছাত্রের পক্ষে বাধ্যতামূলকভাবে শিক্ষণীয় করে তোলার কোন যুক্তি নেই। যে ছাত্র বায়োফিজিক্স, ডাক্তারি বা নৃতত্ত্ব অথবা সমাজবিজ্ঞান পড়বে, প্রয়োজন হলে সংস্কৃত ভাষায় রচিত প্রয়োজনীয় বস্তু যেন সে ব্যবহার করতে পারে তার জন্য ভাষাটা সর্বস্তরে আবশ্যিক না করে অনায়াসেই এমন একটা পাঠ্যক্রম কলেজে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে চালু করা যেতে পারে যেটা সপ্তাহে তিনদিন পড়ে এক বছরের মধ্যে প্রাথমিক ব্যাকরণ ও শব্দসম্ভারের সঙ্গে ছাত্রের পরিচয় হয়।

একে তো প্রাচীন পন্থা শব্দরূপ-ধাতুরূপ মুখস্থ করিয়েই আজও সংস্কৃত পড়ানো হয়, তার ওপর পাঠ্যবই থাকে তদ্বকথায় ঠাসা। কোনো ভাষার প্রতি যথেষ্ট বিদ্রোহ উদ্বেক করার পক্ষে পর্যাপ্ত আয়োজন আমাদের সংস্কৃত পাঠ পদ্ধতিতে। কাজেই অনীহা ও বিরাগ উৎপন্ন হয় প্রাথমিক স্তরে থেকেই। তারপরেও যেসব ছাত্রছাত্রীর সহজাত অনুরাগ আছে ভাষাটি সম্বন্ধে এবং স্বভাবতই তারা সংখ্যা কম—শুধু তারাই স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হয়ে ভাষাটির চর্চা করবে। সকলের ওপরে জোর করে এটা চাপানো একটা অত্যাচার। পৃথিবীর কোনো দেশেই এখন ধ্রুপদী ভাষা আবশ্যিক নয়। অথচ স্বল্প যে কজন প্রাচীন মিশরীয়, সুমেরীয়, ব্যাবিলোনীয়, গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষার চর্চা করেন তাঁদের সে চর্চার মান আমাদের গড়পড়তা পণ্ডিতদের চর্চার মানের থেকে অনেক উন্নত। এর একটা কারণ কেবলমাত্র অনুরাগীরাই এ চর্চা করে থাকেন। দ্বিতীয়ত, ইতিহাস, ভূগোল, সমাজতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব, অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি ইত্যাদি নানা সম্পৃক্ত বিষয়ের পটভূমিকায় সে চর্চা ঘটে নির্ব্যক্তিক, ঐতিহাসিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি চর্চাকে জ্ঞানের জগতে মহনীয় করে তোলে।

সমগ্র পরিবার সংস্কৃতকে সর্বস্তরে অবশ্যপাঠ্য করতে চায়, এরা ভুলে যায় যে, শিবসেনার উপাস্য শিবাজির রাজত্বে রাষ্ট্রব্যবহারের ভাষা ছিল ফারসি, সংস্কৃত নয়। এদের সংস্কৃত প্রবর্তনের চেষ্টার পিছনে একটি উদ্দেশ্যই সক্রিয়—সংস্কৃত হিন্দুত্বের বাহন। প্রথম, সেই যুক্তিতে আরবি, ফারসি, উর্দু ইত্যাদি আরও নানা ধ্রুপদী ভাষাও অবশ্যপাঠ্য করতে হয়। কারণ ভারতবর্ষ বহু জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক সংমিশ্রণের উত্তরাধিকারী ; ভারতীয় সংস্কৃতি শুধু হিন্দু সংস্কৃতি নয়। এটি একটি মিশ্র সংস্কৃতি, এবং ঠিক সেই কারণেই একটি অতি সমৃদ্ধ সংস্কৃতি, যা হত না যদি এটি শুধু হিন্দু

সংস্কৃতি ৩৩। দ্বিতীয়ত, সংস্কৃত হিন্দু ধর্মের বাহন নয়, এতে নানা জাতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের উপাদান বিধৃত আছে; হিন্দুত্ব-বিরোধী নাস্তিক্যপন্থী সাহিত্যও সংস্কৃততেই রচিত হয়েছিল, এবং হিন্দুত্ব কেন্দ্রিক বহু রচনা ইংরাজি ও অন্যান্য ভাষাতে লেখা হয়েছে এখনো। কাজেই ন্যায়শাস্ত্রে যাকে ‘অব্যাপ্তি’ ও ‘অতিব্যাপ্তি’ দোষ বলে তাই খাটে সংস্কৃত ও হিন্দুত্বকে সমান করে দেখলে। তৃতীয়ত এবং মূল সেই প্রশ্নের সম্মুখীন হতেই হবে—ভারতীয় ছাত্রছাত্রীদের কেন বাধ্যতামূলকভাবে সংস্কৃত শিখতে হবে। এবং তার জন্য সাধারণ করদাতার—যাদের মধ্যে বেশ বড় একটা অংশ অহিন্দু—তাদের রাজস্বের অপব্যয় কেন হবে সব ছাত্রছাত্রীকে সংস্কৃতের মাধ্যমে হিন্দুত্বে শিক্ষিত করে তোলার জন্য?

পরিশেষে এই হিন্দুত্বের স্বরূপ কী? শিক্ষার ক্ষেত্রে তার ভূমিকা এ পর্যন্ত যা দেখলাম তা হল সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক অবৈজ্ঞানিক একটি মনোভাব সৃষ্টির প্রয়াস। হিন্দুধর্ম পৃথিবীর শ্রেষ্ঠধর্ম তা বোঝাবার জন্য এই বিচিত্র আয়োজন। এদের ‘সংস্কৃতিজ্ঞান প্রশ্নোত্তরী’ নামের পাঠ্যগ্রন্থে ভুল তথ্য অসঙ্কোচে পরিবেশনের উদ্যম। এদের শিক্ষক শিক্ষিকারা বাধ্যতামূলকভাবে পাঁচ মাস ধরে যে সংস্কৃতি জ্ঞানের পাঠ নেয় পাঠদানের পূর্বে, তা তো ভুলে ভর্তি হিন্দু আত্মসম্মতির পাঠ। যা শেখায় যে, ভারত হিন্দুরাষ্ট্র, অহিন্দু এখানে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক এবং তার কোন অধিকার রক্ষার দায় নেই সরকারের, কারণ তার জন্মভূমি ও কর্মভূমি ভারতবর্ষ হলেও তার পুণ্যভূমি নয় এদেশ। যে কোটি কোটি নাস্তিক অথবা সর্বধর্ম সম্বন্ধে উদাসীন মানুষ জীবন সংগ্রামেই তাদের সর্বশক্তি ব্যয় করেছে প্রতিনিয়ত, যাদের পুণ্যভূমি এদেশে বা বিদেশ কোনটিই নয় তাদের স্বপ্ন কোথায় এই হিন্দুরাষ্ট্রে? এদের পাঠ্যক্রমে নৈতিক শিক্ষাও একটি অংশ, কী সেই নীতি? যা দেশের বেশ বড় একটি অংশকে—যার মধ্যে নাস্তিক হিন্দু ও ধর্মে-উদাসীন হিন্দুও আছে—হিন্দু শ্রেষ্ঠত্বে অবিশ্বাসী সেই অংশকে যে নীতি উনমানব জ্ঞান করে তা তো দুর্নীতি। নারীর পাঠ্যক্রমে যারা গৃহধর্ম সম্বন্ধে শিক্ষাকে আবশ্যিক করে, তাদের নারীপুরুষে ভেদদৃষ্টি শিক্ষাব্যবস্থা পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। এদের নীতি প্রাচীনপন্থী ও পুরুষতান্ত্রিক।

হিন্দু ধর্ম সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমে সংস্কৃতির প্রধান বিষয়রূপে সব ছাত্রছাত্রীর পক্ষে অবশ্য শিক্ষণীয়। মুশকিল হল হিন্দুধর্মের স্বরূপ কী তার স্পষ্ট কোন সংজ্ঞা কেউ কোনোদিন দিতে পারেনি। এ ধর্মের কোনো একটিমাত্র সর্বজনস্বীকৃত শাস্ত্র নেই, কোনো একটি কেন্দ্রীয় সংস্থা এ ধর্মাবলম্বী জগৎকে পরিচালিত করে না। চার শঙ্করাচার্যদের নির্দেশ বহু হিন্দু প্রস্থান মানে না, এবং তাদের নির্দেশ মাঝে মাঝেই পরস্পরবিরোধী হয়, এবং শেষ পর্যন্ত তারা হিন্দুত্বের স্বনির্বাচিত প্রতিনিধি। নামে হিন্দু বহু ভারতীয় নাস্তিক অথবা সর্বধর্মে সমদর্শী, এছাড়া বহু সংখ্যক আদিবাসীর যে সমাজ-আর্যীকরণের সুদীর্ঘ চেষ্টা সত্ত্বেও তাদের আদিম ধর্মবিশ্বাস অনুসারেই চলে—ওপরে হিন্দুত্বের ক্ষীণ প্রলেপ সত্ত্বেও—এরা সকলে কোন যুক্তিতে হিন্দুত্বের

আওতায় পড়বে? এছাড়াও হিন্দুদের মধ্যে নানা সম্প্রদায়, তারা সকলেই শঙ্করাচার্যদের প্রণীত বেদান্তমতের অনুগামী নয়। স্বীকৃত পঞ্চোপাসনাতেই সৌর, শাক্ত, বৈষ্ণব, শৈব ও পাগপত্য প্রস্থান আছে, এর বাইরে অজস্র আঞ্চলিক সম্প্রদায় ও উপাসনপ্রস্থান আছে যারা শঙ্করাচার্যের প্রাধান্যতা বা অনুশাসন স্বীকার করে না। জন্মান্তরবাদ, কর্মবাদ, জাতিভেদ ও আত্মার অস্তিত্ব এ ক’টিই হিন্দুধর্মের স্বীকৃত মূলভিত্তি। মুশকিল, এর সব ক’টিই প্রাচীন ভারতের আর্যব্রাহ্মণ্যযুগেও সকলে মানত না, এবং এর বাইরের বহু অন্য কিছু অনেকেই মানত। কোনো কেন্দ্রীয় মূল শাস্ত্রগ্রন্থ ছাড়াই এখন মৌলবাদ সৃষ্ট হয়েছে; এই মৌলবাদের মূল কী? এর কোন দ্বিধাহীন সদুত্তর নেই। ফলে বেশ বড় একটা অস্পষ্ট ধোঁয়াটে এলাকায় যে যা বিশ্বাস করে তাকেই স্থাপন করে হিন্দুত্বের জয়জয়কার করছে।

শিক্ষাব্যবস্থায় এই অস্পষ্ট মৌলবাদের অনুপ্রবেশের কোন কেন্দ্রীয় তত্ত্ব না থাকলেও কিন্তু বেশ একটা স্পষ্ট চেহারা আছে। তা হল—আর্য-শ্রেষ্ঠত্ব, বেদ-শ্রেষ্ঠত্ব, সংস্কৃত-শ্রেষ্ঠত্ব এবং পরবর্তীকালে ‘হিন্দু’ বলে যা কিছু চালিত হয়েছে তার শ্রেষ্ঠত্ব। আজ আমরা জানি আর্যদের বহু পূর্বে সুমের, এসিরিয়া, ব্যাবিলন, চীন ও গ্রীসে এমন উঁচুমানের সংস্কৃতি আবির্ভূত হয়েছিল যার তুলনায় অর্বাচীন আর্যরা অনেকাংশে হীন।

বেদ একটি সমৃদ্ধ ও বিপুল সাহিত্য, কিন্তু শিক্ষার জগতে বেদচর্চা যেমনভাবে হবার কথা অর্থাৎ নৈর্ব্যক্তিক, ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে, তা এই সঙ্ঘীদের অভিমত নয়, ফলে বেদের বহুবচন যে আজ সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর, অতএব গ্রহণযোগ্য নয়, তা এরা স্বীকার করে না, অতএব এদের অন্ধ বেদনিষ্ঠা ভাবী প্রজন্মের ক্ষতিই করবে। সংস্কৃত নিঃসন্দেহে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ভাষাসাহিত্যের মধ্যে একটি সমৃদ্ধ ও সম্মানিত ভাষা বলে স্বীকৃত। কিন্তু শুধু এই কারণেই এ ভাষাকে স্কুল কলেজে সর্বজনের অবশ্যপাঠ্য করে তোলা তো অন্যায় জুলুম, এমন জুলুম পৃথিবীর অন্য কোনো দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় নেই।

পরিশেষে, হিন্দু বলে যা কিছু পরিচিত তার শ্রেষ্ঠত্ব গোলওয়ালকার থেকে আরম্ভ করে হিন্দুত্বের আরও বহু ধ্বজাধারীরা ক্রমান্বয়ে বলে আসছে সম্পূর্ণ বিনা যুক্তিতে, এই মতকে স্বীকার করা যায় না নানা কারণে। প্রথমত, শ্রেষ্ঠত্ব একটি আপেক্ষিক শব্দ। কার চেয়ে শ্রেষ্ঠ? পৃথিবীর অন্যান্য প্রাচীন সভ্যতা, ধর্ম, দর্শন ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে এদের জ্ঞান এত শোকাবহভাবে নিম্নমানের যে এ ধরনের আপেক্ষিক শব্দপ্রয়োগে এদের অধিকার নেই। সম্পূর্ণ ভ্রান্ত স্বকপোলকল্পিত ‘তথ্য’র ওপরে প্রতিষ্ঠিত যে শ্রেষ্ঠত্বের কল্পনা তা-ই পরিবেশিত হচ্ছে এদের পাঠ্যপুস্তকে ও প্রচারগ্রন্থে। তাই সরলমনে গ্রহণ করতে বাধ্য হচ্ছে শিশু-কিশোর-কিশোরী। তথ্যের স্থান নিচ্ছে রাশি রাশি ভ্রান্ত মত। এর ফলে তাদের মনে সম্পূর্ণ

ভিত্তিহীন এমন একটি শ্রেষ্ঠত্বের বোধ সৃষ্টি করেছে যার ফলে বাইরের পৃথিবীর চক্ষুণ্ণান পণ্ডিতেরা এদের এখনই উপহাস করছেন। শিক্ষাব্যবস্থার বহু বিকারের ফলে আগামী বহু প্রজন্ম অकारणे সম্পূর্ণ বিনা দোষে তাক্সিলা ও উপহাসের পাত্র হুবে। তার চেয়েও বড় কথা, তারা ভুল শিখছে, ভুল শিখবে, সর্বক্ষেত্রে, ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, বিজ্ঞান, সাহিত্য সর্বত্রই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মিথ্যার সংশ্লেষ গৈরিক করে তুলছে পুরো শিক্ষাব্যবস্থাকেই।

এই সুপরিকল্পিত ভ্রান্তির জগতের কাছে আমরা তুলে দিচ্ছি আগামী প্রজন্মকে, দেশের ভবিষ্যতকে। এরা অন্য ভিন্ন সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ উপাদানকে শ্রদ্ধাভরে গ্রহণ করতে শিখবে না, কারণ মিথ্যা শ্রেষ্ঠত্বের অহমিকায় এদের দৃষ্টি রুদ্ধ থাকবে, এবং এরা নিজের ঐতিহ্যের দোষত্রুটি চিনতে জানতে ও মানতে পারবে না, ফলে দেশের ভাবী উন্নতির এবং আত্মসংশোধনের দ্বারা শ্রেয়তর উৎকর্ষলাভ, তাও ঘটবে না। জাতিভেদের নানা ব্যাখ্যা দিয়ে সমর্থন করতে শিখবে ফলে ভারতবর্ষের এই কলঙ্ক অক্ষয় হয়ে থাকবে। অপ্রমাণিত এবং অপ্রমাণসহ জন্মান্তরবাদ, কর্মবাদ এরা নির্দিধায় গলাধঃকরণ করবে, কারণ হিন্দুধর্মকে সম্মীরা বিচারের উর্ধ্বে স্থাপন করেছে। ফলে এদুটি ভ্রান্ত ধারণাও কায়েম হয়ে থাকবে শিশু-কিশোরের মনে, এবং নিয়তিবাদ পুরুষকার ও আত্মপ্রত্যয়ের তলা ক্ষইয়ে দেবে ধীরে ধীরে। তাই বলে এরা শাস্ত, সুস্থিরচিত্ত বা নিজীব একেবারেই নয়। আশেব এদের শেখানো হচ্ছে শত্রু চারটি—মুসলমান (তথা পাকিস্তান), চীন, কমিউনিজম এবং যারা ধর্মান্তরীকরণ করে থাকে তারা (অর্থাৎ মুসলমান, খ্রীষ্টান), হিন্দু ও আর্য সমাজীরাও যে ধর্মান্তরীকরণ করে থাকে সেটা অপ্রাসঙ্গিক ; কারণ হিন্দু যখন ধর্মান্তরীকরণ করে, তখন ধর্মান্তরিত মানুষ হিন্দু হয়, কিন্তু অন্য কেউ করলে ধর্মান্তরিত মানুষ হিন্দুত্বের এলাকার বাইরে চলে যায়।

হিন্দুত্ববাদীরা হিন্দুধর্মের মূল্যায়ন আগেই করে রেখেছে, ঘোষণা করে রেখেছে এটিই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধর্ম এবং এর আওতায় গড়ে ওঠা সংস্কৃতিই শ্রেষ্ঠ সংস্কৃতি। ফলে বহু সংশ্লিষ্ট বিষয়, যেমন, ইতিহাস, সাহিত্য, অর্থনীতি, সমাজনীতি, প্রত্নতত্ত্ব, শিল্পতত্ত্ব, ধর্মতত্ত্ব ও দর্শন-মননের ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে নৈর্ব্যক্তিক বৈজ্ঞানিক ভঙ্গীতে বিচার করলে যে স্বরূপটি ধরা পড়বে তার দোষগুণ নিয়ে, সেটি হবার জো রইল না, কারণ শ্রেষ্ঠত্বের ফতোয়া আগে থেকেই দেওয়া হয়ে গেছে। এর একটা কুফল হল, ভারতীয় সংবিধানে মানবিকতার সপক্ষে যেসব অংশ আছে, যেমন, সকল ভারতীয় অধিকারে সমান, এগুলি এদের দস্তের দাপটে চাপা পড়ে যাবে, ভাবী প্রজন্ম মানবিক মর্যাদা অর্জন করতে পারবে না, ভারতবাসীসাম্রাজ্যকেই আপনজন বলে ভাবতে শিখবে না। জাতপাত তো ছিলই, এখন বিধর্মী, মুসলমান, খ্রীষ্টান, আদিবাসী বা নাস্তিক ভারতবাসীকে এরা অভারতীয় বা দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক বলে ভাবতে

শিখবে। ভারতীয় সংস্কৃতির যে সুসূতম প্রকাশ ঘটেছিল, শান্তিপূর্বে ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বলেছিলেন, 'ন মানবাত্রেষ্ঠতরং হি নির্দিষ্টং' 'মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কিছুই নেই'। এই মানুষের মধ্যে মুসলমান, খ্রীষ্টান, ম্লেচ্ছ, চণ্ডাল আছে, নারীও আছে। হিন্দুত্বের নীতিতে এদের মধ্যে বহির্বিভাগ আছে, ফলে জাতিভেদের অভিশাপ প্রচ্ছন্নভাবে এর মধ্যে আত্মগোপন করে থাকে সাম্প্রদায়িকতা, প্রকাশো ও সদন্তে। এই বাতাবরণের মধ্যে যে তরুণ-তরুণীর মানসিক গঠন হবে তারা একটি অসুস্থ এবং প্রকারান্তরে দুর্নীতির পরিবেশে লালিত হবে ; তারা হিন্দু হবে ঠিকই, কিন্তু পুরো মানুষ হয়ে উঠবে না।

শিক্ষা জগতের সামনে সমস্যাটা জটিল ও কঠিন। আমরা বহু মূল্যবান দশক নষ্ট করেছি, শিক্ষার মানবিকীকরণ করতে পারিনি বলেই আজ তার গৈরিকীকরণ হয়ে চলেছে। পুরো গোবলয় আজ সঙ্খীদের অধীনে, দিল্লির মসনদে এখনো তারা আসীন এবং সেই ক্ষমতাটা চিরকাল তাদের নাও থাকতে পারে এটা জানে বলেই যত দ্রুত সম্ভব তারা গৈরিকীকরণ সমাধা করতে চায়। একটুখানি থেমে ভেবে দেখুন, ষাট বছর আগে জার্মানিতে নাৎসি শক্তি যখন ক্ষমতা দখল করে তখন ইহুদি ও কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে এই ধরনের জেহাদ ঘোষণা দিয়েই তার শুরু হয়েছিল। তথ্যের বিকৃতি, জার্মান জাতির জাতিগত শ্রেষ্ঠতা ঘোষণা, রক্তের জাত নামে অবৈজ্ঞানিক মিথ্যার ভিত্তিতে তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন, সারা পৃথিবীকে তৃতীয় রাইখের পদানত করার কর্মসূচী, জার্মান সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের শ্রেষ্ঠত্বের ঘোষণা এ সবই সেদিন পরবর্তী কয়েক বছরের দ্বিভাষিকার সূচনা করেছিল। আমরা জানি বহু শিক্ষাব্রতীকে প্রাণ দিতে হয়েছিল সম্পূর্ণ মিথ্যা অভিযোগে, শুধুমাত্র তারা নাৎসিবাদের সহযোগিতা করতে অস্বীকার করেছিল বলেই, আরও বহু জ্ঞানতপস্বী, শিল্পী বৈজ্ঞানিক ও মনস্বীকে দেশত্যাগ করে প্রাণ বাঁচাতে হয়েছিল। বই পোড়ানো, বইকে বেআইনি ঘোষণা করা এর একটা অঙ্গ ছিল। এটা সঙ্খীদের আমলে এখনই সূচনারূপে পরিদৃশ্যমান। চিন্তা ও মননের, জ্ঞানের ও তথ্যের জগতে বিকৃতি এনে মিথ্যাকে প্রতিষ্ঠিত করা এর আর একটা অংশ।

এই আগতপ্রায় ফ্যাসিবাদের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত পণ্যমুখী সভ্যতা ও বিশ্বায়ন। একে ঠেকাবার জন্য হিন্দুত্বকে ব্যবহার করার চেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য। ভাবী যুগের মানুষ সামনের দিকে তাকাবে ; জ্ঞান-বিজ্ঞান, ইতিহাস, শিল্পসাহিত্য শুধু নয়, তার সবচেয়ে বড় হাতিয়ার হবে যুক্তি। হিন্দুত্বের পাঠ্যক্রম বা পরিকল্পনার মধ্যে যুক্তির স্থান নেই অতীতে যা ছিল তাকেই শ্রেষ্ঠ আদর্শ মনে করার মধ্যে বশ্যতা ও আনুগত্য আছে, বুদ্ধি বা স্বাধীন বুদ্ধি প্রয়োগের অবকাশ নেই। শিক্ষা বিধানে আমরা যে নাগরিক তৈরি করতে চাই সে অতীতকে চোখ বুজে মেনে নেবে না, খোলা চোখে বুদ্ধি দিয়ে যাচাই করতে শিখবে। যুক্তির কণ্ঠিপাথরে যা টিকবে শুধু তাকেই স্বীকার করবে এবং সে স্বীকৃতিও চিরকালের জন্য নয়, যতদিন পর্যন্ত

সামাজিক পরিবেশে তার যথার্থ উপযোগিতা আছে ততদিনের জন্যই মেনে নেবে ; তারপর যেদিন তা প্রাসঙ্গিকতা হারাবে সেদিন সেটা ভারতীয় বলেই বা অতীতে তা চালু ছিল বলেই তাকে আঁকড়ে থাকবে না। আমাদের ভাবী প্রজন্মের শিক্ষা হবে প্রকৃত সমাজকল্যাণের অভিমুখী। চিন্তাবৃত্তিকে অলস, অসাড় করে রেখে গুরুপরম্পরায় লব্ধ জ্ঞানকে চিরকাল অবিকৃত রেখে মেনে নেওয়া তো জাতির মৃত্যুর লক্ষণ। এর থেকে বাঁচতে হলে আকৈশোর সমস্ত ছাত্রছাত্রীকেই স্বাধীন চিন্তায় উদ্বুদ্ধ করতে হবে যাতে বড় হয়ে তারা দেশের কর্ণধার হবার যোগ্য হয়।

শিক্ষকদের এ প্রসঙ্গে দুটো দায়িত্ব আছে। প্রথমত, শিক্ষাব্যবস্থাকে যুক্তিমুখী করার নিরন্তর চেষ্টা করে যেতে হবে। ছাত্রছাত্রী যেন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাকে জড়বস্তুর মত গ্রহণ না করে, বুদ্ধি দিয়ে ভেবে, ভালোমন্দ বিচার করে জীবনের মধ্যে তাকে অর্জন করে, এবং সর্বদাই তার মূল্যায়ন করে চলে যাতে শ্রেয় থেকে শ্রেয়তর মানে নিয়ে যেতে পারে জ্ঞানকে, যেন জাতির প্রয়োজন যখন পরিবর্তিত হচ্ছে তখন সে অনুযায়ী তারা তাদের লব্ধ জ্ঞানকে পরিবর্তিত করতে পারে। কাজেই জ্ঞান যাতে জড়পিণ্ডমাত্র না হয়ে ওঠে, প্রয়োজনে তার পরিবর্তন ঘটানোর সাধ্যও যেন ছাত্রছাত্রীরা অর্জন করে এমন যুক্তিনিষ্ঠ মন তাদের গড়ে দেওয়া শিক্ষকদের কাজের মধ্যে পড়ে। হিন্দুত্বের কল্লনায় যে জড়তা তাকে পরিহার করার জন্য এই সজীব মন, নিত্য জগৎ, যুক্তি ও পরিবেশের, প্রয়োজনের অভিমুখে জ্ঞানকে নতুনভাবে বিবর্তিত রূপে প্রয়োগ করার ক্ষমতা ছাত্রদের গড়ে দিতে হবে।

দ্বিতীয়ত, চল্লিশের দশকে কমিউনিস্ট পার্টির একটা নির্দেশের কথা মনে পড়ে। প্রত্যেক ছাত্র ও শিক্ষককে চেষ্টা করতে হবে তার বিশিষ্ট ক্ষেত্রে যাতে সে সবচেয়ে উন্নত মানের দক্ষতা অর্জন করতে পারে। প্রত্যেক বিষয়েই যাতে সাম্যবাদী শিক্ষকরা একেবারে সামনের সারিতে থাকতে পারেন সেই চেষ্টা করতে হবে কারণ একমাত্র অপ্রতিদ্বন্দ্বী যোগ্যতার বলেই তাঁরা বিরুদ্ধপক্ষকে স্বক্ষেত্রে পরাভূত করে নিজেদের মতাদর্শের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করতে পারেন। আজ এটার ভীষণ দরকার। অনেকগুলো ক্ষেত্রে এখন সাম্যবাদী অধ্যাপকরা তাঁদের বিদ্যাগত যোগ্যতা ও গবেষণার মানে অপ্রতিরোধ্য। চেষ্টা করতে হবে সব ক্ষেত্রেই যেন এটা ঘটে, কারণ কেবলমাত্র অবিসংবাদিত যোগ্যতার জোরেই আমরা হিন্দুত্ববাদীদের এত উপযুক্তভাবে খণ্ডন করতে পারব। কৃষ্ণগঙ্গ মার্কিনদের মধ্যে একটা কথা চালিত আছে, “ওদের অর্ধেক দূর পর্যন্ত পৌঁছতে আমাদের ওদের দ্বিগুণ জোরে দৌড়তে হবে” (We have to run twice as fast to reach half as far)। এ যাওয়া স্রোতের উজানে, কাজেই এখানে পুরো শিক্ষক সমাজের একটি অনস্বীকার্য দায়িত্ব রয়েছে তা হল সম্পূর্ণ অতন্দ্র অনলসভাবে নিজের বিষয়ে পড়াশোনা করে তেমন যোগ্যতার মান অর্জন করা, যাতে প্রতিপক্ষের মুখ বন্ধ হয়। সেই যোগ্যতার সঙ্গে যুক্ত থাকবে আমাদের জীবনমুখী দর্শন, আমাদের সম্মুখ দৃষ্টি, আমাদের বামপন্থা।

জ্ঞান ও যোগ্যতার উৎকর্ষের কাছে প্রতিপক্ষ যখন নতিস্বীকার করতে বাধ্য হবে তখনই হিন্দুত্বের বিষদাঁত ভাঙবে। কৈশোর থেকে ছাত্রছাত্রীরা যেন এই জ্ঞানের উন্নতমান শিক্ষকের মধ্যে দেখে, যে জ্ঞানকে সকল ছাত্র সম্মান করতে বাধ্য হবে, তাহলে সেই জ্ঞান যে মতাদর্শের সঙ্গে সম্পৃক্ত তাকেও সে সম্মান করতে শিখবে। কাজটা খুবই দুরূহ ; চাকরিতে উন্নতির লোভ, টাকার জন্য লোলুপতা, সারা বছর দেশে বিদেশে সেমিনার কনফারেন্স করে সস্তা খাতির পাওয়া, এসব থেকে নিজেকে মুক্ত করে ব্রতের মত করে মতাদর্শকে দৃঢ় রেখে নিজের অধ্যাপনার বিষয়ে যথাশক্তি উৎকর্ষ বাড়িয়ে চলার সাধনা এটা একাগ্রভাবে, অতন্ত্রভাবে করে যেতে হবে। এখানে আত্মতৃষ্টির কোন অবকাশ নেই। প্রতিবন্ধক বিস্তর, কিন্তু আজ এখানে হার মানলে কাল ভারতে ফ্যাসিবাদ হিন্দুত্বের রূপে দেশকে গ্রাস করবে! এ ব্রতে অতন্ত্র থাকলে জয় হবেই।

সমগ্র পরিবার যে হিন্দুত্বের প্রবক্তা ও প্রচারক তা ভারতীয় ধর্মধারার একমাত্র উপাদান নয় বলেই একান্তভাবে চর্চিত হবার দাবি এর নেই।

বেদ সম্বন্ধে এত আগ্রহের একটা কারণ, বেদ নাকি অপৌরুষেয়। তাই এবারে ধূয়া তোলা হয়েছে এবং স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করেছেন যে, দেশে বেদ বিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে। এগুলো হবে প্রাচীন বৈদিক সংস্কৃতি সম্বন্ধে নানা আজগুবি কুসংস্কার নির্মূলের ঘাঁটি ; এখানে যজ্ঞের অনুষ্ঠান হবে, বেদপাঠ ও গানের ক্যাসেট তৈরি ও বিক্রি হবে, বৈদিক ভারত সম্বন্ধে ছবি তৈরি ও বিক্রি হবে ও প্রদর্শনী হবে, বিশ্ব দেখার সঙ্গে কলা বেচাটাও থাকবে। এর বেশি কিছু বলেননি বলে নানা প্রশ্ন সমস্যা আপনিই আসে।

বেদেই নাকি ভারতবর্ষের ঐতিহ্যের সূত্রপাত। এঁরা ত সিদ্ধসভ্যতাকে প্রাগ্‌বৈদিক বলে স্বীকারই করেন না। কাজেই ভারতীয় সংস্কৃতির উৎস বেদ, অতএব ভাবী প্রজন্মের ভারতীয়ত্বে যেন জ্ঞান ও গর্ব জন্মায় তার জন্যেই এ উদ্যোগ।

সাধারণভাবে ‘ভারতীয়’ না হলেও ভারতীয় ‘আর্য’ সভ্যতার উৎস যে বেদ সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এই কারণে উত্তর প্রদেশের মাধ্যমিক স্কুলগুলির ছাত্রদের পড়তে হয় বেদের গণিত। বৈদিক সাহিত্যের শেষ পর্যায়ে রচিত ‘অথর্ব পরিশিষ্টে’ ষোলোটি সূত্র আছে গণিত সম্বন্ধে, সে যুগের পক্ষে তার গৌরব ছিল, এ যুগের পক্ষে নয়। এযুগের ছাত্রছাত্রীরা এযুগের পদ্ধতিতেই গণিত শিখলে সেটা যথার্থ কার্যকরী শেখা হবে, বৈদিক গণিত অতীত সম্বন্ধে কৌতূহল মেটাতে পারে, প্রয়োজন মেটাতে পারে না।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে সরকারি অনুদানে জেলায় জেলায় যে বেদ পাঠশালা স্থাপনের প্রস্তাব, তার উদ্দেশ্য বা উপযোগিতা কী? ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য চর্চা এর

উদ্দেশ্য হতে পারে না, কারণ সেক্ষেত্রে ফারসি ও আরবি এবং পালি প্রাকৃতও জানতে হবে। তবে এরা বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতির স্বতন্ত্র মূল্য দেয় না।

৬ই নভেম্বর (১৯৯৮) বোধগয়াতে যে বৌদ্ধমহোৎসব অনুষ্ঠিত হয় তাতে আধ্বানি বলেন, ‘বুদ্ধ নতুন কোনো ধর্ম প্রচার করেননি সনাতন ইন্দো-আর্য ধর্মকে নতুন করে উপস্থাপিত করেছেন মাত্র’। উত্তরে নালন্দা বৌদ্ধচর্চা কেন্দ্রের ভূতপূর্ব ডিরেক্টর সি এস উপাসক বলেন, ‘আধ্বানির উক্তি রাজনীতি প্রণোদিত, এটির বক্তব্য অস্পষ্ট, উদ্দেশ্য প্রতারণা করা এবং এ উক্তির চেয়ে আর কিছুই সত্যের থেকে দূরতর হত না’ (ambiguous in content, deceptive in intent, could not have been farther from the truth) বৌদ্ধধর্মকে এভাবে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অন্তর্ভুক্ত করার অপপ্রয়াস সম্বন্ধে বিখ্যাত বিপশ্যানধ্যান শিক্ষক সত্যনারায়ণ গোয়েঙ্কা বলেন, ‘এটি, হিন্দুধর্মের সমর্থকরাও নিঃসন্দেহে স্বীকার করবেন, পারস্পরিক শ্রদ্ধার সম্পর্ক থেকে পৃথক এবং একটি সম্প্রদায়েরই স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রক্ষার উদ্দেশ্যে (করা হয়েছে) উদীয়মান বহুধা প্রকাশিত বহু সংস্কৃতির সমন্বয়ে সৃষ্ট রাষ্ট্রনীতির প্রহসন মাত্র। (...which is, as advocates of Hindutva would no doubt agree, different from mutual respect...and protection of a distinct identity knocks at the emerging pluralist multi cultural identity.) এ হল বৌদ্ধদের সম্বন্ধে অন্তর্নিহিত অবজ্ঞার প্রকাশ, যে বৌদ্ধধর্ম প্রাচীনকালের বেদবিরুদ্ধ একটি প্রস্থান ছিল। বেদ পাঠশালায় স্বভাবতই বৌদ্ধ ধর্মসংস্কৃতির চর্চা হবে না, যদিও তার কাল-সীমাটা বৈদিক যুগের মধ্যেই পড়ে। কেবিনেট মন্ত্রী থাম্বি দুরাই নিজেকে এদের থেকে বিচ্ছিন্ন করে নেন।

তাহলে চর্চা হবে শুদ্ধ বেদের। বলা হয়েছে, এ পাঠশালা উদ্বোধন করবেন মন্দিরের অছি (trustee) এবং এগুলি হবে গুরুকুল ধরনের। এসব পাঠশালা প্রতিষ্ঠানের জন্য রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ প্রতি জেলায় বেদের পণ্ডিতদের সাহায্য চেয়েছে। ৯-১৩ ডিসেম্বর বিশ্ববেদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে বিশ্বহিন্দুপরিষদের অন্তর্ভুক্ত বিশ্ববেদ সংস্থানের সঙ্গে সংযুক্তভাবে, বিজেপি এই উপলক্ষে বেদবিদদের যে সভা ডেকেছে তাতে আমন্ত্রণ পেয়েছেন মহারাষ্ট্র থেকে ১৮০ জন, অন্ধ্র থেকে ১৫০, তামিলনাড়ু থেকে ১২৫, কর্ণাটক থেকে ৭০, গুজরাট থেকে ৪০, ওড়িশা থেকে ৩০, কেরল থেকে ২৫, দিল্লি থেকে ২০ ও অসম থেকে ১৫ জন। পশ্চিমবাংলা থেকে কাউকে ডাকা হয়নি কারণ ‘ওখানে কেউ বেদ জানে না’।

এইসব বেদ পাঠশালা কীভাবে ভবিষ্যতের জন্যে ছাত্রদের তৈরি করবে? প্রবীণ অভিজ্ঞ এক বিশ্বহিন্দু পরিষদ সমর্থক বলেন, ‘কেউ ভবিষ্যতের সন্ধান বেদপাঠে ব্রতী হবে না। এসব পাঠশালায় ছাত্ররা ভর্তি হবে ধর্মগ্রন্থগুলি সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন

করতে। এ একরকম সাধনা।' (No one should take up the study of the Vedas thinking of future prospects. Students should enrol in these pathshalas to attain knowledge of these religious scriptures. It's a kind of sadhana)। জম্মু কাশ্মীরসহ সারা উত্তরভারতেই বিশেষ করে বেদ পাঠশালা প্রতিষ্ঠা করা দরকার, কারণ বেদের চর্চা 'এখনও দক্ষিণ ভারতে পাওয়া যায়। এটি সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়ে গেছে কাশ্মীর, হিমাচল প্রদেশে, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, বিহার, পশ্চিমবাংলা এবং আর্যাবর্তের অন্যান্য অঞ্চলগুলি থেকে। সময় এসেছে বেদ ও তার শিক্ষা সম্বন্ধে মানুষকে আগ্রহী করে তোলার।' (Vedic study can still be found in the southern parts of the country ; it has disappeared from Kashmir, Himachal Pradesh, Uttar Pradesh, Rajasthan, Bihar, W. Bengal and other Parts of northern India...the time has come to get people interested in the Vedas and their teachings)

এ পাঠ্যের উদ্দেশ্য সঙ্ঘ পরিবার বহুদিন থেকেই নানা প্রসঙ্গে বারে বারে ঘোষণা করে আসছে : 'ভারতবর্ষে সিদ্ধু সভ্যতা প্রাগার্য নয় আর্ঘাই, এবং বৈদিক সভ্যতা পৃথিবীর প্রাচীনতম 'সভ্যতা'। যাঁদের পৃথিবীর প্রাচীন ইতিহাসে প্রাথমিক জ্ঞান আছে তাঁরাই জানেন প্রাচীন সভ্যতাগুলির মধ্যে বৈদিক সভ্যতা কনিষ্ঠতম—অসিরীয়, সুমেরীয়, ব্যাবিলনীয়, চীনা ও গ্রীক সভ্যতার তুলনায় বৈদিক সভ্যতা নেহাতই অর্বাচীন। টেনেটুনে যদি খ্রীষ্টপূর্ব দেড় হাজার বছরেও নিয়ে ফেলা হয় বৈদিক যুগের শুরুতে তাহলেও অন্যগুলির তুলনায় তিন থেকে চার পাঁচ হাজার বছরের ছোট বৈদিক সভ্যতা। কিন্তু হিন্দুত্ববাদীর বরাবর চেষ্টা করে আসছে যে বৈদিক আর্ঘ সভ্যতা শুধু প্রাচীনতম নয়, অন্যসব সভ্যতার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। এতটাই শ্রেষ্ঠ যে ভারতবর্ষে "যা কিছু খুব প্রাচীন ঠিক সেইটাই বর্তমান জগতে আধুনিকতম" (Whatever is very ancient for India, that precisely is most modern for the world)। একথা বলেছেন উত্তরপ্রদেশের শিক্ষামন্ত্রী, ১৯৯৮-র এপ্রিল মাসে এলাহাবাদে এক শিক্ষক সমাবেশে। এর অর্থ সমাজ সংস্কৃতি, জ্ঞানবিজ্ঞানের এই তিন সাড়ে তিন হাজার বছরে কোন অগ্রগতি হয়নি। এই ধরনের মনোভাব নিয়েই এরা বলে 'অথর্ব পরিশিষ্টে'র ষোলটি গণিতসূত্র থেকে পৃথিবীর তাবৎ গাণিতিক কাজ ও চর্চার সব সূত্র মেলে। একথা যে মূর্খের, তা শুনলেই বোঝা যায়।

শিক্ষার জগতে যে প্রলয়ঙ্কর তাণ্ডবের সূত্রপাত করেছে এরা, তা আজ নানাভাবে প্রকাশিত। এর প্রধানত দু'টি দিক; প্রথমত, ভারতবর্ষের বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গৈরিকীকরণ। এর মধ্যে পড়ে আই সি এইচ আর ও আই সি এস এস আর এদেশে ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞানের দু'টি উচ্চতম প্রতিষ্ঠান থেকে প্রতিষ্ঠিত পণ্ডিতদের সরিয়ে এক এক করে সঙ্ঘ পরিবারের অনেক কম যোগ্যতার অখ্যাত ব্যক্তিদের চাকরি দেওয়া হচ্ছে। এই নবনিযুক্তদের যোগ্যতার একমাত্র মাপকাঠি হল রাষ্ট্রীয়

স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সদস্যতা, সঙ্ঘ পরিবারের উচ্চশিক্ষা চর্চার মান বেশ : ৫. ফলে কেবলমাত্র গৈরিক রাজনীতির জোরে শিক্ষাজগতে উচ্চপদ লাভ করা গেলে সারা দেশের শিক্ষাগত মানই নেমে যায়।

বেদচর্চা ঐ বেদ পাঠশালায় কীভাবে হবে তা বলা হয়নি কিন্তু ঐ চর্চা এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে কী কী করা দরকার তার একটা তালিকা দিয়েছে বিশ্বহিন্দু পরিষদ : যজ্ঞ অনুষ্ঠান, প্রদর্শনী, বৈদিক সাহিত্যের বিক্রি, বৈদিক গান ও আবৃত্তির ক্যাসেট বিক্রি, ছবি বিক্রি ইত্যাদি। এসব সম্বন্ধে বিশ্বহিন্দু পরিষদের এক সদস্য বলেছেন, 'যদি কয়েকটি পরিবারেও এসবের কিছু কিছু ঢোকানো যায় তাহলে আমাদের উদ্দেশ্যে কতকটা সিদ্ধ হবে।' যজ্ঞ ও প্রদর্শনী (যদি তাতে প্রবেশ মূল্য না থাকে) বাদে সব কটিরই বাণিজ্যিক দিক একটা আছে। দেশে ছোট ছোট 'মা' ও 'বাবা'দের আখড়ায় ঐসবই অর্থের বিনিময়ে হয়ে থাকে। যজ্ঞ ঐ তালিকার একটি অঙ্গ। ছাত্রছাত্রীদের দেখানোর জন্যে যজ্ঞ করা ; এমন মনে করার কোনো কারণ নেই, কারণ এই ধরনের বেদবিশ্বাসীরা মাঝে মাঝেই ইতস্তত যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে থাকে বেদকথিত ফল লাভের আশায়।

যজ্ঞ তিন রকমের, পশু, ইষ্টি ও সোম ; এর মধ্যে পশু ও সোমযোগে বলদ হত্যা করতেই হয়, অন্যান্য বহু পশুও। এখন এই বিশ্বহিন্দু পরিষদ ও সঙ্ঘ পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা ভীষণ রব তুলেছেন কোনোমতেই কোথাও গোহত্যা করা চলবে না। নাগপুরের কাছে রামটেকে বিশ্বহিন্দু পরিষদের যে জমায়েত হয়েছিল সেখানে এক সাধু বলেছিলেন, 'এক ফোঁটা গোরুর ঘাস পাত করবে আমরা তাদের মাথা কেটে ফেলব।' অশোক সিংঘাল বলেছেন, 'সব নদীর জল গোরুরে অপবিত্র হয়েছে।' বলা হয়েছে, গোমূত্র পানি আরোগ্য হয় ক্যান্সার, পুরুষত্বহীনতা, যৌন ব্যাধি, যকৃতের রোগ ও হৃৎপিণ্ডে আকস্মিক শ্বাস রোধ। বিশ্বহিন্দু পরিষদ দাবি করে যে, হত্যাকালে গোরুর কম্পন ও আর্তরবের ফলেই ভূমিকম্প, পোলিও হয়, শরীরে মেদ জমে!' 'চতুষ্পদ প্রাণীর মাংস খেলে অন্ধত্ব, চর্মরোগ ও হৃদরোগ হয়। এর থেকে বিবাহ বিচ্ছেদও হয়, কারণ মাংসভক্ষণে শিশুদের অকালে যৌন পরিণতি ঘটে তার থেকে পুরুষত্বহীনতা, ফলে বিবাহ বিচ্ছেদ! বলা বাহুল্য, চিকিৎসা শাস্ত্র এগুলিকে হাস্যকর দাবি বলে মনে করে। প্রাচীন বৈদিক আর্যরা মুখ্যত গোমাংসভোজী, তাঁদের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ, যৌনব্যাধি, অন্ধত্ব, চর্মরোগ ও হৃদরোগের প্রাবল্য ছিল এমন কথা ত বেদে লেখে না। বিশ্বহিন্দু পরিষদ আরও দাবি করে যে দেশের গোধন কমে যাচ্ছে, এটাও সম্পূর্ণ মিথ্যে। ১৯৮২ সালে গোধনের সংখ্যা ছিল ২৬ কোটি ২০ লক্ষ, '৮৭-তে ২৭ কোটি কুড়ি লক্ষ, '৯২তে ৩০ কোটি ; এর পরে আরও বেড়েছে।

দেশের শতকরা যে ৭৪ জন মাংসাশী তাদের মধ্যে ৯১.৫ শতাংশ চতুষ্পদ প্রাণীর মাংস খায়, শতকরা ৮২.৬ শতাংশ মাছ খায়, ৭৬ শতাংশ মুরগি খায় ও ১২.৭

শতাংশ গোমাংস খায়। এই শেষোক্তদের অধিকাংশই মুসলিম, সম্প্রদায়গতভাবে যারা অত্যন্ত দরিদ্র, খাসীর মাংস, মুরগি বা মাছ তাদের অধিকাংশের নাগালের বাইরে, তাই সবচেয়ে সস্তা যে গোমাংস তাই তাদের প্রোটিন জোগায়। এবং এই মুসলিম সম্প্রদায়টিই বিজেপি ও সঙ্ঘপরিবারের ঘোষিত শত্রু। যেদেশে অধিকাংশ গরু রুগণ, বুভুক্ষু ও শীর্ণ, নূনতম যত্ন যাদের ভাগ্যে জোটে না, বুড়ো শীর্ণ গরু সারি সারি কসাইখানায় মৃত্যুর প্রতীক্ষা করে যেখানে, সেখানে দেশের এমন সম্পদ কোথায়, বা কার, যে অর্থনীতির দিক থেকে ক্ষতির খাতায় লেখা ঐ গরুগুলোকে আমরণ খাজনা দিয়ে তদ্বির করবে, রোগে চিকিৎসা করবে, মৃত্যুকালে পরিচর্যা করবে? পাশ্চাত্য গোখাদক দেশে গরু যা যত্ন পায় তা এদেশে এখনো অকল্পনীয়। কাজেই গোমাতার জন্যে উদ্বেগের পেছনে একটি বড় অভিপ্রায় হল, দরিদ্র মুসলমানকে তার সুলভ প্রোটিন থেকে বঞ্চিত করা।

এই গোহত্যা আবার যজ্ঞে অত্যাবশ্যক ; বেদ চর্চায় যে যজ্ঞ হবে তাতে কি মাটির গরু মারা হবে যজ্ঞে? যজ্ঞে বলদ মারা হত তার নিঃশ্বাস বন্ধ করে (বাংলার রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর ‘যজ্ঞকথা’তেও একথা আছে) এবং এ হনন সময়সাপেক্ষ, গরুর ঐ দীর্ঘ মৃত্যুযন্ত্রণা বেদসম্মত, বেদ পাঠশালার ছাত্রছাত্রী ঐ যন্ত্রণা দেখে বৈদিক ঐতিহ্য সম্বন্ধে সন্দেহান্বিত হবে? যজ্ঞ সম্বন্ধে তো বই পড়েই ধারণা করা যায়, পূনাতে যজ্ঞ করে তার চলচ্চিত্র তোলা হয়েছিল এবং সব রকম ‘পাঠ’ বেদের আবৃত্তির ক্যাসেট তৈরি হয়েছিল এবং পূনা বিশ্ববিদ্যালয় ও ‘বৈদিক সংশোধন মণ্ডলে’ যজ্ঞপাত্র নির্মাণ করে রাখা হয়েছে, দেখে শেখার পক্ষে এই যথেষ্ট। তাতে এদের হবে না ; এই গরিব দেশে ধূমধাম করে আস্ত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে টাকা নষ্ট করে কিশোর কিশোরীদের যজ্ঞ দেখাতে হবে, ছবি, ক্যাসেট পূনাতে থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য যজ্ঞের ছবি, ক্যাসেট তৈরি করে বৈদিক যুগ সম্বন্ধে একটা কৃত্রিম মোহ সৃষ্টি করতে হবে। এরা কি জানে যে পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেই প্রাচীনকালে কোনো না কোনো রকম যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হত প্রকৃতিকে, জীবনকে নিজের অনুকূলে আনবার জন্য? জানে কি যে, আয়ারল্যান্ডে খ্রীস্টীয় চতুর্দশ শতকেও অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়েছিল? এদিকে বৈদিক যজ্ঞের একমাত্র বৈশিষ্ট্য হল সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত সেটা চালিয়ে যাওয়া।

যজ্ঞ করা, ছবি, ক্যাসেট বিক্রি করা ছাড়া আর কী কর্মসূচী বেদ পাঠশালার ; তা নির্দিষ্ট করে বলে দেওয়া হয়নি। ‘গুরুকুলের’ ধরনের বিদ্যালয় মানে আচার্য-শিষ্যক্রমে মৌখিক পঠনপাঠন। শিক্ষাসূচী কী? এরা নীরব সেবিষয়ে। তবে সাধারণ বুদ্ধিতে বোঝা যায় বৈদিক সাহিত্য পুরোটা পড়ানো হবে, অর্থাৎ অন্তত খ্রীস্টপূর্ব দ্বাদশ শতক থেকে খ্রীস্টীয় ষষ্ঠ শতক পর্যন্ত এই প্রায় দুহাজার বছরের সাহিত্য পড়ানো হবে। কেমন ভাবে? অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি, সমাজবিজ্ঞান ও ইতিহাসের পটভূমিকা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে ভুইফোঁড় এক সাহিত্য হিসেবে পড়ানো হবে। এর একটা গৌণ কারণ এই সব বেদভক্তরা মনে করে বেদ অপৌরুষেয়, কোনো

মানুষ এটা রচনা করেনি। এরা মনে রাখে না পৃথিবীর সমস্ত ধর্মশাস্ত্র সম্বন্ধে সেই সেই সমাজও এদাবি করেছিল। তারা বলেছিল বাইবেল অপৌরুষেয়, কোরান অপৌরুষেয় যেমন অপৌরুষেয় অবৈজ্ঞানিক। কেল্টিক ড্রুইডদের শাস্ত্র এবং মেস্সিকোর 'পোপুল হবুহ'। এ না বললে একের কথা অন্যের কাছে প্রামাণ্য হত না, ফলে সমাজে কোনো সংহতি থাকত না। বেদবিদ্যালয়েও বলা হবে 'বেদ কোনো মানুষের রচনা নয়' যদিও এর মধ্যে ভাষায়—ব্যাকরণ, শব্দসম্ভার, অম্বয়, ছন্দ সবেই বিবর্তন অতি স্পষ্ট। বিবক্ষিত বস্তুর বিবর্তনও লক্ষণীয় : কর্মকাণ্ড অর্থাৎ সংহিতাব্রাহ্মণে যজ্ঞই মুখ্য ধর্মাচরণ আর আরণ্যক উপনিষদে আত্মব্রহ্ম-ঐক্য উপলব্ধিই মুখ্য। কর্মকাণ্ডের উদ্দেশ্যে ঐহিক সুখস্বাচ্ছন্দ্য, উপায় যজ্ঞ, জ্ঞানকাণ্ডের উদ্দেশ্যে জন্মান্তরের নিরবচ্ছিন্ন ধারা থেকে অব্যাহতি, উপায় আত্মব্রহ্ম ঐক্যবোধ।

এ বিবর্তনের ব্যাখ্যা ঐ সাহিত্যের অভ্যন্তরীণ কোনো কিছু দিয়েই করা যায় না। সে ব্যাখ্যা সম্ভব পারিপার্শ্বিক ইতিহাসে। এদের শিক্ষাসূচীর মধ্যে অন্যান্য প্রাচীনতম দেশের ধর্মগ্রন্থ, যেমন মিশর, চীন, এসিরিয়া, ব্যাবিলোনিয়া, সুমের, গ্রীস মেস্সিকো এসবের পাশাপাশি রেখে বেদকে বোঝাবার চেষ্টার কোনো রকম পরিকল্পনাই নেই। আজকের দিনে শুধু বেদ দিয়ে বেদকে বোঝা যায় না, তাই কণ্ঠস্থ করে ভাষ্যপাঠ করে যেটুকু জ্ঞান জন্মায় ততটুকুই এদের সন্তুষ্ট করে। শ্রুতি শ্রৌতশাস্ত্রই থেকে যাবে, ভারতের ইতিহাসে এর যথার্থ ভূমিকাটুকুই তা একটুও বোধগম্য হবে না, এমনকী প্রাচীন সভ্যতাগুলির ইতিহাসের পটভূমিকায় বেদের স্থান কোথায় তাও বোঝা যাবে না। বলা বাহুল্য, এমন চর্চায় বেদের যথার্থ গৌরব বাড়ে না ; কমে।

বেদকে বিশ্বাস করে পড়া মানে বেদোক্ত সব অনুষ্ঠান—উপনয়ন থেকে শ্রাদ্ধ পর্যন্ত—মেনে চলা ; আর প্রার্থিত বস্তু যজ্ঞ করে পাওয়া যাবে এ বিশ্বাসে যজ্ঞ করা।

মীমাংসা শাস্ত্রের যুগেই বারংবার যজ্ঞকে নিষ্ফল হতে দেখে মানুষ এ বিশ্বাস আর ধরে রাখতে পারছিল না, পুত্রোপ্তি যজ্ঞে পুত্র জন্মাচ্ছিল না। কারীরী ইষ্টিতে বর্ষা আসে না, অশ্বমেধ করেও রাজচক্রবর্তী হওয়া নিশ্চিত হচ্ছিল না। অবিশ্বাস, হতাশা ও কর্মকাণ্ড থেকে জ্ঞানকাণ্ডে উত্তরণের একটা হেতু, একটা স্তরও। কর্মকাণ্ডের নিষ্ফলতার ফলে (জ্ঞানকাণ্ড আরণ্যক উপনিষদ, যেখানে যজ্ঞ প্রতীকী হয়ে উঠেছে) এবং জ্ঞানকাণ্ডের তত্ত্ব সাধারণ মানুষের বোধের অগম্য। যজ্ঞে, মন্ত্র অলৌকিক শক্তি উৎপাদন করে ইষ্টসাধন করবে এ বিশ্বাস আজকের মানুষ করবে না, কারণ বেদে যেসব প্রার্থিত বস্তুর জন্যে যজ্ঞ করা হত তার অনেকগুলিই এখন বিজ্ঞান মানুষকে জোগাচ্ছে, কাজেই বেদের কর্মকাণ্ড এখন অপ্রাসঙ্গিক, অপ্রযোজ্য ; বেদের জ্ঞানকাণ্ড কেবল মনীষীদেরই বোধগম্য হয়। বহু মানুষ জন্মান্তরেই বিশ্বাস করে না, কাজেই মোক্ষ তাদের প্রার্থিতও নয়।

তাহলে বেদ পাঠশালার সার্থকতা কী? বেদে কী আছে তা জানা? এই জানবার

জন্যে দরকার বেদের ব্যাকরণে জ্ঞান, কারণ কালিদাসের সংস্কৃত বেদের ভাষা নয়। বেদের ভাষার নাম ‘ছান্দস’, এর ব্যাকরণ ধ্রুপদী সংস্কৃত থেকে একেবারে ভিন্ন, এ কাব্য স্বরে (উদাস্ত, অনুদাস্ত, স্বরিত ইত্যাদি) পাঠ করতে হবে ; এই ব্যাকরণ ও স্বরপ্রকরণ আয়ত্ত করতে অন্তত দু-তিন বছর সময় লাগাবার কথা, ততদিন ছাত্ররা কি বেদ ছাড়া অন্য কিছু পড়বে না, ইতিহাস, ভূগোল, গণিত ইত্যাদি ? তা যদি পড়ে তা হলে বেদের ব্যাকরণ, স্বর আয়ত্ত করতে আরও বেশি সময় লাগবে। বৃত্তিমূলক যে শিক্ষা ; তার মধ্যে এত সময় তো ছাত্ররা পাবে না। যদি অনন্যকর্মা হয়ে শুধু বেদই পড়ে তবে তারা পরে কী করবে ? শুধু বেদই পড়াবে। এই গরিব দেশে বেদ বিলাসিতা সময় ও অর্থের অনাবশ্যক অপচয় হবে না ?

এত সময় দিয়ে এত কাঠখড় পুড়িয়ে যদি ছাত্ররা বেদে কী আছে জানেও তাহলে সে জ্ঞান তাদের কোন কাজে লাগবে ? তুলনামূলক, ঐতিহাসিক ও আধুনিক বৈজ্ঞানিক রীতিতে পঠনপাঠন অভিপ্রেত নয় তা এদের কথাবার্তা শুনে বোঝাই যায়। এই আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বেদপাঠের যথেষ্ট উপযোগিতা আছে এবং ভারতবর্ষে এবং পৃথিবীর আরও অনেক দেশে একশ বছরের বেশি কাল আগের থেকে সে চর্চা আরম্ভ হয়েছে। এখনও অব্যাহত চর্চা চলছে সর্বত্র। তার সমগোত্রের চর্চা বেদ পাঠশালার উদ্দিষ্ট বা লক্ষ্য নয়।

বেদ পাঠশালায় বেদ পড়ে ছাত্ররা বেদ সম্বন্ধে যা জানবে তা হল, বেদে কী উদ্দেশ্যে কোন যজ্ঞ কেমনভাবে করা হত, যজ্ঞ সম্বন্ধে কিছু উপাখ্যান এবং পরে ঊষানিষদের দার্শনিক চিন্তা, তার সঙ্গেও কিছু উপাখ্যান এবং সেসব সংলাপে বেশ কিছু কাব্যগুণ। সমাজ সম্বন্ধে জানবার প্রথম পর্বে, অর্থাৎ কর্মকাণ্ডে আগন্তুক আর্যদের সঙ্গে সিদ্ধুসভ্যতায় প্রাগার্য অধিবাসীদের সংঘর্ষ এবং আর্যদের নিজেদের মধ্যেও প্রচুর গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ইতিহাস। এসবের মধ্যে দিয়েই জানা যায় সমাজে বর্ণবিভাগ, ধনী ও দরিদ্রের, নারী ও শূত্রের সামাজিক অবস্থান। নানাভাবে এসবের সদ্ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা চলছে দীর্ঘকাল ধরে, কিছু ছাত্র বেদেই পড়বে ‘খেয়ে এঁটোটা স্ত্রীকে দেওয়া উচিত’ (ভুক্ত্যোচ্ছিষ্টং বন্ধৈঃ দদ্যাৎ) বা ‘যে কাপড় ছাতা জুতো ব্যবহারের সম্পূর্ণ অযোগ্য সেগুলো ভৃত্যকে দেবে’ ‘শূত্রের কাজ আর তিন বর্ণের সেবা করা’; ‘একটি নারীর পক্ষে একটি পুরুষই যথেষ্ট কিন্তু একজন পুরুষের পক্ষে দুটি স্ত্রী আবশ্যিক’ অবশ্য বাস্তব যে চিত্র পাই তাতে দুয়ের অনেক বেশি স্ত্রীরই সন্ধান মেলে। এসব দেখে বেদ পাঠশালার ছাত্রদের প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্য সম্বন্ধে শ্রদ্ধা বাড়বে ?

দাস, শূত্র বা অসতী নারীর শাস্তি চূড়ান্তভাবে অমানবিক ; ব্রাহ্মণ সাহিত্যে পড়ি ; কোনো গুণ বা বিদ্যা নেই এমন ব্রাহ্মণও শুধু জন্মসূত্রে-ব্রাহ্মণ হওয়ার গুণেই সকলের ভক্তির পাত্র। সর্বগুণযুক্তা নারীও সম্পূর্ণ গুণহীন পুরুষের অধম—এসব মেনে নেওয়ার মত মানসিকতা তৈরি করবে বেদ পাঠশালা ? যদি করে ত ভবিষ্যৎ প্রজন্মের, ভারতবর্ষের ভবিষ্যতের পক্ষে তেমন নাগরিক বরণীয় না শাস্তিযোগ্য ?

বেদ বলছে, ঝড় বৃষ্টি ঘটে পূর্ণিমা দেবের ইচ্ছায়, বৃষ্টিপাতের দেবতা ইন্দ্র, যম মৃত্যুর অধিদেবতা ইত্যাদি, আজকের ছাত্রছাত্রীদের কাছে ভূগোল ও বিজ্ঞানের সাক্ষ্য অনারকম ; রাহু, চন্দ্র-সূর্যগ্রহণের দেবতা। বেদ বলে পশুদের প্রজনিকা শক্তি পৃথার হাতে, জীববিজ্ঞান বলে অন্য কথা ; বেদপাঠশালার ছাত্ররা হয় বর্তমান জ্ঞানবিজ্ঞানের পরিধি সম্পূর্ণ পরিহার করবে, নয়ত চরম বিভ্রান্তির সম্মুখীন হবে। কিশোর-কিশোরীদের যথার্থ জ্ঞান থেকে বঞ্চিত করে সাড়ে তিন হাজার বছর আগেকার তথ্যে অবরুদ্ধ রাখবার কোন অধিকার আছে রাষ্ট্রপতিদের? ইতিহাসে ভুরি ভুরি মিথ্যা, ভূগোল, বিজ্ঞান-বিরোধী তত্ত্ব, মাত্র ষোলটি গণিত-সূত্রে আধুনিক গণিতশাস্ত্রের সব কথাই বলা হয়ে গিয়েছিল এবং বিধ মিথ্যা দিয়া গঠিত হবে ভাবী প্রজন্মের জ্ঞান? ঘড়ির কাঁটাকে উল্টো দিকে ঘুরিয়ে দিয়ে ইতিহাসের উল্টো মুখে ছাত্রছাত্রীদের রওনা করে দেবার এ প্রয়াস তো আত্মঘাতী।

তামিলনাড়ুর দশবারোটি কিশোরকে বেশ কয়েকবছর আগে কলকাতায় এনে দেখানো হয়েছিল। দশবারো বছরের সেই ছেলেগুলি প্রত্যেকেই ঋগ্বেদের ১০২৮টি সূক্ত মুখস্থ জানে। বিস্ময়কর কৃতিত্ব, সন্দেহ নেই, কিন্তু সময় ও শক্তির কী নিষ্প্রয়োজন, নিষ্ঠুর, অমানবিক অপচয়! স্নান নিভে যাওয়া চোখগুলো নিজীব দীপ্তিহীন মুখভাব। ঐ মুখস্থ সংহিতাটি ছাড়া আর কিছুই জানে না তারা। সে যুগে ছাপাখানা ছিল না, তখন মুখস্থ করা ছাড়া উপায় ছিল না, পৃথিবীর সর্বত্রই তখন মুখস্থ করার রেওয়াজ ছিল। কিন্তু আজ ছাপাখানার দেড়শ বছর পরেও কি আমরা বলব ‘আবৃত্তিঃ সর্বশাস্ত্রাণাং বোধাদপি গরীমসী’? বোধ, বোঝার চেয়ে কিছুই বড় নয়। গুরুকুলের বিদ্যাদান-গ্রহণের পদ্ধতি ত চিন্তাশক্তিকে জড়, পক্ষাঘাতগ্রস্ত করে রাখবে। প্রতিবাদে বলা হয় ঐ পদ্ধতির মধ্যেও বহু চিন্তাশীল মানুষ তৈরি হয়েছে। প্রথমত, এটা ব্যতিক্রমী ; দ্বিতীয়ত, যারা সাধারণ ছাত্রছাত্রী তাদের কথা মনে রেখেই তো শিক্ষাপদ্ধতি প্রবর্তন করতে হবে, ব্যতিক্রমীদের কথা ভেবে নয়।

পরিশেষে প্রশ্ন ওঠে, এরা কীরকম ভারতবর্ষ চায়? যেখানে মানুষ প্রশ্ন করবে না, সন্দেহ করবে না, যাচাই করবে না, যা শুনবে তাই মেনে নেবে, কণ্ঠস্থ করে আত্মসাৎ করবে? তাহলে জীবনের সবচেয়ে বড় যে সমস্যা—মূল্যবোধ—সে সম্বন্ধে এদের সিদ্ধান্ত হল বেদে যা আছে তাই শেষ কথা, সেটা শেখালেই আগামী প্রজন্মের প্রতি আমাদের কর্তব্য করা হয়ে যাবে? ঝাঁকে ঝাঁকে তোতাপাখি তৈরি করার নাম বেদ পাঠশালা ; তার শিক্ষণীয় বস্তু ও পদ্ধতি? এরা কী ভয়ঙ্কর সর্বনাশ ডেকে আনছে ভারতবর্ষের জনজীবনে সে সম্বন্ধে অবহিত হবার সময় পেরিয়ে যায়। প্রতিবাদের লগ্নভ্রষ্ট হলে ক্ষমা পাব না ভাবী প্রজন্মের কাছে। বেদ পাঠশালা চলবে সরকারি অনুদানে। যেদেশে কোটি কোটি মানুষ খেতে পায় না, সেদেশে সরকারি খরচে জাদুঘরে রাখার মত নিষ্প্রাণ পুতুল তৈরি করার অধিকার কে দিল।

বেদ অসামান্য একটি সাহিত্য, প্রাচীন একটি যুগের সুরক্ষিত একটি সমাজচিত্র,

মননের দলিল, এর ভাষা, ভাষার ইতিবৃত্ত মূল্যবান আলোচ্য বিষয়, এর রাষ্ট্রনীতি জ্ঞানবিজ্ঞানের তৎকালীন বোধ, ধর্মচেতনা ও অনুষ্ঠান, বেদকল্পনা, যজ্ঞপ্রক্রিয়া—এসবের মধ্যে বহু শিক্ষণীয় বস্তু আছে কিন্তু তার ভার ইতিহাস-সচেতন বিজ্ঞানমনস্ক গবেষকের হাতে, যাঁরা আরও বহু প্রাচীন সংস্কৃতির পরিব্যাপ্ত পটভূমিকায় বেদকে স্থাপন করে এর বিচার করতে পারেন, একে এর যথার্থ মূল্যে বুঝতে পারেন। সে কাজ বেদ-পাঠশালারদৃষ্টির চক্রবালের ওপারে, ক্ষমতারও বাইরে। এরা বেদ পড়িয়ে ছেলেগুলোকে বোঝাবেন, এই হল পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সংস্কৃতি ও প্রাচীনতম শাস্ত্র, এমত যে কী গভীরভাবে ভ্রান্ত ও কী অপরিমেয় ক্ষতি সাধন করতে পারে তা কি এরা বোঝে না? বোঝে এবং বুঝেই হিন্দুদের শ্রেষ্ঠতায় অন্ধবিশ্বাসী একটি সম্প্রদায় সৃষ্টি করতে প্রয়াসী, যারা মুসলিম-খ্রীস্টান-শিখ-বৌদ্ধ-বিদ্বৈষী হিন্দু হবে ও এই নারকীয় রাষ্ট্রশক্তিকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রাখবার জন্যে প্রাণ দিতেও প্রস্তুত থাকবে। এইরকম যন্ত্রদানবের একটা জনগোষ্ঠী তৈরি করতে পারলে হিন্দু ফ্যাসিবাদ নির্বিঘ্নে ভারতবর্ষের মাটিতে অবতীর্ণ হবে। এ প্রচেষ্টা সর্বশক্তি দিয়ে রুখতে হবে। হাতে সময় বেশি নেই।

AMARBOI.COM

ধর্ম, নাস্তিক্য ও মানবতন্ত্র

শিবনারায়ণ রায়

আমি আকৈশোর নাস্তিক। ঠিক কখন নাস্তিক্য আমার চেতনায় আকার পায় বলা শক্ত, কিন্তু স্মৃতির সড়ক ধরে যত পিছনেই যাই না কেন এমন কোন কাল আমার নজরে আসে না যখন ঈশ্বর, দেবদেবী, আত্মা, প্রেত, পরকাল ইত্যাদি, কিংবা মানুষীকল্পনাজাত নয় এমন কোন অতিপ্রাকৃতের অস্তিত্বে আমার আস্থা ছিল, অথবা পূজাপ্রকরণে আমার অনীহা গভীর ছিল না। এবং যদিও বহু শুভানুধ্যায়ীর মুখে বারবার শুনেছি যে রক্ত শীতল হয়ে এলে তুরীয়ার প্রয়োজন (এবং ভাগ্যে থাকলে, উপলব্ধি) নাকি আপনি ঘটবে, শাস্ত্রনির্দিষ্ট বাণপ্রস্থের কোঠায় বেশ কয়েক বছর আগে পা দেবার পরও অদ্যাবধি আমার লোকায়ত প্রতিনি্যাসে শৈথিল্য ঘটে নি। এমনকি অজ্ঞাবাদের বিদগ্ধ প্রলোভনও আমাকে কিঞ্চিৎমাত্র আকৃষ্ট করে না।

অথচ যে-পরিবারে আমি জন্মেছি এবং যে-পরিবেশে আমার শৈশব, কৈশোর এবং যৌবনের অন্তত কিছুটা অংশ ক্ষুদ্রটেছে, সেখানে ধর্মবিশ্বাসে অভ্যস্ত হওয়া আমার পক্ষে খুব স্বাভাবিক ছিল। মা ছিলেন খাস কলকেতিয়া মেয়ে ; ইহকাল এবং পরকালের দাবির মধ্যে সুস্থিতির চেতনায় তাঁর ছিল সহজ নৈপুণ্য ; সংসারকে তিনি বশ করেছিলেন রান্নাঘর এবং নিরলস সেবার সূত্রে ; আর তাঁর ঠাকুরঘরে ছিল বেসুমার দেবদেবীর রাজত্ব। বিরাট পরিবার এবং আত্মীয় অভাগতদের বিচিত্র দাবিদাওয়া মিটিয়ে যেটুকু বাড়তি সময় তাঁর মিলত তা ছিল ব্রতপার্বণ, উপবাস অনুষ্ঠানে ঠাসা। কিন্তু ধর্মবিশ্বাসের ভিন্ন রূপও আমার একেবারে অপরিজ্ঞাত থাকে নি। শৈশবকৈশোরে একদিকে যেমন শুনেছি পুরোহিতের মুখে শনি-সত্যনারায়ণ-লক্ষ্মীর পাঁচালি এবং গ্রহস্বস্ত্যয়নের মন্ত্র, অন্যদিকে তেমনি শুনেছি সুগভীর পিতৃকণ্ঠে বেদ-উপনিষদ পাঠ। খোলা বারান্দায় প্রত্যুষের অপসূর্যমান অঙ্ককার ; পিতার ভাস্করলোভন দেহের আর্জবে প্রথম আলোর রেখাঙ্কন ; তাঁর বিশুদ্ধ উচ্চারণে সংস্কৃতের উদাত্ত ধ্বনিতরঙ্গ, পদার্থ না বুঝেও অনুভব করতাম এমন এক উপস্থিতির যা মধুময় এবং অসংকুচিত, প্রোজ্জ্বল, স্বয়ম্ভুর এবং নির্ভীক।

পরিবেশের মধ্যেও ছিল ধর্মের দুই সমান্তরাল ধারা। স্কুলরূপী গোয়ালটির দিন শুরু হ'ত ভবতারিণীর কাছে প্রার্থনা দিয়ে। পাড়ায় ছিল ছোটোবড়ো মন্দির এবং বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন সার্বজনীন পূজা-পার্বণের প্রাচুর্য ; পরিজন পড়োশীদেবীর মধ্যে অনেকেই ছিলেন মাদুলি-তাবিজের চলন্ত বিজ্ঞাপন। উত্তর কলকাতার এই বাঙালী

হিন্দুমধ্যবিত্ত অঞ্চলের বেশিরভাগ বাসিন্দাই ছিলেন কালীভক্ত ; তাদের হান্সাধ্বনির মধ্যে শক্তির পরিচয় কতোখানি ছিল জানি না, কিন্তু তাতে যুথচারিতা এবং সংবেশনের প্রকাশ ছিল সুস্পষ্ট। কৃষ্ণভক্ত এবং রামভক্তদের পাড়া ছিল যথাক্রমে আরও কিছুটা উত্তরে এবং পশ্চিমে ; সামান্য খানিকটা পূর্বের দিকে এগোলে আল্লাভক্তদের দেখা মিলতো। সে দিকটা আমাদের কাছে ছিল নিষিদ্ধ, কিন্তু রাজনৈতিক আন্দোলনের দৌলতে কালীভক্ত এবং আল্লাভক্তদের মধ্যে সংঘর্ষ ক্রমশই সে-যুগে প্রবলতর হয়ে উঠছিল। সেই দাঙ্গাহাঙ্গামার যেসব বিবরণ বয়স্কজনদের মুখে আমরা শুনতাম তা পৌরাণিক সুরাসুর যুদ্ধের মতোই রঞ্জিত, রোমহর্ষক, এবং পৈণ্ডন্যসর্পিল।

অপরপক্ষে পারিবেশিক অন্য ধারাটির সঙ্গেও কিছুটা আমার পরিচয় ঘটে কিশোর বয়সে। এটির প্রধান সূত্র ছিল রবীন্দ্রসংগীত। রবীন্দ্রনাথের গানে পূজা, প্রেম এবং তাঁর গল্প, উপন্যাস নাটক, এমনকি কবিতার সঙ্গে তুলনা করলেই বোঝা যায় রবীন্দ্রসংগীতে ধর্মচেতনার অভিশ্রবণ প্রায় অনবচ্ছিন্ন। ঔপনিষদিক ব্রহ্ম থেকে পৌরাণিক শিব, বৈষ্ণবের রাধাকৃষ্ণ থেকে বাড়লের মনের মানুষ তাঁর বিভিন্ন গানে কখনো পরিশ্রুত, কখনো কেলাসিত, কখনো পরস্পরে অভিসারী, কখনো বা পর্যায়বৃত্ত। পিতা, প্রভু, সখা, প্রেমিক, কবি, নর্তক, বৃহস্যময়ী নানা রূপে তাঁর দেবতা তাঁর কল্পনায় প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছেন, এবং সূরের পরিণামে সেইসব রূপ নাস্তিকের চেতনাতেও অন্তর্লিখিত হয়েছে। অর্থাৎ ধর্মের শোভন এবং সহিষ্ণু রূপও অল্পবয়সেই আমি দেখেছি।

ফলত ধর্মে অনুরাগ থাকলে কৈশোরে যৌবনে একটি না একটি ধর্মীয় বিকল্প অবলম্বন করা আমার পক্ষে কঠিন ছিল না। এমন কি আর-পাঁচজন শিক্ষিত বাঙালি হিন্দুর মতো আমিও বিকল্পবোধকে অগ্রাহ্য করে বিভিন্ন বিশ্বাসের মধ্যে অপাটবমুক্ত বিহারের কৌশল অর্জন করতে পারতাম। নিজের নির্জ্ঞান নিজে বিশ্লেষণ করতে পারি এমন সামর্থ্য আমার নেই ; সুতরাং আমার নাস্তিক্যের পিছনে যদি কোন গৃঢ়চেষ্টা থেকে থাকে তার নির্দেশ আমি দিতে পারব না। যতটুকু বুঝতে পারি আমার মধ্যে প্রথম থেকেই জিজ্ঞাসাবোধ অত্যন্ত প্রবল, এবং ধর্মবিশ্বাসে আশ্রয় না নেবার প্রধান কারণ সম্ভবত আমার মধ্যে এই বিপ্রতীপ প্রশংশীলতার উপস্থিতি। ধর্মবিশ্বাসে সব প্রশ্নেরই উত্তর মেলে ; কিন্তু অল্পবয়স থেকেই লক্ষ করতে শুরু করি যে সেসব উত্তরের মধ্যে না আছে সুসংগতি, না যায় তাদের মেলানো দৈনন্দিন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সঙ্গে। ধর্মীয় উত্তর প্রশ্নোদ্বর্ততা দাবি করে, এবং এই দাবিকে মেনে নেওয়া আমার কাছে কোনদিনই সংগত ঠেকে নি।

অবশ্য ধর্মের কোন সামান্যভিধান পাওয়া শক্ত এটা কৈশোরেই নজরে আসে, এবং একদিকে ইতিহাসচর্চা ও অন্যদিকে নানাদেশে ঘোরার ফলে এ তথ্য ক্রমেই আরো স্পষ্টতর হয়েছে যে সমাজসভ্যতার মতো ধর্মের রূপও বিচিত্র। প্রতি ধর্মের

শাখাপ্রশাখাও বহু, এবং বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে মিলের চাইতে অমিলই বেশি প্রত্যক্ষ। এই বৈচিত্র্য লক্ষ করার পরও সম্ভবত বলা চলে যে অধিকাংশ স্ত্রী-পুরুষ যাকে ধর্ম আখ্যা দিয়ে থাকেন তার কয়েকটি সাধারণ লক্ষণ আছে। এই সব লক্ষণের একটি বিস্তারিত তালিকা পেশ করা আমার উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু নাস্তিকেরা যেসব কারণে ধর্মবিরোধী সেগুলিকে কিছুটা পরিস্ফুট করার জন্য এইসব লক্ষণের মধ্যে কয়েকটির উল্লেখ ও আলোচনা সংগত মনে করি। তারপর সেই প্রকরণে আমার কিছু জিজ্ঞাসা উপস্থাপিত করব।

দুই

সব ধর্মের কেন্দ্রেই কতকগুলি স্বকীয় প্রত্যয় বর্তমান, এবং প্রত্যেক বিশেষ বিশেষ ধর্মের অনুরাগীরা দাবি করে থাকেন যে তাঁদের ধর্মের স্বকীয় প্রত্যয়গুলি অপ্রতর্ক্য, অনপেক্ষ, সর্বজনীন এবং স্বয়ংসিদ্ধ। এই দাবির সমর্থনে কোন যুক্তি প্রমাণ মেলে না; যখন কেউ কেউ যুক্তি খাড়া করবার চেষ্টা করেন, তখন বিশ্লেষণ করলেই চোখে পড়ে তা যুক্তি নয়, যুক্ত্যভাস মাত্র। তথ্যসংগ্রহ, পরীক্ষা-নিরীক্ষা, আবিষ্কার উদ্ভাবনের সূত্রে বিশ্বজগৎ এবং তার উপাদান ও পৃথিবীর অধিবাসী এবং তাদের ইতিহাস সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান গত তিনচার হাজার বছরের মধ্যে অনেক পরিবর্তিত এবং পরিশ্রুত হয়েছে। কিন্তু এই বিশ্বজগতের আড়ালে তার স্রষ্টা, শাসক বা নিয়ামক হিসেবে ঈশ্বর আল্লা বা যিহোবা নামে যাকে বিভিন্ন ধর্মে কল্পনা করা হয়েছে তার সম্পর্কে ধর্মবিশ্বাসীদের প্রধান নির্ভর আপ্তবাক্য। শুধু বিনাবিচারে ঈশ্বর, আল্লা বা যিহোবার অস্তিত্ব মেনে নেওয়াই যথেষ্ট নয়; তারই সঙ্গে ধার্মিকেরা দাবি করেন যে বেদ অভ্রান্ত, বা ভগবদগীতা কৃষ্ণরূপী ঈশ্বরের নিজস্ব বাণী, বা যিহোবা মোজেসকে অথবা আল্লা মহম্মদকে বেছে নিয়েছিলেন তাঁর নির্দেশ প্রচারের জন্য, বা যীশু ঈশ্বরের একমাত্র পুত্র, বা চৈতন্য, রামকৃষ্ণ প্রভৃতি ব্যক্তি এক-একটি অবতার পুরুষ ইত্যাদি, ইত্যাদি। এমনকি ঈশ্বর, আল্লা অথবা যিহোবা জাতীয় কাউকে যিনি আত্মসমর্থনে টানেন নি, সেই বুদ্ধ এমন পূর্ণজ্ঞান অর্জন করেছেন বলে দাবি করা হয়ে থাকে যে জ্ঞান প্রশ্নাতীত এবং প্রমাণাতীত।

এখন এই ধরনের দাবি মেনে নিলে তারই অনুসিদ্ধান্ত হিসেবে আরো অনেক দাবি স্বীকার করতে হয়। ধর্মের যাঁরা প্রবর্তক এবং প্রচারক প্রমাণ-নিরপেক্ষ প্রাধিকারের সূত্রে অতিপ্রাকৃত যে-কোন ঘটনাই তাঁদের ক্ষেত্রে সম্ভব। ফল ভক্তদের কাছে বুদ্ধ হয়ে ওঠেন রহস্যাবৃত এক জাদুকর, মোজেস অনুচরদের নিয়ে অনায়াসে হেঁটে সাগর পেরিয়ে যান, কৌমার্য অক্ষত রেখেই মেরী জন্ম দেন যীশুকে, মহম্মদ সশরীরে স্বর্গে ঘুরে আসেন, কৃষ্ণ একই সঙ্গে বহু নারীতে উপগত গন, রামকৃষ্ণ ভক্তকে বিশ্বরূপ দর্শন করান, অরবিন্দের মৃত্যুর পরে তাঁর নাভিকুণ্ড থেকে

অলৌকিক জ্যোতি উৎসারিত হতে থাকে, সাঁইবাবা হাত ঘুরিয়ে আঙটি, ঘড়ি-জাতীয় নাড়ু দেখান। অতিপ্রাকৃত এবং আপ্তবাক্যকে মেনে নিলে তখন আর আভ্যন্তরীণ সংগতি কিংবা প্রতিষঙ্গের প্রশ্ন তোলা চলে না। অতি-প্রাকৃতের সমর্থনে কোন যুক্তিপ্রমাণ মেলে না, এটাই ধর্মবিশ্বাসের বিরুদ্ধে নাস্তিকের প্রধান দার্শনিক আপত্তি নয়; তার প্রধান আপত্তি ধর্মবিশ্বাসের প্রশ্নোদ্বর্ততার দাবি সম্পর্কে। জিজ্ঞাসার সূত্রে বিজ্ঞানের উদ্ভব ও বিকাশ; সেই জিজ্ঞাসাকে ধর্মবিশ্বাস রুদ্ধ করে বলেই নাস্তিকের বিচারে ধর্ম ক্ষতিকর। প্রকৃত বস্তু বা ঘটনায় অপ্রাকৃতের আরোপ বা উৎপ্রেক্ষণ ধর্মমাত্রেরই বৃত্তি; তার ফলে সত্য-অসত্যের ভেদ অস্পষ্ট হয়ে আসে, প্রকল্পের বিচার ও পরীক্ষা নিষ্প্রয়োজন হয়ে পড়ে, জ্ঞানের বিকাশ ব্যাহত হয়।

কিন্তু ধর্ম যদি শুধুমাত্র অতিপ্রাকৃত এবং আত্মবাক্যের প্রশ্নোদ্বর্ততা দাবি করত তাহলে মানুষের ইতিহাসে তার প্রভাব হয়তো এতটা মারাত্মক হ'ত না। দাবিকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য ক্ষমতা প্রয়োজন, এবং ক্ষমতার অন্যতম প্রধান সূত্র হচ্ছে সংগঠন। কোন একটি ধর্মের মূল প্রত্যয়গুলি যাঁর কল্পনায় প্রথম আকার পায় তিনি যখন লোকালয়ে সেই প্রত্যয়গুলির প্রধান উদ্যোগী হন তখন তাঁর কিছু ভক্ত এবং অনুরাগী জোটে, এবং তাঁর স্বৈচ্ছায় বা অনিচ্ছায় তাদের নিয়ে একটি ধর্মীয় সংগঠন গড়ে ওঠে। এই সংগঠন নানা ধরনের হতে পারে; এবং সেই ধর্মের প্রভাব ব্যাপক হবে কি হবে না এবং যদি হয় তা হতে কতটা সমর্থন লাগবে, তার একটা কাজ চলা গোছের হিসেব করতে গেলেও নানা তথ্য জ্ঞান দরকার। কিন্তু মোটামুটি বলা চলে যেসব প্রত্যয়ীরা সম্প্রচারে সম্পূর্ণ বীতশুষ্ক এবং অকারণে পর্বত, গহুরে বা অরণ্যে অথবা মরুভূমিতে স্বৈচ্ছায় বাস করেন, তাদের ধর্ম ব্যাপক কোন প্রভাব ফেলে কি না সন্দেহ। অপরপক্ষে অধিকাংশ প্রভাবশীল ধর্মের প্রচার প্রতিপত্তির ভিত্তি হচ্ছে সংগঠন, এবং প্রতিষ্ঠাতা নিজে যদি সংগঠক না হন তাহলে তাঁর অন্তত কয়েকটি তেমন ভক্তের প্রয়োজন ঘটে যাঁরা তাঁকে ওজস্বী ভাষায় বহুজনের সম্মুখে সম্প্রচারিত করবেন, এবং যাঁদের সংগঠনের সামর্থ্য অসমান্য। যীশুর এইরকম কয়েকটি প্রচারক ভক্ত জুটেছিল যাঁরা তাঁকে কেন্দ্র করে অজস্র অতিপ্রাকৃত ঘটনা এবং অতিকথা রচনা ও রটনা করেছিলেন। ভারতবর্ষে এ-জাতীয় উদাহরণের কোন অভাব নেই। গত শতকের শেষদিকে রামকৃষ্ণকে প্রাধিকারী খাড়া করে বীর্যবান ও বাগ্মী ভক্ত বিবেকানন্দ যে-সংগঠনটি গড়ে তোলেন মার্কিনের বিভিন্ন শহরে এখনো তার শাখাগুলি সক্রিয়। তাঁর মডেল ছিলেন সম্ভবত জেসুইরা, আবার তাঁর প্রতিষ্ঠানকে মডেল করে সম্প্রতিকালে অনেকগুলি হিন্দু মিশনারী প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে মার্কিনী তরুণ-তরুণী মহলে যাদের বিশেষ রবরবা।

এখন ধর্ম যখনই সংগঠনভিত্তিক হয়ে ওঠে তাকে কতকগুলি লক্ষণ ফুটে উঠতে থাকে যাদের কোন যুক্তিতেই সমর্থন করা দুঃসাধ্য। যে-ব্যক্তির অভিজ্ঞতা, কল্পনা এবং প্রত্যয়সমষ্টির উপাদানে একটি বিশেষ ধর্ম রচিত হয়েছিল তাঁর প্রাধিকারকে

নিচ্যারোধ করবার প্রয়োজনে তাঁর ওপরে দেবতারোপ অবশ্যম্ভাবী। ধর্মের সঙ্গে দর্শনের এটিই অন্যতম প্রধান পার্থক্য। বুদ্ধ নিজে নির্বাণের কথা বললেও চেলারা ধর্মের সঙ্গে তাঁর এবং সঞ্জের শরণ নিয়েছেন ; অনাত্মবাদীকে দেবতা বানিয়ে জুপ, চৈত্যা, বিহার ইত্যাদি পরবর্তীকালে নির্মিত হয়েছে। তাঁর জীবনে নানা অতিপ্রাকৃত ঘটনার সমাবেশ মুখ্যত ভক্তদের প্রয়োজনেই কল্পিত।^১ অপরপক্ষে সঙ্ক্রেটিসের ক্ষেত্রে দেবতারোপ বা তাঁর জীবনে অতিপ্রাকৃত ঘটনার সমারোহ হয়নি কারণ তিনি কোন ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা নন, এবং প্রেটো তাঁর গুরুর প্রাধিকারের ভিত্তিতে কোন ধর্মীয় সংগঠনে গড়ে তোলায় উদ্যোগী ছিলেন না। ভারতবর্ষে, এমনকি বাংলাদেশেও ব্রাহ্মধর্ম যে বিশেষ জনসমর্থন পায় নি তার অন্তত একটি কারণ রামমোহন মহাব্যক্তিহ্রস্বসম্পন্ন পুরুষ হয়েও কোন অতিপ্রাকৃত শক্তি দাবি করেন নি। এবং তাঁর প্রতি সুগভীর শ্রদ্ধা ও অনুরাগ সত্ত্বেও দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র অথবা শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁকে দেবতা বা অবতাররূপে উপস্থিত করার প্রয়াস করেন নি। আসলে ব্রাহ্মধর্মের মূলেই একটি স্ববিরোধ চোখে পড়ে। রামমোহন একদিকে বৈজ্ঞানিক শিক্ষা, প্রায়োগিক দর্শন এবং আরোহী অনুসন্ধানের প্রবল সমর্থক ; অন্যদিকে তিনি উপনিষদের তত্ত্বকে এমন প্রাধিকার দিয়েছেন যা ঘোষিতভাবে অপ্রতর্ক্য। ব্রহ্মজ্ঞানের সঙ্গে বিজ্ঞানের কোন রফা অকল্পনীয়। কারণ প্রথম ক্ষেত্রে জ্ঞান শাস্ত্র এবং অব্যয় রূপে কল্পিত, আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে জ্ঞান স্বীকৃতিভাবেই সীমাবদ্ধ, বিচারসাপেক্ষ, পরিবর্তনশীল, সেখানে নতুন তথ্য আহরণ বা বিচার-বিশ্লেষণের ফলে প্রচলিত প্রকল্প ভ্রান্ত বা অসম্পূর্ণ প্রমাণিত হতে পারে, এবং ফলে সেখানে জ্ঞান অস্বীভূত নয়, তা বিবর্ধমান। ব্রাহ্মধর্ম দুইয়ের মধ্যে রফা করতে গিয়ে ধর্ম হিসেবেও বিশেষ প্রসার লাভ করে নি, দর্শনরূপেও গড়ে ওঠে নি। অপরপক্ষে রামকৃষ্ণ দেবতারোপ করে বিবেকানন্দ শুধু স্বদেশে নয়, বিদেশেও ভক্ত আকর্ষণ করেছিলেন এবং তাঁর পরিকল্পিত সংগঠনের নিয়মানুগত্য, বিস্তারসম্পদ এবং প্রভাব-প্রতিপত্তি বর্তমানে অনেক রাজনৈতিক দল ও ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের চাইতেও বেশি।

ধর্মীয় সংগঠন গড়ে উঠলে তখন তার কাজ শুধু প্রচারে আবদ্ধ থাকে না। সেসব প্রত্যয় এবং তাদের সঙ্গে জড়িত অতি প্রাকৃত কাহিনী-কিংবদন্তী ধর্ম-সংগঠনের আদিম মূলধন, তাদের যথার্থ সম্পর্কে কেউ সংশয়ী হলে তার কঠোরোধ করার জন্য সংগঠন উদ্যোগী হয়ে ওঠে। ধর্ম-সংগঠনের কর্মসূচীর একদিকে যদি থাকে আপ্তবাক্যের প্রচার, অন্য দিকে তাহলে দেখা যায় জিজ্ঞাসুনিধন-যজ্ঞ। প্রচারের রূপটা মোটামুটি স্পষ্ট, কিন্তু নিধনক্রিয়া সবক্ষেত্রে সমান প্রত্যক্ষ নয়। খৃষ্টধর্ম এবং ইসলামের ইতিহাসে দুটি দিকই অত্যন্ত প্রবল ; বাইবেল এবং কোরানের প্রচার শুধু শব্দের জাদুর উপরে নির্ভর করেনি, তার জন্য বারবার অস্ত্রশস্ত্রের প্রয়োগ ঘটেছে। যাঁরা অন্য ধর্মের লোক অথবা অবিশ্বাসী তাঁদেরই শুধু জবরদস্তি করে নিজের ধর্মে ভেড়াবার চেষ্টা হয় নি, নিজের ধর্মের মধ্যে যাঁরা কর্তৃপক্ষের ব্যাখ্যানে কিছু সন্দেহ

প্রকাশ করেছেন ব্যতায়ী বলে তাঁদেরও প্রভূত অত্যাচার সহিতে হয়েছে। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ধর্মের এই হিংস্র অসহিষ্ণুতা আমাদের যুগে বর্তেছে ফ্যাসিজম্ এবং কমিউনিজম্ নামা দুই রাজনৈতিক ব্যবস্থায়। অন্তত এদিক থেকে শেষোক্তরা ধর্মীয় ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী।

আপাতদৃষ্টিতে হিন্দুধর্মে এই হিংস্রতা তত স্পষ্ট নয়। তার কারণ নানা, কিন্তু কারণ যা-ই হোক হিন্দুধর্মের ক্ষেত্রেও অন্তত দুটি প্রাসঙ্গিক লক্ষণ অগ্রাহ্য করা অসংগত। এই উপমহাদেশের ইতিহাসে ভাবনাচিন্তার ক্ষেত্রে এক সময়ে চার্বাক এবং বৌদ্ধদর্শনে জিজ্ঞাসার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। চার্বাক বা লোকাযত চিন্তার প্রতি সহিষ্ণুতার বিশেষ চিহ্ন এদেশে দেখা যায় না, বস্তুত ঐ চিন্তার সূত্রাদি যেভাবে বিকৃত এবং প্রায় অবলুপ্ত হয়েছে তা থেকে ধর্মীয় হিংস্রতার ও অসহিষ্ণুতারই প্রমাণ মেলে।^১ বৌদ্ধজিজ্ঞাসা সম্ভবত বুদ্ধ এবং বোধিসত্ত্ব পূজার প্রভাবে নিজে থেকেই ক্ষীণ হয়ে আসে। দ্বিতীয় দিকটি এর চাইতেও বেশি ভয়াবহ। হিন্দুধর্মের মুখ্য বাহন সমাজ-সংগঠন, আচারবিচার, পূজা প্রায়শ্চিত্ত ইত্যাদি। হিন্দুদের মধ্যে যাঁরা নিজেদের উচ্চজাতি বলে ঘোষণা করে এসেছেন অধম জাতিদের সম্পর্কে তাঁদের ধারণা এবং শেষোক্তদের প্রতি উচ্চজাতিদের আচরণ সব চাইতে অসহিষ্ণু এবং সহিংস ধর্মদেরও সম্ভবত হার মানায়। এদেশের ইতিহাসে তার প্রচুর পরিচয় বর্তমান; বস্তুত সমকালীন ভারতবর্ষেও অস্পৃশ্যদের প্রতি হিন্দু উচ্চজাতিদের ধর্মীয়-সামাজিক অসহিষ্ণুতা বিশেষ কমেছে বলে মনে হয় না। আইনের চোখে কেউই আর অস্পৃশ্য নেই বটে; সংবিধান অনুসারে তফসিলভুক্ত গোষ্ঠীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থাও করা হয়েছে। কিন্তু সেখানে ব্রাত্যগোষ্ঠীর কোন মানুষ সামাজিক জীবনে উচ্চবর্ণের মানুষের সঙ্গে সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে সেখানেই উচ্চবর্ণের লোকেরা প্রবল আঘাত হেনেছে। সংবাদপত্রে প্রায় প্রত্যহই ‘হরিজন’দের বা ‘দলিত’দের উপরে সুপরিকল্পিত আক্রমণের বিবরণ প্রকাশিত হয়।

ধর্মবিশ্বাসীরা তুরীয় এবং অপার্থিবের কথা বললেও নথিপত্র থেকে দেখা যায় পার্থিবের প্রতি তাঁদের আকর্ষণ কিছুমাত্র কম নয়। ব্যক্তিগত ব্যতিক্রম নিশ্চয় আছে, কিন্তু সংগঠন গড়ে উঠলেই জমিজমা, বিত্তপ্রতিপত্তির প্রয়োজন ঘটে; তখন আশ্রমকে কেন্দ্র করেই আকার নেয় জমিদারি, লেনদেন, মুনাফা ইত্যাদি। বৈষয়িক স্বার্থের খাতিরে ধর্মপ্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থার সমর্থক হয়ে ওঠেন—তেমন শক্তি সঞ্চয় করতে পারলে তাঁরাই হন সেই ব্যবস্থার প্রধান ধারক এবং পরিচালক। অন্যথায় রাজা, জমিদার, ব্যবসায়ীদের সঙ্গে তাঁরা খাতির পাতানোর উদ্যোগী হন। এই ক্ষেত্রে পূর্ব এবং পশ্চিমের অভিজ্ঞতায় খুব একটা ফারাক দেখা যায় না। চার্চই শুধু প্রচুর বিষয়সম্পত্তি করে নি; এদেশে মঠমন্দিরকে কেন্দ্র করেও বিস্তারিত জমিদারি ও মহাজনী কারবার গড়ে উঠেছে। সম্প্রতিকালে এই প্রক্রিয়ায় ছেদ ঘটেছে মনে করার কারণ দেখি না। শাদা, কালো, হলদে, গেরুয়া, লাল, নানা রঙের উর্দি চাপিয়ে

বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এখনো পরমার্থের নামে বিস্তর অর্থ সংগ্রহ করছেন এবং সেই অর্থ নানারকম মুনাফাজনক শোষণের ব্যবসায়ে খাটিয়ে যাচ্ছেন।

ধর্মের বিরুদ্ধে নাস্তিকের মুখ্য অভিযোগের একটি হল এই যে পাহারাওয়ালা এবং সৈন্যবাহিনীর চাইতেও অনেক বেশি সাফল্যের সঙ্গে ধর্মপ্রতিষ্ঠানরা প্রতিষ্ঠিত অসাম্যভিত্তিক সমাজব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখায় সাহায্য করে এসেছেন। সব সমাজেই কম বেশি অসাম্য, অত্যাচার, শোষণ এবং পীড়ন বর্তমান। তার ফলে যে বিক্ষোভ হওয়া স্বাভাবিক, ক্ষমতাশালীরা তাকে দমন করার জন্যে পাহারাওয়ালা এবং সেনাবাহিনীকে নিযুক্ত করবেন, এটা প্রত্যাশিত। কিন্তু গায়ের জোরে দমনের চাইতে মনের ভিতর থেকে বিক্ষোভকে সংবেশিত করা প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিদের কাছে ঢের বেশি কাম্য। এই কাজটি ধর্মের মারফৎ সব চাইতে সাফল্যের সঙ্গে করা চলে। “আদিম পাপ”—এ কিংবা জন্মান্তরবাদে বিশ্বাস যদি ব্যাপক এবং দৃঢ়মূল করা যায় তাহলে গ্লানিকর ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ নিরর্থ হয়ে পড়ে। যা আছে তা দৈবাদিষ্ট ও অসংগত নয় এটা যদি একবার মেনে নেওয়া যায়, তাহলে পরিবর্তনের জন্য আর কোন উদ্যোগ উৎসাহ প্রবল হতে পারে না। জিজ্ঞাসা সম্মোহিত হলে ধর্মবিশ্বাসীদের যেমন সুবিধে হয়, প্রতিষ্ঠিত অসাম্য এবং শোষণের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ভিতর থেকেই ভোগবৃন্ত হলে সেই ব্যবস্থায় যাঁদের কায়েমী স্বত্ত্ব আছে তাঁরা নিশ্চিত বোধ করতে পারেন। এক্ষেত্রে ধর্মের “অবদান” সুবিদিত।

জিজ্ঞাসার চাপে যদি আমি নাস্তিক হয়ে থাকি, সেই নাস্তিক্য প্রবলতর হয়েছে প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থার প্রতি ধর্মীয় প্রতিপন্যাসের চেহারা লক্ষ করে। ছেলেবেস থেকে পথঘাটে দেখেছি ভিখারী, কুষ্ঠরোগী, অর্ধাহারী অনাহারী স্ত্রী-পুরুষ। কেন তাদের এমন অবস্থা এই প্রশ্নের উত্তরে শুনেছি পূর্বজন্মের পাপকর্মের এই নাকি ফল। পূর্বজন্মে কে কী করেছে ইতিহাসে তার কোন হদিশ মেলে না। অপরপক্ষে সমাজব্যবস্থার বিশ্লেষণ করলে এইসব দুঃখের কিছুটা হেতু নির্ণয় সম্ভব; এবং হেতু জানলে দুঃখ দূরীকরণের, অন্ততপক্ষে লাঘবের প্রচেষ্টা করা যায়। বড়ো হয়ে দেখেছি ব্যাপক দুর্ভিক্ষ এবং মহামারী, যুদ্ধ এবং সাম্প্রদায়িক হত্যাকাণ্ড, শুনেছি জার্মানীতে ইহুদিনিধনের ভয়াবহ কাহিনী, পড়েছি নিগ্রোদের ওপরে শ্বেতকায় মার্কিনীদের অত্যাচারের কথা, সোভিয়েট ইউনিয়নে দাসশিবিরের বিবরণ। এসব দেখা জানা পড়ার পরও যাঁরা বোঝাতে চেয়েছেন জগতে সব-কিছুর পিছনেই কোন মঙ্গলময় উদ্দেশ্য আছে, শেষ পর্যন্ত সব অত্যাচার, অবক্ষয়, যন্ত্রণার পিছনে কোন পরমকারুণিক অস্তিত্ব সক্রিয়, তাঁদের ব্যাখ্যাকে গ্রহণ করা সম্ভবপর ঠেকে নি। বরং মনে হয়েছে মার্কস, ফ্রয়েড, রাসেল প্রভৃতির রচনায় মানবীয় অবস্থার কয়েকটি নির্ভরযোগ্য সূত্রের নির্দেশ পাওয়া যায়, এবং এই সূত্রগুলি পথনির্দেশক হলেও প্রশ্নোদ্ভব নয়। শরীরের মতো সমাজের ক্ষেত্রেও কারণ জানা থাকলে অস্বাস্থ্য থেকে স্বাস্থ্যের দিকে যাওয়ার চেষ্টা সম্ভবপর; এবং কোন পরমজ্ঞান দাবি না করেও

(অথবা দাবি না করার ফলেই) চিকিৎসক যেমন দায়িত্বশীল ও সক্রিয় হতে পারেন, একজন বিবেকী নাস্তিকও নিজের জ্ঞানের সীমা সম্পর্কে সচেতন থেকেই তেমনি অসাম্য এবং অত্যাচারের প্রতিকারের কাজে নিজেকে নিযুক্ত করতে পারেন। তাঁর নির্ভর দেবতা, গুরু, মন্ত্র অথবা অতিপ্রাকৃত শক্তি নয় ; তাঁর নির্ভর অভিজ্ঞতা, যুক্তি, মমতা, উদ্যোগ, সহযোগিতা এবং নিজের ও সকল মানুষের প্রতি অনড় দায়িত্ববোধ।

তিন

কিন্তু যদিও আমি চিন্তার দিকে থেকে সম্পূর্ণভাবেই নাস্তিক, তা হলেও ধর্মকে শ্রেফ এক ধরনের মানসিক আফিম বলে খারিজ করা আমার কাছে যুক্তিসংগত ঠেকে না। কেন ঠেকে না সে-কথা বলার ভিতর দিয়ে ধর্ম সম্বন্ধে আমার কয়েকটি জিজ্ঞাসা স্পষ্টতর হয়ে উঠবে আশা রাখি।

ধর্মীয় প্রত্যায়াবলীর সমর্থনে যে সব যুক্ত্যাভাস খাড়া করা হয়ে থাকে তারা যদিচ নিতান্তই নড়বড়ে এবং ধর্মপ্রচারের ইতিহাসে জিজ্ঞাসার উপস্থচ্ছেদ এবং মর্ষকাম ও ধর্ষকামের প্রাবল্য যদিও সবিশেষ প্রত্যক্ষ, তবু অন্তত তিনটি কারণে ধর্মকে আমি ব্যামোহমাত্র মনে করি না। প্রথমত এমন কয়েকজন ব্যক্তিকে আমি দেখেছি এবং জানি যাঁরা ঘোষিতভাবে ধর্মবিশ্বাসী, কিন্তু যাঁদের চরিত্রে এবং আচরণে এমন সব গুণ উপস্থিত (যেমন করুণা, সততা, প্রসন্নতা, সৃষ্টিশীলতা, সেবাবৃত্তি, সাহস, সমভাব, ইত্যাদি, যা আমার বিচারে অত্যন্ত মূল্যবান। তার অর্থ নয় যে এইসব গুণ ধর্মবিশ্বাস থেকে উদ্ভূত। কিন্তু অন্তত এই বিশেষ স্ত্রীপুরুষদের ক্ষেত্রে এইসব গুণকে তাঁদের ধর্মবিশ্বাস থেকে বিচ্ছিন্ন করা বোধ হয় যায় না। ফলে মনে প্রশ্ন ওঠে, ধর্মের সঙ্গে এইসব গুণের সম্পর্ক কী? “চতুরঙ্গের” জ্যাঠামশায়ের চরিত্রে যেসব গুণের সমাবেশ ঘটেছিল তাদের উদ্ভব এবং পোষণের জন্য কোন ধর্ম-বিশ্বাস প্রয়োজন হয় না। আমার সমকালীন ও ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত যে অল্প কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি আমার চরিত্রে ও চিন্তায় প্রভাব ফেলেছেন—যেমন বট্টান্ড রাসেল, মানবেন্দ্রনাথ ও এলেন রায়, রাজশেখর বসু, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, আলবের কামু প্রভৃতি—তাঁরা কেউই ধর্মবিশ্বাসী ছিলেন না। কিন্তু যে অল্প কয়েকজন পরিচিত ধর্মবিশ্বাসীকে আমি শ্রদ্ধা করি, তাঁরা কি ধর্মের আশ্রয় ছাড়া তাঁদের সদগুণগুলিকে শুভনাস্তিক্যের আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে পারতেন? ধর্মবিশ্বাস যদি তাঁদের এইসব গুণাবলীর রক্ষণে এবং বিকাশে সাহায্য করে থাকে তাহলে নিজে নাস্তিক হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের সেই বিশ্বাসকে আমি অশ্রদ্ধা করতে পারি না।

দ্বিতীয় কারণটি প্রথমটির চাইতে স্থানে কালে অনেক বেশি ব্যাপক। গত পাঁচহাজার বছরের ইতিহাসে একদিকে যেমন ধর্মীয় মূঢ়তা এবং অসহিষ্ণুতার অজস্র নজির মেলে, অন্যদিকে তেমনি শিল্পে, সংগীতে, কাব্য ধর্মের বিস্তীর্ণ এবং

গভীর প্রভাব নিতান্তই প্রত্যক্ষ। আধুনিক যুগকে যদি বাদ দিই তাহলে সম্ভবত একথা বলা চলে যে মানুষের সৃজনশীল কল্পনা এবং বিবিধ শিল্পকর্মে তার রূপায়ণ অনেকখানিই ধর্মবিশ্বাসের দ্বারা চিহ্নিত। সারনাথের বুদ্ধ, মথুরার বিষ্ণু, এলিফ্যান্টার শিব, অথবা মমলুপুরের মহিষমর্দিনীকে বাদ দিয়ে এই উপমহাদেশে ভাস্কর্যের ইতিহাস অকল্পনীয়। ধর্মীয় স্থাপত্যের অসংখ্য বিস্ময়কর উদাহরণ দেখতে পাই মধ্যযুগীয় ইয়োরাপের উৎকাঙ্ক্ষায়ী গথিক ক্যাথিড্রালগুলিতে, পশ্চিম এশিয়ার নীলাভ মসজিদ মিনারেটগুলিতে, সাঁচী স্তূপে, ভুবনেশ্বর-কোনারক-খাজুরাহের রূপোৎকীর্ণ মন্দিরগুলিতে। শুধু যে ভারতীয় সংগীতের একটি প্রধান অংশ ধর্মীয় বিশ্বাসের সঙ্গে যুক্ত তা নয়, ইয়োরাপীয় সংগীতেও ধর্মীয় প্রভাব দীর্ঘকাল ধরে প্রবল ও ফলপ্রসূ। ইয়োরাপীয় সংগীত যাঁরা উপভোগ করেন তাঁদের দার্শনিক চিন্তা যে-ধরনেরই হোক না কেন মোৎসার্ট, বেটোফেন হাগনার কিংবা স্ট্রাভিনস্কির তুলনায় বাখ তাঁদের কম প্রিয় নন। এরই সঙ্গে লক্ষণীয় যে সব দেশেই প্রাগাধুনিক যুগের কাব্যে ধর্ম খুব বড়ো অংশ জুড়ে আছে। দান্তের মহাকাব্য আজও আমাদের তেমনি মুগ্ধ করে যেমন করে অনেক বৈষ্ণব পদাবলী অথবা রামপ্রসাদের শ্যামাসংগীত। ফলত কোন নাস্তিক যদি সুবেদী এবং রসিক হন, শিল্প, সংগীত এবং সাহিত্যের যদি তাঁর অনুরাগ থাকে, তাহলে তিনি লক্ষ করতে বাধ্য যে ঐ জগতের অনেকটাই একদা ধর্মাশ্রিত ছিল, এবং আধুনিক যুগেও এই সম্পর্ক পুরোপুরি ছিল হয় নি। বিশ শতকের কবিদের মধ্যে যাঁরা আমাদের বিশেষ প্রিয় তাঁদের মধ্যে যেমন আছেন সুধীন দত্ত, এলুয়ার ও নেরুদা তেমনি আছেন রবীন্দ্রনাথ, রিলকে ও এলিয়ট। অবশ্য প্রত্যক্ষভাবে ধর্মের সঙ্গে যুক্ত নয় এমন স্থাপত্য, ভাস্কর্য, চিত্রাঙ্কন, সংগীত, সাহিত্য অতীতেও রচিত হয়েছে, বর্তমান যুগে এই বিয়োগ অনেক বেশি ব্যাপক এবং পরিস্ফুট। তা সত্ত্বেও প্রশ্ন থাকে, ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে শিল্পকল্পনার সম্পর্ক কী ধরনের? এই সম্পর্ক কি সমাপতনের? দু'এর মধ্যে দীর্ঘকাল ধরে যে সন্নিধি দেখা দিয়েছিল তা কি আসলে আপাতিক? অথবা এরা উভয়েই এক মানসউৎস থেকে উদ্ভূত? একের কৃশায়ণ অথবা অভিক্রান্তির ফলে অন্যটি প্রবল অথবা দুর্বল হয়? এলিয়ট, ম্যারিট্যা প্রমুখ অনেকে অভিযোগ করেছেন আধুনিককালে আটকে ধর্মবিশ্বাসের জায়গায় বসাবার চেষ্টা হয়েছে এবং তাঁদের মতে এ-চেষ্টা নিতান্তই অপচেষ্টা। এলিয়ট শুধু ধর্মবিশ্বাসী নন, তিনি এ যুগের একজন প্রধান কবি এবং সাহিত্যসমালোচক। তার এই অভিযোগকে সাহিত্যানুরাগী নাস্তিক কতটা গুরুত্ব দেবেন?

তৃতীয় কারণটি দ্বিতীয় কারণটি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা, যদিও প্রথম কারণটির সঙ্গে তার যোগ আছে। প্রত্যেক ধর্মের কেন্দ্রে যেসব প্রত্যয় থাকে তাদের মধ্যে অনেকগুলিই নীতিজাতীয়, অর্থাৎ বিশ্বাসীদের কাছে সেগুলি উচিত অনুচিতের নির্ণায়ক। এইসব নীতির মধ্যে প্রচার-বিবিরোধ থাকে এবং ফলে বাকছল ও ভণ্ডামিতে

অভ্যস্ত না হলে ধর্মাচরণ নিতান্ত কঠিন কাজ। তা সত্ত্বেও বোধহয় বলা চলে যে প্রতি ধর্মের কেন্দ্রেই কতকগুলি নৈতিক নির্দেশ বিদ্যমান এবং বিশ্বাসীদের জীবনে এইসব নির্দেশের প্রভাব বহুপ্রসারী। মানুষের ক্ষেত্রে নীতিকে বাদ দিয়ে কী ব্যক্তিগত কী সামাজিক জীবন দুই-ই অকল্পনীয় ; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এমনকি এই আধুনিক যুগেও ধর্মের প্রাধিকার থেকে বিচ্ছিন্ন করে নীতি নির্দেশের প্রতি আনুগত্যের কথা ভাবতে পারেন না। মানুষের বোধবুদ্ধির কাছে অহিংসানীতির আবেদন প্রত্যাশিত ; কিন্তু জীবনে যাঁরা অহিংসানীতির অনুসরণে উদ্যোগী তাদের মধ্যে অধিকাংশই ধর্মীয় সূত্রে এই নীতি গ্রহণ করেছেন। কেউবা এই আদর্শে দীক্ষিত হয়েছেন বৌদ্ধ অথবা জৈন্য ধর্মের সূত্রে, কেউবা খৃষ্টধর্ম বা বৈষ্ণবধর্মের সূত্রে। অহিংস নাস্তিক মানবতাবাদী অবশ্যই আছেন, কিন্তু এখনো পর্যন্ত সংগঠনমূলক কাজে তাঁদের উপস্থিতি কম চোখে পড়ে। সেবানীতির ঔচিত্য সহজ বুদ্ধিতেই বোঝা যায় ; কিন্তু দুঃস্থিত জনের সেবায় যাঁদের জীবন নিয়োজিত তাঁদের মধ্যে এমন ব্যক্তি খুব বেশি মেলে না যাঁরা আপন আপন ধর্মবিশ্বাস থেকে সেবাব্রতের নির্দেশ পান নি। গৃহযুদ্ধের প্রচণ্ড আবর্তের মাঝখানে আমি দেখেছি করুণাময়ী ক্যাথলিক সেবিকাকে যিনি গভীর নিষ্ঠায় সর্বজনের পরিত্যক্ত কুষ্ঠরোগীদের একাকী শুশ্রূষা করছেন। মহামারীর কেন্দ্রে দেখেছি বৌদ্ধ ভিক্ষুকে যিনি বিস্ফটিকাক্রান্ত রোগীদের সেবা এবং চিকিৎসা করছেন। তাঁদের সাহস, করুণা, সেবাবৃত্তি, সংগঠনসামর্থ্য ও দক্ষতা আমাদের তাদের প্রতি শ্রদ্ধাশ্রিত করেছে। কাব্য, ভাস্কর্য, সংগীতের মতোই অহিংসা এবং সেবাকে আমি জীবনে অত্যন্ত মূল্যবান মনে করি। কবীন্দ্রনাথ, রোদ্যাঁ অথবা আলাউদ্দিন খাঁর মতো মাদার টেরেসার ভিতরেও আমি মনুষ্যত্বের প্রকৃষ্ট প্রকাশ দেখতে পাই। কোন ধর্ম বিশ্বাস যদি এই নীতিবোধের সহায়ক হয়, তাকে অগ্রাহ্য করা অন্তত আমার বিচারের অসংগত ঠেকে।

অর্থাৎ যদিও আমি মনে করি দেবতা, ঈশ্বর, আত্মা অতিপ্রাকৃত ইত্যাদি মানুষের কল্পনামাত্র এবং মানুষের পূর্বে ও পরে অথবা মানুষকে বাদ দিয়ে এদের কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই, তবুও ধর্মকে শুধুমাত্র ক্ষতিকর মনে করা আমার বিচারে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন নয়। সেক্ষেত্রে প্রশ্ন ওঠে, সেসব গুণ এবং ক্রিয়াকে মূল্য দিয়ে থাকি ধর্মীয় প্রত্যয় এবং চেতনার সঙ্গে তাদের কোন আবশ্যিক ও সার্বিক যোগ আছে কিনা। এ জাতীয় প্রশ্নের সর্বজনগ্রাহ্য উত্তর মেলা সহজ নয়, কিন্তু এ-প্রশ্ন নিয়ে যাঁরা মুক্তমনে বিচার করবেন তাঁদের কয়েকটি কথা স্মরণে রাখা দরকার। প্রথমত, ইতিহাসে এবং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় এমন কিছু ব্যক্তির পরিচয় মেলে যাঁরা পূর্বোক্ত গুণরাজির অধিকারী, কিন্তু যাঁরা ধার্মিকতার দ্বারা চিহ্নিত নন। এপিকুরসের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে বিশেষ তথ্য মেলে না ; কিন্তু জীবনকে একটি উদ্যানের মতো করে গড়ে তোলার যে আদর্শ তিনি উপস্থিত করেছিলেন তা থেকে তাঁর চরিত্রের কিছুটা নির্দেশ মেলে এবং সেটি ধার্মিকতার নয়। জিজ্ঞাসু সক্রেনটিস অথবা

বিদ্রোহী স্পার্টাকুস কি ধর্মীয় বিশ্বাসের দ্বারা অনুপ্রেরিত হয়েছিলেন? অথবা ঐশি-
শতকী বাংলায় প্রায়নিঃসঙ্গ সমাজসংস্কারক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর? আমার ব্যাঙগত
পরিচিতির মধ্যে নাস্তিক এবং বিবেকী ব্যক্তি হিসেবে মনে পড়ে মানবেন্দ্রনাথ
রায়কে এবং তাঁর স্ত্রী ও সহকর্মী এলেন রায়কে, অন্ধপ্রদেশের গান্ধীবাদী
“গোরা”কে, মহারাষ্ট্রের তারকুণ্ডেকে, গুজরাটী ভাবুক এ.বি. শাহ-কে, কলকাতার
নির্মলকুমার বসু এবং গৌরী আইয়ুবকে। এইসব উদাহরণ থেকে কোন সাধারণ সূত্র
প্রমাণিত হয় না। শুধু এইটুকু বোধহয় বলা চলে সে ধর্মীয় প্রত্যয় ছাড়াও বিবেকের
উপস্থিতি ও সক্রিয়তা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার দ্বারা সমর্থিত। তা থেকে কি এই অনুমান
অসংগত যে অহিংসা, সেবা, করুণা, বীর্যবন্তা, সততা, দায়িত্ববোধ, ইত্যাদি গুণ
অনেকের ক্ষেত্রে ধর্মবিশ্বাসের দ্বারা সমর্থিত হতে পারে, কিন্তু তাদের উৎস
ধর্মবিশ্বাস নয়? সেই উৎস কি মানব-অস্তিত্বের এমন কোন গুঢ় দিক যা থেকে
নীতিবোধ এবং ধর্ম উভয়েই নিজের নিজের সমর্থন সংগ্রহ করে? এবং প্রস্তাব কি
বিচার্য নয় যে মানুষ-নামক জৈব সামাজিক প্রাণীটি জন্মসূত্রেই বিকল্প চেতনা ও
দায়িত্ববোধের দ্বার চিহ্নিত, এবং ধর্ম, সমাজসংগঠন, নীতি শিক্ষা, আইনকানুন,
ইত্যাদি এই বোধকে পুষ্ট, বিস্তীর্ণ অথবা বিকৃত করতে পারে?

দ্বিতীয়ত শিল্পসাহিত্যের ইতিহাসে ধর্মবিশ্বাস একটি বড়ো ভূমিকা নিয়ে
থাকলেও নির্ধারিত কোন ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত নয় এমন
শিল্পসাহিত্য পূর্বেও রচিত হয়েছে, এবং গুণে দুশো বছর ধরে বিভিন্ন সমাজে
ধর্মবিশ্বাস থেকে বিযুক্ত শিল্পসাহিত্য ক্রমে প্রধান হয়ে উঠেছে। তন্ত্রের দ্বারা
প্রভাবান্বিত হবার আগে বৌদ্ধধর্মে নারীকে প্রশ্রয় দেওয়া হয় নি। সাঁচীর তোরণে
যে তুলনাবিহীন যক্ষীমূর্তি রূপ পেয়েছে অথবা অজন্তার গুহাগাত্রে একদা যে
নারীরূপের বন্দনা ঘোষিত হয়েছিল, তার প্রেরণা কি নির্বাণতত্ত্বে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের
বিশ্বাস? মেঘদূত অথবা অমরকশতক কি ধর্মীয় কাব্য? কাটুল্লুস, প্রপারটিউস, লি পো
অথবা পেত্রার্ক কি ধর্মীয় কবি? দার্শনিক কবি লুক্রেটিউস তো ঘোষিতভাবেই
নাস্তিক, জড়বাদী, এপিকুরসপন্থী। কিন্তু শেক্সপীর অথবা গোয়েটের মহৎ
সাহিত্যকর্মের ভিত্তি কি কোন নির্দিষ্ট ধর্মবিশ্বাস? টম জোনস, ট্রিস্টান শ্যাভি, জ্যাক
ও তার প্রভু থেকে শুরু করে স্ত্রীদাল, ফ্রোবেয়ার, প্রুস্ত, কাফকা, লরেন্স, টমাস মান,
কাম্যু, সার্ত্র, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় অথবা সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহর বিভিন্ন বিচিত্র
উপন্যাসরাজির যে বিস্ময়কর পরম্পরা তার সঙ্গে কোন ধর্মবিশ্বাসের কি আদৌ
সম্পর্ক আছে? হুগ্‌নার অথবা স্ট্রভিনস্কীর সংগীত কি কোন ধর্মবোধ
থেকে উৎসারিত? অথবা ব্রানকুসীর ভাস্কর্য, রেনোয়া কিংবা পিকাসোর ছবি?
রবীন্দ্রনাথের অনেক গানে তাঁর ধর্মবিশ্বাস উদভাসিত, কিন্তু তাঁর ছবি সম্বন্ধে একথা
কি বলা চলে?

বস্তুত যেসব শিল্পসাহিত্য সংগীতের প্রেরণা এবং উপজীব্য প্রত্যক্ষভাবেই ধর্মীয়

দেশকাল পেরিয়ে যখন তারা ভিন্ন যুগে, বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন স্ত্রী-পুরুষদের মনে আবেদন করে, তখন সেই আবেদনের প্রকৃতি কি ধর্মীয় সহানুভূতি থেকে স্বতন্ত্র নয়? সার্ব-এর ক্যাথিড্রাল সুবেদী দর্শকচিহ্নে সে সম্ভ্রমাস্থিত বিস্ময়ের উদ্বেক করে তা কি শুধু বিশ্বাসী খ্রীস্টানদের মধ্যে সীমাবদ্ধ? খাজুরাহোর মহাদেও মন্দিরের ঐশ্বৰ্যে সাড়া দেবার জন্য শৈব হওয়া কি প্রয়োজন? আমাদের তৃষিত চেতনায় বৃষ্টির ধারার মতো যখন রবীন্দ্রসংগীত নামে তখন তার রস গ্রহণের জন্য রবীন্দ্রনাথের ধর্মবিশ্বাসে অংশভাক হওয়া কি সকলের পক্ষেই নিতান্ত জরুরী?

ফলত ধর্মের জগৎ এবং শিল্পের জগৎ দীর্ঘকাল ধরে পরস্পর থেকে গ্রহণ করে থাকলেও এ দুটি কি আলাদা জগৎ নয়? সম্প্রতিকালে এ দুয়ের মধ্যে ব্যাপকভাবে বিচ্ছেদ দেখা দিয়েছে। কিন্তু ধর্মের ক্ষেত্রে, অন্তত পশ্চিমে, অবসন্নতা প্রকট হয়ে ওঠা সত্ত্বেও একথা কি আদৌ বলা চলে যে শিল্পের ক্ষেত্রে গত একশো-দেড়শো বছরে নবনবোন্মেষশালী প্রতিভার অভাব ঘটেছে? স্তাঁদাল-বালজাক-জর্জ এলিয়ট-ডিকেপ টলস্টয়-ফ্লোবেরারের পর এসেছেন প্রুস্ত, জিদ, টমাস মান, ভার্জিনিয়া উলফ, ফকনার, কাম্য, সার্ব; দেগা-রেনোয়া-গোগাঁর পরে মাতিস্, পিকাসো, জ্যাকসন পোলক, সিডনি নোল্যান; হাউপ্টম্যান-ইবসেনের পর পিরাভেলো, ব্রেখট, বেকেট, হুখ্‌থ, পিটার হাইস। আসলে ধর্ম এবং শিল্পের নিগূঢ় সাধারণ উৎস কি সেই আশ্চর্য মানবীয় শক্তি নয় যার নাম কল্পনা? যা নেই তাঁকে এই শক্তি রূপ দেয়, এবং সেই রূপ এমন প্রাণময় হতে পারে যে যা আছে তার চাইতে এই কল্পিত রূপ আমাদের কাছে বেশি প্রত্যক্ষ ঠেকবে। এই কল্পনাশক্তি ধর্ম ও শিল্প উভয়ক্ষেত্রেই দীর্ঘকাল সক্রিয় ছিল, কিন্তু উৎসের একতা এবং বহু শতাব্দীর সহযোগ সত্ত্বেও এই দুই ক্ষেত্রের কল্পজগতের মধ্যে কিছু কি মৌলিক ফারাক আগাগোড়াই ছিল না? শিল্পের কল্পজগতের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কি নিরাসক্ত এবং অপ্রয়োগবাদী নয়? অর্থাৎ শিল্পে যেখানে এবং যখন শিল্পরূপ স্বতন্ত্রভাবে স্বীকৃত হয় সেখানে এবং তখন এই প্রয়োগহীন নিরাসক্ত সন্তোগই কি তার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ককে চিহ্নিত করে না? অপরপক্ষে ধর্মের কল্পজগৎ অনেকটাই কি প্রত্যাশাপূরণের আশার দ্বারা বিধৃত নয়? যজ্ঞই হোক আর পূজাই হোক তার পিছনে লোভের উপস্থিতি কি একেবারেই অপ্রত্যক্ষ—বিশ্বের লোভ, ক্ষমতার লোভ, যশের লোভ, অনায়াস করে শাস্তি না পাওয়ার লোভ, স্বর্গের লোভ, পুনর্জন্ম থেকে মুক্তির লোভ, শাস্তির লোভ, এইসব নানাবিধ লোভই কি প্রার্থনারূপে প্রকাশিত হয় না? অবশ্য প্রার্থনাহীন ধর্মও আছে, কিন্তু সে-ধর্ম খুব কম মানুষকেই আকৃষ্ট করে। পূজা, প্রার্থনা, লোভের প্রত্যাশা—এসব বাদ দিলে ধর্মের কল্পজগৎ শীর্ণ হয়ে পড়ে। লোকেরা বুদ্ধ, রাম, হনুমান, খ্রীস্ট, মহম্মদ ইত্যাদির শরণ নিয়ে থাকে, কিন্তু কালিদাসের যক্ষ অথবা শেক্সপীয়রের হ্যামলেট আমাদের সঙ্গে যে সম্পর্ক স্থাপন করে তা নিরাসক্ত এবং প্রয়োগপ্রত্যাশামুক্ত। অর্থাৎ ধর্মের সঙ্গে শিল্পের যে ব্যবধান আধুনিক ইতিহাসে

প্রত্যক্ষভাবে বিবর্তমান সৈটির সূত্র হয়তো সমকালীনে সীমাবদ্ধ নয়, হয়তো আগাগোড়াই দুই কল্পজগতের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম এবং অর্থপূর্ণ পার্থক্য বিরাজমান।

চার

এখন কল্পনা যদিও একটি বিশিষ্ট মানবীয় শক্তি তবু উপাদান-সংগ্রহ এবং সক্রিয়তার জন্য তাকে মানুষের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা, অনুভব, বৃত্তি এবং ভাবের উপরে নির্ভর করতে হয়। নানা ধর্মের মধ্যে মানবকল্পনার যেসব বিচিত্র প্রকাশ চোখে পড়ে তা থেকে দু'একটা সম্ভাব্য সূত্রের এবং সেইসব সূত্রের সঙ্গে জড়িত প্রশ্নের উল্লেখ করে এই আলোচনায় আপাতত ইতি টানব।

সম্ভ্রাসবোধ এবং তা থেকে উদ্ভবের আকাঙ্ক্ষা সম্ভবত সব প্রতিষ্ঠিত ধর্মেরই একটি সামান্য লক্ষণ। এই সম্ভ্রাসবোধ স্বাভাবিক, এবং এ থেকে কোন মানুষই যে কোনদিন সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারবেন এমন আশা আমার অন্তত নেই। মানুষের তুলনায় যে বিশ্বপ্রকৃতিতে তার বাস তা এতই বিরাট যে অধিকাংশ মানুষের পক্ষে তার সম্পর্কে কোন নির্ভরযোগ্য ধারণা করাই কঠিন। আংশিকভাবে ছাড়া এই বিশ্বপ্রকৃতির মানবীয় নিয়ন্ত্রণ অকল্পনীয়। ভূমিকম্প, প্লাবনে, ঝড়ঝঞ্ঝায় প্রকৃতির প্রবল এবং উদ্দেশ্যহীন শক্তি বারবার ব্যক্ত হয়, এবং এই অভিজ্ঞতার ফলে মানুষের অসহায়তা ত্রাসচিহ্নিত হয়ে ওঠে। কিন্তু কন্যা ভূমিকম্পের অভিজ্ঞতা ছাড়াও মানুষের সম্ভ্রাসের অন্য বহু কারণ আছে। মৃত্যু প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই অনিবার্য; যৌবনের পরে জরাকেও কেউ ঠেকাতে পারে না; অধিকাংশ মানুষের জীবনের ব্যাধি প্রায় নিত্যসঙ্গী। যুদ্ধ, গৃহযুদ্ধ, দুর্বলের উপরে প্রবলের অত্যাচার, আহার এবং আশ্রয়ের অনিশ্চয়তা—পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ এইসব অভিজ্ঞতার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে অথবা পরোক্ষে পরিচিত। দেহের ঘেরের দ্বারা আমরা প্রত্যেকেই অপর থেকে বিচ্ছিন্ন, অথচ বাঁচবার প্রয়োজনে আমাদের যেমন আহার এবং আশ্রয় দরকার তেমনি দরকার স্নেহ-ভালোবাসা-বন্ধুত্বের নির্ভরযোগ্য পারস্পরিক সম্পর্কের। এই সবই দুর্লভ, কিন্তু যদি-বা তেমন সম্পর্ক গড়ে ওঠে তা যে টিকবে এমন নিশ্চয়তা নেই। ব্যাধি এবং মৃত্যু প্রিয়জনকে সরিয়ে দেয়; মনের নানা মর্যকামী এবং ধর্মকামী গুঢ়েষা বন্ধুত্বকে রূপান্তরিত করে শত্রুতায়, নৈকট্যের জায়গায় আনে অনতিক্রম্য ব্যবধান। ভয় তাই মানুষের অস্তিত্বের অংশ এবং এই ভয় থেকে মুক্তি মানুষ মাত্রেরই কাম্য।

আর এই ভয়ের সর্বজনীন অভিজ্ঞতা এবং তা থেকে উদ্ধারের এই যে সার্বজনিক কামনা—উভয়কে নিজের অঙ্গীভূত করে বলেই কি ধর্মের আবেদন এত ব্যাপক এবং গভীর? যে-সংসারে সবই অনিশ্চিত, সেখানে রবীন্দ্রনাথের মতো আশ্চর্যভাবে সৃষ্টিশীল প্রতিভা বহু সময়ে মনে করেন তাঁর জীবনে “কিছুই তো হল

না”, সেখানে সব মানুষের না হোক বেশিরভাগ মানুষেরই চাই এমন কোন নিশ্চয়তা যা অবলম্বন করে সে বাঁচতে পারে। এই অনাক্রম্য নিশ্চয়তা শুধু ধর্মই দিতে পারে, কারণ ধর্ম যে কল্পনাকে রচনা করে তা অপ্রতর্ক্য কিন্তু নিরাসক্ত নয়। তাকে বিচার করা যায় না, কিন্তু তার উপরে নির্ভর করা যায়। ধর্ম একদিকে মানুষের ভয়, অসহায়তা, যন্ত্রণা এবং ব্যর্থতার একটা ব্যাখ্যা দেয়, অন্যদিকে ধর্ম এই দশা থেকে উদ্ধারের প্রতিশ্রুতি আনে। প্রতিশ্রুতির আবেদনকে প্রবলতর করার জন্য প্রায় সব ধর্মের মানুষের আত্মপ্রত্যয়েকে ক্ষীণ করে হীনতাভাবকে বাড়াবার চেষ্টা হয়। মানুষ মোহমুগ্ধ জীব, অথবা আদিম পাপে তার জন্ম—জাগতিক দুঃখের এই ধরনের ব্যাখ্যার পর আশ্বাস দেওয়া হয় বুদ্ধ, শিব, বিষ্ণু, মহম্মদ অথবা খ্রীস্টের শরণ নিলে আর ভয় থাকবে না। এঁরা প্রত্যেকেই শঙ্কাহরণ ও দুঃখহরণ—এঁরা করুণা করলে পাপ-তাপ দূরীভূত হয়। যাঁরা হয়তো-বা ঐতিহাসিক চরিত্র ধর্মের জাদুতে তাঁরাও দেবতা হন, এবং যেহেতু ভয় থেকে উদ্ধারের ভরসাটাই আসল কথা সে-কারণে এই দেবতারোপে ভক্তদের আপত্তি কচিৎ উচ্চারিত হয়।

প্রশ্ন হল, ভয়ের অভিজ্ঞতা এবং ভয় থেকে উত্তরণের কামনা যদি মানব অস্তিত্বের সাধারণ লক্ষণ হয় তাহলে ধর্মীয় প্রত্যয়ের উচ্ছেদ কি আদৌ কল্পনায়? আমরা জানি যে জ্ঞান, কর্ম, শিল্পসাধনা অথবা সেবার সূত্রে কিছু মানুষ ভয়কে সংযত করতে পারে, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা পারে কি? যদি না পারে তাহলে ধর্মপ্রত্যয়ই কি তাদের একমাত্র অবলম্বন? ঈশ্বরোন্মত্তি, সন্তোষ ও ঈশ্বর এবং তার ছাপোষাদের উদ্ভাবন কি মানুষের পক্ষে অবশ্যজ্ঞাবী? আমরা প্রচলিত অর্থে ধর্মবিশ্বাসী নন সেই কম্যুনিষ্টরাও যখন ইতিহাসের নৈতিকতায় এক ধরনের ঐশী সংকটতারণের নিশ্চয়তা আরোপ করেন তখন তাঁরা দ্বারা তাঁরা কি মানবীয় দুর্বলতারই প্রমাণ দেন না? ধর্মের স্তোভবাক্য ছাড়া মানুষের চলবে না এ-প্রস্তাব আমার মতো যাঁরা মানুষের আত্মসৃজনক্ষমতায় বিশ্বাসী তাঁদের পক্ষে অবশ্যই গ্রহণযোগ্য নয়। কিন্তু প্রত্যয় প্রমাণ নয়, এবং ফলে মনের মধ্যে এ-সম্পর্কে জিজ্ঞাসা থেকে যায়।

ভয় যদি মানুষের অস্তিত্বের একদিক হয়, বিকাশের উৎকাঙক্ষা তার অন্যদিক। মানুষ শুধু স্মৃতি আর বর্তমানের ভিতরে নিজেকে নিবদ্ধ রাখে না, তার অতীত এবং সমকাল ভবিষ্যতের কল্পনার সঙ্গে যুক্ত। কোন অবস্থাই মানুষের কাছে শেষ অবস্থা নয়, তা থেকে প্রকৃষ্টতর অবস্থার কথা সে ভাবতে পারে, এবং সেই অবস্থার দিকে যাবার চেষ্টা করতে পারে। এই উৎকাঙক্ষা মানুষের সহজাত বৃত্তি, কোন স্তোভবাক্য বা ঐশ্বরিক-ঐতিহাসিক প্রতিশ্রুতির উপরে এটি নির্ভর করে না। মানুষের ইতিহাসে নানাভাবে এই উৎকাঙক্ষা প্রকাশিত হয়—শিল্পসাহিত্যে, অন্বেষণ-উদ্ভাবনে, সমাজসংস্কার ও সমাজবিপ্লবে, ধর্মকল্পনায়। এই উৎকাঙক্ষার স্বাক্ষর চক্রযান ও অর্ণবপোতের উদ্ভাবনে, ইলোরার কৈলাস মন্দিরে, নভস্প্ক ক্যাথিড্রালে, স্যার টমাস মোরের “ইউটোপিয়া” গ্রন্থে, নানা দেশের লোকগীতিতে, সমাজতান্ত্রিক এবং

নৈরাজ্যবাদী আন্দোলন এবং আদর্শে, রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতী পরিকল্পনায়। ধর্মের ক্ষেত্রে এই উৎকাঙক্ষা যে কদাচিৎ নয় তার প্রচুর উদাহরণ মেলে। তাহলে যে হীনতাবোধ, নির্বৈদ, বস্তুরতি এবং মর্ষকাম বেশিরভাগ ধর্মে প্রবলভাবে প্রত্যক্ষ তার প্রকাশে এই উৎকাঙক্ষা কি করে টেকে? হয়তো একদিকে সম্ভ্রাসবোধ আর তা থেকে অভয়ের স্তোভবাক্য এবং অন্যদিকে বিকাশের উৎকাঙক্ষা ও উদ্যম প্রতি ধর্মের মধ্যেই বিরাজমান; হয়তো এই বৈপরীত্য ধর্মের মধ্যে গতি সঞ্চার করে। ধর্ম প্রবলভাবে মানুষের ক্ষতি করে যখন ভয় এবং তা থেকে মুক্তির সংবেশনী প্রতিশ্রুতি ধর্মে প্রাধান্য পায়। অপরপক্ষে, যে ধর্মবিশ্বাসীদের মধ্যে বিকাশের প্রত্যাবৃত্তি আকল্প সক্রিয় তাদের অগ্রাহ্য করা অসংগত।

কিন্তু বিকাশের উৎকাঙক্ষা যদি কোন ধর্মে প্রাধান্য পায় তাহলে সেই ধর্ম কি আর ধর্মরূপে বহুজনকে আকৃষ্ট করতে পারে? শ্রুতি অথবা ধর্মপ্রতিষ্ঠাতার অপতর্ক্য প্রাধিকার, নীতিনির্দেশের পিছনে অতিপ্রাকৃতির সংস্থান, পূজাপ্রকরণের দ্বারা লোভনীয়কে লভ্য করার প্রত্যাভূতি এবং ভয়কে জয় করার আশ্বাস—অর্থাৎ ধর্মের লোকসমর্থন যেসব সূত্রে প্রতিষ্ঠিত হয়—বিকাশের উৎকাঙক্ষা বৃদ্ধি পেলে তার চাপে এগুলির কি অবক্ষয় ঘটবে না? যদি ঘটে তা নিয়ে মাথাব্যথা তাঁদেরই যাঁরা ধর্মের ক্ষেত্রে মাতব্বর, এবং সেই মাতব্বরীর জোরে সমাজে বিস্তৃত এবং প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন। অপরপক্ষে যাঁরা ধর্মের আদিবিন্দ্যিক প্রকল্পকে অগ্রাহ্য করেও ধর্মের মধ্যে উৎকাঙক্ষীয় বৃত্তির কিছুটা প্রকাশ দেখে তাঁরা কোন কোন রূপকে তারিফ করে থাকেন, তাঁরা এই ঘটনাকে স্বাগত করবেন বলেই মনে হয়। প্রেমে, সেবায়, সৃষ্টিতে, সত্যতায় এবং পারস্পরিক সহযোগে এই মানবীয় উৎকাঙক্ষা যদি উৎসারিত হয় তাহলে প্রতিষ্ঠিত ধর্মসমূহের অস্তিত্ব আদৌ কোন শূন্যতা সৃষ্টি করবে এমন আশঙ্কার কারণ দেখি না।

টীকা

১। বুদ্ধপ্রসঙ্গে একটি চমৎকার কাহিনী আছে যেটি বুদ্ধের প্রতি আমাদের যেমন শ্রদ্ধাশ্রিত করে তেমনি তাঁর শিষ্যদের আভিমুখ্যের উপরেও আলোকপাত করে। সারিপুত্ত একদিন বুদ্ধের কাছে এসে বললেন, প্রভু অতীতে, বর্তমানে, ভবিষ্যতে এমন কোন জ্ঞানী জন্মান নি বা জন্মাবেন না যিনি আপনার চাইতেও জ্ঞানী। বুদ্ধ শুনে শ্মিতহাস্যে বললেন, সারিপুত্ত, তুমি নিশ্চয়ই অতীতের যত মহাজ্ঞানী ছিলেন তাঁদের জেনেছ এবং তাঁদের জ্ঞানের সারমর্ম অনুধাবন করেছ। সারিপুত্ত বললেন, না প্রভু। তাহলে তুমি নিশ্চয়ই ভবিষ্যতের সমস্ত মহাজ্ঞানীদের জেনেছ এবং তাঁদের জ্ঞানকে তোমার মন দিয়ে গ্রহণ করেছ। না প্রভু। তাহলে অন্তত আমি যেটুকু জেনেছি তার সবটাই জেনেছ। না প্রভু, তাও পারি নি। তবেই দেখ সারিপুত্ত, তুমি অতীতের অথবা বর্তমানের জ্ঞানীদের কথা

জান না। তাহলে কেন তুমি এই সোৎসাহ সংকীর্ণনে প্রবৃত্ত হয়েছ? (T. W. R. Davids, Dialogues of the Buddha, iii. 87)

মৃত্যুর পূর্বে বুদ্ধ তাঁর প্রিয়শিষ্য আনন্দকে বলেন, যারা নিজেদের কাছে নিজেসাই প্রদীপ হয়ে উঠবে, বাইরের কোন কিছু উপরে নির্ভর না করে নিজের নিজের দীপশিখার আলোকেই নিজেদের জীবন পরিচালিত করবে, আমার জীবদ্দশাই বা কি, আমার মৃত্যুর পরেই বা কি, তারাই তো চরম শিখরে উঠবে। (ঐ, ১৫৩)।

সম্ভবত বুদ্ধ নিজে কোন নতুন ধর্ম প্রতিষ্ঠা করতে চান নি। কিন্তু তাঁর জীবদ্দশাতেই ধর্মী বণিকদের পুষ্টপোষণায় সংঘ বিস্তার অর্থ সংগ্রহ করে। তাঁর মৃত্যুর একশো বছর পরেই তাঁর ভক্তদের মধ্যে থেরবাদী এবং মহাসংঘিকদের বিরোধ প্রকট হয়ে ওঠে। তারপরে অশোকের সমর্থনপুষ্ট সংঘ থেরবাদের সমালোচক বৌদ্ধদের বিতাড়িত করে। সম্রাটের পুষ্টপোষণায় দেশময় স্তূপ, চৈত্য, বিহার প্রতিষ্ঠিত হয়; স্তূপ পূজা এবং বুদ্ধের নানা প্রতীক পূজা ব্যাপক প্রসার লাভ করে। আগে থেকেই বুদ্ধ-পূর্ববর্তী, পঞ্চবিংশ বুদ্ধের কল্পনা থেরবাদীদের কাছে স্বীকৃতি পেয়েছিল। মহাযানী বৌদ্ধরা বুদ্ধকে দেবতা বানায়, অসংখ্য বোধিসত্ত্ব উদ্ভাবন করে, বিভিন্ন দেবদেবীকে বৌদ্ধধর্মের অন্তর্ভুক্ত করে। তা না হলে হয়তো এদেশে বৌদ্ধধর্মের কয়েক শতাব্দী ব্যাপী প্রবল জনপ্রিয়তা সম্ভব হত না। বুদ্ধ যখন শেষ পর্যন্ত বিশ্বের নবম অবতারে পর্যবসিত হলেন, তখন বোঝা গেল বুদ্ধের স্বকীয়তা এদেশ থেকে লোপ পেয়েছে। বৃথাই তিনি সারিপুস্তকে সাবধান করেছিলেন। হিন্দুধর্মের সর্বগ্রাসী পাচকরস বৌদ্ধধর্মকে জারণ করে অবশিষ্ট বৌদ্ধদের একটি নগণ্য সম্প্রদায় হিসেবে হিন্দু সমাজের এককোণে রেখে দেয়।

২। ব্রাহ্মণ্যধর্ম বা হিন্দুয়ানী এদেশে দৃঢ় এবং ব্যাপক প্রতিষ্ঠা পাবার আগে ভারতীয় মনীষীদের মধ্যে কেউ কেউ নাস্তিক ও জড়বাদী ছিলেন। পরবর্তী ধর্মগ্রন্থীদের প্রবল বিদ্বিষ্ট হস্তক্ষেপ সত্ত্বেও তার কিছুটা আভাস রয়ে গেছে। বৃহস্পতির মতে স্বর্গ, পরলোক, আত্মা, মোক্ষ, চতুর্বর্ণ এসবই অসত্য; কিছু ব্যক্তি জীবিকা অর্জনের জন্য বেদ এবং যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠানাদি উদ্ভাবন করেছে (M. Monier Williams : *Indian Wisdom*, 1893, 120-22)। বুদ্ধের সমসাময়িক অজিত কেশকম্বলিন সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে, মানুষ ক্ষিতি, অপ, তেজ এবং মরুতের সমাবেশ মাত্র, মৃত্যুতে এই সমাবেশ ভেঙে গিয়ে প্রতিটি উপাদান আপন-আপন ক্ষেত্রে মিশে যায়, দেহহীন আত্মা বলে কিছু নেই, অমরত্বের কথা অর্থহীন (দৌষ নিকায়, ১,৫৫)। জাবালি রামকে বলেছিলেন, চতুর ব্রাহ্মণদের ধান্নাবাজিতে ভুলো না; মুঢ়জনই প্রেত, পরলোক, পূজা, বলি, প্রায়শ্চিত্ত ইত্যাদিতে আস্থা রাখতে পারে। 'চার্বাক' বা লোকাযত পন্থীদের যেটুকু সামান্য বিবরণ "সর্বদর্শনসংগ্রহ" থেকে মেলে তা স্পষ্টতই বিদ্বিষ্ট ও বিকৃত, কিন্তু "অর্থশাস্ত্র" ও "কামসূত্রের"র কিছু উল্লেখ-উদ্ধৃতি থেকে অনুমান করা চলে যে কোন এক সময়ে লোকাযতবাদী চিন্তা অন্তত শিক্ষিত নাগরিকদের উপরে বেশ কিছুটা প্রভাব ফেলেছিল। জড়বাদী দর্শনের যে-গ্রন্থটি পরবর্তীকালে পাওয়া যায় সেটির নাম "তত্ত্বোপপ্লবিংহ"। এটির রচয়িতা জয়রাশী অষ্টম শতকে জীবিত ছিলেন। তাঁর সমকালের প্রধান ধর্মগুলির পিছনে যে যুক্তির কোন সমর্থন নেই এটিই তিনি বিচার করে দেখাবার চেষ্টা করেছিলেন। ৩। অন্যবিধ প্রত্যয়তন্ত্রের মতো বিশেষ বিশেষ ধর্মের কেন্দ্রে যে-নীতিবোধ কাজ করে কখনো কখনো তা ধর্মবিশ্বাসীকে প্রতিষ্ঠিত অন্যায়া সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হতে প্রেরণা দেয়। প্রতিষ্ঠিত শোষণ এবং শাসনব্যবস্থার সঙ্গে বিভিন্ন ধর্মীয় সংগঠনের কুটুন্নিতা বা আঁতাতের কথা আগে বলেছি, এবং সভ্যতার ইতিহাসে এই সহযোগের উদাহরণ অজস্র মেলে। কিন্তু অত্যাচারী শক্তির বিরুদ্ধে ধর্মীয় অভ্যুত্থান, এবং রাষ্ট্রিক-আর্থিক-সামাজিক অন্যায়ে ধর্মভিত্তিক সমালোচনার উদাহরণও নিতান্ত নগণ্য নয়। ধর্মীয় অভ্যুত্থানগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যুক্তির দ্বারা চালিত অথবা পরিশীলিত নয়; মেসায়ী অথবা দৈবশক্তিসম্পন্ন উদ্ধারকর্তার আবির্ভাবে বিশ্বাস এইসব

আন্দোলনের বিশিষ্ট লক্ষণ; এগুলি অনেকক্ষেত্রেই সহিংস এবং অধিকতর শক্তিশালী কায়মীস্বার্থের বা রাষ্ট্রের দ্বারা হিংস্রভাবে বিধ্বস্ত। কিন্তু এইসব আন্দোলনের পিছনে ন্যায়ভিত্তিক আন্দোলন-অভ্যুত্থান সম্পর্কে অনেক তথ্য সংগৃহীত হয়েছে এবং এদের চরিত্র ও ফলাফল নিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ হয়েছে ও হচ্ছে। হুবার, কোন, রেডফিল্ড, হব্‌স্বম, রাডিন, লানটারনারি, মুয়েহলমান প্রভৃতি গবেষণাদি এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য।

৪। এই প্রবন্ধটি ‘দেশ’ পত্রিকায় প্রকাশিত হবার পর পাঠক-পাঠিকাদের কাছ থেকে বেশ কয়েকটি চিঠি পাই। সেইসব চিঠিপত্রে যে প্রসঙ্গগুলি উত্থাপিত হয়েছিল তাদের সম্পর্কে কয়েকটি কথা সংক্ষেপে পুনশ্চরুপে এখানে যোগ করতে চাই। মূল প্রবন্ধেও প্রসঙ্গগুলি আলোচিত হয়েছে, কিন্তু পাঠক-পাঠিকারা যেভাবে প্রশ্ন তুলেছেন অথবা মন্তব্য করেছেন তা মনে রেখে চারটি শিরোনামে আমার বক্তব্য স্পষ্টতর করার চেষ্টা করছি।

ক। ধর্ম ও বিজ্ঞান : সব ধর্মেরই একটি বড়ো অংশ জুড়ে থাকে বিশ্বজগতের উৎপত্তি এবং রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত ব্যাখ্যা, সেটি তার পৌরাণিক অংশ। জগতের সঙ্গে নিজের সম্পর্ক বোঝার জন্য সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়ের ব্যাখ্যা মানুষের পক্ষে জরুরী। যখন জগৎ-সম্পর্কে যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য তথ্য সংগৃহীত হয় নি এবং কাল্পনিক ব্যাখ্যাকে যাচাই করে নেবার চিন্তাপদ্ধতি, ভাষা, সাধিত প্রভৃতি উদ্ভাবিত হয় নি, তখন পৌরাণিক ব্যাখ্যার ভিতর দিয়েই মানুষের জ্ঞানান্বেষণ ও যুক্তিশীলতা প্রকাশ পেয়েছিল। কিন্তু বৈজ্ঞানিক চিন্তার উদ্ভব ও বিকাশ পৌরাণিক ব্যাখ্যাকে কালবিরুদ্ধ করে। ধর্ম যে ব্যাখ্যা দেয় সেটিকে ধর্মবিশ্বাসীরা মনে করে প্রশ্নাতীত, প্রমাণোদ্ধার, নিত্য। পুরুষের মুখ থেকে ব্রাহ্মণ বেরিয়েছিল কিংবা যিহোবা ছয় দিনে বিশ্বজগৎ রচনা করেছিলেন, এসব কল্পকাহিনীকে বিশ্বাসীরা চিরন্তন সত্য বলে মনে করেন এবং কেউ সে-সম্পর্কে সংশয়ী হলে তাকে ঐহিক এবং পারলৌকিক, সামাজিক এবং দৈহিক শাস্তির ভয় দেখান। অপরপক্ষে বৈজ্ঞানিককে বিস্তর অধ্যবসায় করে তথ্য সংগ্রহ করতে হয়, এবং কোন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাই চরম সত্য বলে উপস্থাপিত হতে পারে না। তথ্য এবং প্রযুক্তির প্রতি নিষ্ঠা বৈজ্ঞানিকের বিশিষ্ট চরিত্রগুণ। যে ব্যাখ্যা তিনি উপস্থাপিত করেন বা গ্রহণ করেন তা যে পরে ভ্রান্ত বা অসম্পূর্ণ বলে প্রমাণিত হতে পারে এ সম্পর্কে সচেতনতা তাঁর সত্যানুসন্ধানেরই অঙ্গ। এই কারণে ধর্মিক ব্যাখ্যার পিছনে যে মনোভাব আর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার পিছনে যে মনোভাব এই দুইয়ের মধ্যে রফা সম্ভব নয়। ধর্মবিশ্বাসীরা বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসাকে দমন করার চেষ্টা আগাগোড়াই করে এসেছেন এবং যেখানে তাঁদের হাতে দমন করবার ক্ষমতা নেই সেখানে বৈজ্ঞানিক চিন্তাকে আধ্যাত্মিক বাকছল দিয়ে ঝাপসা করার চেষ্টা করেছেন।

বৈজ্ঞানিক মনোভাবের জন্য যে মানসিক ব্যয়প্রাপ্তির এবং নিত্যজাগত প্রশ্নাশীলতা প্রয়োজন, অধিকাংশ মানুষের মধ্যে এখনো তা গড়ে ওঠে নি। অধিকাংশ স্ত্রী-পুরুষ এখনো পর্যন্ত আদিম মানুষ এবং শিশুর মতো নিশ্চিত চরম উত্তর চায়—শিঙরা ভাবে এটি তাদের মা-বাবা দিতে পারে, বল্লস্ক শিঙরা ভাবে এটি দিতে পারে পুরাণকাহিনী, ধর্ম, গুরু, সাধুসন্ত। বৈজ্ঞানিক জানেন তথ্য নির্ভর সব উত্তরই আংশিক এবং শর্তাধীন—কোন ব্যাখ্যাই বিচারোদ্ধার বা অপরিবর্তনীয় নয়। প্রশ্ন যেখানে সীমাবদ্ধ, খণ্ডিত, সুনির্দিষ্ট সেখানে তাঁর নির্ভরযোগ্য উত্তর সম্ভব (যেমন ম্যালেরিয়া প্রভৃতির ব্যাধির কারণ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে), কিন্তু যেখানে সে-প্রশ্ন বহুমুখী ও ব্যাপক সেখানে তথ্য-সংগ্রহে, ব্যাখ্যায়, প্রমাণে ত্রুটি বা অসম্পূর্ণতা থাকতেই পারে। বৈজ্ঞানিক সে-কথা ভেবে ছাত্রদের স্তোভ দেবার জন্য ব্রহ্মজ্ঞতা দাবি করেন না, অপরপক্ষে চরম উত্তর অপ্রাপ্য বলে তিনি মন এবং হাত গুটিয়েও বসে থাকেন না। উপযোগী তথ্যসংগ্রহে, বিষয়মুখিতার অনুশীলনে, ধারণা এবং সাধিত্রের সূক্ষ্মতাসাধনে, প্রকল্পের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় তিনি নিজেকে নিয়ত নিয়োজিত রাখেন এবং অপর বৈজ্ঞানিকদের বক্তব্য ও সমালোচনা বিশেষ যত্নের সঙ্গে অনুধাবন করেন। ধর্মিকরা তাঁদের বিশ্বাসাদি বিচারোদ্ধার ও অপরিবর্তনীয় মনে করার ফলে বিভিন্ন ধর্মের মানুষদের মধ্যে একত্র হয়ে পর-পর ধর্ম নিয়ে

চর্চার উদাহরণ কচিং চোখে পড়ে। এবং ইতিহাসে ধর্মযুদ্ধের ভয়ংকরতাই অনেক বেশি প্রাবল্যে বারবার দেখা যায়। অপরপক্ষে বৈজ্ঞানিকরা পরস্পরের যুক্তি, তথ্য, প্রমাণাদি বিচার করে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মতৈক্যে পৌঁছতে পারেন এবং তাঁদের বিভিন্ন প্রকল্প ও ব্যাখ্যা ক্রমেই অধিকতর নির্ভরযোগ্যতা ও সর্বজনগ্রাহ্যতা অর্জন করে। প্রকৃত শিক্ষার সূত্রে বৈজ্ঞানিকতার এই মনোভাবের প্রসারের ফলে যখন পৃথিবীর অধিকাংশ স্ত্রী-পুরুষ বৈজ্ঞিক বয়ঃপ্রাপ্তি লাভ করবে তখন স্রষ্টার দিক থেকে ধর্মীয় ব্যাখ্যার কালবিক্রদ্ধতা তাদের কাছে সহজেই ধরা পড়বে।

খ। ধর্ম ও শিল্পসাহিত্য : উভয় ক্ষেত্রেই কল্পনা-উদ্ভাবনার ভূমিকা প্রধান। যা আছে, যা অভিজ্ঞতা-জ্ঞাত এবং অভিজ্ঞতা-সমর্থিত তা থেকে উপাদান নিয়ে মন এমন সব রূপ রচনা করে, রচনার পূর্বে যারা ছিল না। কল্পনা অনন্তিত্বকে অন্তিভবান করে। শিল্প বিভিন্ন মাধ্যমের ভিতর দিয়ে সেই রূপকে অপরের কাছে প্রত্যক্ষ করে তোলে। সেই কল্পনাপ্রসূত রূপ যে অভিজ্ঞতাপ্রসূত জগতের চাইতেও প্রকৃত, নানা মস্ততত্ত্ব, পূজাপ্রকরণের দ্বারা এই বিশ্বাসকে ধর্ম প্রতিষ্ঠিত করে।

এখন শিল্পসাহিত্যের একটা বড়ো অংশ দীর্ঘকাল ধরে ধর্মকে সমর্থ করেছিল এবং ধর্মের দ্বারা সমর্থিত হয়েছিল বলে অনেকের ধারণা এ দুটির মধ্যে কোন অচ্ছেদ্য বা সম্পূরক সম্বন্ধ আছে। কিন্তু তথ্য অথবা যুক্তি এই অচ্ছেদ্যতার ধারণাকে সমর্থন করে কিন্তু অতীত কালেও বেশ কিছু স্থাপত্য, ভাস্কর্য, প্রতিকৃতি ও প্রাকৃতিক চিত্র, গাথাকাহিনী, সংগীত, কবিতা, নাটক উপন্যাস পাওয়া যায় যাদের বিষয়বস্তু ও প্রতিন্যাস স্পষ্টই ঐহিক, যাদের সঙ্গে ধর্মবিশ্বাসের সম্পর্ক যদি আদৌ থাকে তা নিতান্তই ক্ষীণ। অপরপক্ষে গত তিনশো বছর কাল ধরে শিল্প স্পষ্টতই ধর্মীয় বিষয় এবং মনোভাব থেকে সরে এসেছে—ব্যতিক্রম থাকা সত্ত্বেও এই অভিমুখ্য স্পষ্ট। অর্থাৎ ধর্মের উপরে নির্ভরতা শিল্পের পক্ষে মোটেই অপরিহার্য নয়, যদিও ধর্মের আবেদন ও প্রসারের জন্য শিল্পের সহযোগ সম্ভবত বিশেষ প্রয়োজনীয়।

শিল্প এবং ধর্ম দুই-ই কল্পনাজাত হলেও দুইয়ের মধ্যে অন্তত দুটি মৌলিক পার্থক্য আছে বলে মনে করি। শিল্প যে কাল্পনিক রূপের জগৎ রচনা করে এবং আমাদের কাছে প্রত্যক্ষ করে তোলে সেটিই একমাত্র প্রকৃত জগৎ, এমনকি আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার জগতের চাইতে অধিকতর সত্য জগৎ—এমনতর দাবি শিল্পের আবেদনের জন্য নিষ্প্রয়োজন। শিল্প একটি স্বয়ম্ভব জগৎ রচনা করে আমাদের প্রাত্যহিক জগতের পাশাপাশি যেটিকে আমরা তার নিজগুণে গ্রহণীয় বিবেচনা করি। এটি বিশুদ্ধ যন্ত্রসংগীতের ক্ষেত্রে সব চাইতে স্পষ্ট, কিন্তু স্থাপত্য, ভাস্কর্য, চিত্রকলা, নৃত্য, অভিনয় এমনকি সাহিত্যের ক্ষেত্রেও এটি অভিজ্ঞতাসিদ্ধ। অয়দিপাউস, দ্রৌপদী, হ্যামলেট, ফাউস্ট, অথবা কাফ্কার “কে”—এরা প্রত্যেকেই এদের স্বষ্টির কল্পিত চরিত্র ; এদের অভিজ্ঞতার সঙ্গে আমাদের প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতার কিছু মেলে, অনেকটাই মেলে না ; কিন্তু এদের প্রত্যেকের স্বষ্টা নিজের নিজের কল্পনা ও শিল্পনৈপুণ্যের জোরে এদের ভিতরে এমন শক্তি সঞ্চার করেছেন যে এদের চরিত্র্য এবং কাহিনী আমাদের কাছে প্রবলভাবে প্রত্যক্ষ। অপর পক্ষে সেই কারণে এদের সান্নিধ্যে আমাদের পরিচিত জগৎকে মায়া অথবা তুচ্ছ অথবা অসত্য মনে করার কারণ ঘটে না। শিল্পের জগৎ অভিজ্ঞতার জগৎকে গ্রাস করে না, তাকে নিজের অধীন করে না, তা থেকে উপাদান সংগ্রহ করে তার পাশাপাশি নিজের গৌরবে উপস্থাপিত হয়। অপরপক্ষে ধর্মের কল্পিত জগৎ সংসারে আস্তিত্বিক হীনতা আরোপ করে, তার কল্পিত নায়ক-নায়িকাকে ত্রাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ করে, তাদের উপরে দেবত্ব অথবা অলৌকিকত্ব আরোপ করে সেই কল্পিত জগৎকেই পরম সত্য বলে দাবি করে। সেই জগৎ অসহিষ্ণু, সর্বগ্রাসী এবং ফলে এক ধর্মের কল্পিত জগতের সঙ্গে আর-এক ধর্মের কল্পিত জগতের সংঘর্ষ অনিবার্য। একই পাঠকের পক্ষে অভিজ্ঞানশকুন্তলা, আরব্যারজনী এবং কিং লিয়রের জগতে বিস্ময়াকুল চিন্তে প্রবেশ করা স্বাভাবিক। চার্লদস্ত হ্যামলেট, হিলহেলম মাইস্টার কিংবা মাদাম বোভারির জগতে আমরা আমগ্রস্ত ; সেখানে অনুভব, সজ্ঞোগ, বিচার-

বিশ্লেষণ, প্রবেশ-প্রস্থানের স্বাচ্ছন্দ্য আছে, আনুগত্যের জন্য কোনো জুলুমবাজী নেই। কিন্তু মোজেস-এর জগৎ, খৃস্টের জগৎ, কৃষ্ণের জগৎ, অথবা মহাম্মদের জগৎ একতত্ত্বতা বা সার্বভৌমতা দাবি করে। একাগ্রয়িতা বা নিঃশর্ত আনুগামিতা ছাড়া ঐ জগতে অপরের প্রবেশ ধর্মবিশ্বাসীদের মতে নিষিদ্ধ। জিজ্ঞাসুরূপে ওইসব জগৎকে আমরা বোঝবার চেষ্টা করলে বিশ্বাসীরা বলেন পূর্ণ বিশ্বাস না থাকলে ওই জগতে ঢোকা অন্যের অসাধ্য। এমনকি যারা ধর্মজগতের পোপ, খলিফা, পেট্রিয়ার্ক, শঙ্করাচার্য মার্কো প্রাচীন মহাসম্ভের মালিক নন, নিতান্তই অর্বাচীন ছোটোখাটো সম্প্রদায়ের নেতা—রামকৃষ্ণ, সৎসঙ্গ, হরেকৃষ্ণ, ডিভাইন লাইট, আনন্দময়ী, সত্যসাঁই ইত্যাদি—তাদের জগৎ ও একচেটিয়াপন্থী এবং পরস্পরের জগতের প্রতি অসহিষ্ণু।

দ্বিতীয় পার্থক্য হল ধর্মীয় কল্পনা শুধু স্বকীয় জগৎ রচনা করে তৃপ্ত নয়, তাতে স্পষ্ট নির্দেশ থাকে, ঐ জগৎকে যারা চরম সত্য বলে মানে তাদের কী কী করণীয় এবং কী কী অকরণীয়। এবং যারা বিশেষ বিশেষ ধর্মকে রক্ষা করার দায়িত্ব ও অধিকার নিজেদের উপরে আরোপ করেছেন তাঁরা সংগঠিত পরাক্রমে ব্যবস্থা করেন যাতে ঐ সব বিধিনিষেধ প্রতিপালিত হয় এবং পালিত না হলে পাপীজন যথার্থ শাস্তি পায়। টমাস মান এই বিষয়টি নিয়ে একটি চমৎকার গল্প লিখেছিলেন। গল্পটির নাম—“দি টেব্‌ল্‌স্‌ অব্‌ দি ল”। এটি মোজেস এবং ওল্ড টেস্টামেন্টের দশমহানির্দেশ সম্পর্কিত। ইহুদিদের মধ্যে যারা মোজেস-এর নির্দেশ মানে নি মোজেস-এর আজ্ঞায় যোশুয়া ধর্ম প্রতিষ্ঠা ও রক্ষার নামে তাদের সকলকে হত্যা করেন। মোজেস নিজের হাতে নির্দেশগুলি পাথরে খোদাই করে তাঁর অনুযায়িকদের বলেন, অদৃশ্য ইয়াহওয়ে এই নির্দেশগুলি দিয়েছেন। গল্পের শুরুতে মান মোজেস সম্পর্কে লিখেছেন :

His birth was disorderly. Therefore he passionately boned order, the immutable, the bidden and the forbidden...He was sensual, therefore he longed for the spiritual, the pure and the holy—in a word, the invisible—for this alone seemed to him spiritual, holy and pure.

গল্পের শেষে তিনি নবধর্মের প্রতিষ্ঠাতা মোজেসকে দিয়ে বলিয়েছেন :

And the Lord says. I shall raise my foot and shall trample him unto the mire, to the bottom of the earth I shall cast the blasphemer, one hundred and twelve fathoms deep...and all the people said Amen.

শিল্পসাহিত্যে এই ধরনের কোন ব্যবহারিক নির্দেশ দেয় না, এবং শিল্পী-সাহিত্যিকরা সংগঠন তৈরি করে বেয়াড়া পাঠক-পাঠিকাদের কোন শাস্তিবিধান করেন না। হ্যামলেটের অপ্রেমে দ্বিধাধ্বন্দ্ব-যন্ত্রণায় আমরা অংশভাক্ত হই, কিন্তু আমাদের কী করণীয় সে-সম্পর্কে ওই নাটক থেকে কোন নির্দেশ পাই কি? খাজুরাহো, কোনারকের মিথুনমূর্তি থেকে আমাদের মনে গভীর আনন্দ সঞ্চারিত হয়, কিন্তু আমাদের কর্তব্য সম্বন্ধে কোন উপদেশ ঐসব মন্দিরে লিখিত নেই। (শাস্ত্রকারেরা ঐসব ভাস্কর্যের যেসব ব্যাখ্যা করেন, সেসব তাঁদের ধর্মতত্ত্ব থেকে নির্গত, শিল্পকর্মের ভিতরে সেই ব্যাখ্যার কোন সমর্থনই মেলে না।) কোন গান, ছবি, নাটক, কাহিনী বা উপন্যাস যদি কারো ভালো না লাগে তার জন্য সেই ব্যক্তিকে কোন পাপ অর্সায় বলে কেউ মনে করে না। অবশ্য যতক্ষণ সেটিকে শিল্প হিসাবে ভাবা যায় ততক্ষণ একথা খাটে, তাকে ধর্মীয় বস্তু বা ধর্মশাস্ত্র হিসেবে ধরলে তখন ধর্মের অন্য অসহিষ্ণু দাবি সেক্ষেত্রেও করা হয়। কিন্তু কর্তব্য নিরূপণের দায়িত্ব থেকে মুক্ত বলেই শিল্প শিল্প। কর্মের ও বস্তুজগতের চৌহদ্দির বাইরে শিল্পের যে সিদ্ধতা ও শুদ্ধতা ক্রোচে তাকেই বলেছেন তার বিশিষ্ট “ইস্টেটিক”, গুণ। এই শিল্পকান্তির জন্যই শিল্প এই মূল্যবান। ধর্ম শিল্পকে নিজের প্রচারের কাজে ব্যবহার করে, কিন্তু বিশেষ বিশেষ ধর্মসম্প্রদায় লোপ পাবার পরে, এবং ঐ সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত নয় এমন স্ত্রী-পুরুষের কাছেও, ঐ ধর্মমতের সংশ্লিষ্ট শিল্প গভীর আবেদন করতে সক্ষম।

গ। ধর্মীয় অভিজ্ঞতা : ধর্মবিশ্বাসীদের মধ্যে কেউ কেউ বলেন, শাস্ত্র, গুরু, আচার-অনুষ্ঠান এসব

বাইরের জিনিস, আসল ব্যাপার হচ্ছে এক ধরনের অপরোক্ষানুভূতি যা ধর্মের উৎস। এই ধর্মীয় অভিজ্ঞতা ব্যাপারটি নাকি বড়ো গুহ্য, যাঁদের হয়েছে তাঁরাই শুধু জানেন, অন্যদের কাছে এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সম্ভব নয়। একদা-প্রসিদ্ধ ‘মস্কো বনাম পণ্ডিচেরী’ প্রবন্ধগ্রন্থের লেখক প্রয়াত কৌতুকী শিবরাম চক্রবর্তীর অনুসরণে আমিও বলতে পারতাম যে যা গুহ্য তা বরং গুহ্যতাই নিহিত থাক। কিন্তু আমি কৌতুহলী হয়ে আমার চেনাজানার মধ্যে এসব বিশ্বাসীদের গুনিয়েছি, আপনার কি সেই অপরোক্ষানুভূতি হয়েছে? অথবা আপনার, অথবা আপনার? না, অন্তত আমার পরিচিতদের মধ্যে কেউই ব্রহ্মাস্বাদের দাবি করেন নি। তবে বলেছেন, যাঁদের হয়েছে তাঁদের কথা নাকি তাঁরা জানেন। কিন্তু আমার না জানা এবং তাঁদের জানা এইসব মহাত্মাদের যেটুকু বিবরণ গ্রন্থাদি ও পরিচিত ব্যক্তিদের সূত্রে পেয়েছি তা থেকে অনুমান করি অধ্যাত্মজ্ঞান বলে কিছু থাক বা নাই থাক এইসব তুরীয়মার্গীরা সকলেই সম্মোহন বিদ্যায় পারঙ্গম এবং ভেলকিবাজিতে ওস্তাদ।

তবু তত্ত্ব হিসেবে হয়তো স্বীকার করা চলে নানা ধরনের বিশিষ্ট অভিজ্ঞতার মধ্যে একজাতের অভিজ্ঞতাকে ‘ধর্মীয়’ অভিজ্ঞতা নামে দেওয়া যায়। আকাশ, সমুদ্র, হিমালয়ের আনাত্তর সান্নিধ্যজাত বিস্ময়, প্রথম প্রেমের গভীরতার উপলব্ধি, শিল্পসৃষ্টির অভিনিবেশ ও আনন্দ, জটিল বৌদ্ধিক সমস্যার আকস্মিক বিদ্যুৎস্পন্দ সমাধান, মাদকসেবনের কল্যাণে সেবকের চেতনায় বিবিধ অবাস্তব রূপ ও ঘটনাবলীর সাময়িক-প্রতিদর্শনমণ্ডিত—এসব বিভিন্ন জাতীয় অভিজ্ঞতা আমাদের প্রাত্যহিক খাওয়া-দাওয়া, চলাফেরা, কাজকর্মের অভিজ্ঞতা থেকে বেশ কিছুটা অন্য ধরনের। হয়তো বা ধর্মীয় অভিজ্ঞতা এদেরই মতো বিশিষ্ট এবং স্মরণীয় কোন অভিজ্ঞতা যা সকলের প্রাত্যহিক জীবনে না ঘটতে পারে। কিন্তু কোন অভিজ্ঞতাকে সম্ভাব্য অভিজ্ঞতা হিসেবে মানার অর্থ নয় যে বিশ্বাসী ঐ অভিজ্ঞতার যে অর্থ আরোপ করেছেন সেটি বিনা প্রমাণ-পরীক্ষায় মেনে নেওয়া হচ্ছে। মদ্যপানের মাত্রা বাড়লে মাতাল ব্যক্তি চোখের সামনের বস্তুকে দ্বিগুণিত রূপে দেখেন; তাঁর দেখাটা মোটেই অবিশ্বাস্য নয়, শারীরবৃত্তে তার ব্যাখ্যাও মেলে, কিন্তু যে বস্তুটি তিনি দেখেছেন সেটি বাস্তবে দ্বিগুণিত হয় না। সিদ্ধিসেবী তাঁর প্যাসের নিচের পথকে ঢেউ খেলানো ভাবতে পারেন, হাওয়ায় উড্ডীন গোলাপি হাতির লাবণ্য তাঁকে পদগদচিহ্ন করতেও পারে, কিন্তু ফলে সমতল পথে চড়াই উৎরাই রচিত হয় না, গোলাপি হাতিও হাওয়ায় ওড়ে না। যাঁদের সচরাচর ‘মরমী’ বলা হয় তাঁরাই সম্ভবত ধর্মীয় অভিজ্ঞতায় সিদ্ধ। তাঁদের সেই অভিজ্ঞতার উপাদান নিয়ে তাঁদের কল্পনা নানা রূপ রচনা করে এবং অনেক সময় প্রতীকের সূত্রে কিংবা কবিতায়, গানে, ছবিতে আকার নিয়ে সেই রূপ অন্যদের কাছে পৌঁছায়। এসব থেকে তাঁদের অভিজ্ঞতার সত্যতা ও কল্পনার সমৃদ্ধতার পরিচয় মেলে, কিন্তু তাঁদের অভিজ্ঞতা ও কল্পনার বাইরে কোন দেবতার বা তুরীয় লোকের অস্তিত্বের প্রমাণ মেলে না। ধর্মীয় অভিজ্ঞতা অবশ্যই মনস্তত্ত্বের আলোচ্য বিষয়, কিন্তু ঐ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে কোনো অধিবিদ্যাত্মক প্রস্তাব দাঁড় করানো অযৌক্তিক।

শিক্ষা, সংস্কৃতি ও মৌলবাদ

পবিত্র সরকার

‘শর্টার অক্সফোর্ড ডিকশনারি’র মতে মৌলবাদ বা ‘ফান্ডামেন্টালিজম’ কথাটির যে অর্থ হল ‘strict adherence to the traditional orthodox tenets (e.g. literal inerrancy of scriptures) held to be fundamental to the Christian faith’—তার ব্যবহার ১৯২৩ সাল থেকে। কথাটা হয়তো সত্য নয়, কারণ আমেরিকায় উনিশ শতকের শেষ দিক থেকেই ‘The Fundamentalist’ বলে খ্রিস্টানদের একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে। কোনো ধর্মের যা শাস্ত্রীয় ভিত্তি এবং গ্রন্থবদ্ধ নির্দেশাবলি তা নির্ভুল এবং আক্ষরিকভাবে পালনীয়—এই হল মৌলবাদের গোড়ার কথা। এও ঠিক যে, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রোটেষ্ট্যান্টদের একটি শাখাই ‘ফান্ডামেন্টালিজম’ কথাটিকে জনপ্রিয় করে তোলে। পরে ‘মৌলবাদ’ কথাটি অন্যান্য ধর্মের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা শুরু হয়েছে। কথাটি খুব পুরনো নয়, কিন্তু ধারণাটি যে প্রাচীন তা আমরা জানি। মৌলবাদ সংক্রান্ত নানা প্রশ্নের নিষ্পত্তির জন্যই বৌদ্ধধর্মে একাধিক ‘মহাসংগীতি’র অধিবেশন হয়েছিল এবং মৌলবাদের প্রশ্নেই—কে বেশি শাস্ত্রনির্দেশ বা গুরুবাক্যের প্রতি অনুগত—বহু ধর্মের মধ্যে দ্বন্দ্ব এবং পরবর্তী বিভাজন দেখা দিয়েছে। ফলে বিভিন্ন ধর্মে মৌলবাদের চরিত্রে নানা স্থানিক ও সাময়িক প্রভেদ ঘটে। এরই কাছাকাছি আরও অনেক শব্দ ইংরেজিতে ব্যবহৃত হতে দেখি আমরা—traditionalist বা ঐতিহ্যবাদী, ‘religious conservative’ বা ধর্মীয় রক্ষণশীল, ‘religious right’ বা ধর্মীয় দক্ষিণপন্থী। ধর্মীয় বামপন্থীও আছে—(দক্ষিণ আমেরিকার ক্যাথলিক গির্জাগুলিতে এই ‘চার্চ র্যাডিকাল’দের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়), ‘revivalist’ বা পুনরুত্থানবাদী, ‘obscurantist’ অন্ধতাবাদী। এই শব্দগুলিও ফান্ডামেন্টালিস্ট, ফান্ডামেন্টালিজম কথাগুলির অর্থের মধ্যে নানা মাত্রা যোগ করে—কারণ সবগুলি শব্দই এক ভাবক্ষেত্রের (semantic field) অন্তর্গত।

মৌলবাদ কথাটির অর্থের এত সব মাত্রাগত জটিলতার মধ্যে না গিয়ে আমরা প্রথমে এর দুটি দিক স্পষ্টভাবে বুঝে নিতে চাই। একটি হল ভাবগত বা ধারণাগত দিক। কোনো ধর্মের মৌলবাদীরা সাধারণভাবে তাদের ধর্মকে (অর্থাৎ তাদের ধর্ম সম্বন্ধে তাদের ধারণাকে) অন্যদের ধর্মের চেয়ে, কিংবা তাদেরই ধর্মের অন্য শাখাপ্রশাখা বা রূপান্তরের চেয়ে শুদ্ধতর বা শ্রেয়তর মনে করে। এই মূলত যুক্তিহীন শ্রেষ্ঠত্বের বোধ হল মৌলবাদের ধারণাগত ভিত্তি। কিন্তু এই শ্রেষ্ঠত্বের বোধের সঙ্গে

সঙ্গেই থাকে একটি সক্রিয়, প্রায় আক্রমণাত্মক প্রোগ্রাম—অন্যদের ওপর এই ধর্ম ও তার নির্দেশগুলি চাপিয়ে দিতে হবে, এই ধর্মের শিক্ষা নিতে আচার-অনুষ্ঠান পালন করতে, বিশেষত ধর্মাবলম্বীদের বাধ্য করতে হবে। মৌলবাদ উদারতন্ত্র বা লিবারালিজমের বিরোধী, সেই সঙ্গে সাংস্কৃতিক বহুত্ববাদ বা প্লুরালিজমেরও বিরোধী। অর্থাৎ মৌলবাদের একটি উগ্র অ্যাকটিভিস্ট দিকও আছে। মৌলবাদ নিজের এই প্রচারিত শ্রেষ্ঠত্বের প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে পেশিশক্তি দেখাতে দ্বিধা করে না এবং খুন জখম অন্যধর্মের ধর্মস্থান ধ্বংস বা পোড়ানো সবকিছুই প্রশংসা দেয় তা আমরা ভারতের সাম্প্রতিক ইতিহাসেই লক্ষ্য করি। কিছু কম হিংস্র নানা প্রকল্প তো তার থাকেই। মৌলবাদ সবসময় রাজনৈতিক শক্তিকেস্ত্রের কাছাকাছি থাকতে চায়, যেখানে তা পারে না সেখানে সে বিরোধীদের পিছনে থাকে। অর্থাৎ মৌলবাদ মুখে যাই বলুক, রাজনীতিকে একটা অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে। রাজনীতির অস্ত্র আর লাঠি-ছুরি-বন্দুকের বাস্তব অস্ত্র সবই সে স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করতে চায়, কারণ মৌলবাদ সবসময়ে আত্মপ্রসারকামী এবং প্রতিবাদ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার ব্যাপারে অসহিষ্ণু।

২

মৌলবাদ নিজের প্রসার-প্রতিষ্ঠার জন্য অপেক্ষাকৃত কম হিংস্র বা হিংস্রতাকে গোপন রেখে যেসব উপায়কে গ্রহণ করতে চায় শিক্ষা তার মধ্যে একটি। শিক্ষা যেহেতু একজন নাগরিককে সমাজের যোগ্য সদস্য হতে সাহায্য করে মৌলবাদীরাও শিক্ষাকে নানাভাবে নিয়ন্ত্রণ করে ভারী নাগরিকদের ওপর নিজেদের প্রভাব সঞ্চার করতে সচেষ্ট হয়। এ তাদের শক্তি অর্জনের পরিকল্পনার অন্যতম প্রধান অঙ্গ। শিক্ষার ক্ষেত্রে ছাত্রদের মস্তিষ্ক-নিয়ন্ত্রণের দ্বারা তাদের অনুগামীর সংখ্যা যতই বাড়বে ততই তাদের রাজনৈতিক ও অন্যান্য ভিত পোক্ত হবে। মৌলবাদী শিক্ষা মানুষের চিন্তা, ইচ্ছা, আবেগ, বিশ্বাস, প্রত্যাশা, স্বপ্ন ইত্যাদিকে এমন সুনির্দিষ্ট ও অভিমুখবদ্ধ রূপ দেয় যে, শিক্ষিতরা শেষপর্যন্ত তাদের ‘ধর্মসেনা’ হয়ে ওঠে এবং মৌলবাদের মারমুখী বাহিনীকে স্ফীত করে তোলে। ফলে মৌলবাদীরাও জাতীয় বা রাজ্যস্তরে একটা সমান্তরাল শিক্ষানীতি তৈরি করে রাখে এবং সেটা যেখানে সম্ভব প্রয়োগ করার চেষ্টা করে।

শিক্ষার দুটি রাস্তা আছে—প্রাতিষ্ঠানিক (ফর্মাল), আর অপ্রাতিষ্ঠানিক (ইনফর্মাল)। ‘নন-ফর্মাল’ কথাটার একটা নির্দিষ্ট অর্থ দাঁড়িয়ে গেছে বয়স্ক-শিক্ষায়, তার থেকে আমরা অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাকে আলাদা করে দেখতে চাই। স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসঘরে শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীর মধ্যে পাঠ্যপুস্তক ও পাঠ্যক্রম-নির্ভর আদান-প্রদান এবং পরীক্ষা-ডিপ্লোমা-ডিগ্রি সংশ্লিষ্ট যে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা তার থেকে স্বাধীন ও স্বৈচ্ছাগৃহীত অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার চরিত্র আলাদা। সে

শিক্ষা আমরা নিই স্কুল-কলেজের বাইরে এক বিশাল উন্মুক্ত সিলেবাস থেকে। তাতে আছে ফিল্ম, টেলিভিশন, রেডিয়ার বৈদ্যুতিন মাধ্যম, আছে সংবাদপত্র, পত্রপত্রিকা, গল্প-উপন্যাস-প্রবন্ধের গ্রন্থাদির মুদ্রিত মাধ্যম, আছে অভিভাবক, গুরুদেব ও বন্ধুদের উপদেশ-পরামর্শ, পথের পোস্টার ব্যানার ইশতেহার, বিজ্ঞাপন, দোকানের সাইনবোর্ড, মাঠের বক্তৃতা, মঞ্চের বা পথের নাটক, রেকর্ড ক্যাসেট বা কমপ্যাক্ট ডিস্কের গান ও অন্যান্য শ্রাব্য উপকরণ। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা আমাদের নির্দিষ্ট বয়সে শুরু করে নির্দিষ্ট বয়সে শেষ করতে হয়। কিন্তু মুক্ত শিক্ষা চলে চিরজীবন। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সক্রিয় আবার অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা অধিকাংশ ক্ষেত্রে অক্রিয়। এর ক্ষেত্রে আমরা যে শিখছি সেই চেতনা সবসময় থাকে না। আমরা ভাবি এ আমাদের বিনোদন বা সংস্কৃতিকর্মে অংশগ্রহণ। অংশগ্রহণ করতে করতেই কিন্তু নানা ধরনের শিক্ষা আমরা আত্মস্থ করি, আবার শুধু অনাসক্ত শ্রোতা বা দর্শক হিসেবেও বেশ কিছু তথ্য, ধারণা, জ্ঞান, বিশ্বাস ইত্যাদি আমাদের মস্তিষ্কে প্রবেশ করে।

এই প্রাতিষ্ঠানিক ও মুক্তশিক্ষা আমরা কীভাবে গ্রহণ করে আমাদের জ্ঞান ও বিশ্বাসের মূল ভাণ্ডারটি গড়ে তুলি তার প্রক্রিয়াটি দীর্ঘ ও জটিল, সে সম্বন্ধে বলবার যোগ্যতাও আমাদের নেই। তবে একথা ঠিক যে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা আমাদের সুস্থ ও স্বচ্ছ জীবনচেতনা দিতে অধিকাংশই ব্যর্থ হয়। তারই পরিণামে ডাক্তার, বিজ্ঞানী বা বিজ্ঞানের অধ্যাপকদের হাতে নানা জ্যোতিষী নির্দেশিত পাথরের আংটি থাকে, তাঁদের কেউ কেউ গুরু ধরেন, এবং স্কুলে কলেজে বিজ্ঞানমেলা বিজ্ঞান-প্রদর্শনীর ছাড়াছড়ি সম্বন্ধে ভূত ভগবান বা দেবদেবীতে বিশ্বাস কমে না। এই পৃথিবী এবং আমাদের জীবন যে কোনো অলৌকিক সত্তা—ঈশ্বর দেবদেবী ভূতপ্রেত জিন গোবলিন বা দূরবর্তী গ্রহনক্ষত্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়, এই সহজ শিক্ষাটা কোনো স্কুল-কলেজ আমাদের দেয় না। দিতে চায় না বলাই ভালো। কারণ পরিবার বা সমাজে শৈশবে ‘ঠাকুন্নমো করো’ থেকে যে অলীক বশ্যতা শেখায় স্কুল-কলেজের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা তার বিশেষ কোনো প্রতিষেধক বা প্রতিবিধান তৈরি করতে পারেনি। ভারতের পৃথিবীর বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত জনতার শতাংশের মতো আছে—নেহাৎ সংখ্যার দিক থেকে তা বৃহত্তম বলে শুনেছি, কিন্তু তা সম্বন্ধে এ দেশ ধর্মীয় ও অন্যান্য কুসংস্কারের সোনার খনি বললেই হয়। এ ব্যাপারে কোনো দেশই যে খুব একটা আদর্শ অবস্থায় আছে তা নয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো বিশেষ ‘উন্নত’ দেশের কী অবস্থা তা আমরা পরে আইজ্যাক অ্যাসিমভের সাক্ষ্য থেকে লক্ষ্য করব। এটা মনে রাখতে হবে যে, দেবদ্বিজে ভক্তির বাইরে যেসব মানুষ এ সমাজে ছিটকে আসে, তারা সে কাজটা করতে পারে মূলত তাদের স্বাধীন শিক্ষার সমর্থনে—যে স্বাধীন শিক্ষা তারা স্বচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে গ্রহণ করে। কিন্তু স্বাধীন শিক্ষার ক্ষেত্রে কোনো একটা নির্দিষ্ট ধারা নেই। এই ক্ষেত্রটি ব্যবসায় ও লাভালাভের

নিয়মের দ্বারা সঞ্চালিত—ফিল্ম, টেলিভিশন, বিজ্ঞাপন, পত্রপত্রিকার ফিচার—সবই আমাদের নানাদিকে একসঙ্গে টানাটানি করতে থাকে, বহু পরস্পরবিরোধী আকর্ষণ তৈরি করে আমাদের জন্য। ফলে আমাদের অধিকাংশের ক্ষেত্রেই একটি সচেতন, স্বনির্বাচিত জীবনবোধ তৈরিতে কোনো শিক্ষাই সাহায্য করে না, না প্রাতিষ্ঠানিক, না মুক্ত।

বলা বাহুল্য, মৌলবাদের বীজবপন ও আগাছা বিস্তারের পক্ষে এ এক আদর্শ অবস্থা। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাতেও যখন সেই কঠোর বিজ্ঞানসম্মত ভিত্তি নেই, তা যেহেতু জীবন সম্বন্ধে কিছু ভাসা-ভাসা অস্পষ্ট ধারণা, সমাজ ও জীবিকার কাজে কিছু অসম্পূর্ণ দক্ষতা দেবার চেষ্টা করে, কিন্তু কখনোই তার অতিরিক্ত কিছু দেয় না—বলে না যে ‘এই হল পৃথিবী ও বিশ্বজগতের চলন-রহস্য, এইভাবে চলে মানুষের সমাজ, এইভাবে নিয়ন্ত্রিত ও সঞ্চালিত হয় তোমার জীবন’ এবং কোনো অলৌকিক বা অলীক ভিত্তি নেই পৃথিবী ও জীবনের’—তখন এই নৈঃশব্দের মধ্য দিয়ে তৈরি হতেই পারে অন্ধবিশ্বাস আর মৌলবাদের গুপ্ত সুড়ঙ্গ। মুক্ত শিক্ষার ক্ষেত্র তো আরও বিশৃঙ্খল ও ব্যবসায় আর বাজার-নিয়ন্ত্রিত, সেখানে মৌলবাদের স্থান আরও স্বচ্ছন্দ।

পরে আমরা আরও দেখব যে, শুধু প্রাতিষ্ঠানিক এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক মুক্ত শিক্ষা নয়, এ দূরকম শিক্ষার যে প্রধান উপায় ভাষা, তাকেও নিয়ন্ত্রণ করবার চেষ্টা করে মৌলবাদ, তার নিজস্ব কৌশল ও ভঙ্গিতে।

৩

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় মৌলবাদের হস্তক্ষেপের প্রধান উপায় হচ্ছে শিক্ষার বিষয়বস্তু বা ‘কন্টেন্ট’ নিয়ন্ত্রণ। এই বিষয়বস্তু থাকে তার পাঠক্রমে। ধর্মীয় পাঠ বা ধর্মগ্রন্থ পাঠ বাধ্যতামূলক করা হয়, এমনকী শিশুদের ক্ষেত্রেও। যদি শিশুরা অন্যভাষার দ্বারা বা অচেনা বিষয়বস্তুর দ্বারা প্রতিহত হয়ে তা পাঠে অনীহা দেখায় তবে তাদের ওপর অত্যাচার করতে মৌলবাদের কোনো দ্বিধা নেই। পাকিস্তানের মানবাধিকার কমিশনের ১৯৯৪-এর প্রতিবেদনে লক্ষ্য করি যে, ধর্মবিদ্যালয় দীন-ই-মাদ্রাসাগুলিতে কোরান শেখানোর জন্য প্রায় তিনশো শিশুকে বেঞ্চের সঙ্গে লোহার শেকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছিল। এর ভারতীয় সংস্করণ যে নেই তা নয়, অনেক আগেই রবীন্দ্রনাথ ‘অচলায়তন’-এ বালক মধ্যে তার নমুনা দিয়ে গেছেন। এই অন্ধ ধর্মীয়তার আক্রমণ নেমে আসে মূল্যবোধ শিক্ষার নামে স্কুলে ‘গীতা’ পাঠ চালু করায়—গুজরাটে যা হয়েছে। বেদ উপনিষদ গীতাকে যদি মানবরচিত উত্তম কাব্য হিসেবে পড়ানো যায় তাহলে আমাদের আপত্তির জায়গা ততটা নেই, কারণ এগুলি কাব্যই, হয়তো ইতিহাসের ক্ষীণ সূত্র থেকে নির্মিত মনোরম তত্ত্ব ও আখ্যানকল্পনা। কিন্তু এগুলিকে যখন সত্য এবং চিরকালীন সত্য এবং জগৎ ও জীবনের চরম

পাঠান বলে ছাত্রদের সামনে ধরে দেওয়া হয় তখনই মৌলবাদের অন্তর্লীন কণ্ঠস্বর শোনা যায়।

এর চেয়েও বড় কথা, মৌলবাদ সাধারণ পাঠ্যবস্তুর মধ্যে প্রবেশ করবার চেষ্টা করে। ইতিহাস পুনর্লিখিত হয়, দর্শনের ভাববাদকে অন্ধভাবে গ্রহণ করা হয় আর রাজনীতি-বিজ্ঞানকে পক্ষপাতী চেহারা দেওয়া হয়। বিজ্ঞানের মূল ও আধুনিক সভ্যগুলিকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করা হয়। মার্কিন দেশের ক্যাথলিক চার্চ পরিচালিত ধর্মীয় ‘প্যারোকিয়াল’ স্কুলগুলিতে কুড়ি-পঁচিশ বছর আগেও শেখানো হত যে গ্যালিলিও কোপার্নিকাস ভুল, টলেমিই ঠিক, অর্থাৎ শেখানো হত যে, পৃথিবী গোল নয়, ঘন এক আয়তক্ষেত্র : একটি লম্বা ছাদওয়ালা বাড়ির মতো—যার ওপর দিয়ে হেঁটে গেলে একসময় প্রান্তে এসে অতল শূন্য পা ফসকে পড়ে যাবার ভয় থাকবে। পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘোরে না, সূর্য পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে। স্কুলের পাঠ্যে এসব থাকত, তবে শুনেছি শিক্ষকেরা নাকি বলেই দিতেন যে, এর একটা বিকল্প মতও আছে, সেটা স্কুলের বাইরে থেকে শিখে নিলে ছাত্রদের উপকারই হবে। কয়েকবছর আগে কেরলের গির্জাপোষিত শিক্ষা ব্যবস্থাতেও এরকম বিজ্ঞানশিক্ষার কথা শোনা গিয়েছিল।

মার্কিনদেশে আশির বছরগুলির গোড়ার দিকে এই ধরনের কিছু ধর্মীয় উন্মাদের কথা লিখেছেন আইজ্যাক অ্যাসিমভ তাঁর ‘দ্য রোভিং মাইন্ড’ বই-এ। সেখানে ‘ক্রিয়েশনিষ্ট’ বা ‘সায়েন্টিফিক ক্রিয়েশনিষ্ট’ নামে তৈরি হয়েছে এক খ্রিস্টীয় তাত্ত্বিক সম্প্রদায়—যারা মনে করে ঈশ্বর ঠিক দশ হাজার বছর আগে একদিন সকালবেলায় পৃথিবী আর মানবসমাজ সৃষ্টি করেছিলেন। তাদের যুক্তিগুলি শুনলে শিশুদের পক্ষেও হাসি সামলানো কঠিন হয়ে ওঠে। এক নম্বর যুক্তি, মশাইরা, ঘড়ি একটা জটিল যন্ত্র। এ যন্ত্রটা কি নিজে নিজে হয়েছে? তা নয় একজন কারিগর এটা বানিয়েছে। তাহলে পৃথিবীর মতো জটিল সৃষ্টির একটা কারিগর থাকবে না? নিশ্চয়ই থাকবে। সে কারিগর হল ঈশ্বর। দ্বিতীয় যুক্তি—ঈশ্বর আছে তার প্রমাণ হল পৃথিবীর বেশিরভাগ লোকই বিশ্বাস করে ঈশ্বর আছে। এ হল ভোটাভুটির যুক্তি। তৃতীয় যুক্তি কিছু নয়—ডারুইনের বিবর্তনবাদকে ‘ওনলি আ থিয়োরি’ বলে উড়িয়ে দেওয়া। সে কথা প্রমাণ করার কোনো দায়িত্ব তারা নেবে না। দশ হাজার বছর আগেই ঠিক পৃথিবী ঈশ্বরমশাই তৈরি করলেন কেন এ সম্বন্ধে তাদের কোনো স্পষ্ট উত্তর নেই, কিন্তু বোঝা যায় যে ভূবিজ্ঞান, নৃবিজ্ঞান—এসব তারা স্বীকারই করে না, বিবর্তন তো নয়ই। ঈশ্বর সবই পারে, ফলে রাতারাতি পৃথিবী মানুষ জীবজন্তুও তৈরি করে ফেলতে পারে। এরা দাবি করছে, ‘ক্রিয়েশনিজম’-কে স্কুলপাঠ্যের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। অ্যাসিমভ এই আন্দোলনকে ‘Creationist Lunacy’ আখ্যা দিয়েছেন, কিন্তু এই উন্মত্ততার একটা স্রোত সব ধর্মেই থাকে।

পাঠ্যবস্তুতে ধর্মীয় এবং অন্ধবিশ্বাসের উপাদান যোগ করার এই চেষ্টার

পাশাপাশি থাকে ইতিহাসের পক্ষপাতী ব্যাখ্যা, উদ্দেশ্যমূলক নির্বাচন এবং নানা শব্দব্যবহারে পক্ষপাতকে স্পষ্ট করা। এন-সি-ই-আর-টি থেকে প্রকাশিত মূল্যবোধ শিক্ষাবিষয়ক একটি বইয়ে (শেষাঙ্গি ও অন্যান্য সম্পাদিত, ১৯৯২ : ৩৩-৩৮) আচার 'আওয়ার কালচারাল হেরিটেজ' প্রবন্ধটি যদি পড়ে দেখি তাহলে দেখব আমাদের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের মধ্যে ভারতে পাঠান আর মুঘল শাসনের কোনো কণামাত্র নেই। অর্থাৎ ভারতীয় সংগীত, বিশেষত উত্তর ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সংগীত, দরবার চিত্রকলা (এমনকী পরবর্তী ব্রিটিশ আমলে কোম্পানি চিত্রকলা) এবং নৃত্য, স্থাপত্য ('তাজমহল' নিশ্চয়ই বিস্মরণযোগ্য) ভারতীয় ইসলামের মূল্যবান দানকে আঢ্য আমাদের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের অন্তর্ভুক্ত করার যোগ্য মনে করেননি।

ধর্মের প্রচ্ছায়াপুষ্ট এক ধরনের শিক্ষাগত মৌলবাদ থেকেই নির্গত হয়েছে ইতিহাসের 'স্বর্ণযুগ' 'অন্ধকার যুগ' ইত্যাদির ধারণা। এই ধরনের সরল দ্বন্দ্বহীন নামকরণ সময় ও প্রতিবেশের জটিলতাকে আমাদের আদৌ বুঝতে সাহায্য করে না। বরং আমাদের বিভ্রান্তি ও মূঢ়তা আরও বাড়ায় এই কারণে যে, এসব নামকরণ একটা সময়ের মধ্যে যে অন্য বাস্তবও থাকতে পারে প্রদীপের নীচে অন্ধকারের মতো—সেটা আমাদের কাছে আড়াল রেখে দেয়। যে প্রাচীন ভারত নিয়ে আমরা গৌরব করি সেই প্রাচীন ভারতে শতকরা নিরানব্বই ভাগ যে দরিদ্র এবং নিরক্ষর ছিল, তাতে যে শম্ভুকব্ধের মতো ঘটনা অসংখ্য ঘটত এবং অনার্যদের তথা শূদ্রদের মানবিকতা অপমানিত ও অবজ্ঞাত থাকত, মৈত্রেয়ী-গার্গীদের মাহাত্ম্য ঘোষণা সম্বন্ধেও নারীর সম্মান ও অধিকার প্রায় কিছুই ছিল না—এইসব গুরুতর সত্য 'স্বর্ণযুগ' নামের পিছনে লুকিয়ে যায়, আমাদের উদবাহ নৃত্যে কোনো দ্বিধামগ্নতা দেখা যায় না। তেমনই 'অন্ধকার যুগ'—এরও অন্য কোনো ইতিবাচক দিক আছে কিনা তা সন্ধান করতেই আমাদের উৎসাহ দেওয়া হয় না। ইউরোপের তথাকথিত অন্ধকার যুগ যে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন অন্ধকার ছিল না সে সম্বন্ধে তো গবেষণাও হয়েছে। যে কোনো ব্যক্তি, সময় বা অবস্থা সম্বন্ধে একটা লেবেল মেরে দেওয়াই সেসব বিষয়ে একটা খণ্ডিত ধারণার প্রশ্রয় দেয়।

ইতিহাসের এই পুনর্লিখন বা কখনও অজ্ঞতাপ্রসূত, কখনও অভিসন্ধিপ্ৰসূত লেবেলিং-এর প্রবণতার পূর্ণ সুযোগ নেয় মৌলবাদী শক্তি। কিন্তু ভারতে তার আর একটা চেহারা দেখা যাচ্ছে, সেটা হল গবেষণা-সংস্থার নিয়ন্ত্রণ দখল। আই সি এইচ আর বা ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর হিস্টোরিকাল রিসার্চের কর্তৃত্ব চলে গেছে ভারতীয় জনতা পার্টির সাক্ষাৎ সেবকের হাতে, যিনি বাবরি মসজিদের জায়গায় রামমন্দিরের 'ঐতিহাসিক অস্তিত্ব' সম্বন্ধে 'মৌলিক' 'গবেষণা' করেছিলেন। সেখানকার ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসকে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ করার যে পরিকল্পনা ছিল প্রয়াত পার্থসারথি গুপ্তের মতো স্বনামধন্য ঐতিহাসিকেরা যা প্রস্তুত করেছিলেন, নতুন

পরিচালক সেসব বাতিলের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, কারণ সে সব ইতিহাস তাঁর দলের মনোমতো নয়। কলকাতার মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ইনস্টিটিউট অব এশিয়ান স্টাডিজের বসানো হয়েছিল এক বিদ্যাভিস্তিহীন প্রাক্তন মিলিটারিকে (যতদূর শুনেছি), তাঁর দাপটে ত্রাহি ত্রাহি রব উঠেছিল। এখন বোধহয় তিনি প্রব্রজ্যা নিয়েছেন।

এছাড়া ছাত্র, অধ্যাপক ও কর্মচারীরা ফ্রন্টের ক্ষমতা দখলের মধ্য দিয়ে আন্দোলন করেও রাজনৈতিক মৌলবাদী শাসন কায়েম করা সম্ভব। দিল্লির জামিয়া মিলিয়া, ইসলামিয়াতে ‘মুশিরুল হাসান বৃত্তান্ত’ তার উদাহরণ। উপাচার্য মুশিরুল হাসান সালমান রাশদির ‘দ্য স্যাটানিক ভার্সেস’ বই পছন্দ করেননি, তবু এর নিষিদ্ধ করার বিপক্ষে ছিলেন মত প্রকাশের গণতান্ত্রিক অধিকারের বিবেচনায়। মৌলবাদীদের তৈরি করা ছাত্র অশান্তি তাকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করে।

শিক্ষালয়ের আচার-অনুষ্ঠান নিয়ন্ত্রণ

ধর্মীয় ও মৌলবাদী অনুপ্রবেশের একটি সূক্ষ্ম পথ হল পাঠ্যের বাইরে, শিক্ষালয়ের বছরজোড়া আচার অনুষ্ঠানের পুনর্গঠন। স্কুল আরম্ভের আগে প্রার্থনাগীতি, দেশপ্রেমের সম্মেলক গান ইত্যাদি তো ঠিকই আছে, কিন্তু ১৯৯৮-র নভেম্বরে উত্তর প্রদেশের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী কল্যাণ সিং যে হুকুম দিয়েছিলেন তাতে ওই পুনর্গঠনের লক্ষ্য অস্পষ্ট নয়। প্রতিটি সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলে স্কুল শুরুর আগে ‘বন্দেমাতরম’ এবং সরস্বতী-বন্দনা গাইতে হবে, এমনকী মুসলমান ছাত্রপ্রধান মাদ্রাসাগুলিতেও। মুসলিম ধর্মীয় নেতাদের আপত্তিতে শেষপর্যন্ত এ নির্দেশ প্রত্যাহার করতে হয়।

৪

স্কুল-কলেজের দেয়ালের বাইরে শিক্ষা-সংস্কৃতির যে ব্যাপক বাতাবরণ তৈরি আছে, যেখানে মানুষ খানিকটা স্বেচ্ছায় ও স্বাধীনভাবে, খানিকটা অসচেতনভাবে শিক্ষা গ্রহণ করে—সেখানেও মৌলবাদ তার থাবা বসাবার চেষ্টা করে। তবে এখানে একটা ভরসার কথা এই যে, এখানে মৌলবাদ-বিরোধীরাও সক্রিয় হতে পারেন এবং একটা প্রতিবাদ প্রতিযোগিতা ও বিতর্ক গড়ে তুলতে পারেন যেটা নিয়ন্ত্রিত শিক্ষাক্ষেত্রে সম্ভব নয়।

এখানেও অবশ্য কিছুটা নিয়ন্ত্রণ থাকে। ভারতে রেডিয়ো ও দূরদর্শন দুই-ই নিয়ন্ত্রিত সরকারের দ্বারা, কিন্তু খোলা বাজারে বইপত্রের এলাকাটা কিছুটা নিয়ন্ত্রণ-মুক্ত। খোলা বাজারের সমস্যা হল, সেখানে অর্থের ক্ষমতা চলে এবং যদি মৌলবাদী শক্তির হাতে অর্থশক্তিরও জমা হয় বা কোনোক্রমে অর্থশক্তি মৌলবাদকে লাভজনক মনে করে তখন মৌলবাদ বিরোধীদের যুদ্ধ এক অসম যুদ্ধে পরিণত হয়। স্কুল-কলেজের গণ্ডির

বাইরে আমাদের শিক্ষা চলে ছাপানো বইপত্র মুদ্রণ ও বৈদ্যুতিন মাধ্যমে, চলচ্চিত্রে, নানা আলোচনা, অনুষ্ঠান বজ্রুতায়। সমস্ত কিছুৰ মধ্যেই কখনও সংগঠিত কখনও অসংগঠিত (ব্যক্তিগত) মৌলবাদ নিজের মুখ দেখাতে চায়। বৃহত্তর পাঠক ও দর্শক-শ্রোতা গোষ্ঠীর মনকে নিয়ন্ত্রিত ও যুথবদ্ধ করাই তার লক্ষ্য এবং এ কাজে অসংখ্য ব্যক্তি গোষ্ঠী ও সংগঠন নিজেদের ব্যস্ত রেখেছে।

বইপত্রের ব্যাপারটাই ধরা যাক। প্রায়ই খুব সস্তা কাগজে ছাপা, ভুয়ো গবেষণাধর্মী কিছু বই আমাদের হাতে আসে। এরকমই একটি বই দিল্লি থেকে প্রকাশিত অধ্যাপক জি.বি. কানুনগো-র ‘ব্যানিশমেন্ট অব সীতা’ বা ‘সীতানির্বাসন’। এই বইয়ে অধ্যাপক কানুনগোর দাবি, রামচন্দ্র সীতাকে নির্বাসনে পাঠিয়েছিলেন এ গল্প একেবারে গাঁজাখুরি রটনা (তাঁর ভাষায় ‘শ্যাম’ বা ‘আ ফেক স্টোরি’)। তাঁর মতে বাশ্মীকি এসব কথা আদৌ লিখে যাননি বরং কেরলের খ্রিস্টীয় যাজক টমাস বাশ্মীকির রামায়ণ রচনার দুশো বছর পরে এই গল্প রামায়ণের ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। তাঁর সিদ্ধান্তের সূত্র কিছুই দেননি অধ্যাপক মশাই, বলেননি যে, কেরলের এক প্রাচীন যাজকের গুঁজে দেওয়া কল্পিত রামায়ণী গল্প সারা ভারতে কী করে প্রচারিত হল। বোঝাই যায়, রামকে যারা দেবতাজ্ঞানে পূজা করে, তার চরিত্রের নেতিবাচক দিকগুলি ধোলাই ও সংস্কার করার কাজে একদল লোক স্বেচ্ছাশ্রম দিচ্ছে, তারা রামকে দোষগুণযুক্ত মহাকাব্যের নায়ক হিসেবে মেনে নিতে রাজি নয়। এখানে ইতিহাসের শুধু নয়, পুরাণ মহাকাব্যেরও পুনর্লিখনের চেষ্টা চলে এবং মৌলবাদীদের কাছে অবশ্যই পুরাণ আর ইতিহাসের কোনো তফাত নেই, ইতিহাস পুরাণের অব্যাহত অনুবৃত্তি, কখনও কখনও পুরাণের দ্বারা আক্রান্ত! কল্পনা ও গবেষণার জ্ঞানপদ্ধতির তফাতকে মৌলবাদীরা আদৌ গ্রাহ্য করে না।

দক্ষিণ এশিয়ার পটভূমিতে খবরের কাগজ ও অন্যান্য পত্রপত্রিকার ক্ষেত্রে, অসম হলেও, একটা প্রতিযোগিতা ও বাদ-প্রতিবাদের জায়গা তৈরি আছে। যেখানে এই প্রতিবাদ-প্রতিরোধ দুর্বল সেটা হল বহু অর্থ বিনিয়োগনির্ভর চলচ্চিত্র ও দূরদর্শনের নানা অনুষ্ঠান। বিশেষ করে পুরাণ ও রামায়ণ-মহাভারতভিত্তিক অনুষ্ঠানগুলিতে মৌলবাদের এই নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা বিশেষ প্রকট। ভারতীয় রেডিয়োর পূর্ববর্তী মহানির্দেশক পি সি চ্যাটার্জি একটি লেখায় ফিলিপ লুটগেনডর্ফ বলে এক মার্কিন গবেষকের সাক্ষ্য উদ্ধৃত করেছেন। লুটগেনডর্ফ লক্ষ করেছিলেন যে, যখন ভারতীয় দূরদর্শনে ‘রামায়ণ’ ধারাবাহিক দেখানো হত তখন এদেশের অনেক বাড়িতে এটি একটি সাপ্তাহিক পূজানুষ্ঠানের মতো ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাতে টেলিভিশন সেটে গাঁদার মালা পরানো হত, তাতে চন্দনের প্রলেপ ও ফোঁটা লাগানো হত, সিঁদুরও লাগানো হত, আর ঘরে শাঁখ বাজিয়ে সে সিরিয়ালের উদ্বোধন হত। চ্যাটার্জি যে মন্তব্য করেন এ প্রসঙ্গে তা বিশেষ অনুধাবনযোগ্য—‘সংবিধানের ২৮ নম্বর ধারায় বলা আছে, সরকারি অর্থে পূর্ণভাবে পরিচালিত কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে

কোনো ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া যাবে না। আকাশবাণী ও দূরদর্শন কি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান? পরিষ্কার উত্তর হবে, 'হ্যাঁ'। আর দুটিই, সরকারি অর্থে পরিচালিত 'জাতীয়' প্রতিষ্ঠান, ফলে বিপত্তির ভয় আরও বেশি।

বাণিজ্যিক চলচ্চিত্রের জগৎটি মৌলবাদী শিক্ষার বিস্তারে আরও গুরুত্বপূর্ণ স্থান নিয়েছে। আগেই বলেছি, এইসব চলচ্চিত্র নির্মাণে কোটি কোটি টাকার বিনিয়োগ হয় বলে এখানে যুক্তিবাদী বা ধর্মনিরপেক্ষ প্রতিপ্রয়াসের সুযোগ যেমন কম, তেমনই ভারতের ব্যাপকতম নিরক্ষর ও ধর্মাচ্ছন্ন জনগোষ্ঠীর ওপর এগুলির প্রভাবও খুব গভীর। এক ধরনের ফিল্ম পৌরাণিক বা অপৌরাণিক দেবদেবীর মহাত্ম্য প্রচারের জন্যই তৈরি হয়—'জয় হনুমান', 'রামভক্ত হনুমান', 'হর হর মহাদেব', 'বাবা তারকনাথ' ইত্যাদি। এগুলির প্রভাব কীরকম হতে পারে তার একটি নিদর্শন 'বাবা তারকনাথ' নামে বাংলা ছবি। কাঁধে বাঁক নিয়ে তাতে হাঁড়ি ঝুলিয়ে তারকেশ্বরে জল দিতে যাওয়া ওই ছবিটির পর যেমন বেড়েছে, বিশেষ করে শ্রীমতী সন্ধ্যা রায়ের বাঁকবাহনে মেয়েরা যেভাবে লালপেড়ে শাড়ি পরে সেই মিছিলে যোগ দিয়েছে তা এখন চোখে পড়ার মতো। এই মিছিল এখন তারকনাথ থেকে অন্যান্য মানবিক 'বাবা'-র জন্যও বরাদ্দ হয়েছে। লোকনাথ ব্রহ্মচারীর জন্মদিন উপলক্ষেও এই বাঁকবহনকারীদের শোভাযাত্রা সংগঠিত হয়ে চলেছে কয়েক বছর ধরে। এর মধ্যে এখন বাঙালি ও অবাঙালি ব্যবসায়ীদের বাণিজ্যবুদ্ধিও পিছনে চমৎকার কাজ করছে। বিশেষ বিশেষ চিহ্ন দাগা টি-শার্ট ও আন্ডারওয়্যার ধরনের হাফ প্যান্ট, বাঁকের ওপর বসিয়ে দেওয়ার জন্য প্লাস্টিকের ছোট ছোট ত্রিশুলের অলংকরণ, বাঁক, কলসি ইত্যাদি সবকিছু উৎপাদন ও বিপণনের এক মস্ত ব্যবসায় পরিণত হয়ে গেছে। এমনকী পথে পথে এদের বাঁক রেখে বিশ্রাম করার যেসব স্থায়ী ও অস্থায়ী জায়গা তৈরি করে বা হয়, সেখানেও এদের পরিষেবার জন্য নানা ব্যবস্থা থাকে, তাতেও বাণিজ্য চলে। এখানে বাণিজ্য-সংগঠন ধর্মীয়তাকে কাজে লাগায়—এবং প্রচ্ছন্নভাবে কুসংস্কার ও মৌলবাদের ভিত্তি গড়ে তুলতে বা অটুট রাখতে সাহায্য করে।

চলচ্চিত্রের এই অন্ধতা বিস্তারের ক্ষেত্রে 'জয় সন্তোষী মা' নামে ১৯৬০-এর বছরগুলির শেষদিকে মুক্তিপ্রাপ্ত একটি হিন্দি ছবির কথা নিশ্চয়ই আমাদের বয়সিদের মনে আছে। তার আগে পর্যন্ত ভারতের অধিকাংশ হিন্দু গণেশের কন্যা বলে কথিত এই সন্তোষী মা-র অস্তিত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিল। যেই ছবিটি অসাধারণ জনপ্রিয়তা পেল, তখনই সেই তেত্রিশ কোটি দেবতাবাহিনীতে আর একটি দেবী যুক্ত হল। শুধু জ্ঞানের ক্ষেত্রে এই ঘটনাটা ঘটলে তত আতঙ্কের কিছু ছিল না, তার অধিষ্ঠান ঘটল আমাদের সংসারের কর্ম বা কৃত্যের ক্ষেত্রেও। শিক্ষিতা মধ্যবিত্ত ও উচ্চমধ্যবিত্ত মহিলারা শুক্রবার শুক্রবার সন্তোষী মা-র উপাস ও পার্বণ করতে শুরু করলেন, ওইদিন টক না খাওয়া, লুচি মিষ্টি ইত্যাদির দ্বারা বালক ভোজন

ইত্যাদি শুরু হয়ে গেল। শুধু তাই নয়, সন্তোষী মা-র ভূমিকাভিনেত্রী শ্রীমতী অনীতা গুহ যেখানেই যেতেন সেখানেই তার পূজার্নার আয়োজনে তাঁকে বিড়ম্বিত হতে হত। চিদানন্দ দাশগুপ্ত তাঁর ভারতীয় চলচ্চিত্র সম্বন্ধে বইটিতে ও ধরনের ঘটনায় ‘macabre marriage of consumerism and fundamentalism’-এর দৃষ্টান্ত দেখেছেন।

শুধু পৌরাণিক বিষয়ের ছবি নয়, আধুনিক নাগরিক বা গ্রামীণ আখ্যান নিয়ে বাস্তবধর্মী মুম্বাই চলচ্চিত্রে প্রায়ই নানা অলৌকিক ঘটনা ঘটে। মন্দিরে কৃষ্ণের তৃতীয় নেত্র থেকে জ্যোতি নির্গত হয়ে মৃত শিশুকে পুনর্জীবন দেয়, মনসা বা শিবের কাছে প্রার্থনার জোরে সাপ এসে সাপে-কাটা মৃতের শরীর থেকে বিষ টেনে নিয়ে তাকে বাঁচিয়ে তোলে, গৃহদেবতা গৃহের কর্তার মরণান্তিক অসুখ সারিয়ে দেয়—এসব ঘটনা হিন্দি চলচ্চিত্র বা টেলিসিরিয়ালে অহরহ ঘটে।

সেই সঙ্গে তৈরি হয়েছে এক বিশাল ধর্মীয় গানের ক্যাসেট সাম্রাজ্য। যদি কেউ জন্ম থেকে বৈষ্ণোদেবীর মন্দিরে যান বা উত্তর ভারতের অন্য ধর্মস্থানে যান, তিনি লক্ষ্য করবেন যে কোনো দোকানে তারস্বরে ধর্মীয় গানের ক্যাসেট বাজছে এবং ভারতব্যাপী ট্রাক পরিবহনের রমরমায়ে এই ক্যাসেট-বাগিজ্য ফেঁপে উঠেছে। মৌলবাদীরা যে সংগীতকে বিশেষভাবে মৌলবাদ প্রচারে কাজে লাগাতে তৎপর, সে সম্বন্ধে ম্যানুয়েল প্রমুখ গবেষকেরা লক্ষ্য করেছেন। চলচ্চিত্র, দূরদর্শনের ধারাবাহিক ও ক্যাসেটের সহযোগিতায় গড়ে তোলা এই সর্বব্যাপ্ত ধর্মীয়তার আবহ আমাদের দেড়-দু শতাব্দীর তথাকথিত আধুনিকতাকে প্রতিমুহূর্তে উপহাস করে এবং শহরে ও গ্রামের বাবু বা সাহেবদের জুতো মোজা সুট নেকটাইয়ের তলায় যে তাবিজ-কবজ-লাল সুতো হাঙে পলা-গোমেদ ইত্যাদির আংটি ইত্যাদি বিরাজ করে—সেই দুর্বলতা, অন্ধতা ও ভয়ের মনস্তত্ত্বকে চিরস্থায়ীরূপে বজায় রাখতে সাহায্য করে। রামায়ণ-মহাভারত ইত্যাদি ধারাবাহিকের দর্শনও একটি ধর্মীয় গোষ্ঠীর এক দেশব্যাপী ধর্মসভার চেহারা নেয়। পিটার ভ্যান ডার ডির-এর মন্তব্য এখানে উল্লেখযোগ্য—‘Television allows many millions to be connected at the same time and thereby creates the sensation of a religious gathering (a satsang). while allowing everyone to stay home with their own family.’ চলচ্চিত্র একই কাজ করে, তবে তার দর্শক আরও সংহত ও সীমাবদ্ধ, আর ক্যাসেটের গান যুক্ত করে অসংহত শ্রোতাদের। চলচ্চিত্র, সিরিয়াল ইত্যাদির ‘শিক্ষা’-গত প্রভাব তুচ্ছ করবার মতো নয়। দূরদর্শনের রামায়ণ ধারাবাহিকের প্রচার এবং ১৯৯২-এর ৬ ডিসেম্বর বাবরি মসজিদের ধ্বংসের মধ্যে যে একটা প্রচ্ছন্ন কার্যকারণ যোগ ছিল তা অনেকেরই দৃষ্টি এড়ায়নি। বস্তুতপক্ষে হিন্দু শক্তিমত্তার প্রতীক হিসেবেই এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি প্রতীকী সতর্কতার মতো একাধিক হিন্দু দেবদেবীর নতুন, প্রায় সামরিক রূপ

দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। তৈরি হয়েছে রাম, শিব, কৃষ্ণ, গণেশ, হনুমান ইত্যাদির সামরিক চেহারা। তারা ধর্মের জয় এবং অধর্মের পরাজয় সুনিশ্চিত করে, কিন্তু হিন্দু মৌলবাদীদের কাছে অধর্ম আর অন্য ধর্ম সমার্থক—যে-কোনো মৌলবাদীদের কাছেই তাই। খ্রিস্টানদের ‘হিটলার’-দের সম্বন্ধে এবং কটর ইসলামে ‘কাফের’-দের সম্বন্ধে অবজ্ঞার মতোই অধর্ম ও অন্য ধর্মের (এমনকী একই ধর্মের অন্য মতে বিশ্বাসীদের) এই সমীকরণ তৈরি হয়ে যায়। এই কারণেই মুর্শিদাবাদে বাউল-ফকিরদের ওপর মুসলিম মৌলবাদীরা নানাভাবে নির্যাতনের চেষ্টা করে। সম্প্রদায়গত এথনোসেন্সিটিভিজম ‘আদার’ হলেই তাকে ‘ইনফিরিয়র’ বা ‘ইভিল’ ভাববার চেষ্টা করে। সব মৌলবাদেই শিক্ষা-সংস্কৃতির অন্যান্য ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা এক রামরাজ্য বা স্বর্গরাজ্যের অলীক স্বপ্ন তৈরি করা হয় এবং ওই হিন্দু দেবতাদের মতোই তো হয়ে ওঠে এক আকর্ষক সংহতিসাধক প্রতীক।

৫

মৌলবাদ মূলত নিষেধ ও নিয়ন্ত্রণের মধ্যদিয়েই প্রধানভাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করে। তার একটা উদ্যোগমুখী প্রোগ্রামও থাকে, যেমন দেখা গেছে মধ্যযুগের ফ্রান্সে বা রোমান ক্যাথলিকদের ইনকুইজিশনে। অর্থাৎ নিষেধ ও ডাঙা—উভয়কেই সে কাজে লাগায়। ইসলামের মৌলবাদ সংগীত, চিত্রকলা ও নৃত্যকে নিষিদ্ধ করবার চেষ্টা করে সার্থক হয়নি, ইসলামি রাষ্ট্রগুলিতে এসবের চর্চা প্রচুর হয় এবং তাতে সফল ও অনিন্দনীয় সৃষ্টির সংখ্যাও কম নয়। শেষপর্যন্ত সমাজের নানা শ্রেণী এইসব বিধিনিষেধ উপেক্ষা করতে পারে, ইতিহাসে তার দৃষ্টান্ত চিরকালই সুলভ। শাসক ও প্রভুশ্রেণী তো পারেই, কারণ ধর্ম চিরদিনই শাসক ও ক্ষমতালী শ্রেণীর দাসত্ব করে। কিন্তু যারা শাসকশ্রেণী নয়, বৃহত্তর লোকজীবন—সে জীবন চোরাগোপ্তাভাবে মৌলবাদের অঙ্ক শাসন অগ্রাহ্য করে, তাদের সৃষ্টিশীলতা ও বিনোদনের প্রবল আকাঙ্ক্ষা মৌলবাদের চোখরাঙানিকে নানাভাবে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে। বছর কুড়ি আগে রাজ্য লোকসংস্কৃতি উৎসবে নদীয়ার একটি গ্রাম থেকে আসা মুসলমান গৃহবধু ও মেয়েরা মুসলমান অন্তঃপুরের বিয়ের গান গেয়ে শ্রোতাদের মুগ্ধ করেছিল। পরে শুনেছি সাধারণে এই অভিকরণের (পারফরম্যান্সের) জন্য তাদের গ্রামে একঘরে করবার চেষ্টা হয়েছিল। বিয়ের গান বিষয়ে তাদের কী ধর্মীয় বা নৈতিক আপত্তি আছে তা জানি না, কিন্তু মহারাষ্ট্রে পাকিস্তানের প্রখ্যাত গজল গায়ক গোলাম আলির গানের অনুষ্ঠান বন্ধ হল তা অন্য এক ধরনের মৌলবাদ, রাজনৈতিক মৌলবাদ। ধর্মীয় মৌলবাদের প্রকাশ ঘটল মকবুল ফিদা হুসেনের সরস্বতীর ছবিটিকে নিয়ে। প্রাচীন ভারতীয় দেবদেবীদের মূর্তিকলায় তাদের যে পোশাক-আশাক দেখানো হয় তা ব্রাহ্ম বা ভিক্টোরীয় গুচিবাইয়ের দ্বারা চিহ্নিত নয়। তাদের শরীরে উর্ধ্বাংশ কদাচিত সম্পূর্ণ আবৃত,

উন্মুক্ত স্তনের ওপর হার—এসব কমণীয় মূর্তি যে-কোনো জায়গায় সুলভ— ভারতীয় জ্ঞানপীঠ যে সরস্বতী মূর্তিটিকে নিজেদের প্রতীক হিসেবে প্রচার করে তার সঙ্গে ফিদা হোসেনের ছবির বিশেষ কোনো তফাত নেই। তবু শিল্পীর স্টুডিয়ো আক্রান্ত হল, তাঁর ছবি নষ্ট করা হল। পাকিস্তানি ক্রিকেট টিমকে ভারতে খেলতে না দেওয়া, টোরোন্টো ও শারজায় ভারতের খেলাকে নিষেধ যদি রাজনৈতিক মৌলবাদ হয়, তো ধর্মীয় মৌলবাদের দাপট ফলানোর চেষ্টা হয় সংস্কৃতির অন্যান্য নানা স্তরে, বিশেষ করে মেয়েদের জীবনযাত্রা, খাবার-দাবার, পোশাকে-আশাকে। হিন্দু সমাজে বৈধব্য এইরকমই একটি যুক্তিহীন মৌলবাদী বিধিব্যবস্থা, যার শাসনে হিন্দু মহিলাদের পোশাক, খাবার দাবার, জীবনাচরণ, বিচরণস্থান—সবই নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করা হয়েছে, একসময় বিধবার জীবনকে বিধিমতে ধ্বংসই করা হয়েছে সতীদাহ প্রথার দ্বারা। সুকুমারী ভট্টাচার্য মেয়েদের ওপর এই মৌলবাদী নির্যাতনের বৈদিক ও পৌরাণিক পটভূমিকা, এর পিছনে অর্থশক্তি ও আর্থিক ও ভূসম্পত্তির অন্তরালবর্তী সংঘর্ষের ছবিটি দেখিয়েছেন। মৌলবাদ ও নারী একটি সম্পূর্ণ পৃথক প্রসঙ্গ, এখানে তার আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হবে।

ভাষা, সংস্কৃতির অধিপ্রণালী

শিক্ষা ও সংস্কৃতির সুপার-চ্যানেল বা অধিপ্রণালী হল ভাষা, কাজেই মৌলবাদ যে ভাষার বিষয়ে নানা নিয়ন্ত্রণ জারি করবার চেষ্টা করবে তা বলা বাহুল্য মাত্র। মৌলবাদ প্রথম নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে ভাষার অভিধান। তারা শব্দগুলিকে ‘হিন্দু’ বা ‘মুসলমান’ ইত্যাদি চিহ্ন দেয় এবং প্রয়োগ চেষ্টা করে একে অন্যের অভিধান থেকে এই শব্দগুলিকে নির্বাসন দিতে। তাদের মধ্যে ভাষাগত ‘বিশুদ্ধি’ সম্বন্ধে একটা নির্বোধ ও অবৈজ্ঞানিক ধারণা আছে। তারা জানে না (বা মানে না) যে, সব ভাষাই সমৃদ্ধ হয় অন্য ভাষা থেকে ঋণ নিয়ে বরং ভাষার ঋণ কখনও ফেরত দেবার দরকার পড়ে না। এই কারণেই গত শতাব্দীতে উত্তর ভারতে উর্দু ও হিন্দির বিরোধ তীব্র হয়ে উঠেছিল এবং কাশীর পণ্ডিতেরা সংস্কৃতপ্রধান এক কৃত্রিম সাহিত্যিক হিন্দি ভাষার সৃষ্টি করেছিলেন যা সাধারণ মানুষের ব্যবহৃত হিন্দি থেকে বহু দূরবর্তী। ফলে উর্দুও আরও কঠোরভাবে আরবি-ফারসির সংক্রমণ গ্রহণ করতে থাকে এবং হিন্দি-উর্দু ভাষাগত সাম্প্রদায়িকতার বিস্তার ঘটে। তৈরি হয় ভাষাবিচ্ছেদ। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালি হিন্দু পণ্ডিতেরা বাংলা ভাষাকে হিন্দুত্বের দিক থেকে সংস্কৃত নির্দেশ খেলায় মেতে উঠেছিলেন, বাংলা ভাষা থেকে রোজকার ব্যবহৃত ফারসি ও আরবি শব্দগুলিকে বিদায় করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন, এই নিয়ে যুক্তিবাদী মনস্বী হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাঁদের প্রচুর ব্যঙ্গবিদ্রূপ করেছেন। তাঁদের পদ্ধতি ছিল বিকল্পন (Substitution), অর্থাৎ তাঁরা ‘কলম’, ‘দোয়াত’, ‘পাট্টা’, ‘আদালত’ ইত্যাদির বদলে ‘লেখনী’, ‘মস্যাধার’, ‘ভোগবিধায়ক পত্র’, ‘বিচারালয়’ ইত্যাদি

গণ্য করতে চান। হরপ্রসাদ নিজেকে যার ‘চালা’ বলেছেন সেই প্রবল নাস্তিক ও প্রাক্ত ভাষাবিদ অধ্যাপক শ্যামাচরণ গাঙ্গুলি ১৮৭৮-এই এই অসুস্থ চেষ্টার বিরুদ্ধে মন্তব্য করেছিলেন। শেষপর্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্রের ‘বাঙলা ভাষা’ (১৯৭৮) শ্যামাচরণের প্রবন্ধের প্রতিক্রিয়ায় লেখা এই ভাষাবিরোধে একটা সমন্বয়ের চেষ্টা দেখা যায়—যাতে তিনি সিদ্ধান্ত করেন—‘বলিবার কথাগুলি পরিস্ফুট করিয়া বলিতে হইবে, যতটুকু বলিবার আছে সবটুকু বলিবে—তজ্জনা ইংরেজি, ফার্সি, আরবি, সংস্কৃত, গ্রাম্য, বন্য, যে ভাষার শব্দ প্রয়োজন তাহা গ্রহণ করিবে, অশ্লীল ভিন্ন কাহাকেও ছাড়িবে না।’

ভাষা বিচ্ছিন্নতার এই প্রয়াস যে এখনও ক্ষান্ত হয়েছে তা বলা যায় না, খুব কাছেই তার দৃষ্টান্ত আছে। একটি সংবাদপত্রের চিঠিপত্রের কলামে কিছুদিন ধরে বাঙালি মুসলমানদের ‘বাংলা’ নামকরণের ব্যাপারে বেশ কিছু চিঠিপত্র বেরোল। চিঠিগুলি লিখছেন অধিকাংশ হিন্দুরা। তাদের মতে ‘আকবর’, ‘রহমান’, ‘কুদরত-ই-খুদা’, ‘সাজ্জাদ’ এসব নাম বাংলা নয়। বিস্ময়ের কথা হল, তারা যে নাম প্রস্তাব করেন, বেশিরভাগই সংস্কৃত শব্দবাহিত নাম। অর্থাৎ এর মধ্যেও এক ধরনের হিন্দুত্ববোধ প্রচ্ছন্ন আছে, যেন সংস্কৃত বা তৎসম শব্দের নামই, ‘বাঙালি নাম, ‘করিম’ ‘রহিম’ ‘রহমত’ ইত্যাদি নয়। আমি এই যুক্তির অর্থ বুঝি না। ‘করুণাময়’ নাম বাঙালি হলে ‘রহিম’ কেন বাঙালির নাম হবে না তার যুক্তি আমার কাছে স্পষ্ট নয়। অধিকাংশ হিন্দু বাঙালি এ নামগুলি অর্থ জানেন না সেটা একটা সমস্যা। আধুনিক হিন্দু মুসলমান বাঙালি যারা যুক্তিবাদে বিশ্বাসী তারা অবশ্যই নামকরণে ধর্মীয় অনুষঙ্গ বাদ দেবার কথা ভাবতে পারেন। সেক্ষেত্রে এমনধারা হিন্দু বাঙালিদের কাছে ‘ভবেশ’, ‘নারায়ণ’, ‘ভবানীচরণ’, ‘রমাপতি’ ইত্যাদি নামও এখন গ্রহণযোগ্য মনে হওয়া উচিত নয়। ফলে নাম ধর্মনিরপেক্ষ হোক—তা প্রকৃতি, কবিতা, সাহিত্য, ইতিহাস, প্রতিষ্ঠান ও স্থাপত্য-ভাস্কর্য সব জায়গা থেকেই আসতে পারে—এইটে হল আসল দাবি। এরকম নাম বাংলাদেশে প্রচুর হচ্ছে—বর্ষা ইসলাম, সুরঞ্জনা ফারুকি, বিদিশা রায়হান ইত্যাদি নাম যথেষ্টই পাই, এখানেও সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের মতো লেখকেরা তাঁর পুত্রসন্তানদের এরকম নাম দিয়েছেন। কিন্তু তাই বলে নামকরণে আরবি-ফারসি শব্দ থাকলেই তা ‘বাঙালি’ নয়—এটা একটা সংস্কার এবং এর পিছনে একটা প্রচ্ছন্ন সাম্প্রদায়িকতা আছে, যে সম্বন্ধে হয়তো সব পত্রলেখক সচেতন নন। আমার মতে ওই আরবি-ফারসি শব্দগুলিও যথেষ্টই বাংলা। আমরা একশ্রেণীর বাঙালি সেগুলির অর্থ জানি না তার কারণ আমাদের অধিকাংশগত হিন্দু অভিধানকার এসবের অর্থ দেবার কথা বিবেচনাই করেনি, তারাও হিন্দুচেতনাবদ্ধ এক ভাববিশ্বের অধিবাসী ছিলেন, যাতে ওই নামগুলির অর্থ বোঝার গুরুত্ব তাঁদের কাছে তত বেশি ছিল না। যেজন্য তাঁরা ‘জল’ কথাটির পাণ্ডশব্দ হিসেবে ‘অপ’ ‘সলিল’ ‘জীবন’ ইত্যাদি লিখেছেন, কিন্তু ‘পানি’ কথাটা

লেখেননি—যে-কথাটি লিখলে অধিকাংশ বাঙালির বোধগম্য হত। তাঁরা এ কথাও খেয়াল করেননি যে, ‘পানি’, ‘আপ্তা’ ইত্যাদি মোটেই আরবি-ফারসি শব্দ নয়, একেবারে খাঁটি তদ্ভব ও অর্ধ-তৎসম শব্দ—দুটিই সংস্কৃত থেকে এসেছে, এদের মূল হল ‘পানীয়’ ও ‘অস্ত’। কিন্তু বাঙালি মুসলমানের দ্বারা ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হওয়ার ফলে অচেতন ও প্রচ্ছন্ন সাম্প্রদায়িকতার প্রভাবে আমরা এগুলিকে ‘মুসলমানি’ শব্দ বলে চিহ্নিত করেছি। এ কথাও ভুলে থেকেছি যে সিলেট চট্টগ্রাম অঞ্চলে বহু হিন্দুও ‘পানি’ কথাটা ব্যবহার করেন এবং সর্বভারতীয় কোটি কোটি হিন্দুও তা ব্যবহার করেন।

সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদের প্রশ্নে যে কোনো দেশের সচেতন সংখ্যাগুরু একটা বিশেষ দায়িত্ব থাকে, যে-দায়িত্ব সংখ্যালঘুর থাকে না। সংখ্যাগুরুকে একটু বেশি সতর্ক হয়ে ভাবতে হয় যে, তার কথায় বা আচরণে শুধু প্রকাশ্য স্পষ্ট সাম্প্রদায়িকতা নয়, কোনো অচেতন অপপ্রকাশ্য সাম্প্রদায়িকতা আছে কিনা। শরৎচন্দ্র যে ‘শ্রীকান্ত’ প্রথম পর্বে ‘বাঙালি’ ও মুসলমান ছাত্রদের ফুটবল খেলার প্রসঙ্গে বাঙালি বলতে হিন্দু বুঝিয়েছিলেন, তাতে আছে ওই অসচেতন সাম্প্রদায়িকতার ইঙ্গিত। সচেতনভাবে শরৎচন্দ্র মৌলবাদী নন, সাম্প্রদায়িকও নন। কিন্তু আমাদের চেতনার নানা ভিতরকার ভাঁজে আমাদের জাতীয় ও সামাজিক ইতিহাস কোথায় কী সংস্কার লুকিয়ে রেখে দিয়েছে সে সম্বন্ধে অনেক সময় আমরা নিজেরাই অবহিত নই। তা কখনও কোনো শব্দ ব্যবহারে হঠাৎ বেরিয়ে আসে।

শরৎচন্দ্র যদি বাঙালি-হিন্দু এই সমীকরণ করে ভুল করে থাকেন সে ভুল তাঁর আগে থেকেই মুসলমানরাও করে আসছেন। আমার ধারণা এই ভুলের জন্ম মুসলমান সমাজের উচ্চ অংশেরা নিজেদের বাঙালি পরিচয় গোপন করতেন, যাঁরা ‘শরিফ’ বা ‘আশরাফ’ বর্গের, যাঁরা নিজেদের তুর্কি, ইরানি, আফগান শাসকদের বংশধর বলে কল্পনা করতেন। তাঁরই হিন্দুদের ‘বাঙালি’ হিসেবে দেখবেন—এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। এবং ইসমাইল হোসেন শিরাজির মতো লেখকেই আমরা পাই ওই হিন্দু অর্থে ‘বাঙালি’ কথাটার প্রয়োগ। বঙ্কিমচন্দ্রের ‘দুর্গেশনন্দিনী’-র জবাবে লেখা তাঁর ‘রায়নন্দিনী’ উপন্যাসের ভূমিকাতেই ‘বাঙ্গালি লেখকেরা’ বলতে তিনি হিন্দু লেখকদেরই নির্দেশ করেছেন, তা শরৎচন্দ্রের বহু আগে। কাজেই শরৎচন্দ্রকে অহেতুক দায়ী করার কোনো অর্থ হয় না।

এসব দৃষ্টান্তই বুঝিয়ে দেয়, ভাষার শব্দ ব্যবহার সম্বন্ধে আমাদের প্রতি মুহূর্তের সতর্ক ও সচেতন থাকা দরকার। কারণ প্রকাশ্য সাম্প্রদায়িকতা যদি মৌলবাদের দ্বারা ব্যবহৃত হতে পারে প্রচ্ছন্ন সাম্প্রদায়িকতাও মৌলবাদকেই শেষপর্যন্ত সহায়তা করে। সংখ্যাগুরু এবং সংখ্যালঘু দু দলেরই এ বিষয়টা বুঝে নেওয়া দরকার, বিশেষত সংখ্যাগুরুর দরকার আরও বেশি।

সভ্যতার বিবর্তনে ধর্ম

জয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায়

মহাবিশ্বের এক হাজার কোটি বৎসরের বিবর্তন এবং পৃথিবীর পাঁচশো কোটি বৎসর বিবর্তনের শেষে মাত্র ত্রিশ-চল্লিশ হাজার বৎসর আগে যে মানব প্রজাতি (homosapien) পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছিলো, সে কোন ধর্ম সংগে নিয়ে জন্মায় নি। মানব সভ্যতার বিবর্তনের মধ্য দিয়েই মানুষের ধর্মবিশ্বাস গড়ে উঠেছে। আর বিবর্তনের মধ্য দিয়েই ধর্মবিশ্বাস এবং ধর্মের জাগতিক কাঠামোর পরিবর্তন হচ্ছে। সভ্যতার বিবর্তনের সংগে সংগে ভবিষ্যতেও ধর্মের পরিবর্তন অবশ্যজ্ঞাবী। মানুষ সভ্যতার প্রথম পরিচয় পাওয়া যায় পুরাতন প্রস্তরযুগ থেকে। তারপর নূতন প্রস্তরযুগ আরম্ভ করে আজ পর্যন্ত প্রযুক্তির বিকাশের সংগে অবিচ্ছেদ্য ভাবে মানব সভ্যতার বিবর্তন ঘটে চলেছে। প্রযুক্তির উন্নতির ফলে উৎপাদন ব্যবস্থাও ক্রমে রূপান্তরিত হয়েছে। প্রথম পর্যায়ের খাদ্য সংগ্রহ ও শিকারের যুগের পর পশুপালন যুগ, তারপর কৃষিযুগ। তুলনাক্রমে অতি সাম্প্রতিককালে আরম্ভ হয়েছে শিল্পযুগ। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে জ্ঞানবিজ্ঞানের বিস্ময়কর উন্নতির ফলে এই শিল্পযুগ আবার ইতিমধ্যেই দ্রুত এমন এক পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে যখন মহাবিশ্ব, পৃথিবী এবং মানুষের জীবন সম্বন্ধে অনেক প্রাচীন এবং মধ্যযুগীয় ধারণা পরিত্যক্ত হয়ে নূতন জ্ঞানের সঞ্চার হচ্ছে। মানব সভ্যতায় ধর্মের বিবর্তনের ইতিহাস প্রযুক্তি ও উৎপাদন ব্যবস্থার বিকাশের ইতিহাসের সংগে অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত। ধর্মের পরিণতিও উৎপাদন ব্যবস্থা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ভবিষ্যৎ বিবর্তনের উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। মানুষের জৈবিক এবং জাগতিক বিবর্তনকে অস্বীকার করে তার চৈতন্যের বিকাশ অনুধাবন করা সম্ভব নয়।

ত্রিশ-চল্লিশ হাজার বছর আগেকার প্রথম পর্যায়ের মানব প্রজাতি স্থূল (অর্থাৎ পালিশ না করা) পাথরের অস্ত্র দিয়ে শিকার এবং বনজংগল থেকে অন্যান্য খাদ্য সংগ্রহের উপর নির্ভরশীল ছিলো। পশুপালন কিংবা কৃষি কাজ তখন মানুষের জ্ঞান ও ক্ষমতার বাইরে ছিলো। সে তখন তার প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে নিজেই আলাদা করে ভাবতে শেখেনি, অর্থাৎ তার আত্মচৈতন্য বিকশিত হয়নি। সে তখনো নিজেই 'আমি' এবং বিশ্বপ্রকৃতিতে 'তুমি' বা 'সে' বলে ভাবতে শেখেনি। নিজেই আর প্রকৃতিকে সে এক অবিভক্ত সত্তা বলেই মনে করতো।' প্রত্নতাত্ত্বিক সমীক্ষায়, বিশেষত কবর এবং গুহাচিত্র থেকে জানা গেছে যে মানুষ তখন পশুপাখি-গাছপালার সংগে একটা অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক কল্পনা করতো, এবং এখান থেকেই

ক্রমশ টোটেম প্রথার উৎপত্তি হয়েছিলো। আর জন্মমৃত্যুর আপাতরহস্য বুঝতে না পেরে মৃত্যুর পরবর্তী অবস্থা সম্বন্ধে মানুষের স্থূল ভাবনা আরম্ভ হয়েছিলো। কিন্তু তখনো ধর্ম নামক অধুনা প্রসিদ্ধ পদার্থের জন্ম হয়নি। এক ধরনের স্থূল ধর্মের প্রথম আবির্ভাব ঘটেছিলো নবপ্রস্তর যুগে, যখন মানুষ পালিশ করা উন্নত পাথরের অস্ত্র ব্যবহার করতে শিখেছিলো। আর সে নব প্রস্তরযুগ আরম্ভ হয়েছিলো মাত্র দশ হাজার বছর আগে। তখন শিকার ও খাদ্য আহরণের সংগে সংগে কিছুটা পশুপালন এবং একটু একটু কৃষি আরম্ভ হয়েছিলো। গুহাচিত্র থেকে বোঝা যায় তখন টোটেম প্রথা আরো স্থায়ী রূপ ধারণ করেছিলো। কবরের উপকরণ এবং অনেক ক্ষেত্রে মৃতদেহ পোড়ানোর উদাহরণ থেকে মনে করা হয় যে পরলোকচিন্তা মানুষকে তখন আগের চেয়ে আরো বেশি প্রভাবিত করেছিলো। নানা দেশে পাওয়া শিবলিংগ জাতীয় পাথরের যোনিমূর্তি থেকে অনুমান করা হয় যে জন্ম সম্বন্ধে টোটেম ভিত্তিক আদিম ধর্মচিন্তা গড়ে উঠতে আরম্ভ করেছিলো। যেখানে যেখানে কৃষি আরম্ভ হয়েছিলো, সেখানে শস্যের জন্মদাতা এবং পালক রূপে কল্পিত সূর্য-চন্দ্র এবং পৃথিবী স্তুতিও আরম্ভ হয়েছিলো। আর সেই সংগে আরম্ভ হয়েছিলো ভালো শস্য কামনায় নরবলি। অসুখ-বিসুখ দূর, অমংগল বিতাড়ন এবং শত্রু দমনের জাদু জানা এক রকম আদিম গুণি শ্রেণীরও সৃষ্টি হয়েছিলো এ সময়েই, যা থেকে পরবর্তীকালে পুরোহিত শ্রেণী গড়ে উঠেছিলো। জ্ঞানবিজ্ঞানের অভাব বশত মানুষের ধীশক্তি ছিলো তখনো অনেকটা শিশুর মতো। চিন্তার চেয়ে কল্পনা, অর্থ ভাষার চেয়ে ইমেজ বা ভাবমূর্তিই ছিলো তার আত্মপ্রকাশের প্রধান উপকরণ। তাই তাত্ত্বিক ধর্ম এবং ধর্মগ্রন্থের তখনো জন্ম হয়নি।

প্রায় সাত হাজার বছর আগে যখন কৃষিব্যবস্থা পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে প্রবর্তিত হলো, তখন থেকে এই জাগতিক অগ্রগতির পরিবেশে মানুষের ধর্মীয় কল্পনারও অনেক পরিবর্তন আরম্ভ হলো। প্রথমত, নারী ও ভূমির উৎপাদন ক্ষমতা লক্ষ করে নারী এবং পৃথিবীকে অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন দেবী রূপে কল্পনা করা হলো (প্রাচীন মিশরে অবশ্য প্রথমে আকাশকে নারী রূপে এবং পৃথিবীকে পুরুষ রূপে কল্পনা করা হয়েছিলো)। মানুষের বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে দেবীদের দোসর রূপে একজন দেবতাও থাকতেন, যেমন মিশরে আইসিসের সংগে ওসিরিস, ব্যাবিলনে ইশতারের সংগে দুমু-জি বা তাম্মুজ, ইত্যাদি। এসব দেবী ও দেবতাদের কালক্রমে রূপেগুণে এবং কাজে অনেক পরিবর্তন হতে থাকে, কিন্তু তাদের প্রথম উদ্ভব যে কৃষির সংগে জড়িত ছিলো, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তাছাড়া নারী ও দেবীদের ধর্মীয় গুরুত্ব সম্ভবত মাতৃতান্ত্রিক উপজাতীয় ব্যবস্থার সংগে যুক্ত ছিলো। আর নারীর এই পারিবারিক-সামাজিক প্রাধান্যের মূলে তার জন্মদানের ক্ষমতা ছাড়াও ছিলো আদিম কৃষি ব্যবস্থা, বাড়ি তৈরী প্রভৃতিতে তার অগ্রণী ভূমিকা। পুরুষেরা শিকারে কিংবা পশু চরাতে বেরিয়ে গেলে নারীরাই বীজ বুনতো, ঘর বানাতো এবং সারাতা,

শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণ করতো, আর অনেক সময় আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধও করতো। পরবর্তীকালে কৃষিতে লাংগল প্রভৃতি ভারী যন্ত্রপাতি ব্যবহার এবং গরু-মোষ প্রভৃতি ঙ্গুকে পোষ মানিয়ে তাদের সাহায্যে চাষ আরম্ভ হলে বেশি শারীরিক শক্তির প্রয়োজন হয়, এবং কৃষিতে তথা পরিবারে পুরুষের প্রাধান্য এবং পিতৃতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠা হয়। সম্ভবত একই কালে জন্মে পুরুষের ভূমিকা সম্বন্ধেও সচেতনতা সৃষ্টি হয়, এবং ফলে অনেক সময় নারীকে 'বীর্যহীন' এবং পুরুষ কর্তৃক সন্তান উৎপাদনের জীবন্ত আধার রূপে গণ্য করা হতে থাকে। তখন ক্রমশ ধর্মেও পুরুষ দেবতাদের প্রাধান্যের সূচনা হয়। কিন্তু কৃষি সভ্যতায় দেবীদের অস্তিত্ব বহুকাল পর্যন্ত একেবারে মুছে যায়নি। কারণ মানুষ দেখেছে যে পৃথিবীতে পরিবার ও সমাজের জন্য নারী-পুরুষ দুয়েরই প্রয়োজন হয়। সে ভেবেছে যে দেবলোকেও তার ব্যতিক্রম হতে পারে না।^২

দ্বিতীয়ত, কৃষি ব্যবস্থা প্রচলিত হবার ফলে প্রাচীন পৃথিবীর সর্বত্র শ্রেষ্ঠ দেবতা হিসেবে সূর্য এবং আরেক দেবতা চন্দ্রের উদ্ভব হলো। কারণ প্রাচীন মানুষ লক্ষ্য করেছিলো যে অংকুর উদ্গম থেকে ফসল পাকা পর্যন্ত সবই সূর্যের কৃতিত্ব। আর রাত্রিতে পৃথিবী শীতল রাখবার আর শস্যদের বাঁচিয়ে রাখবার কৃতিত্ব ছিলো চন্দ্রের। ধীরে ধীরে প্রাচীন মিশর, মেসোপটেমিয়া, এবং প্রাচীন গ্রিস সহ অনেক দেশে সূর্যমন্দির ও চন্দ্রমন্দির প্রতিষ্ঠিত হলো। আবাস, অগ্নি, বায়ু, ঝড়, বজ্র, প্রভৃতি প্রাকৃতিক বস্তুগুলোতে অলৌকিক দৈবশক্তি আরোপ করে তাদেরও পূজোর ব্যবস্থা হলো। দেবদেবীদের আবাসস্থল হিসেবে কল্পিত পাহাড়, বন, সমুদ্র, নদী, বৃক্ষ প্রভৃতিও ধর্মীয় গুরুত্ব পেলে। সংগে সংগে আবার প্রাকৃতিক শক্তিগুলোর শুভ-অশুভ দূরকম পরস্পরবিরোধী প্রভাব দেখে অনুরূপ দুই পরস্পরবিরোধী দৈবশক্তির কল্পনা গড়ে উঠলো। প্রাচীন মিশর ও মেসোপটেমিয়ার ধর্মচিন্তার এই কল্পনা জন্মলাভ করে পরে বিশেষ গুরুত্ব অর্জন করলো প্রাচীন ইরানের মাজদা ধর্মে, যেখানে আত্মর মাজদা এবং অংগ্র মন্য ছিলো যথাক্রমে শুভ এবং অশুভ দৈবশক্তি, যারা চিরকাল পরস্পর বিবদমান। পরবর্তী কালের বৈদিক পৌরাণিক হিন্দু ধর্মে দেবাসুরের যুদ্ধেরও আদি উৎস এখানেই, যদিও এর বিবর্তিত এবং জাগতিক বিকাশ হয়েছিলো উত্তর-পশ্চিম ভারতে আর্য-অনার্য সংঘাতকে কেন্দ্র করে।

একথা মনে করলে অবশ্য ভুল হবে যে নব প্রস্তরযুগের পরেই পৃথিবীর সর্বত্র একসঙ্গে কৃষিযুগ আরম্ভ হয়েছিলো। কৃষিযুগের আগে এবং সমকালে অনেক জায়গায় পশুপালন ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থাও বর্তমান ছিলো। উদাহরণস্বরূপ, প্রাচীন মিশরে, সুমেরে কিংবা সিন্ধু সভ্যতায় যখন কৃষিযুগে অনেকটা এগিয়েছিলো, যাযাবর আর্যরা তখনো প্রধানত পশুপালনের উপর নির্ভরশীল ছিলো। এ ধরনের যাযাবর উপজাতীয় ধর্মে যুদ্ধজয় এবং শত্রু নিধনের জন্য যুদ্ধের দেবতাদের (যেমন ঋগ্বেদ-এর ইন্দ্র), আর অগ্নি ও সূর্য প্রভৃতি অন্ধকার বিরোধী প্রাকৃতিক শক্তির প্রাধান্য

ছিলো। জাদুভিত্তিক যজ্ঞ ও প্রার্থনায় মূলত সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘ আয়ু, শত্রুজয়, বহুসংখ্যক গবাদি পশু, বহু সন্তান, এবং বিপুল ঐশ্বর্যের জন্য আকৃতি থাকতো। মানুষের বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রাচীন কৃষি ধর্মের মতো পশুপালন ধর্মেও নৈসর্গিক দেবতা এবং দেবী দুইয়েরই অস্তিত্ব ছিলো, যথা ঋত্থেদ-এর সূর্য এবং উষা। কিন্তু যাযাবর সমাজে সাধারণত নারী-পুরুষ সামাজিক সাম্য বজায় থাকবার ফলে ধর্মে দেবদেবীদের মধ্যেও বিশেষ অসাম্য লক্ষ করা যায় না। ঋত্থেদ-এ এর অনেক উদাহরণ ছড়িয়ে আছে। এখানেও যাগযজ্ঞ এবং অন্যান্য ধর্মজাদু পরিচালনা করবার জন্য প্রাচীনতর গুণিনদের মধ্য থেকে এক ধরনের বিশেষজ্ঞ পুরোহিত শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছিলো। কিন্তু সংগঠিত বা প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের সৃষ্টি যাযাবর সমাজ থেকে হয়নি। তা হয়েছে স্থায়ী কৃষি সংস্কৃতি থেকেই।

এভাবে মানব সমাজের বিবর্তনের মধ্য দিয়ে ক্রমশ প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের অভ্যুত্থানের সমাজবৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায় মানুষের তৎকালীন সামাজিক সম্পর্কের গঠন ও অভিজ্ঞতার মধ্যেই। সে ধরনের মানবিক সম্পর্ক ও অভিজ্ঞতাকেই মানুষ আরোপ করেছিলো কৃষির সংগে সংশ্লিষ্ট দেবদেবীদের উপর। যাদের কাছে মানুষ কিছু পাবার প্রত্যাশী, তাদের প্রশংসা-স্তুতিতে সন্তুষ্ট করে, তাদের কাছে প্রার্থনা করে, তাদের দান উপঢৌকনে তুষ্ট করে, অতীষ্ট বস্তু লাভের চেষ্টা করে থাকে। নিজেদের এই সামাজিক অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তেমনি ভাবে প্রাচীন মানুষ শুভফলের আশায় প্রাকৃতিক শক্তিগুলোকে ক্ষমতাবান মানুষের মতো কল্পনা করতো, এবং তাদের কাছে সুস্বাস্থ্য, সন্তান, সময়ে বৃষ্টি, ভালো ফসল, ধনৈশ্বর্য, দীর্ঘ জীবন প্রভৃতি কামনা করতো। আর সে উদ্দেশ্যে যজ্ঞ (দান), স্তুতি-প্রার্থনা (মন্ত্র) দ্বারা তাদের সন্তুষ্ট করবার চেষ্টা করতো। আবার বলবান শত্রুর হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য মানুষ যেমন একই উপায়ে প্রশংসা-স্তুতি-প্রার্থনা দানের পদ্ধতি অনুসরণ করে, সে ভাবে মৃত্যু, অসুখ, খরা, বন্যা, ঝড়, বজ্রপাত, হিংস্র পশু, সাপ প্রভৃতি অশুভ প্রাকৃতিক শক্তিগুলোকে যজ্ঞ-পূজো-মন্ত্র-দানের মাধ্যমে তুষ্ট রাখার চেষ্টা করতো। কিন্তু মানুষের মতো প্রাকৃতিক শক্তিগুলোর সামনা-সামনি দেখা পাওয়া যেতো না বলে কিছুটা কল্পনা এবং জাদুর আশ্রয় নিতেই হতো। আবার এক দিকে পুরানো টোটেম প্রথার পরম্পরা, আর অন্য দিকে বন্য পশুকে বশীভূত করে বাহন রূপে ব্যবহার করবার অভিজ্ঞতার ফলে বিভিন্ন দেবদেবীর বাহন রূপে বিভিন্ন পশুপাখিকে কল্পনা করা হতো। আর ধর্মজাদু, যজ্ঞ, পূজো, প্রার্থনা প্রভৃতি ক্রিয়াকলাপের বিশেষজ্ঞ হিসেবে প্রাচীন গুণিনদের মধ্য থেকে কৃষিযুগে দ্রুত এক পুরোহিত শ্রেণী উঠে আসে এরা যে শুধু ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপের বিশেষজ্ঞ ছিলো তাই নয়। এরা মৌখিক মিথলজি বা পৌরাণিক অতিকথা রচনা করতো, ধর্মের ব্যাখ্যা করতো, শাসক শ্রেণীর প্রয়োজন অনুযায়ী নূতন নূতন ধর্মতত্ত্ব সৃষ্টি করতো, এবং লিপি আবিষ্কৃত হবার পর থেকে ধর্মগ্রন্থ রচনা করতো। জনসাধারণের দানে এবং

গাভানুগ্রহে এই পুরোহিত শ্রেণী এবং তাদের মন্দিরগুলো ক্রমশ বিস্তারিত ও ক্ষমতাবান হয়ে ওঠে। আবার এই পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে প্রাচীন উপজাতি প্রধান, রাজা, বিস্তারিত মানুষ বা ক্ষমতাবান পুরোহিতেরা নিজেদের সূর্য, চন্দ্র কিংবা অন্যান্য দেবদেবীর পুত্র, বংশধর বা প্রতিনিধি বলে ঘোষণা করতো। অনেক সময়ে নিজেরাই দেবতা বলে দাবি করতো। যাতে তাদের বিশেষ সুযোগ সুবিধাগুলো সম্বন্ধে জনসাধারণের মনে কোন সন্দেহ না জন্মায়। আর পুরোহিত শ্রেণী ধর্মতত্ত্ব ও ধর্মীয় অনুশাসন রচনা করে এ ব্যাপারে তাদের সাহায্য করতো। এভাবেই কৃষিযুগে সর্বপ্রথম প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের গোড়াপত্তন হয়।

ক্রমশ উদ্ভূত ফসল, কুটীরশিল্পজাত এবং মণিমুক্তো নিয়ে বিভিন্ন উপজাতির মধ্যে বাণিজ্য আরম্ভ হয়। আর জনসংখ্যা বৃদ্ধির সংগে সংগে জমির লড়াইও জোরদার হয়ে ওঠে। এই পরিস্থিতিতে একটি নির্দিষ্ট উপজাতির নিজস্ব সীমানা অতিক্রম করে বৃহত্তর ভৌগোলিক ও জনসমষ্টির ঐক্যের প্রয়োজন হয়। কোন কোন উপজাতি প্রধান যুদ্ধে অন্য উপজাতিদের বশীভূত করে এবং রাজ্যস্থাপন করে রাজা হয়। এভাবে প্রাচীন রাষ্ট্রের উৎপত্তি হলো। আর রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব ও শৃংখলার জন্য এই বৃহত্তর ভৌগোলিক পরিসীমার মধ্যে অবস্থিত উপজাতিগুলোর ভিন্ন ভিন্ন টোটেম, স্থানীয় দেবদেবী এবং প্রাকৃতিক দেবদেবীর সমন্বয়ের প্রয়োজন দেখা দিলো। এই অবস্থাতেই রাষ্ট্রশক্তি ও পুরোহিত শ্রেণীর মিলিত চেষ্টায় সব উপজাতির কাছে গ্রহণযোগ্য একজন প্রধান দেবতা সৃষ্টি করা হয়। এই জাগতিক উৎস থেকেই সমাজের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিবর্তনের সংগে সংগে ক্রমশ বড়ো বড়ো ধর্মগুলোর জন্ম হয়।

বর্তমানে প্রচলিত বিভিন্ন ধর্মের প্রধান প্রধান ধর্মগ্রন্থগুলোও এই ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতেই রচিত হয়েছিলো। বিভিন্ন উপজাতি ও অন্যান্য জনগোষ্ঠীর মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার কানুনিক বুনিয়াদ হিসেবে ধর্মীয়-সামাজিক অনুশাসনের সংকলন প্রয়োজন হয়েছিলো। এই অনুশাসন বা বিধানগুলো রাজন্য শ্রেণী, ব্যবসায়ী শ্রেণী এবং পুরোহিত শ্রেণীর সম্মিলিত চেষ্টায় বৃহত্তর ভৌগোলিক-রাজনৈতিক সামাজিক পরিবেশে বলবৎ করা হয়েছিলো। প্রকৃতপক্ষে এই ধর্মগ্রন্থগুলোই সর্বপ্রথম নতুন আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামোর তাত্ত্বিক সমর্থনে ব্যবহৃত হয়, এবং এই শ্রেণীবিভক্ত অসম কাঠামোর শ্রীবৃদ্ধিতে সহায়তা করে। কিন্তু কোন বড়ো ধর্ম গঠিত হবার সময়েই তার প্রধান ধর্মগ্রন্থে সম্পূর্ণ নতুন ধর্মীয়-সামাজিক অনুশাসন রচিত এবং প্রবর্তিত হয়নি। কারণ তাহলে জনসাধারণের কাছে সে ধরনের অভিনব বিধান বোধগম্য কিংবা গ্রহণযোগ্য হতো না। অতএব ধর্মগ্রন্থগুলোতে এক দিকে যেমন সমকালীন ঐতিহাসিক প্রয়োজন এবং প্রভুশ্রেণীর স্বার্থ পূরণের প্রবণতা লক্ষ করা যায়, তেমনি আবার সব ক্ষেত্রেই আগে থেকে প্রচলিত ধর্মীয় ঐতিহ্যকে সেগুলোর সংগে জুড়ে দেবার চেষ্টাও স্পষ্ট।

উদাহরণস্বরূপ, স্মৃতিশাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত ধর্মসূত্র, ধর্মশাস্ত্র ভগবদ্গীতা এবং রামায়ণ মহাভারত হিন্দু ধর্মের স্বীকৃত প্রধান ধর্মগ্রন্থ হওয়া সত্ত্বেও প্রাচীনতর বেদ-উপনিষদের শ্রুতির ঐতিহ্যকেও এসব ধর্মগ্রন্থে স্বীকৃতি ও উচ্চ সম্মান জানানো হয়েছে। বৌদ্ধ ধর্ম বৈদিক যাগযজ্ঞের বিরোধী হলেও ত্রিপিটকে উপনিষদের আত্মায় বিশ্বাস ও বৈরাগ্যবাদ, এবং প্রাচীন হিন্দু দর্শনের জন্মান্তরবাদ প্রভৃতি গ্রহণ করা হয়েছিলো। তাছাড়া হিন্দু ধর্মের অনেক দেবদেবী অল্পকালের মধ্যেই বৌদ্ধ ধর্মে গৃহীত হয়েছিলো। পরবর্তীকালে বৌদ্ধ ধর্ম যখন চীন ও জাপানে প্রবর্তিত হয়, তখনো যথাক্রমে প্রাচীনতর তাও ও কনফুসিয় ধর্ম এবং শিটো ধর্মের অনেক কিছুই মেনে নিয়েছিলো। তেমনি ভাবে বাইবেল-এ ইহুদি ধর্মের প্রাচীনতর পরম্পরার পরিচয় আছে, যে পরম্পরা সংশ্লিষ্ট ভৌগোলিক এলাকায় খ্রিস্ট ধর্ম গড়ে ওঠবার আগে প্রচলিত ছিলো। কোরান-এও ইহুদি ধর্ম এবং খ্রিস্ট ধর্মের দুটি ঐতিহ্যকেই স্বীকৃতি ও সম্মান জানানো হয়েছে, কারণ আরব দেশে ইসলাম ধর্ম প্রচলিত হবার আগে যদিও পৌত্তলিক ধর্মেরই প্রাধান্য ছিলো, তথাপি ইহুদি এবং খ্রিস্ট ধর্মের সমর্থকেরাও সংখ্যায় নগণ্য ছিলো না। আর পশ্চিম এশিয়ার সংলগ্ন অঞ্চলে তখন খ্রিস্ট ধর্ম বহুল প্রচলিত ছিলো।

উপজাতীয় বৈদিক ধর্ম নিয়ে প্রাচীন ইরান-আফগানিস্তান অঞ্চল থেকে আর্যেরা প্রথমে ভারতে এসেছিলো। তারপর বহিরাগত আর্যদের সংগে ভূমিপুত্র অনার্যদের সংঘাত, পরবর্তী কালে বাইরে থেকে আসা 'মল্ল' অনার্যদের সংগে আর্যদের সংঘাত, বৈদিক আর্যধর্মের বিরোধী কয়েকটি নাস্তিক গোষ্ঠীর আবির্ভাব প্রভৃতির ফলে আর্য সভ্যতার বিস্তারের সংগে-সংগে ধর্মক্ষেত্রে সমন্বয়ের প্রয়োজন দেখা দেয়। এই আর্য অনার্য ধর্মের সমন্বয়ের প্রয়োজনেই একেশ্বরবাদ ও অদ্বৈতবাদের সৃষ্টি হয়। এভাবেই হিন্দু ধর্মের সেই তাত্ত্বিক বুনியাদ গড়ে ওঠে, যাতে অসংখ্য দেবদেবী একই ঈশ্বরের বিভিন্ন প্রকাশ বা রূপ বলে স্বীকৃতি পেয়ে থাকে। আবার চাতুর্বর্ণ্য প্রথাকে ধর্মীয় সমর্থন জানিয়ে আদিম শ্রম বিভাজনের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা অসম আর্থসামাজিক কাঠামোকে মহিমান্বিত ও চিরায়ত করবার চেষ্টা করা হয়। এই আর্থসামাজিক কাঠামোতে সে কৃষক-শ্রমিক শ্রেণীকেই শোষণ-পীড়নের শিকার বানিয়ে অবমাননিক হীনস্থানে ঠেলে দেয়া হয়, যে শ্রেণী ছিলো জনসংখ্যার বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ। মুষ্টিমেয় ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় পরগাছা শ্রেণী আর্থসামাজিক পিরামিডের শিখরদেশে অবস্থান করে তাদের নিরংকুশ শোষণ-শাসন অব্যাহত রাখে।^৭ তেমনি ভাবে জনসংখ্যার অর্ধেক ও নারী সমাজ, তাকেও পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার পাদদেশে নির্বাসিত করে তার জন্য অমাননিক আর্থসামাজিক স্থানাংক নির্দিষ্ট হয়।^৮ আর মনুষ্মতি, ভগবদ্গীতা এবং পল্লবিত রামায়ণ মহাভারত-এ ধর্মীয় সমর্থনে মহিমান্বিত করা হয় এই অমাননিক আর্থসামাজিক কাঠামোকেই।^৯ এভাবেই কৃষিযুগের বিকাশের সংগে সংগে প্রাতিষ্ঠানিক হিন্দু ধর্মের

গোড়াপত্তন হয়।

ব্রাহ্মণ্য ধর্মের যাগযজ্ঞ ও অন্যান্য ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপ এবং চাতুর্বর্ণের বিরোধিতার মধ্য দিয়ে নিরীশ্বরবাদী ও অহিংসাবাদী বৌদ্ধ ধর্ম ও জৈন ধর্মের উদ্ভব হয়। সম্রাট অশোকের আমলে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে বৌদ্ধ ধর্ম মৌর্য সাম্রাজ্যে, অর্থাৎ প্রায় সারা ভারতবর্ষে, ধর্মীয় ঐক্য স্থাপনে সহায়তা করে। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই বুদ্ধে, সংঘে এবং ধর্মে শরণ নেবার রীতিতে বৌদ্ধ ধর্মও অন্য ধর্মের মতোই বিশ্বাসে প্রতিষ্ঠিত গোড়া ধর্ম হয়ে দাঁড়ায়। দ্বিতীয়ত, তাত্ত্বিক, দৃষ্টিকোণ থেকে বৌদ্ধ ধর্ম চাতুর্বর্ণ বিরোধী হলেও কার্যত চাতুর্বর্ণ ভিত্তিক আর্থসামাজিক কাঠামোকে পরিবর্তনের বিশেষ চেষ্টা করেনি। প্রকৃতপক্ষে বৌদ্ধ ধর্মের আর্থিক নিয়ন্ত্রণ শ্রেষ্ঠ বা ধনী ব্যবসায়ীদের হাতে চলে যায়। তৃতীয়ত, মহাযান বৌদ্ধ ধর্মের উদ্ভবের পরে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অনেক ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপ বৌদ্ধ ধর্মের মধ্যে প্রবেশ করে। এভাবে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্মের মধ্যে মূল পার্থক্যগুলো ক্রমশ কমে আসে। চতুর্থত, মানব জীবন অবিমিশ্র দুঃখের আধার, আর জন্মমৃত্যুর হাত থেকে নির্বাণ লাভ করে মহাশূন্যে মিলিয়ে যাওয়াই ধর্মের লক্ষ্য, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের এই তত্ত্ব এদের ক্রমশ হীনবল হবার অন্যতম ঐতিহাসিক কারণ। পরবর্তীকালে মানব জীবনের প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টি গ্রহণ করেই চীন ও জাপান বৌদ্ধ ধর্ম জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠায় সমর্থ হয়েছিলো।

খ্রিস্ট ধর্মের উৎপত্তি হয়েছিলো ইহুদি উপজাতিদের উপর রোমান সাম্রাজ্যের বারংবার নৃশংস অত্যাচারের ফলে। সমস্ত প্রতিরোধে বারংবার ব্যর্থ হয়ে ইহুদিদের এক অংশ পরলোকে মুক্তির সন্ধান করে। এই পরিস্থিতিতে ডেড সি অঞ্চলে সম্ভবত ইসিন (Essene) সম্প্রদায়ের মধ্যে খ্রিস্ট ধর্মের জন্ম হয়। ইহুদিদের মধ্য থেকে এভাবে খ্রিস্ট ধর্মের উদ্ভবের পেছনে সম্ভবত বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব ছিলো। অশোকের দ্বারা প্রেরিত বৌদ্ধ ধর্মযাজকেরা যে এই অঞ্চলে তৎপর ছিলেন, তার ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে।^৬ তাছাড়া যে অহিংসার তত্ত্ব নিয়ে খ্রিস্ট ধর্মের উৎপত্তি হয়েছিলো, তার কোন পুরানো ঐতিহ্য ইহুদিদের মধ্যে ছিলো না। ডেড সি অঞ্চল থেকে পাওয়া প্যাপিরাস পাণ্ডুলিপিগুলো থেকেও স্পষ্ট হয়েছে যে বৌদ্ধ ধর্মের সংগঠন ও তাত্ত্বিক আদর্শের সংগে আদি খ্রিস্ট ধর্মের অনেক মিল ছিলো।^৭ অবশ্য ডেড সি স্ক্রোলগুলো আবিষ্কৃত হবার অনেক আগেই কোন কোন পণ্ডিত এ সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাবে ইসিনদের মধ্য থেকে খ্রিস্ট ধর্মের উৎপত্তি হয়েছিলো।^৮ তারপর বিশাল রোমান সাম্রাজ্যের ক্রীতদাস শ্রেণী এবং নিপীড়িত উপজাতিদের মধ্যে খ্রিস্ট ধর্ম কিছুটা প্রসার লাভ করে। এদিকে রোমান সম্রাটেরা বহু জাতি-উপজাতিতে এবং বিভিন্ন ধর্মে বিভক্ত তাদের সাম্রাজ্যে একটি মাত্র ধর্মের সাহায্যে সাংস্কৃতিক সমন্বয় ও ঐক্য প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হলেন। কিন্তু প্রথমে তারা খ্রিস্ট ধর্মের কথা ভাবেন নি। রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টায় প্রথমে রোমের দেবী রোমা, এবং জুপিটার বা বৃহস্পতির পূজা

বাধ্যতামূলক করবার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু এ চেষ্টা ব্যর্থ হয়। প্রকৃতপক্ষে এ সময়ে মিশরজাত দেবী আইসিস এবং ইরানজাত দেবতা মিত্রের পূজো রোমক সাম্রাজ্যের বহুল প্রচলিত ছিলো। কিন্তু এসব ধর্ম এই বিশাল সাম্রাজ্যে ধর্মীয় ঐক্য স্থাপনে, আর নিপীড়িত জনসাধারণকে পারলৌকিক মুক্তির আশ্বাস দিতে ব্যর্থ হয়েছিলো। পর পর কয়েকটি ক্রীতদাস বিদ্রোহ ব্যর্থ হবার পর জনসাধারণ ইহলৌকিক মুক্তির আশা ত্যাগ করে পারলৌকিক মুক্তির আশায় উদগ্রীব হয়ে পড়েছিলো। খ্রিস্ট ধর্মে ছিলো এই মুক্তির আশ্বাস আর রোমক সাম্রাজ্যের সর্বজনীন ধর্ম হবার প্রতিশ্রুতি। তাই খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতকে সম্রাট কনস্টানটাইন এই ধর্মকেই রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসেবে বেছে নেন। তিনি নিজে কখনো খ্রিস্ট ধর্মে দীক্ষিত হন নি। কিন্তু সিংহাসনে তার নিজের এবং সাম্রাজ্যের স্থায়িত্বের জন্য পুরোহিত শ্রেণীর সাংগঠনিক শক্তির সমর্থন পেতে, আর এই পরলোকমুখী ধর্মের সাহায্যে জনসাধারণকে বশে রাখতে আগ্রহী ছিলেন।

মরুপ্রধান আরব দেশ প্রাচীনকালে বহুসংখ্যক যাযাবর বেদুইন ও অল্প কিছু কৃষিনির্ভর উপজাতিতে বিভক্ত ছিলো। এরা অন্যান্য দেশের প্রাচীন উপজাতিদের মতোই নানা রকম পশুপাখি, গাছপাথর এবং দেবদেবীর মূর্তি পূজো করতো। খ্রিস্টীয় যুগের প্রথম দিকে আরব দেশ একটি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যপথের অন্তর্ভুক্ত ছিলো। মিশর, ইথিওপিয়া, মেসোপটেমিয়া, সিরিয়া এবং প্যালেস্টাইনের বাণিজ্য আরব দেশের মধ্য দিয়ে ক্যারাভান পথে যেতো। লোহিত সাগরের কাছে অবস্থিত মক্কা অঞ্চল এই ক্যারাভান পথে অবস্থিত ছিলো বলে একটি সমৃদ্ধ শহরে পরিণত হয়েছিলো। ফলে এটি প্রধান ধর্মস্থান ও তীর্থস্থানের মর্যাদাও পেয়েছিলো। সমস্ত উপজাতিদের দেবদেবীর মূর্তি এখানকার কাবায় রাখা হতো। কুরেশি উপজাতির অভিজাত পরিবারগুলো এই বাণিজ্য ও তীর্থযাত্রা থেকে প্রচুর অর্থ উপার্জন করতো। কিন্তু ষষ্ঠ শতাব্দীতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যপথ আরব থেকে ইরানে সরে যাবার ফলে জনসাধারণের, বিশেষত যাযাবর উপজাতিগুলোর আর্থিক সংকট দেখা দেয়। তখন বিভিন্ন উপজাতির মধ্যে মরুভূমিতে দুর্লভ কৃষিযোগ্য জমির জন্য সংঘাত আরম্ভ হয়। ঐক্যের প্রয়োজনে হানিফ নামে একটি ধর্মগোষ্ঠী একেশ্বরবাদ প্রচার আরম্ভ করে। আরব দেশে এ সময়ে যেসব ইহুদি এবং খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বী বাস করতো, তাদের মাধ্যমে একেশ্বরবাদের সংগে মানুষের আগেই পরিচয় ঘটেছিলো।

এই ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতেই হযরত মোহাম্মদ ইসলাম ধর্ম প্রচার আরম্ভ করেন। মক্কার অভিজাত ব্যবসায়ী সম্প্রদায় এই আশংকায় প্রথমে তাঁর বিরোধিতা করে যে দেবদেবীহীন এই নূতন ধর্মের ফলে মক্কার প্রাচীন ধর্মীয় গুরুত্ব লোপ পেয়ে তাদের বড়ো রকমের অর্থক্ষতি হবে। কিন্তু মদিনায় প্রধানত দরিদ্র কৃষক শ্রেণীর বাস ছিলো, আর চারিদিকে ছিলো প্রায় নিঃস্ব বেদুইন উপজাতি। তাদের জমির ক্ষুধা ছিলো, আর ছিলো মক্কার অভিজাত ব্যবসায়ীদের প্রতি ঈর্ষাপ্রসূত বিরূপ মনোভাব। তারা বহু সংখ্যায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে, এবং হযরত মোহাম্মদের সৈন্যবাহিনীতে

যোগ দিয়ে ৬৩০ খ্রিস্টাব্দে তাঁকে মক্কা অধিকার করতে সাহায্য করে। মক্কার কুরেশি সম্প্রদায়ও এই অঞ্চলের নূতন রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় গুরুত্ব উপলব্ধি করলো। ওছাড়া হযরত মোহাম্মদ তীর্থস্থান হিসেবে কাবাকে সর্বোচ্চ স্বীকৃতি দেবার ফলে ধর্মস্থান ও তীর্থস্থান হিসেবে কাবার গুরুত্ব কমে না গিয়ে বরঞ্চ অনেক বৃদ্ধি পেলো। যেসব অভিজাত পরিবার কাবা এবং মক্কার তীর্থযাত্রীদের কাছ থেকে প্রচুর অর্থ উপার্জন করতো, তাদের আর্থিক লোকসানের ভয়ও চলে গেলো। এসব কারণে ঋমতশালী কুরেশি উপজাতি এবং অন্যান্য অভিজাত সম্প্রদায়ের লোকেরা তাদের আগেকার বিরোধিতা পরিত্যাগ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ এবং হযরত মোহাম্মদের আনুগত্য স্বীকার করে নিলো। তারপর অনেকগুলো যুদ্ধ এবং ধর্মপ্রচারের মাধ্যমে হযরত মোহাম্মদ উপজাতীয় ঐক্য এবং শক্তিশালী আরব রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। সকলেই জানেন, মোহাম্মদের মৃত্যুর পরে একশো বছরের মধ্যে আরব সাম্রাজ্য এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপ বিস্তৃত হয়, এবং ইসলাম ধর্ম এই সাম্রাজ্যের সাধারণ ধর্মে পরিণত হয়।

কৃষিযুগে যে ধর্ম গড়ে উঠেছিলো, শিল্পযুগে তার পরিবর্তন ছিলো অবশ্যস্বাভাবী। কারণ কৃষি ছিলো মূলত সূর্য-চন্দ্র-মেঘ-বৃষ্টি প্রভৃতি প্রাকৃতিক-নৈসর্গিক শক্তির উপরে নির্ভরশীল। তাই এসব শক্তিকে দেবদেবী রূপে কল্পনা করে তাদের কাছে জাগতিক শ্রীবৃদ্ধি এবং বিপদ থেকে মুক্তির আশায় পূজো-মন্ত্র-দান-প্রার্থনাকে ভিত্তি করে মানুষের ধর্ম গড়ে উঠেছিলো। একেশ্বরবাদের উদ্ভবের ফলে ইহুদি ধর্ম, খ্রিস্ট ধর্ম এবং ইসলামের মধ্যে অবশ্য বহু দেবদেবীর পূজো ক্রমশ উঠে গিয়েছিলো, যদিও খ্রিস্টধর্মের মধ্যে যিশু, মেরী এবং সন্তুরা দেবদেবীদের শূন্যস্থান অনেকখানি অধিকার করেছিলেন। কিন্তু কৌশল ক্ষেত্রেই কৃষিধর্মের বিষয়বস্তু কৃষি সভ্যতার প্রাকৃতিক এবং জাগতিক পরিবেশকে অতিক্রম করতে পারে নি। অন্য দিকে শিল্প উৎপাদন প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল নয়। কারখানা বাড়ির মধ্যে যন্ত্রের সাহায্যে মানুষ নিজ শ্রমে শিল্পদ্রব্য উৎপন্ন করে। বাইরে রোদ, জল, বজ্রপাত যাই হোক না কেন, সে সবার ফলে উৎপাদনের কোন ব্যাঘাত হয় না। এমনকি কারখানা বাড়িকে সম্পূর্ণ বাতানুকূল করাও সম্ভব হয়েছে। তাই শিল্পযুগে প্রাকৃতিক দেবদেবী এবং তাদের নিয়ন্ত্রা পরমেশ্বর, আর মিথলজি বা পৌরাণিক অতিকথার প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়। শিল্পের বিকাশের ফলে শিল্পজাত যন্ত্রপাতি এবং রাসায়নিক সার ব্যবহার করে কৃষির উন্নতি সম্ভব হয়। নদীতে বাঁধ দিয়ে, খাল কেটে সেচের ব্যবস্থা করা যায়। ফলে প্রাকৃতিক শক্তির উপর কৃষির নির্ভরতাও অনেক কমে আসে। আর এ ভাবে নিজের শ্রমশক্তি এবং প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতির উপর মানুষের আস্থা বাড়ে। সেই সংগে শিল্প সভ্যতায় অনিবার্য ভাবেই জ্ঞানবিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশ হয়। শিল্প সভ্যতার এই নূতন জাগতিক পরিবেশে মানুষের ধর্মচিন্তার বিবর্তনও হয়ে পড়ে অবশ্যস্বাভাবী।

ইউরোপে মধ্যযুগের শেষে যখন নিবিড় কুটীর ও ক্ষুদ্রশিল্পের দ্রুত অগ্রগতি

হচ্ছিলো, এই ক্ষেত্রে পুঁজি বিনিয়োগ দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছিলো, আর ব্যাংকিং ব্যবস্থা গড়ে উঠছিলো, তখন খ্রিস্ট ধর্মের অভ্যন্তরে রেফরমেশন বা ধর্ম সংস্কার আন্দোলনের মাধ্যমে প্রোটেস্টান্ট ধর্মের উদ্ভব হয়েছিলো। কারণ প্রচলিত খ্রিস্ট ধর্ম সে সময়ে মানুষের জাগতিক উন্নতির চেষ্টাকে ধর্মবিরোধী বলে ঘোষণা করতো, আর ধর্মীয় অনুশাসনে ব্যক্তিগত মুনাফা এবং পুঁজির উপর সুদ নিষিদ্ধ করেছিলো। এভাবে কৃষিযুগের খ্রিস্ট ধর্ম শিল্পের বিকাশের পরিপন্থী হয়ে দাঁড়িয়েছিলো।^৯ আবার ইউরোপের বৌদ্ধিক নবজাগরণ, ধর্মসংস্কার এবং শিল্পবিপ্লবের ফলে অষ্টাদশ শতাব্দীতে যে জ্ঞানবাদী আন্দোলন (Enlightenment) গড়ে উঠেছিলো, তার মধ্যে প্রাধান্য পেয়েছিলো ধর্ম ও পুরোহিত শ্রেণীর উপর সরাসরি বৌদ্ধিক আক্রমণ। ধর্ম ও পুরোহিত শ্রেণীর প্রতি এই বিরোধিতা ফরাসী বিপ্লবে কেন্দ্রীয় গুরুত্ব পেয়েছিলো। অন্য দিকে ধনতন্ত্রের প্রাথমিক যুগে শ্রমিক শ্রেণীর অমানবিক শোষণ ও দুর্দশার মধ্যেও পুরোহিত শ্রেণী এবং এক শ্রেণীর সমাজ চিন্তক ধর্মের সাহায্যে দারিদ্র্যের ব্যাখ্যা চালিয়ে যেতে থাকেন। উনিশ শতকের প্রথম ভাগেও দারিদ্র্যকে মানব জাতির আদি পাপ এবং সঞ্চিত পাপের সাহায্যে ব্যাখ্যার প্রবণতা শাসক শ্রেণীর মধ্যে বহুল প্রচলিত ছিলো।^{১০} এই ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতেই উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে মার্কসীয় চিন্তাধারায় ধর্মকে অলীক দর্শন এবং জনগণের আফিম রূপে চিহ্নিত করা হয়, আর ধর্মহীন, শোষণহীন সমাজতন্ত্রের আদর্শ গড়ে ওঠে।

বিংশ শতাব্দীর শেষে আবার প্রযুক্তিগত উৎপাদন ব্যবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তনের সূচনা হয়েছে। যানবাহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ, বিভিন্ন দেশের মধ্যে যৌথ উৎপাদন ব্যবস্থা, উৎপাদন-প্রযুক্তির আন্তর্জাতিক প্রসার, কমপিউটারের সাহায্যে স্বয়ংক্রিয় উৎপাদন ব্যবস্থা বা অটোমেশনের মাধ্যমে কম কায়িক শ্রমে বেশি উৎপাদন, কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সংবাদ আদান প্রদানের বিস্ময়কর অগ্রগতি, এক সংস্কৃতির উপর অন্য সংস্কৃতির অনিবার্য প্রভাব, এবং এসবের ফলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিস্ময়কর অগ্রগতি ঘটে চলেছে। সংবাদ মাধ্যমগুলো যখন পৃথিবীর যেকোনো জায়গার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ঘটনার বিবরণ প্রতিদিন প্রকাশ করে চলেছে, টেলিভিশন যখন পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তের ক্ষুদ্রতম ঘটনা তৎক্ষণাৎ আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরেছে, আর কৃত্রিম উপগ্রহের ক্যামেরা যখন পৃথিবীর প্রতি ইঞ্চির ছবি তুলছে, তখন পৃথিবীর কোন এক জায়গায় এক নকল মানবগোষ্ঠী কিছু প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ এবং অন্ধ বিশ্বাস আর কুসংস্কার বেশি দিন আঁকড়ে ধরে থাকতে পারবে না। মানুষ যখন চাঁদের মাটিতে হেঁটেছে, আর মহাকাশে অভিযানকারী কৃত্রিম উপগ্রহের ক্যামেরা এবং উন্নত যন্ত্রপাতির সাহায্যে সৌরমণ্ডল তথা মহাবিশ্বের ভৌতিক প্রকৃতি সম্বন্ধে সম্যক অবহিত হচ্ছে, তখন আর আকাশের জ্যোতিষদের দেবদেবী মনে করা সম্ভব নয়।

মান সত্ত্ব নয় দেবদূতে বিশ্বাস বা অন্যান্য প্রাকৃতিক শক্তিগুলোর পূজো-উপাসনা। মহাপ্রবাদের বিবর্তন সম্বন্ধে ক্রমবর্ধমান জ্ঞানের ফলে ভবিষ্যতে আর সম্ভব হবে না প্রাচীন ধর্মগ্রন্থের সৃষ্টিতত্ত্ব বা জাগতিক অনুশাসনগুলোতে অন্ধ বিশ্বাস অটুট রাখা।

অবশ্য একথা মনে রাখতে হবে যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ এবং জনগোষ্ঠীর মধ্যে এখনো প্রযুক্তি, উৎপাদন ব্যবস্থা, এবং শিক্ষা ও জ্ঞানবিজ্ঞানের বিকাশের স্তরে বিরাট অসাম্য বর্তমান। প্রকৃতপক্ষে শিক্ষা, প্রযুক্তি ও উৎপাদন ব্যবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন প্রধানত পৃথিবীর উত্তর গোলাধারে দেশগুলোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তৃতীয় বিশ্বের উপর ঐতিহাসিক ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদ, ইউরোপ-আমেরিকায় শিল্পবিপ্লব, উত্তর ও দক্ষিণ গোলাধারে যথাক্রমে শুভকর ও ক্ষতিকর জলবায়ু, এবং বর্তমানকালে উত্তর গোলাধারে (মূলত উত্তর অতলাস্তিক অঞ্চলের) দেশগুলোর দক্ষিণ গোলাধারে নয় সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্য প্রভৃতি বিভিন্ন ঐতিহাসিক-অর্থনৈতিক-প্রাকৃতিক-রাজনৈতিক কারণ এই অসম আন্তর্জাতিক উন্নয়নের জন্য দায়ী। ফলে তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশই এখনো গণশিক্ষা, বিজ্ঞান, ও প্রযুক্তির মান অত্যন্ত নিম্নস্তরের, এবং উৎপাদন ব্যবস্থা এখনো সামন্ততান্ত্রিক, অথবা আধা-ধনতান্ত্রিক এবং আধা-সামন্ততান্ত্রিক। আর প্রধানত সে কারণেই এসব দেশে এখনো শাস্ত্রীয় ধর্মবিশ্বাস, ধর্মীয় কুসংস্কার এবং ধর্মীয় মৌলবাদের ব্যাপকতা লক্ষ করা যায়। এক দিকে যেমন অনেক দেশে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও গণশিক্ষার প্রসারে প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ধর্মবিশ্বাসের ভিত্তিমূলে ফাটল ধরেছে, অন্য দিকে অনেক দেশে এখনো প্রাচীন ধর্মগ্রন্থের বিধান অনুযায়ী রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক কাঠামো গঠন, গুণিন বা ওঝা দিয়ে অসুখ সারানো বা ভূত তাড়ানো, জাইনী নিধন, সাপ-বাঘ-শীতলা-শনি পূজো, তুকতাক তাবিচকবচ, এবং সাম্প্রদায়িক হানাহানির প্রাবল্য বর্তমান। কিন্তু গণশিক্ষা এবং জ্ঞানবিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিশ্বময় বিকাশ যখন সম্ভব হবে, তখন সারা বিশ্বেই প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ধর্মবিশ্বাস শিথিল হওয়াও অবশ্যসত্তাবী।

কিন্তু ধর্মের জাগতিক ভিত্তি সম্বন্ধে এ আলোচনা শেষ করবার আগে একটি সতর্কতার কথা মনে রাখা প্রয়োজন। সেটি এই যে মূলত মানুষের জাগতিক পরিবেশ থেকে ধর্মের উদ্ভব হলেও কালে কালে ধর্ম মানুষের অবচেতন মনের গহনে প্রবেশ করে একটা স্বকীয়তা, স্বাভাব্যতা এবং নিজস্ব গতিশীলতা অর্জন করে। ৭শ পরম্পরায় জন্মগত ভাবে মানুষের সমাজচিন্তা ও সংস্কৃতিকে এভাবে প্রভাবিত করে ধর্ম অনেক সময় এমন এক স্বাধীন শক্তি অর্জন করে যে সে তখন মানুষের জাগতিক অগ্রগতিকে প্রতিহত করবার ক্ষমতা রাখে। অতএব ধর্মকে শুধুমাত্র ঐশ্বর্যগতের উপরিকাঠামো বললে ভুল হবে। সে কারণেই আমরা দেখতে পাই যে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগেও এমনকি অনেক শিক্ষিত মানুষ প্রাচীন ধর্মবিশ্বাস খাঁকড়ে ধরে থাকেন। যে ঐতিহাসিক-জাগতিক পরিবেশে সে সব কল্পনাভিত্তিক বিশ্বাসের উদ্ভব হয়েছিলো, সে পরিবেশে যুগান্তকারী পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু

প্রাচীন পরিবেশে উৎপন্ন সে বিশ্বাস আজও অনেকখানি অপরিবর্তিত আছে।

অতএব এক দিকে ধর্মের বিবর্তন যেমন প্রযুক্তি ও উৎপাদন ব্যবস্থার বিকাশের দ্বারা গভীর ভাবে প্রভাবিত হয়েছে, অন্য দিকে আবার ধর্মও মানুষের জাগতিক বিকাশকে কখনো প্রতিহত, কখনো ত্বরান্বিত করতে সাহায্য করেছে। উদাহরণ স্বরূপ, মধ্যযুগীয় ইউরোপে ধর্ম সভ্যতার জাগতিক বিকাশকে প্রতিহত করেছে। আবার রেফরমেশনের পরে ধর্মই ব্যক্তিগত মুনাফাকে স্বাগত জানিয়ে এবং ব্যক্তিমানুষের আর্থিক উদ্যোগকে উৎসাহিত করে ধনতন্ত্রের প্রবৃত্তিকে (“spirit of capitalism”) বন্ধনমুক্ত করেছে। ধনতন্ত্রের বিকাশের উপর প্রোটেষ্ট্যান্ট ধর্মের এই প্রভাব ম্যাক্স ওয়েবার গভীর ভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি যদিও ইউরোপের রেনেসাঁস ও রেফরমেশনের পেছনে অর্থনৈতিক কারণের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন নি, তথাপি তিনি দেখতে চেষ্টা করেছেন কিভাবে রেফরমেশন ধর্মকে গির্জা থেকে বের করে এনে বাজারে স্থাপিত করেছিলো, আর এভাবে সুগম করেছিলো ইউরোপে ধনতন্ত্রের বিকাশের পথ।^{১১} আধুনিক জাপানের দ্রুত আর্থিক উন্নয়ন সম্বন্ধে মিচিও মরিশিমা তুলনীয় সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। তিনি দেখতে চেষ্টা করেছেন যে প্রাচীনিষ্টা ধর্ম এবং বৌদ্ধ ধর্ম থেকে উদ্ভূত আচরণবিধির সংগে পাশ্চাত্য প্রযুক্তির সমন্বয়ের মাধ্যমেই আধুনিক জাপানের দ্রুত আর্থিক বিকাশ সম্ভব হয়েছে।^{১২} আর ভারত সহ দক্ষিণ এশিয়া, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, এবং পশ্চিম এশিয়ার ধর্ম কিভাবে আর্থিক বিকাশকে প্রতিহত করেছে, তা আমরা অন্য একটি গ্রন্থে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেছি।^{১৩}

মানুষের ত্রিশ-চল্লিশ হাজার বৎসরের ইতিহাসে মাত্র পাঁচ হাজার বৎসর আগে ধর্মের আবির্ভাব হয়েছিলো। আর ষাড়ে বড়ো ধর্মগুলো গড়ে উঠেছে আরো অনেক পরে, মোটামুটি আড়াই হাজার বছর আগে থেকে। মানুষ এবং তার সভ্যতার বিবর্তন ভবিষ্যতে সুদূর প্রসারিত। সুদূর অতীত এবং অনাগত সুদূর ভবিষ্যতের তুলনায় ধর্মের বর্তমান বয়স অতি সামান্য। বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে এ ভবিষ্যদ্বাণী খুবই যুক্তিসম্মত যে জ্ঞানবিজ্ঞানের অগ্রগতি এবং জনমনের গভীরে বিস্তার, তথা মানব সমাজের বর্তমান রাজনৈতিক ও আর্থসামাজিক কাঠামোর ব্যাপক পরিবর্তনের ফলে হয় মানবসভ্যতা থেকে ধর্ম বিলুপ্ত হবে, অথবা মানুষের ধর্ম এমন কোন রূপ পরিগ্রহ করবে যে আজকের সংজ্ঞায় সে ধর্মকে আর চেনাই যাবে না। আবার সভ্যতার গতি নির্ণয়ে ধর্মের প্রভাব সংক্রান্ত উপরের আলোচনা থেকে আরেকটি সিদ্ধান্তও অনিবার্য হয়ে পড়ে। জ্ঞানবিজ্ঞান ও প্রযুক্তির শক্তিতে দ্রুত পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে আগামী দিনেও যেসব দেশ অথবা জনগোষ্ঠী প্রাচীন ধর্মগ্রন্থগুলোতে অন্ধ বিশ্বাসে অচল থাকবে, তারা যে শুধু নিজেদের সভ্যতার অগ্রগতিকে আত্মঘাতী ভ্রান্ত চেতনায় প্রতিহত করবে তাই নয়, বিশ্বময় মানব প্রজাতির প্রগতিকেও তুলবে মন্দ্র করে।

পাদটীকা

১। বিপ্লবিত আলোচনার জন্য দেখুন, Henry Frankfort et al., *Before Philosophy : The Intellectual Adventure of Ancient Man*, Penguin, Harmondsworth, 1963. ch.।

২। কৃষি সভ্যতার সংগে দেবীপূজা এবং নারীর সামাজিক অবস্থানের সম্পর্ক বিষয়ে নিদক্ষ আলোচনার জন্য দেখুন, R. Briffault. *The Mothers : The Matriarchal Theory of Social Origin*, Howard Fertig, New York, 1993 reprint of 1963 edition ; Erich Newman. *The Great Mother*, tr. Ralph Manheim, Routledge & Kegan Paul, London, 1955. ch. 13 ; James George Frazer. *The Golden Bough*, Macmillan, London, 1957. chs. 40-41.

৩। বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন, জয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায়, সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে নগরদর্শীতা, এলাইড পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৪, পরিচ্ছেদ ৪-৭।

৪। ঐ, পরিচ্ছেদ ৮।

৫। বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন, জয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায়, মহাকাব্য ও মৌলবাদ, এলাইড পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৩ (দ্বিতীয় সংস্করণ); সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে নগরদর্শীতা, ঐ।

৬। অশোকের ১৩ নম্বর শিলালিপিতে সিরিয়া, মিশর, ম্যাসিডোনিয়া, সাইরিন ও পার্সিয়াসে বৌদ্ধ ধর্মযাজক প্রেরণ এবং বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাবের উল্লেখ আছে। প্রত্নতাত্ত্বিক খননে পরবর্তী কালে মধ্য এশিয়ায় অনেক বৌদ্ধ উপনিবেশের নিদর্শন পাওয়া গেছে।

৭। মূল Dead Sea Scroll-গুলোর ইংরেজী অনুবাদের জন্য দেখুন, Theodor H. Gaster, *The Scriptures of the Dead Sea Sect*, Secker & Warburg, London, 1957 ; Edmund Wilson, *The Scrolls from the Dead Sea*, W.H. Allen, London, 1955 ; J.M. Allegro, *The Dead Sea Scrolls*, Penguin, Harmondsworth, 1956.

৮। Arthur Lillie, *Buddhism in Christendom or Jesus the Essene*, Kegan Paul, London, 1887 ; *India in Primitive Christianity*, Kegan Paul, London, 1909.

৯। R.H. Tawney, *Religion and the Rise of Capitalism*, Penguin, Harmondsworth, 1938. pp. 312-313.

১০। বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন, Jayantanuja Bandyopadhyaya, *The Poverty of Nations : A Global Perspective of Mass Poverty in the Third World*, Allied Publishers, Calcutta, 1988, ch. 7.

১১। Max Weber. *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*, tr. Talcott Parsons, George Allen & Unwin, London, 1930, fifth impression 1956.

১২। Michio Morishima, *Why Japan has Succeeded : Western Technology and the Japanese Ethos*, Cambridge University Press, Cambridge, 1982.

১৩। পাদটীকা নং ১০, পরিচ্ছেদ ৫ দেখুন।

বিজ্ঞানমনস্কতা আধুনিক জীবনে অপরিহার্য

ডঃ তারকমোহন দাস

বিজ্ঞানমনস্কতা শুধু আধুনিক জীবনে অপরিহার্য নয়, সর্বকালেই অভিপ্রেত ছিল। সেটা না থাকার জন্যই মানুষের বিশাল মস্তিষ্কের এতাবৎকাল ব্যাপক অপব্যবহার ঘটেছে সেই সঙ্গে পৃথিবীর সীমিত সম্পদের শোচনীয় অবক্ষয় ঘটে চলেছে।

পরীক্ষা, প্রমাণ ও যুক্তির ওপর নির্ভর না করে শুধু অন্ধ বিশ্বাস ও ভাবাবেগে চালিত হলে অথবা তাৎক্ষণিক লাভ ও লোভের বশবর্তী হয়ে কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা গেছে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে নানা জটিলতার সৃষ্টি হয়,—যা জমতে জমতে নানা বড় বড় কৃত্রিম সমস্যার সৃষ্টি করে, ব্যক্তি মানসিকতার সম্প্রসারণ ও সমাজের স্বাভাবিক গतिकে ব্যাহত করে, জীবন ও পরিবেশের ওপর প্রতিকূল প্রভাব বিস্তার করে।

কিন্তু বিজ্ঞানমনস্ক বলতে কি বোঝায়?—যে মানুষ (বিজ্ঞানে তার ডিগ্রী নাই বা থাকল) সংস্কার মুক্ত, সংগঠিত-সংশয়বাদী, অনুসন্ধিৎসু বিজ্ঞানসম্মত যুক্তি ও প্রমাণের ওপর নির্ভরশীল এবং ধর্মীয় আবেগ ও আপ্তবাক্য অনুসারে চলেন না।—তাকে বিজ্ঞানমনস্ক বলা যায়। কিন্তু এমন মানুষের সংখ্যা আমাদের দেশে কম। খুবই কম, পৃথিবীতেও তারা সংখ্যালঘিষ্ঠ। যদি তারা সংখ্যা গরিষ্ঠ হত তাহলে ধর্মের ভিত্তিতে আমাদের দেশ ভাগের প্রয়োজন হত না, বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে সব মানুষই একই প্রজাতিভুক্ত। পেন্ডোরার বাস্ক খোলার মত ঐ একটি ভুল থেকে হাজারটি কৃত্রিম সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে, সারা দেশে ব্যাপক বিচ্ছিন্নতাবাদের জন্ম, মন্দির-মসজিদ সমস্যা প্রতিবেশী দেশগুলির মধ্যে পারস্পরিক সন্দেহ, অবিশ্বাস, ঘৃণা, এবং তার জন্য পরমাণু বোমা সমেত বিপুল প্রতিরক্ষা ব্যয়ভার বহন (বর্তমান বাজেটে প্রতিরক্ষা খাতে ধরা হয়েছিল ৩০ হাজার কোটি টাকা, পরমাণু বোমা বিস্ফোরণের পর তা বর্ধিত হয়েছে ৪১ হাজার কোটি টাকায়)। সেই সঙ্গে পরিবেশের সম্পদের বিপুল অবক্ষয়—এ সবেই সৃষ্টি হয়েছে একটি মাত্র ভুল সিদ্ধান্ত থেকে যার পেছনে কোন বিজ্ঞান সম্মত যুক্তি ছিল না।

মানুষের মস্তিষ্ক অন্যান্য প্রাণীর তুলনায় অতি বিশাল এবং অনেক বেশী জটিল। মানব মস্তিষ্কের যে অংশ চিন্তাভাবনা ও কথা বলা নিয়ন্ত্রণ করে সেই ফ্রন্টাল ও টেম্পোরাল লোবের আয়তন মস্তিষ্কের অন্যান্য অংশ থেকে অস্বাভাবিক রকম বিশাল,—যার জন্য মানুষ অনেক আকাশ-পাতাল চিন্তা-ভাবনা করতে পারে। ঐ

চিন্তা ভাবনা সাহায্যে মনে মনে অজস্র কাল্পনিক ছবি আঁকতে পারে, কিন্তু ঐ চিন্তামালা যদি যুক্তি প্রমাণের কোষ্ঠিপাথরে পরীক্ষিত বা পরিশীলিত না হয়ে আনন্দোন্মত্ত অবস্থায় ব্যবহৃত হয় তাহলে ঐ চিন্তাধারা প্রসূত ‘সিদ্ধান্ত’ অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভ্রান্ত হতে বাধ্য।

আমরা আজ জনসংখ্যার ভারে অতি বিব্রত, এই একটি সমস্যা থেকে বহু সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে,—যেমন খাদ্য, বাসস্থান, জীবিকা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আইন-শৃঙ্খলা, ইত্যাদি,—যার সমাধানের কোন হদিস পাওয়া যাচ্ছে না। অথচ প্রকৃতির মধ্যে লক্ষ-লক্ষ প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণী রয়েছে তাদের মধ্যে একটিও প্রজাতি মানুষের মত জনসংখ্যার ভারে বিব্রত নয়। পৃথিবীতে মানুষ ছাড়া সকল জীবেরই জন্মাবার ও মৃত্যুহারের মধ্যে একটা আশ্চর্য সমতা আছে যার ফলে কারোরই সংখ্যা বিশেষ বাড়ছে না—বিগত শতাব্দীতে চার্লস ডারউইন যা বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছিলেন। ইকোলজী বা বাস্তব্য বিজ্ঞানের নীতি অনুযায়ী জীবনের টিকে থাকার এটা অন্যতম সর্ত। মানুষ পৃথিবীতে এসেছে প্রায় কুড়ি লক্ষ বছর আগে, এই দীর্ঘ সময়ের শতকরা ৯৯.৯৯ ভাগই মানুষের সংখ্যাজাত কোন সমস্যা ছিল না, প্রাকৃতিক পদ্ধতিগুলির মাধ্যমেই তা নিয়ন্ত্রিত হয়ে এসেছে। মাত্র দেড়শ’ দুশ’ বছর হল মানুষের সংখ্যা হঠাৎ অস্বাভাবিক হারে বাড়তে শুরু হয়েছে, মূলত লুইপাস্তরের আবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক তথ্যের সাহায্যে অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে শিশুমৃত্যুর হার কমানোর জন্যই এটা ঘটেছে, কিন্তু সেই সঙ্গে জন্মহার কমানও একান্ত প্রয়োজনীয় ছিল। এই অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে, আমরা যদি প্রকৃত বিজ্ঞানমনস্ক হতাম তাহলে এটা ঘটত না। ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজ অর্থনীতিবিদ টি. আর. ম্যালথাস্ অঙ্ক কষে, যুক্তি প্রমাণের সাহায্যে বোঝাতে চেয়েছিলেন এই ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা ভবিষ্যতে কী বিপর্যয় ঘটাতে পারে এবং সেইসঙ্গে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তাও। সমাজের যারা ধারক ও বাহক, সেই সরকার, রাজনীতিবিদ ও ধর্মীয় সংস্থাগুলি,—যাঁরা বিজ্ঞানের আবিষ্কার-লব্ধ প্রযুক্তিগুলি, ভবিষ্যৎ পরিণামের কথা চিন্তা না করেই ব্যবহারে অভ্যস্ত, তাঁরা তাঁর কথায় বিন্দুমাত্র কর্ণপাত করেন নি। এনারা যদি বিজ্ঞানমনস্ক হতেন তাহলে বিজ্ঞানের এই অপব্যবহার ঘটত না, অর্থাৎ প্রকৃতির বাস্তব্য তন্ত্রের মধ্যে যে বিজ্ঞান আছে তার প্রতি যদি আমরা বিশ্বস্ত হতাম তাহলে এমন অবস্থা আদৌ ঘটত না। এ থেকেই উপলব্ধি হয় পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ যখন বিজ্ঞানের অবদানগুলি ব্যবহার করছে তখন তার বিজ্ঞানমনস্ক হওয়া একান্তই প্রয়োজন। বিজ্ঞানমনস্ক না হয়ে বিজ্ঞানের আবিষ্কারগুলি ব্যবহার করলে পরিণামে কী বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হয়—জনবিস্ফোরণের ঘটনাটি তার সবচেয়ে ৭৬ প্রমাণ।

বিজ্ঞানের মূল স্বরূপ জানতে হলে এবং মানুষের বর্তমান সমস্যাগুলির মূল উৎসের সন্ধান করতে হলে প্রকৃতির নিজস্ব গতিময় রূপ ও স্থিতিশীলতা সম্পর্কে

একটা পরিষ্কার ধারণা থাকা দরকার। সৃষ্টির সূচনা থেকেই অজস্র বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের ওপর নির্ভর করে বিশ্বপ্রকৃতি টিকে আছে। পৃথিবীর জীবন ও পরিবেশ-সহ বিশ্ব-প্রকৃতির সব কিছুই চলছে ঐ অসংখ্য বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের ওপর নির্ভর করে। সকল বিজ্ঞানই প্রকৃতিগত। পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, উদ্ভিদতত্ত্ব, প্রাণিতত্ত্ব, শারীরবৃত্ত, ভূতত্ত্ব, জ্যোতির্বিদ্যা। যাই হোক না কেন, সব কিছুর উৎসই প্রকৃতি। আমরা নিজের হাতে কোন বিজ্ঞান তৈরি করিনি বা বিজ্ঞান সৃষ্টি করিনি। আমরা পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষা, প্রমাণ ও যুক্তির ওপর নির্ভর করে, নির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করে তা আবিষ্কার করেছি মাত্র। অতি সামান্যই এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়েছে। কিন্তু আবিষ্কৃত তত্ত্বগুলির ব্যবহার অনেক সময়ই উপযুক্ত সতর্কতা ও বিচক্ষণতার সঙ্গে করা হয় নি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাৎক্ষণিক সমস্যা সমাধানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে ব্যবহার করা হয়েছে ভবিষ্যতের কথা চিন্তা ভাবনা না করেই। মানুষের কাছে যা আপাত সুখকর, অর্থকরী ও লাভজনক বলে মনে হয়েছে মানুষ তাই সাগ্রহে গ্রহণ করেছে পরিণতির কথা বিবেচনা না করেই। বহুক্ষেত্রে ঐগুলিই আজ সমাজে নানা দুর্লভ সমস্যার সৃষ্টি করেছে। এখানেই প্রকৃত বিজ্ঞানমনস্কতার প্রয়োজন ছিল, যার অভাবে বিজ্ঞানের এই অপব্যবহার ঘটেছে।

প্রকৃতির মধ্যে যে বিজ্ঞান রয়েছে—তার ব্যবহারে আদর্শ ব্লু-প্রিন্ট কিন্তু প্রকৃতির মধ্যেই আছে, মানুষ তার স্বরূপ জানতে বা তার প্রকৃত মূল্য বুঝতে কোনদিন তেমন আগ্রহ বোধ করেনি। অনন্তকাল ধরে প্রকৃতির মধ্যে এই বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলি যে ভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং মানুষের দ্বারা যেভাবে সেগুলি ব্যবহৃত হচ্ছে তার মধ্যে বিস্তর প্রভেদ লক্ষ্য করা যায়। মানুষের নিজেরই স্বার্থে এই তুলনামূলক বিষয়টির চর্চার প্রাসঙ্গিকতা আছে এবং এর লাভ-ক্ষতির হিসাব-নিকাশ করার প্রয়োজনীয়তাও আছে। অস্তিত্বেরক্ষার জন্য সুখম অনুপাতে সংখ্যা নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা—প্রকৃতিতে বিজ্ঞানের আদর্শ ব্যবহারের ব্লু-প্রিন্ট থেকেই জানা যায়, যার প্রতি মানুষ সামান্যই গুরুত্ব আরোপ করেছে—সেকথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। মানুষ প্রায় সকল ক্ষেত্রেই প্রকৃতির দিকে না তাকিয়েই বিজ্ঞানের আবিষ্কারগুলি ব্যবহার করে গেছে এবং অতীব দুঃখের বিষয়, মানুষের মনের বিকাশ বিজ্ঞানের আবিষ্কারগুলির সঙ্গে তাল ও মাত্রা রেখে এগিয়ে যেতে পারে নি। পুরাণ ভ্রান্ত ধ্যান-ধারণা, অলীক, অন্ধ সংস্কার,—যুক্তির মাধ্যমে নূতন কিছু গ্রহণ করার ক্ষমতাকে দমিয়ে রেখেছে, যার ফলে প্রকৃত বিজ্ঞানমনস্কতার প্রসার আদৌ ঘটে নি। কিন্তু কেন এমন হল?

জীববিজ্ঞানে বিবর্তনবাদ প্রসঙ্গে একটা কথা বলা হয়—কোন প্রজাতির শৈশবকাল থেকে বৃদ্ধ অবস্থা পর্যন্ত যে পরিবর্তনগুলি ঘটে তার মধ্যেই ঐ প্রজাতির বিবর্তনের ইতিহাস খুঁজলে পাওয়া যেতে পারে। মানুষের শৈশব অবস্থার সঙ্গে তাই তার আদিম সভ্যতার প্রথম দিনগুলি তুলনীয়। শৈশবে বিশ্ব প্রকৃতি সম্পর্কে মানব শিশুর জ্ঞান প্রায় শূন্য,—কিন্তু জানবার ইচ্ছা প্রচণ্ড, সে বিশ্বপ্রকৃতি সম্পর্কে যা

শোনে, গাড়াবচার না করে তাই বিশ্বাস করে। চারপাশে এক রূপকথার জগৎ গড়ে তোলে। তারপর, বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতি সম্পর্কে যতই প্রকৃত তথ্য জানতে শুরু করে ততই তার প্রিয় রূপকথার জগৎ হারিয়ে যেতে শুরু হয়, তার অগাধতা, অলীকত্ব বুঝতে তার কোন বিলম্ব হয় না।

ঠিক তেমনিই, আদিম যুগে মানব সভ্যতার উষাকালে প্রকৃতি সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান ছিল প্রায় শূন্য, কিন্তু জ্ঞানার্জনের স্পৃহা ছিল অদম্য, কল্পনা শক্তি ছিল অসাধারণ। তাই প্রকৃতির সকল রহস্যেরই উত্তর যখন সমাজের শীর্ষস্থানীয়রা নানা মনোজ্ঞ কাল্পনিক বাহিনীর মাধ্যমে দিত তাই ধ্রুবসত্য হিসাবে গ্রহণ করত। ঐ সময়ই সমাজের নির্দিষ্টরূপ, আচার বিচার ও প্রাচীন ধর্মগুলির সূচনা হয়। তাই প্রতি ধর্মের মধ্যেই দেখা যায় সৃষ্টি-রহস্য ও বিশ্ব প্রকৃতি সম্পর্কে নানা অসাধারণ মনগড়া, অলীক কাহিনীর সমাবেশ। কিন্তু সভ্যতার বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির প্রকৃতরূপ যখন মানুষের সামনে ধীরে ধীরে উন্মোচিত হতে শুরু হল তখন এই রূপকথার জগৎ থেকে মানুষের উত্তোরণ স্বাভাবিক ছিল, শ্রেয় ছিল, এবং প্রেয় ছিল। কিন্তু বাস্তবে তা ঘটেনি। ধর্মীয় আবেগের বাতাবরণে ঢাকা নানা সংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস অধিকাংশ মানুষের দৃষ্টিশক্তিকে আজ আচ্ছন্ন করে রেখেছে, এজন্য অনেকে আমাদের শিক্ষার ঝুটি, নিরক্ষরতা ও দারিদ্র্যকে দায়ী করে থাকেন,—কিন্তু তার থেকে বড় কারণ হল, মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাস ও আবেগকে মূলধন করে একদল বুদ্ধিমান মানুষ সকল যুগেই প্রাপ্যের অতিরিক্ত পেতে চেষ্টা করে এসেছে এবং তাদের উদ্যম ও আধিপত্য যুগে যুগে ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে। এদেরই ঐকান্তিক চেষ্টার ফলে একটা উপমহাদেশ কৃত্রিমভাবে দুই-ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। সেই বিভাজনের ব্লু-প্রিন্ট নিয়ে আজ চারিদিকে বিচ্ছিন্নতাবাদ ও সন্ত্রাসবাদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে, অসংখ্য কৃত্রিম সমস্যা তৈরি হয়েই চলেছে। অত্যন্ত অনুতাপের বিষয় রাজনীতি, এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে ব্যবহার করা হচ্ছে এই অরাজকতা বিস্তারে।

কিন্তু প্রকৃতি মধ্যে যে জীবন সাড়ে তিনশ কোটি বছর ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে বয়ে চলেছে যেখানে বিজ্ঞানের এই অপব্যবহারের কোন অবকাশ নেই, বরং তার মধ্যে একটি নির্দিষ্ট ‘দর্শন’ আছে যার ওপর নির্ভর করে জীবন টিকে আছে পৃথিবীতে।

বিজ্ঞান অন্তর্নিহিত এই দর্শন সম্পর্কে বর্তমান প্রবন্ধ লেখক বিশেষ আগ্রহী, এর আগে এই সম্পর্কে একাধিক বিশেষ প্রবন্ধ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাতে প্রকাশ করেছেন। এবং কয়েকটি সেমিনারের আয়োজন করেছেন। প্রকৃতিগত বিজ্ঞানের মধ্যে ‘দর্শন’ আছে, ওতঃপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষা, যুক্তি ও প্রমাণের সাহায্যে প্রকৃতির রহস্য উন্মোচনে সুশৃঙ্খল বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির উদ্ভব কিন্তু খুব পাতীন নয়, মাত্র হাজার দেড়েক বছর থেকে এর ব্যাপক ব্যবহার শুরু হয়েছে এবং অসম্ভব দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। ভাবলে আশ্চর্য হতে হয় প্রায় আট-নয় হাজার বছর আগে থেকে এই যুক্তি প্রমাণের ওপর নির্ভর করেছে—অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি

প্রয়োগ করেই মানুষ যখন চাম্বাস করতে শিখল, পাঁচ-ছয় হাজার বছর আগে থেকে যখন ব্রোঞ্জ, লোহা, তামা প্রভৃতি ধাতুর ব্যবহার শিখল, চিকিৎসাশাস্ত্রের অসাধারণ উন্নতি ঘটাল, তখন প্রকৃতির রহস্যভেদে ঐ একই পদ্ধতি কেন প্রয়োগ করল না, পরীক্ষা ও প্রমাণের ওপর নির্ভর করে জল, বাতাস, মাটি প্রভৃতি পদার্থের ধর্ম, এগুলি জানতে এবং সমাজের মধ্যে জমে থাকা নানা অন্ধ বিশ্বাস, কুসংস্কার, ভ্রান্ত ক্ষতিকর ধারণা এসব দূরকরতে সে যুগের মানুষ কেন অগ্রসর হল না। হলে অনেক দুর্ভোগের হাত থেকে মানুষ রক্ষা পেত। মানুষের ইতিহাস অন্যভাবে লেখা হত।

ঠিক তেমনিই, বর্তমান যুগেও বিজ্ঞান-প্রযুক্তি যে গতিতে এগিয়ে চলেছে, সেই গতির সঙ্গে তাল রেখে মানুষের সামাজিক ধ্যান-ধারণা ও দূরদৃষ্টি বাড়েনি, বিজ্ঞানের মধ্যে সে 'দর্শন' আছে তাকে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া তো নয়ই,—তার প্রকৃত মূল্যায়নও হয়নি। হলে বিজ্ঞানের অপব্যবহারে পরিবেশের সম্পদের ব্যাপক অবক্ষয়, জন-বিস্ফোরণ—সেই সঙ্গে মানুষ সহ হাজার হাজার প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণী অস্তিত্ব বিপন্ন হত না। বিজ্ঞান অন্তর্নিহিত দর্শনকে অবহেলা করার ফলেই হয়ত মানুষের ভবিষ্যৎ ইতিহাস আজ অন্যভাবে লেখা হতে চলেছে।

প্রকৃতিগত বিজ্ঞানের ইতিহাস ও কর্মসূচী বিশ্লেষণ কারণে কয়েকটি চিরন্তন সত্য বা ধ্রুবকের সন্ধান পাওয়া যায়, যার মধ্যে বিজ্ঞান অন্তর্নিহিত দর্শনের রূপকথার পরিচয় পাওয়া যেতে পারে।

প্রথম ধ্রুবক হিসাবে সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতিকে মনে হয় যেন একটা নিয়মের রাজত্ব, সবকিছুই যেন চলেছে ঘড়ির কাঁটা ধরে। পৃথিবীর দৈনিক ও বার্ষিক আবর্তনের এক সেকেন্ডের হেরফের হয় না, জোয়ার-ভাটা, সূর্যগ্রহণ-চন্দ্রগ্রহণ, সূর্যোদয়-সূর্যাস্তের সময় ঘড়ি ধরে বলে দেওয়া যায়। কিন্তু লক্ষ্য রাখলে দেখা যাবে সময়ের এই শৃঙ্খলা সম্পূর্ণ নির্ভরশীল জ্যোতিষ্কগুলির আপেক্ষিক দূরত্ব, গতি ও ভরের ওপর। কোন কারণে পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব যদি কমে যায় বা বেড়ে যায় বা তাদের গতি বা ভরের হেরফের ঘটে তাহলে ঐ সময়েরও পরিবর্তন ঘটবে। পৃথিবীর বুকে জীবজগতেরও ধারাবাহিক পরিবর্তন ঘটছে এবং তার জন্য যে চারটি ফ্যাক্টর, মূলত দায়ী সেগুলি হল (১) বাতাসের কার্বন-ডাইঅক্সাইড, (২) মহাদেশগুলির গতিশীলতা, (৩) জল ও (৪) অক্সিজেন। এর মধ্যে প্রথম দুটির ভূমিকা খুবই নাটকীয়। বাতাসের কার্বন-ডাইঅক্সাইডই পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। বাতাসে যদি কার্বন-ডাইঅক্সাইড আদৌ না থাকত তাহলে ধরাপৃষ্ঠের তাপমাত্রা নেমে যেত শূন্য ডিগ্রীর ২৪ ডিগ্রী নীচে। পৃথিবী বাতাসে কার্বন ডাই-অক্সাইডের মাত্রা কখনও স্থির থাকে নি, অতীতে বেশী ছিল, তারপর ধীরে ধীরে সমুদ্রতলে থিতুয়ে পড়েছিল (Sedimentation) আবার বেড়েছিল প্রধানতঃ ব্যাপক অগ্ন্যুৎপাতের কারণে। তার ফলে ভূ-পৃষ্ঠের তাপমাত্রারও হ্রাস বৃদ্ধি ঘটেছে। মাত্র ৪ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রা হ্রাসের ফলে পৃথিবীতে তুষার যুগের আবির্ভাব

ঘটেছে এই রকম কয়েকটি তুষারযুগের সাক্ষ্য পাওয়া যায়। এই তুষারযুগের সঙ্গে খাপখাইয়ে নিতে গিয়ে বহু পুরাতন প্রজাতি অদৃশ্য হয়ে গেছে, এসেছে নূতন প্রজাতি। হারিয়েছি ম্যামথকে, পেয়েছি আধুনিক মানুষকে। বিখ্যাত জীবতত্ত্ববিদ পল ভাইসের মতে মানুষ হল এই তুষার যুগেরই সৃষ্টি, অর্থাৎ এই নিদারুণ ঠাণ্ডার হাত থেকে আত্মরক্ষা করতে গিয়ে নানারকম কলাকৌশল আবিষ্কার করতে গিয়ে মানব মস্তিষ্কের দ্রুত বিবর্তন ঘটেছে। কিন্তু লক্ষ লক্ষ বছর ব্যয় হয়েছিল এইসব পরিবর্তনগুলি ঘটতে।

তেমনি বিগত কোটি কোটি বছর ধরে পৃথিবীর মহাদেশগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে দূরে সরে যাচ্ছে—প্রতিবছর এক থেকে পনেরো সেন্টিমিটার গতিতে। এক বছরের হিসাবে খুবই সামান্য, কিন্তু কোটি বছরে হিসাবে তাইই হয়েছে একহাজার থেকে পনেরো হাজার কিলোমিটার। তার ফলে ঐ চলমান মহাদেশগুলির জীববৈচিত্র্যও ধারাবাহিকভাবে পরিবর্তিত হয়েছে পরিবর্তনশীল আবহাওয়ার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে গিয়ে। কিন্তু প্রকৃতির বুকে এই সব পরিবর্তন ঘটেছে অতি দীর্ঘ সময় ব্যয় হয়েছে, সময়ের ব্যাপ্তি অতি দীর্ঘ হওয়ায় পৃথিবীর জীববৈচিত্র্যের কোন প্রকৃত ক্ষতি হয়নি। পৃথিবীর জীবজগৎ যথেষ্ট সময় পেয়েছিল নিজেদের খাপ খাইয়ে নেবার জন্য, যারা পারে নি তারা চলে গেছে, সেই সঙ্গে বহু নূতন প্রজাতির আবির্ভাবও ঘটেছে। পৃথিবীর জীবজগৎ পরোক্ষ সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। জীবনের ক্রমবিকাশের ধারাবাহিকতা এক অসাধারণ সার্থকতার সঙ্গে সুরক্ষিত হয়েছে।

কিন্তু আজ মানুষের হাতেও পরিবেশের পরিবর্তন ঘটেছে এবং যা পরিবর্তন ঘটেছে তা অত্যন্ত দ্রুত ও ব্যাপক। প্রতি বছর পৃথিবীর দুই থেকে আড়াই শতাংশ বনভূমি অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে,—যার অর্থ হল আগামী পঞ্চাশ বছর পর সংরক্ষিত অরণ্যের বাইরে পৃথিবীতে আর কোন অরণ্যই থাকছে বা, সেই সঙ্গে থাকছে না সেখানকার বন্য প্রাণীরাও। অতি বিপুল ক্রমবর্ধমান হারে জ্বালানী পোড়ান হচ্ছে, CFC₁₁, CFC₁₂ এবং হ্যালন প্রভৃতি কৃত্রিম রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহারের ফলে ঐ সকল গ্যাস বাতাসে সঞ্চিত হচ্ছে, ফলে ভূ-পৃষ্ঠের গড় তাপমাত্রা বাড়ছে। এই CFC₁₁, ও CFC₁₂-এর জন্যই উর্ধ্বাকাশে ওজোন গহ্বরের সৃষ্টি হয়েছে যার ফলে মানুষ ও সামুদ্রিক উদ্ভিদ-সহ সমগ্র জীব জগতের ওপর সূর্যের আলট্রা ভায়োলেট রশ্মির প্রভাব ক্ষতিকর মাত্রায় বাড়ছে। অত্যন্ত আশঙ্কাজনক বিষয় হল, বর্তমান পৃথিবীতে প্রতি বছর প্রায় দশ হাজার প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণী অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। এই অবলুপ্তির হার সামনের শতাব্দীর শেষে পঞ্চাশ হাজারে উঠতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। মানুষ সৃষ্ট এই পরিবর্তনগুলি এতই দ্রুত এবং এতই আকস্মিক যে তার প্রভাবে যে সব উদ্ভিদ ও প্রাণী আজ অবলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে তারা চিরতরেই হারিয়ে যাচ্ছে কোন প্রতিনিধি না রেখেই। এটা ঠিক, পৃথিবীতে কোন জীবন যেমন অমর নয়, তেমনি কোন প্রজাতিও অমর নয়, জুরাসিক যুগের ডাইনোসররা চলে

গেছে, কিন্তু তার জায়গায় আমরা পেয়েছি বহু নূতন প্রজাতির সরীসৃপ, কিন্তু আজ যারা চলে যাচ্ছে তারা চিরতরেই হারিয়ে যাচ্ছে পৃথিবী থেকে,—তার স্থান আর পূর্ণ হচ্ছে না, নূতনতর প্রজাতির বিবর্তনে, তাই এই ক্ষতি চিরস্থায়ী, ভবিষ্যতে কোনদিন কোনোভাবেই তা পূর্ণ হবে না। পৃথিবীর জীব বৈচিত্র্যের স্থায়ী অবক্ষয় ঘটছে।

দ্বিতীয় ধ্রুবক হিসাবে মনে হয় নিখিল বিশ্বের প্রতিটি বস্তুই পরস্পর সম্পর্কযুক্ত এক ‘সময়’ ও ‘দূরত্ব’ নিরপেক্ষ তন্ত্রে,—পৃথিবীর জীবজগৎও তার সঙ্গে সম্পৃক্ত।

সূর্য থেকে পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছে এই মতবাদ যদি সত্য হয়, তাহলে পৃথিবীর প্রতিটি কণিকার সঙ্গে সূর্যের সম্পর্ক রয়েছে। চন্দ্রশিলা বিশ্লেষণ করে এমন কোন মৌলিক পদার্থের সন্ধান পাওয়া যায়নি যা পৃথিবীতে নেই। পৃথিবীর মৌল পদার্থের সাহায্যেই আমাদের দেহ গঠিত হয়েছে। আমাদের দেহে যে কার্বন, নাইট্রোজেন ও পটাশিয়ামের পরমাণুগুলি রয়েছে তাদের কোন কোনটি হয়ত ছিল কোন আদিম গুহামানবের দেহে, কোনটি হয়ত ছিল জুরাসিক যুগের অতিকায় ডাইনোসরের দেহে অথবা আদিম কোন সামুদ্রিক শেওলার দেহে। দেহ থেকে দেহান্তরে ঘুরে ঘুরে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে ঐ পরমাণুগুলি যুগ যুগ ধরে এক ‘সময়’ ও ‘দূরত্ব’ নিরপেক্ষ তন্ত্রের মাধ্যমে। ঠিক এই ভাবেই মানুষের সঙ্গে উদ্ভিদরাজির, মানুষের সঙ্গে অগণিত আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত নীহারিকার সম্পর্ক স্থাপন করা যায় পৃথিবী ও সূর্যের মাধ্যমে।

এই নিখিল বিশ্বের প্রতিটি বস্তুকণাই পরস্পরের সঙ্গে কোন-না-কোন ভাবে সম্পর্ক যুক্ত—তা হাজার হাজার আলোকবর্ষ দূরেই থাক বা কোটি কোটি বছর অতীত বা ভবিষ্যতের গর্ভেই নিহিত থাক—এক ‘সময়’ ও ‘দূরত্ব’ নিরপেক্ষ তন্ত্রে তারা পরস্পরের সঙ্গে আত্মীয়তা সূত্রে আবদ্ধ,—নিখিল বিশ্বের পূর্ণরূপ দানে প্রত্যেকেরই সক্রিয় ভূমিকা আছে। কেউ অবহেলার নয়। আমরা প্রত্যেকেই এক সমগ্রের অংশ মাত্র।

তৃতীয় ধ্রুবক হিসাবে দেখা যায় নিখিল বিশ্বের প্রতিটি জ্যোতিষ্কসহ পৃথিবীর প্রতিটি জীবই পরস্পরের ওপর নির্ভর করে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করে থাকে।

পারস্পরিক নির্ভরতা বিশ্বের সর্বাপেক্ষা তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়। মহাকাশের সূর্যসহ তারকারাজির বেলায় একথা যেমন সত্য পৃথিবীর প্রতিটি জীবের বেলায়ও তাই। পৃথিবীর সাড়ে তিনশ’ কোটি বছরের জীবনের ইতিহাস পরীক্ষা করলে দেখা যাবে পৃথিবীর সকল জীবই সর্বকালে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করে এসেছে, আজও করছে অপরের কাছ থেকে বিকল্পহীন সাহায্য গ্রহণ করে, অপরকে অপরিমেয় সাহায্য দান করে। প্রাণীরা যেমন নির্ভরশীল সবুজ উদ্ভিদের ওপর, উদ্ভিদরাও তেমনি নির্ভর করে থাকে প্রাণীদের পরিত্যজ্য সার পদার্থের ওপরে।

একটি জীবনকোষের ক্রিয়াকলাপ বিশ্লেষণ করলে আমরা কি দেখতে

পাই?—তার প্রতিটি সূক্ষ্ম অংশ, তার প্রতিটি উপাদান একে অপরের ওপর নির্ভর করে, একে অপরের সহায়তায়, এক যৌথ উদ্যোগে নির্দিষ্ট কতকগুলি কাজ অত্যন্ত শৃঙ্খলভাবে সম্পাদন করছে। জীবকোষের কোন সূক্ষ্ম অংশ যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলে জীবকোষের সমস্ত অংশেরই শৃঙ্খলা ভেঙ্গে পড়বে, তার জীবন-সংশয় ঘটবে। জীবকোষ অতি সূক্ষ্ম বলে খালি চোখে আমরা তা দেখতে পাই না।

ঐ সূক্ষ্ম জীবকোষের সাহায্যে আমাদের দেহের যে সব অঙ্গ গঠিত,—যেমন হৃদয়, ফুসফুস, পাকস্থলী, মস্তিষ্ক, ইত্যাদি,—তারাও নির্দিষ্ট কতকগুলি কাজ একে অপরের সহায়তায় এক যৌথ উদ্যোগে সম্পন্ন করে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করে থাকে, আমাদেরও বাঁচিয়ে রাখে, কোন একটি অঙ্গ বিকল হলে এই পারস্পরিক সহযোগিতার শৃঙ্খলটিই ভেঙ্গে পড়বে আমাদেরও বেঁচে থাকা সম্ভব হবে না।

ঠিক তেমনিই আমাদের পরিবেশের মধ্যে অজস্র বিক্রিয়া ঘটছে—আমরা নিজেরাই যার অন্যতম উপাদান। পৃথিবীর সফল জীবগোষ্ঠীই এক বিস্ময়কর শৃঙ্খলার সঙ্গে পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করে মিলিত উদ্যোগে নির্দিষ্ট নিয়ম-নীতি পালন করে চলেছে। মূলত যার ওপর নির্ভর করে তারা পৃথিবীতে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করে চলেছে। এই ঘটনাগুলি অনেক ব্যাপক বলে এবং এর ব্যাপ্তিকাল অতি দীর্ঘ বলে আমাদের চোখে তা পড়ে না।

এই পারস্পরিক নির্ভরতার ধ্রুবকটি বিশ্লেষণ করলে আমরা কতকগুলি নির্দিষ্ট ‘সূত্র’ সন্ধান পাব, সংখ্যায় তারা চারিটি—সর্বযুগেই উদ্ভিদ ও প্রাণীরা অত্যন্ত কঠোর নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরণ করে এসেছে, সেটাই তাদের সমৃদ্ধি ও অস্তিত্ব রক্ষার কৌশল। যেমন—(১) জীবের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও জন্ম ও মৃত্যু হারের সমতা—যার কথা আগেই বিস্তারিত ভাবে বলা হয়েছে। (২) খাদ্য পিরামিডে উদ্ভিদ ও প্রাণীর সুষম অনুপাত। (৩) জল ও মৌল পদার্থের পুনঃ পুনঃ ব্যবহার এবং (৪) সকল জীবেরই অভিবাসন বা ছড়িয়ে পড়ার প্রবণতা।

পৃথিবীর সাড়ে তিনশ’ কোটি বছরের জীবন-বিজ্ঞানের ইতিহাসের মধ্যে যে ‘দর্শনের’ সন্ধান পাওয়া যায় তার সঙ্গে মানুষের ‘জীবন-দর্শনের’ বহু রকম অসঙ্গতি লক্ষ্য করা যায়। মানুষের ইতিহাস অনুসন্ধান করলে দেখা যায় সেখানে কোন যুগেই তেমন সুদূর-প্রসারী বিজ্ঞান ধর্ম চিন্তা-ভাবনার স্থান হয় নি, কোন এক লক্ষ্য অভিমুখী সংস্কৃতিরও সৃষ্টি হয় নি, যার ফলে হাজার হাজার অর্থহীন, উদ্দেশ্যহীন, কলহ? বিবাদ, যুদ্ধ-বিগ্রহে ও প্রাকৃতিক সম্পদগুলি লুট-পাটে তার অধিকাংশ সময় কেটেছে। মানুষ তার মৌলিক সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য নানাভাবে চেষ্টা করে এসেছে নানা বুদ্ধি ও কৌশলের আশ্রয় নিয়েছে, নানা ধর্মমত, রাজনৈতিক আদর্শ এবং অর্থনৈতিক পন্থা উদ্ভাবন করে ঐ সমস্যাগুলির স্থায়ী সমাধান খুঁজেছে, কিন্তু লক্ষ্য করবার বিষয় হল মানুষের অনুসৃত এই সকল পদ্ধতির কোনটিতেই প্রকৃতি যে নিয়মে চলেছে সেই নিয়মের অস্তিত্ব ও সামঞ্জস্য ছিল না।

জীবের যৌথ বসবাস নীতির চারটি সূত্রই লঙ্ঘিত হয়েছে নানাভাবে নানা মাত্রায়, যার ফলে সভ্য মানুষের অনুসৃত কোন মত বা কোন পদ্ধতিই শেষ পর্যন্ত ইঙ্গিত লক্ষ্য ভেদ করতে সমর্থ হয় নি। তা অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়ার সামিল হয়েছে,—যা শেষ পর্যন্ত মানুষকেই আহত করেছে।

পারস্পরিক নির্ভরতাই যেখানে পৃথিবীর সকল জীবের অস্তিত্ব রক্ষার মূল পদ্ধতি :—যেখানে মানুষ দলবেঁধে প্রাকৃতিক সম্পদ বিনষ্ট করে বারবার ঝাঁপিয়ে পড়েছে নিজেরই প্রজাতির এক অংশকে নিশ্চিহ্ন করবার জন্য। এই ধরনের নিজের প্রজাতির মধ্যে আত্মঘাতী সংগ্রামের নজির প্রকৃতির মধ্যে একান্তই বিরল। বাঘ হরিণ মারে ঠিকই, তার আহার সংগ্রহের জন্য মারতে হয়, কিন্তু সব হরিণ মারে না, নিজের খাদ্য শৃঙ্খল অটুট রাখে নিজেরই স্বার্থে। খাদ্য অভাবে, নিজ এলাকা সংরক্ষণে ও স্ত্রী-পুত্রের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য প্রাণীরা প্রাণপণ চেষ্টা করে, struggle করে, কিন্তু war নয়, struggle ও war দুটি শব্দের অর্থ এক নয়, আকাশ-পাতাল তফাৎ। “যুদ্ধ” “বিপ্লব” এগুলি প্রক্ষিপ্তভাবে প্রবেশ করেছে মানুষের জীবন পদ্ধতির মধ্যে, এগুলি একান্তভাবে মানুষের নিজের হাতের সৃষ্টি। কিছু শক্তিশালী মানুষের গায়ের জোরে নিজে এলাকা বা নিজ মতের বিস্তারের জন্য অথবা আচারের আধিপত্য কেড়ে নেবার জন্য দলবদ্ধ প্রচেষ্টার নাম যুদ্ধ। পৃথিবীতে যুদ্ধের মাধ্যমে মানুষের মৌলিক সমস্যার এপর্যন্ত কোন স্থায়ী সমাধান হয়নি, কোন স্থায়ী কল্যাণও নয়। পৃথিবীর জীব-পরিবেশ কেবল বিপন্ন হয়েছে—আজও হচ্ছে।

UNESCO-র প্রাকৃতিক-বিজ্ঞান বিভাগের পক্ষ থেকে রিচি কলডার উত্তর-আফ্রিকা ও উত্তর-পশ্চিম এশিয়ার মরুভূমিগুলির পর্যালোচনা এবং সেখানকার প্রাচীন সভ্যতাগুলি উত্থান-পতনের কারণ অনুসন্ধানের জন্য নিযুক্ত হয়ে ছিলেন। এই সমস্ত অঞ্চলে একটি-দুটি নয়, বিভিন্ন যুগে পনেরোটি মানব সভ্যতা সমৃদ্ধির চূড়ান্তে পৌঁছে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। এই সমস্ত সভ্যতা গড়ে উঠেছিল টিউনিসিয়া, লিবিয়া, মিশর, সিনাই মরুভূমি হয়ে মোসোপটেমিয়া, পারস্য, আফগানিস্তান ও উত্তর-পশ্চিম এশিয়ায়। এই সব অঞ্চলেই গ্রীক, রোমান, ফারাওদের ও সুমেরিয়ানদের সমৃদ্ধ সভ্যতার কল্পনাভীত বিরাট শস্যগারগুলি গড়ে উঠেছিল, বিরাট জনসংখ্যা সমৃদ্ধ নগরীগুলি ছিল। আজ সবই ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। এই সব সভ্যতার ধ্বংসের অনেকগুলি কারণ ছিল, তারমধ্যে প্রধান হল নিজেদের মধ্যে অস্থিীন যুদ্ধ-বিগ্রহ, বিদেশী আক্রমণ, শত্রুকে নিশ্চিহ্ন করবার উদ্দেশ্যে পরস্পর এলাকার প্রাকৃতিক সম্পদের চূড়ান্ত বিনাশ। রিচি কলডার শুধু পৃথিবীর একটি অংশের মানব সভ্যতার উত্থান-পতনের ইতিহাস পর্যালোচনা করেছিলেন, পৃথিবীর অন্যান্য অংশে আরো বহু সভ্যতার উত্থান-পতন ঘটেছে,—তার মধ্যে দক্ষিণ আমেরিকার মায়া, অ্যাজটেক, ইনকা সভ্যতা অন্যতম, তাদেরও ধ্বংসের কারণ অনুসন্ধান করলে ঐ একই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তির সাক্ষ্য পাওয়া যাবে। কিন্তু লক্ষ্য

করবার বিষয় হল মানুষ তার নিজের ইতিহাস থেকে কোনোদিন কিছু শিক্ষাগ্রহণ করে নি। বিগত দশহাজার বছর ধরে একই ভুল করবার করে গেছে এবং প্রত্যেক বারই আগের থেকে আরো বড় রকম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে।

কিন্তু মানুষ কি একা যুদ্ধবাজ প্রাণী? যুদ্ধ স্পৃহা কি তার জিনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে? এক কথায় এর উত্তর হচ্ছে 'না'—মানুষ কখনই একা যুদ্ধবাজ প্রাণী নয়, তার জিনের সঙ্গে এই বৈশিষ্ট্য জড়িয়ে নেই। মানুষ যদি যুদ্ধবাজ প্রাণী হত তাহলে এত কাণ্ড মহাকাব্য লিখে তার মনে যুদ্ধ স্পৃহা জাগাবার প্রয়োজন হত না। মানুষ যে যুদ্ধবাজ প্রাণী নয় খুব সহজেই সেটা প্রমাণ করা যায়,—পৃথিবীর যে কোন অঞ্চলের ১০০ জন মানুষকে জিজ্ঞেস করলে ১০০ জনই উত্তর দেবে,—তারা যুদ্ধ চায় না, এমন কি যারা যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধ করেছে তারাও নয়। কিন্তু তবু যুদ্ধ হচ্ছে—এবং বড় রকম যুদ্ধ না হলেও আজ সারা পৃথিবীতে অসংখ্য আঞ্চলিক সংঘর্ষ, সন্ত্রাসবাদ। বিচ্ছিন্নতাবাদ, জাতিদাঙ্গা, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় সংঘর্ষ অগুনের মত ছড়িয়ে পড়ছে। মানুষের মনুষ্যত্ব এবং প্রকৃতির অমূল্য সম্পদ দুইই বিকিয়ে যেতে বসেছে। যুদ্ধ না হলেও আজ যুদ্ধের সরঞ্জাম তৈরি ও তার ব্যবসায়ের ওপর বহুদেশ অতি বিপজ্জনক ভাবে তাদের অর্থনৈতিক বুনিয়ে গড়ে তুলেছে। এই ব্যবসার পরিমাণ অতি দ্রুত বাড়ছে। বর্তমান শতাব্দীতে সামরিক সাজ-সরঞ্জাম ও মাদকদ্রব্য ব্যবসায়ে আর্থিক লাভ সর্বাপেক্ষা বেশি। অর্থনীতির সরল নিয়মে তাই অতি বিপুল পরিমাণ অর্থ ও উদ্যোগ এতে নিয়োজিত হয়েছে, সেই সঙ্গে অতি বিপুল পরিমাণে প্রাকৃতিক সম্পদ নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে।

প্রতিবছর প্রতিরক্ষা খাতে সকল দেশের একত্রে ব্যয় হয় একহাজার বিলিয়ন বা এক ট্রিলিয়ন ডলার। প্রতি বছরই ঐ খাতে ব্যয় বাড়ছে, আমাদের পরমাণবিক বিস্ফোরণের পর ঐ ব্যয় একলাফে এগার হাজার কোটি টাকা বেড়ে গেছে সে কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। (এখানে স্মরণ করা যেতে পারে স্বাধীনতা উত্তরকালে আমাদের শস্যের মোট উৎপাদন তিনগুণেরও বেশি বেড়েছে, তার অন্যতম মূল কারণ হল বিরাট বিরাট বাঁধ তৈরি করে সেচ ব্যবস্থার অভূতপূর্ব প্রসার ঘটেছে এদেশে। এজন্য ভাখরা-নাঙ্গাল, ও ডি.ভি.সি.-র বাঁধ নির্মাণে মোট ব্যয় হয়েছে নয় হাজার কোটি টাকার মত) প্রতি বছর মোট সংগৃহীত প্রাকৃতিক সম্পদের শতকরা পঁচিশভাগের বেশিই ব্যয় হয় যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম, মাদক দ্রব্য ও প্রয়োজনের অতিরিক্ত বিলাসদ্রব্য উৎপাদনে। শতকরা পঞ্চাশভাগের বেশি প্রাকৃতিক সম্পদ নিছক অপচয় হয়। শস্যাঙ্কে সার ও সেচের জলের শতকরা আশীভাগই নানা ভাবে অপচয় হয়। বাকী মাত্র কুড়ি ভাগ গাছের কাজে লাগে।

শহরের যানবাহনের গতি যদি বাড়ান যায় তাহলে শতকরা ত্রিশ থেকে চল্লিশ ভাগ জ্বালানীর সাশ্রয় হয়। মানুষের অবশ্য প্রয়োজনীয় চাহিদা যেমন অন্ন, বস্ত্র আশ্রয় চিকিৎসা, শিক্ষা যোগাযোগ, ও সাংস্কৃতিক প্রয়োজন প্রভৃতি মেটাতে আহরিত

প্রাকৃতিক সম্পদের মাত্র শতকরা বাইশ ভাগেরও কম ব্যয় হয়।

এই বিপুল অপচয়ের সামান্যও যদি আমরা বাঁচাতে পারতুম তাহলে পরিবেশ ও জীবনের সমস্যাগুলির সমাধান করা সম্ভব হত। এই মূল সমস্যাগুলি কী? পৃথিবীর একদল লব্ধ প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানী নানা দিক বিবেচনা করে মানুষের ১৪টি মূল বা প্রকৃত সমস্যা স্থির করেছেন। ঐগুলি সমাধানে কত অর্থ লাগবে, কত সময় লাগতে পারে তাও নির্ধারণ করেছেন। এই ১৪টি মূল সমস্যা হল (১) পৃথিবীর জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ (২) অরণ্য ধ্বংস প্রতিরোধ, (৩) ভূমিক্ষয় নিয়ন্ত্রণ, (৪) সকলের জন্য পরিশ্রুত জল সরবরাহ, (৫) উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে শক্তির সাশ্রয় (৬) অচিরাচরিত শক্তি উৎপাদন, (৭) উন্নয়নশীল দেশগুলির বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ, (৮) সকলের জন্য গৃহ নির্মাণ, (৯) সকলের জন্য সুস্বাস্থ্য বিধি পালন, (১০) ক্ষুধা ও অপুষ্টি দূরীকরণ, (১১) গ্রীনহাউস এফেক্ট নিয়ন্ত্রণ, (১২) অ্যাসিডের নিয়ন্ত্রণ, (১৩) ওজন গহুর নিয়ন্ত্রণ, এবং (১৪) নিরক্ষরতা দূরীকরণ। প্রতিবছর এজন্য ২৫০ বিলিয়ন ডলার ব্যয় করলে আগামী ৩০ বছরের মধ্যে ঐগুলির স্থায়ী সমাধান সম্ভব হতে পারে। কোন খাতে কত ব্যয় হবে তাও তাঁরা নির্ধারণ করেছেন এবং কোথা থেকে ঐ বিপুল অর্থ পাওয়া যেতে পারে তারও হদিস তাঁরা দিয়েছেন। পৃথিবীর রাষ্ট্রগুলি প্রতিবছর প্রতিরক্ষা খাতে যে একহাজার বিলিয়ন ডলার ব্যয় করে তা থেকে যদি মাত্র শতকরা ২৫ ভাগ বাঁচান যায় তাহলে ঐ অর্থের সাশ্রয় হতে পারে। যুদ্ধের মাধ্যমে নয় মানুষের প্রকৃত সমস্যাগুলির সমাধান হলে পৃথিবীতে স্থায়ী শান্তি নেমে আসবে। পৃথিবী বাসযোগ্য হয়ে উঠবে। অন্যদিকে এই উচ্ছৃঙ্খলতার অবাধ প্রশ্রয়ে আহরিত সম্পদের শতকরা ৭৫ ভাগ ধ্বংস ও অপচয় ঘটতে থাকলে পৃথিবীতে মানুষ সহ সকল জীবের অস্তিত্বই বিপন্ন হবে, এখনই তার স্পষ্ট লক্ষণ দেখা দিয়েছে।

মানুষের মস্তিষ্ক এবং প্রকৃতিগত বিজ্ঞান দুইই অত্যন্ত শক্তিশালী ও সক্রিয় বস্তু। যে সতর্কতা ও বিচক্ষণতার সঙ্গে এ দুটির ব্যবহার অবশ্য প্রয়োজনীয় ছিল তা না হবার জন্যই মানুষের অধিকাংশ সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। এই ১৪টি মূল সমস্যার জন্মই হত না মানুষ যদি প্রকৃত অর্থে বিজ্ঞানমনস্ক হত। বিজ্ঞানের ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে তার সুদূর প্রসারী ফলাফলের কথা চিন্তা করলে,—‘বিজ্ঞান অন্তর্নিহিত দর্শনকে’ বোঝার চেষ্টা করলে, তার যথাযথ মূল্যায়ন ও বাস্তবপ্রয়োগ ঘটলে মানব সমাজের প্রকৃত এবং স্থায়ী অগ্রগতি ঘটত। বস্তুত বিজ্ঞানের অকল্পনীয় শক্তিকে আত্মীকরণ করে নেবার মত কোন উপযুক্ত বিজ্ঞানধর্মী সংস্কৃতির সৃষ্টি হয় নি, মূল গলদটা ঘটেছে ঐ খানেই।

পৃথিবীর নানা দেশে প্রচলিত বর্তমান সংস্কৃতি ও সমাজ-ব্যবস্থা মূলত নানা ধর্মীয় ও রাজনৈতিক মতবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এই সমস্ত ধর্মীয় ও রাজনৈতিক মতবাদগুলি পুরাতন এবং সঙ্গত কারণেই অসম্পূর্ণ—যা আমূল সংস্কারের অপেক্ষা

গাথে। এই ধর্মীয় ও রাজনৈতিক মতবাদগুলি যখন গড়ে ওঠে তখন পৃথিবীতে জীবের যৌথ-বসবাস নীতি বা ইকোলজী সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান ছিল খুব অস্পষ্ট। পরিবেশের সম্পদগুলির প্রকৃত মূল্য, তার প্রয়োজনীয়তা, তার সীমিত পরিমাণ সর্বোপরি জনসংখ্যার চাপজনিত সম্ভাব্য বিপর্যয় সম্পর্কে মানুষের কোন সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না, সুতরাং, সমাজের ছাঁচটাও গড়ে উঠেছে সেইভাবে। যার ওপর মানুষ সমেত সকল জীবের অস্তিত্ব নির্ভর করছে সেই পরিবেশের সম্পদগুলির প্রকৃত মূল্যায়ন ও সংরক্ষণের ওপর সামান্যই গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। উত্তরোত্তর বর্ধিত পরিমাণে সেগুলির বিনাশের ওপরেই মানুষের অর্থনৈতিক বুনியাদ গড়ে তোলা হয়েছে অত্যন্ত বিপজ্জনকভাবে। বিজ্ঞানকে ব্যবহার করা হচ্ছে সেই বুনিয়াদ তৈরীর হাতিয়ার হিসাবে,—লাভ ও লোভের হাতিয়ার রূপে।

তাই আজ সভ্যদেশের সমাজ-সচেতন মানুষের মনে প্রশ্ন উঠেছে, সেই বিভিন্ন মতবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত (Ideology based) বর্তমান সমাজব্যবস্থা পৃথিবীতে মানুষ ও অন্যান্য জীবের স্থায়ী কল্যাণের পক্ষে কতদূর অর্থবহ? কতদূর কার্যকর? এর ভবিষ্যৎই বা কি? এই ‘মতবাদ নির্ভর’ পুরাতন সমাজব্যবস্থার বদলে প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষাকারী ‘প্রজাতি-নির্ভর’ (Species based) এক নূতন সমাজব্যবস্থার কথা ভাবা যেতে পারে। এই নূতন সমাজব্যবস্থার মূল কথা হল—পৃথিবীতে মানুষ-প্রজাতি অন্যান্য উদ্ভিদ ও প্রাণীর মত একটি বিশেষ প্রজাতি মাত্র। সুতরাং, পৃথিবীতে তাকে দীর্ঘকাল টিকে থাকতে হলে—প্রকৃতির নিয়ম শৃঙ্খলা মেনে অন্যান্য উদ্ভিদ ও প্রাণীর সঙ্গে সমঝোতা করে বসবাস করতে হবে। পরিবেশের সম্পদগুলিকে অপচয় হ্রাস, তার সুষ্ঠু ব্যবহার এবং প্রকৃতির স্বাভাবিক চক্রগুলির সচলতা ও সক্রিয়তাও বজায় রাখা প্রয়োজন। এজন্য মানুষকে তার বর্তমানে আপাত-আরামপ্রদ জীবন পদ্ধতি বা জীবন-দর্শনের আমূল পরিবর্তন ঘটাতে হতে পারে। পৃথিবীর আকাশ, জল, বাতাস, মাটি, সমুদ্র, নদ-নদী অরণ্য এবং পশুপক্ষী, কীট-পতঙ্গ নিয়েই পৃথিবীর জীবন, পৃথিবীর চিরস্থায়ী সম্পদ। সুতরাং, তার স্থায়িত্ব রক্ষার জন্য নিজেদের কৃত্রিম চাহিদার হ্রাস, সংখ্যার ভার লাঘব এবং প্রকৃতির সঙ্গে নূতনভাবে খাপ খাইয়ে নেবার মধ্যেই নিজেদের স্থায়িত্বরক্ষার প্রতিশ্রুতি খুঁজে নিতে হবে।

এই নূতন সমাজব্যবস্থার কাঠামো একান্তভাবে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুযায়ী পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষা প্রমাণ ও যুক্তির ওপর গড়ে উঠেছে, সুতরাং, প্রয়োজন মত সহজেই এর পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংস্কারসাধন সম্ভব সব সময়ই এটা করা যেতে পারে। বাস্তবিক পক্ষে সর্বকালে ও নিরবচ্ছিন্নভাবে এই পদ্ধতি চলতে থাকলে ভবিষ্যতে মানুষ সর্বদাই প্রকৃতির সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পারবে। অন্যদিকে বর্তমান মতবাদ-নির্ভর সমাজ ব্যবস্থায় এই সুবিধা নেই বললেই চলে। ওই সব মতবাদের প্রবক্তারা অতীতে যে সব কথা বলে গেছেন তা বর্তমানে সম্পূর্ণ মূল্যহীন, মিথ্যা ও ক্ষতিকর হলেও তার ধারক ও বাহকরা ধ্রুবসত্য জ্ঞানে তা

আঁকড়ে ধরে আছেন ও তাই নিয়ে অসংখ্য তেরি করা কৃত্রিম সমস্যার সৃষ্টি করেছেন, যার জন্য মানুষের মূল সমস্যাগুলির দিকে দৃষ্টি দেবার অবকাশই হচ্ছে না। অত্যন্ত মূল্যবান সময়, অর্থ ও মনীষার-অপচয়, সেই সঙ্গে অজস্র মূল্যবান জীবনের বিনাশ ঘটছে।

ধর্মের মূল অর্থ হল ধারণ করা। অতীতে মানুষের সমাজ ও জীবন-পদ্ধতিকে সার্থকভাবে ধারণ করবার জন্যই নানা ধর্ম ও লোকাচারের সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু একথা বললে মোটেই ভুল হবে না, অত্যাুক্তিও হবে না,—এবং এটাই এই প্রবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়,—বিজ্ঞানই তার অজস্র বিস্ময়কর নিয়ম, নীতি ও তত্ত্বের মাধ্যমে সৃষ্টির সূচনা থেকেই নিখিল বিশ্বকে ধারণ করে রেখেছে। পৃথিবীর সকল জীবের বেলায়ও একথা সত্য। আমরা জানি বা না জানি, চাই বা না চাই—বিজ্ঞানই আমাদের সার্থকভাবে ধারণ করে রেখেছে—তার অসাধারণ তাৎপর্যপূর্ণ নিয়ম নীতিগুলির মাধ্যমে। সুতরাং, বিজ্ঞানকে ধর্ম হিসাবে গ্রহণ করতে অসুবিধা কোথায়?—শুধু মানুষের নয় বিজ্ঞান সকল জীবেরই ধর্ম, নিখিল বিশ্বের ধর্ম,—এবং এই ধর্ম সাধনার জন্য চোখবুজে ধ্যান করবার কোন প্রয়োজন নেই, শুধু তীর অনুসন্ধান স্পৃহা, যুক্তিবোধ ও বিজ্ঞানমনস্কতা অর্জনই যথেষ্ট।

AMARBOL.COM

ধর্ম ও ভারতবর্ষ : আদি-পর্বের রূপরেখা

পল্লব সেনগুপ্ত

প্রথম অধ্যায়

‘হিন্দু’ শব্দের উৎস সন্ধান করতে গিয়ে ভাষাতত্ত্ববিদ্যার পণ্ডিতেরা যে-বিশেষ শব্দটিকে প্রত্নপ্রতিমা (বা, আর্কিটাইপ) হিসেবে নির্দেশ করেছেন প্রায় সর্বসম্মতভাবেই, সেটি হল, সিদ্ধু। পশ্চিম এশিয়ার বণিক এবং পরিব্রাজক-ভাগ্যান্বেষীদের মুখের ভাষায় কালক্রমে সেটিই হয়ে দাঁড়িয়েছে, হিন্দু। বস্তুতপক্ষে, ধর্ম হিসেবে ‘হিন্দু’ শব্দের প্রয়োগ খুব প্রাচীনকালীন ব্যাপার নয়; শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, গাণপত্য ইত্যাদি নানা-মতাবলম্বী ধর্মধারাগুলিকে একত্রে ‘হিন্দুধর্ম’ হিসেবে সমন্বিত করে বলার রীতিটা মূলত মধ্যযুগেই ঘটেছে—আরবী-ফারসী-ভাষী প্রথম আমলের মুসলিম ধর্মাবলম্বীরাই এর প্রচলন করেছিলেন, এমনটা ভেবে-নেওয়া অযৌক্তিক হবে না। প্রাচীন-এবং-মধ্যযুগের বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে ‘হিন্দু’ শব্দের প্রয়োগ করা হয়েছে, এমন নজির সুপ্রাপ্য নয়।

সিদ্ধু>হিন্দু এই-যে বিবর্তন, এটি কিন্তু ধর্মধারাগুলির ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রেও অবশ্যই প্রযোজ্য। আমাদের অনেকের মনেই একটি পূর্বাভিমান আছে যে, হিন্দুধর্ম বলতে যা বোঝায়, তা হল বৈদিকদের ধর্মেরই একটি উত্তরাধিকার-স্বল্প রূপ; এবং মূলত আর্যভাষী ঋক্-বৈদিকরা যে-সব ধর্ম, দেবতা আচার-ইত্যাদিকে মেনে চলতেন, তাদেরই আধুনিকতর রূপায়ণে হিন্দুধর্মের অভিব্যক্তি ঘটেছে। কিন্তু, বাস্তব ঘটনা প্রকৃতপক্ষে তা নয়। একমাত্র প্রাজাপত্য-মতে অনুষ্ঠেয় বিবাহরীতির কিছু-কিছু ক্ষেত্র ছাড়া বৈদিক ধর্ম-এবং-আচার/সংস্কার, হিন্দুর সামাজিক, পারিবারিক কিংবা ব্যক্তিগত জীবনে কোনো প্রতিভাসই রাখেনি। দেবতাভাবনায় তো এ-ব্যাপারটা একেবারে নিরক্ষুশভাবেই ধ্রু৷...তাহলে এখন যা হিন্দুধর্ম বলে পরিচিত, তার এতসব দেবদেবী, আচার-বিশ্বাস, রীতি-প্রকরণ—এগুলির উদ্ভব ঘটল কীভাবে, সেই প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই উঠবে। এর জবাবে যদি কোনো-গবেষক সিদ্ধু-উপত্যকার সংস্কৃতি—তথা, হরাপ্পা সংস্কৃতির কথা বলেন (যা-বলেছেন সর্বজনমান্য বিদ্বানদের বহুজনেই), তাহলে ভারতের প্রাচীন ধর্মবিশ্বাস নিয়ে আলোচনা শুরু করার পক্ষে সেটাই হবে সঠিক পথ-নির্দেশিকা। সিদ্ধুতীরের প্রত্ন-ঐতিহাসিক যুগের জনজীবনে যে-ধর্মধারাগুলি বহুমান ছিল তাদের সম্পর্কে একটা সাধারণভাবে ধারণা গড়ে-নিতে পারলে এবং তার পরবর্তী পর্যায়ে, বৈদিক ধর্মকাণ্ড-বিষয়ে প্রাসঙ্গিক অনুধাবন করলে পরেই হিন্দুধর্মের উদ্ভব-ও-বিকাশের প্রেক্ষিতটি স্পষ্ট হবে।

হিন্দুধর্মে গড়ে-ওঠার আগের যে-সুদীর্ঘ একটি পর্বকাল প্রত্ন-ইতিহাসের পণ্ডিতেরা চিহ্নিত করেছেন, তার শুরু অবশ্যই আরও পূর্ববর্তী আদিম-ধর্মবিশ্বাসের ক্রমবিকাশের শেষ পর্বে। সেই প্রাগৈতিহাসিক ধর্মচিন্তার ধারার বিশ্বজনীন নিয়ম আমাদের দেশেও সমানভাবেই ক্রিয়াশীল হয়েছে। ভারতের আদিবাসী জাতিকোমগুলির মধ্যে তার অস্তিত্বের এখনও অল্পবিস্তর খোঁজ মেলে। আগের অধ্যায়েই সেটি দেখেছি আমরা।

ঐ আদিম ধর্মপ্রত্যয়ের একটি বিশিষ্ট অঙ্গ ছিল মাতৃকা-উপাসনা। বিশ্বের বিভিন্ন প্রত্যন্তে, বিশেষত মধ্যপ্রাচ্যের বিস্তীর্ণ এলাকায় তারই অনুষঙ্গ হিসেবে অজস্র নগ্নিকা-মূর্তি প্রত্ন-অনুসন্ধানের সূত্রে মিলেছে। এই মূর্তিগুলি—প্রত্নতত্ত্বের পরিভাষায় যাদের নাম ভেনাস ফিগারাইন্স—বৈশিষ্ট্য হল এদের নাক-চোখ-মুখ ইত্যাদি প্রায়ই থাকে না, পক্ষান্তরে নারীত্বসূচক প্রত্যঙ্গগুলি খুবই পৃথুল এবং তীক্ষ্ণরেখায় চিহ্নিত ; এবং এগুলিতে বহুক্ষেত্রেই গর্ভবতী দেহলক্ষণ সূচিত। ‘সিন্ধু’-সভ্যতা বা হরাপ্পা সংস্কৃতি, যা-ই বলা হোক না-কেন, তারও পূর্ববর্তী স্তরে যে-প্রাথমিক গ্রামীণ এক সংস্কৃতির সন্ধান পাওয়া গেছে বেলুচিস্তান-ইত্যাদি অঞ্চলে, সেখানেও ঐ ধরনের নগ্নিকামূর্তি মিলেছে যথেষ্ট সংখ্যাতেই। এগুলি প্রায়শই পোড়ামাটির, সিঁদুরে-লাল রঙে রঞ্জিত এবং মাত্র কয়েকটি ‘মডেল’-ই সর্বত্র দেখা গেছে। এই ব্যাপারগুলি, এদের মাধ্যমে একধরনের ধর্মধারা (কাল্ট) প্রচলিত থাকার ইঙ্গিত দেয়। মাতৃকা-উপাসনা, এবং তার অনুষঙ্গে উর্বরতাতাত্ত্বিক ভাবনার একটি প্রারম্ভিক স্তরকেই সূচিত করে এই ছোট-ছোট নগ্নিকামূর্তিগুলি।

ঐ সংস্কৃতির পরিণততর কয়েকটি কেন্দ্রে এই ব্যাপারটি আরও কিছুটা স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। ‘ঝোব’, ‘কুল্লি’, ‘আমরি’-প্রভৃতি প্রাক্-হরাপ্পা সংস্কৃতিকে কেন্দ্রগুলিতে নারীত্ব নির্দেশক সুস্পষ্ট প্রত্যঙ্গ-তক্ষিত নগ্নিকামূর্তিগুলির সঙ্গে-সঙ্গে বিশালাকৃতি যোনিপ্রতীক, শিশ্নুপ্রতীক-ইত্যাদিও পাওয়া গেছে উৎখাননের ফলে। মুঘল ঘুণ্ডাই, রণ ঘুণ্ডাই, পেরিয়ানো ঘুণ্ডাই-প্রভৃতি স্থানে পাওয়া এই প্রত্ননিদর্শগুলি স্পষ্টতই শিশ্নোপাসনার হৃদিশ দেয় বলে মনে করা যেতে পারে। প্রাচীনতর আমলে মাতৃকা-উপাসনা, উর্বরতাকেন্দ্রিক ধর্মধারা ইত্যাদি যা প্রচলিত ছিল, তার সঙ্গে পরবর্তীকালে এইসব সংস্কৃতিতে প্রচলিত ধর্মপ্রত্যয়ের পার্থক্য ছিল এই যে, এদের মধ্যে মাতৃকাশক্তির সঙ্গে-সঙ্গে পিতৃশক্তিরও উপাসনাধারা সমন্বিত হয়েছিল। অনেক পরবর্তীকালের ঝোব, কুল্লি-ইত্যাদি সংস্কৃতির বয়স $\pm 6,000$ বছর ; মেহেরগড়ে ইদানীংকাল যে-প্রত্ন-অনুসন্ধান করা হয়েছে, তার বিশ্লেষণে পণ্ডিতেরা অনেকেই অন্তত ঐ সংস্কৃতিকে কেন্দ্রটিকে মেসোপটেমিয়ার নগরসংস্কৃতির কাছাকাছি সময়ের বলেই মনে করছেন ; অর্থাৎ $\pm 4,000$ বছর। হিন্দু ধর্ম-দর্শনের প্রকৃতি-ও-পুরুষ তত্ত্বের প্রাথমিক প্রত্নপ্রতিমা (আর্কিটাইপ) হিসেবে এই যৌথভাবে যোনি-শিশ্নোপাসনার রীতিকে গণ্য করা অসঙ্গত হবে না।

হরাপ্পা-সংস্কৃতিতে যদিও লিপি-লিখন প্রচলিত ছিল তবু আজো তার পাঠোদ্ধার সঠিকভাবে সম্ভব হয়নি বলে প্রত্ননিদর্শের সঙ্গে লৈখিক সাক্ষ্যকে মিলিয়ে নিয়ে কোনো নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছনো খুবই দুর্লভ ব্যাপার। তবে পূর্বতন সংস্কৃতির অনুবর্তনই যে এখানে ক্রমপরম্পরায় ঘটেছিল, সে-কথা মেনে নিতে অসুবিধা হয় না। প্রচুরসংখ্যক মাতৃকামূর্তি, ‘শীলমোহর’ বলে যেগুলি সাধারণভাবে পরিচিত—তাদের উপরে খোদাইকরা নানা ধরনের দৃশ্য এবং পশুমূর্তি, কিছু বিশিষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ পুরুষমূর্তি ইত্যাদির মাধ্যমে একটা ‘ব্যবহারযোগ্য ধারণা’ গড়ে তোলা যায়। এছাড়াও পুরুষত্ব বাচক এবং নারীত্ব-নির্দেশক প্রত্যঙ্গের ছোট-বড় অজস্র প্রতীকও হরাপ্পা-সংস্কৃতির বিভিন্ন কেন্দ্রে মিলেছে। শীলমোহরের লিখন অব্যাক্ষাত থাকলেও এবং ঋক্-বৈদিক আর্যভাষীরা ভিন্ন এক সংস্কৃতির মানুষ হলেও, বৈদিক সাহিত্যের (বিশেষত, ঋগ্বেদেরই) বেশ কিছু অংশকে অবলম্বন করেও সেই ‘ব্যবহারযোগ্য ধারণা’-র সীমাকে বিস্তৃত করা সম্ভবপর।

যেমন ঋগ্বেদে অমিত্র কোনো জনগোষ্ঠীকে ধিক্কার দেওয়া হয়েছে “অন্যত্রত”/“মূরদেবাঃ”/“শিশ্নদেবাঃ” বলে। বৈদিক দেবতার মূলত অমূর্ত—সূর্য, মিত্র, বরুণ, অগ্নি, পর্জনা, ইন্দ্র, রুদ্র, উষা, অদিতি, ঋশ্বিদয়, নাশতা-ইত্যাদি দেবতার প্রাকৃতিক বিভিন্ন শক্তিরই অভিব্যক্তি হিসেবে গ্রহণ—যাঁদেরকে মানবায়িত ভাবরূপে কল্পনা করা হয়েছে। এঁদের মূর্তির কোনো সমকালিক প্রত্ননিদর্শ আজ অবধি মিলেছে বলে জানা নেই। অতএব এটা মনে দেওয়া যায় যে, ঋগ্বেদের ধারক যে-আর্যভাষী জাতিকোমণ্ডলি ছিল, তাদের সঙ্গে বৈরিতা আছে এমন সংস্কৃতির মানুষেরাই মূর্তিপূজা এবং শিশ্নপূজা করত। এই ভাবানুষঙ্গটি সিদ্ধু-উপকূলবর্তী/জাতিগুলির সঙ্গেই যেহেতু মানানসই, তাই তাদেরকেই ঐ বৈদিক আর্যদের বৈরী বলে গ্রহণ করা যায়।

যে-দেবাদেবীদেরকে মূর্তি, অথবা ‘শীলমোহর’-এ খোদাই বিভিন্ন ছবিতে দেখা যায়, তাদের বিবরণ দেওয়ার একটা প্রয়োজন এখানে দেখা যাচ্ছে : প্রায়-নগ্না, অথচ শিরোভূষণ এবং অলঙ্কারে সজ্জিতা নারীমূর্তিগুলিকে বিশেষজ্ঞরা স্মরণাতীত কাল থেকে মধ্যপ্রাচ্য এবং তার পড়শী অঞ্চলগুলিতে উপাসিত মহা-মাতৃকা দেবতারই একটি রূপ বলে মনে করেছেন। কুম্ভি, কোব্ ইত্যাদি সংস্কৃতির প্রায়-অনুরূপ মূর্তিগুলির সঙ্গে এদের একটি উল্লেখ্য পার্থক্য আছে ; প্রাক-হরাপ্পাকালের নগ্নিকামূর্তিগুলি পূর্ণাঙ্গ নয়—কোমর—কোনো-কোনো ক্ষেত্রে যোনি অবধি তাদের নিম্নসীমানা। পক্ষান্তরে, এগুলি প্রায় পূর্ণাবয়ব। লাল রং—যা কয়েক সহস্রাব্দের স্পর্শ সত্ত্বেও মোছেনি, এদের বৈশিষ্ট্য ; দীপাধারের মতো পোড়াদাগ এদের মাথায় (শিরোভূষণে) প্রায়শই রয়েছে—যা-কিনা, এগুলি যে কোনো ধর্মাচারের সঙ্গে

সম্পৃক্ত ছিল সেটাই প্রতীত করে। মহামাতা বা ‘ম্যাগনা মার্টা’ রূপে যে-দেবী ইস্তার, তানিট, আইসিস, সিবিলা, ননা, ঋআ-প্রভৃতি বিচিত্র নামে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল এবং মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন এলাকায় প্রত্ন-ঐতিহাসিক কাল থেকে পরিচিতা ছিলেন, এই সিদ্ধদেবীকে তাঁরই আরও এক রূপান্তর বলে ধরা যায় হয়ত বা। নথ্যতার সূত্রে উর্বরতাকেন্দ্রিক ধর্মধারার ব্যবহারিক একটি প্রকাশের সঙ্গেও তিনি সম্পৃক্তা ছিলেন।

এ-কথার কিছু সমর্থক-সাক্ষ্য ‘শীলমোহর’গুলির ছবি খোদাই থেকে পাওয়া যাচ্ছে। একটি শীলে দেখা যাচ্ছে, এক পিঠে রয়েছে দুই হাত উর্ধ্বে উখিত নগ্না-এক নারীর শিরচ্ছেদনে উদ্যত পুরুষ মূর্তি ; অন্য পিঠে বিবৃত-উরু নারীর স্ত্রীপ্রত্যঙ্গ থেকে বৃক্ষোদগমের ছবি খোদাই করা। শস্যাকামনায় নারীবলি এবং তার অনুসূত্রেই নতুন শস্য/গাছ জন্মাচ্ছে, নবা-প্রসূতরযুগীয় এই ধারণার সঙ্গে উর্বরতা তত্ত্বের যোগাযোগ সুপ্রতিষ্ঠ। মাতৃদেবতার ‘বসুমতী’ এবং ‘শাকস্তরী’ রূপদুটি পরবর্তীকালের হিন্দুধর্মে যথেষ্টই মিলেছে। এই শীলমোহরে তাঁদেরই প্রত্নপ্রতিমা দেখা যাচ্ছে মনে করতে পারেন। চারটি পরস্পর-সম্পর্কিত শীলমোহর চন্-শ-দড়োর উৎখনন থেকে সংগৃহীত হয়েছে : এদেরকে মহিষমর্দিনী দেবীর আদি রূপ বলেও গণ্য করা অসঙ্গত নয়।

আরও যেসব শীলমোহর হরাপ্পা-সংস্কৃতির বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে সংগৃহীত আছে, তাদের মধ্যে এক-বা-একাধিক বৃক্ষদেবীর প্রতিভাস আছে বলে মনে করা যেতে পারে। বৃক্ষ এবং সপল্লব লতার মধ্যে বিন্যস্ত নারীর মূর্তি, যা এই শীলগুলিতে খোদিত আছে—এ সিদ্ধান্তেরই সূচনা করে। এই জাতীয় শীলমোহরগুলির মধ্যে একটির প্রসঙ্গ একটু বিশেষভাবে উল্লেখনীয় : এ রকম এক বৃক্ষদেবীর পূজার দৃশ্য, আরও সাতটি নারীমূর্তি তক্ষণ করা হয়েছে দেবী, উপাসক এবং আনীত বলির পশুটির সামনে। এঁদেরকে পৌরাণিক সপ্তমাতৃকার আদিক্রম বলে যেমন গণ্য করা যায়, আবার তেমনভাবেই, লৌকিক ধর্মধারার সাতবৌনি সাতসিনি-প্রভৃতি দেবীদেরও প্রত্ন-প্রমাতামহী হিসেবে ধার্য করলে অসঙ্গত হবে না।

নারীর (তথা, দেবীর) মূর্তি এবং চিত্রগুলিই কিম্ব হরাপ্পা-সংস্কৃতির ধর্মচিন্তার একমাত্র পরিচায়িকা নয়। পুরুষমূর্তি—সংখ্যায় কম মিললেও—প্রাসঙ্গিক গুরুত্ব তাদেরও যথেষ্টই আছে। কয়েকটি শীল পাওয়া গেছে মহেঞ্জোদড়ো, হরাপ্পা, কট্ ডিজি প্রভৃতি সংস্কৃতি-কেন্দ্রে, যাদের উপর বিশেষ ভঙ্গীতে আসীন এক পুরুষ দেবতারও ছবি খোদাই করা আছে। যোগাসনে উপবিষ্ট এমনই একটি মূর্তির তিনটি মুখ, মাথায় মহিষশৃঙ্গের মুকুট, এবং তাঁকে ঘিরে রয়েছে নানা প্রজাতির পশু এই মূর্তিকে সার জন মার্শাল ‘আদি শিব’ রূপে গণ্য করেছেন, যদিও দামোদর ধর্মানন্দ কোশাশ্রী এ-ব্যাপারে একমত হননি। মাঝামাঝি একটা সিদ্ধান্তে এসেছেন দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।... পুরাণ-প্রথিত ‘ত্রিবজ্জ’-‘যোগীরাজ’-‘পশুপতি’ শিবরূপে এঁকে গণ্য করি, আর না-ই করি—ইনিই যে হরাপ্পা-সংস্কৃতির মূখ্য পুরুষ দেবতা, তাতে কোনো

সংশয়ের অবকাশ নেই। এঁকে নানা কারণেই, ঋগ্বেদে-উল্লেখিত অহি-বৃত্রের সঙ্গে ও সমীকরণ করা সম্ভব। পরের একটি অধ্যায়ে এঁর সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে বলব।

॥ ৩ ॥

মাতৃদেবতা, পিতৃদেবতা, যোনি, শিশ্ন এবং যোনি-শিশ্ন পূজার যে-সব নিদর্শ সিদ্ধুর সংস্কৃতিকেন্দ্রগুলিতে পাওয়া গেছে—হরাম্পা-কৃষ্টিবলয়ে ধর্মপ্রত্যয়ের সামগ্রিক পরিচয় তারাই শুধু দেয় না যে, এ কথাটাও এখানে বলে রাখা বাঞ্ছনীয়। যোগাসনে আরুঢ় ঐ পুরুষদেবতার মূর্তিচিত্রণের সূত্রে, ঐ সংস্কৃতির ধারক-সমাজে যোগসাধনার যে একটা ধারা বহমান ছিল, তারই প্রমাণ মেলে। আসনারুঢ় যোগভঙ্গিমারত একটি পুরুষ মূর্তি এবং মাথা, ঘাড় এবং শিরদাঁড়ার ঋজুকঠিন ভঙ্গীর সঙ্গে-সঙ্গে নাসিকাত্রে স্থিত অর্ধনিমীলিত দুই চোখের দৃষ্টিসম্পন্ন পুরোহিতের পোশাক-পরা আরেকটি পুরুষ মূর্তি (যথাক্রমে হরাম্পা এবং মহেঞ্জোদাড়ো থেকে পাওয়া) সিদ্ধুসভ্যতায় যোগক্ষেমী সাধকদের অস্তিত্বকেই প্রমাণ করে যে ‘যতি’ (এই শব্দের উৎস এবং ‘যোগ’ শব্দের উৎস অভিন্ন)—দের ‘সালাবুক’ (অর্থাৎ নেকড়ে বাঘ)—দের মুখে ফেলে দিয়ে ইন্দ্র হিংসা চরিতার্থ করতেন বলে পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে নানা জায়গায় বলা হয়েছে, ধরা যেতে পারে তাঁরা হলেন ঋক্-বৈদিক আর্যভাষীদের দ্বারা উৎসাদিত এবং বিধ্বস্ত সিদ্ধুজনের অন্তর্গত ঐ যোগসাধকরাই। বৈদিক ঋষিদের প্রতিষ্ঠার স্বার্থে অবৈদিক ঐ ধার্মিক সাধকদেরকে সান্নিধ্যের আহ্বায়ে পরিণত করা হয়েছিল মনে করা যায়। করজোড়ে আসনবন্ধ-অঙ্গহায় উপবিষ্ট আরো কিছু পুরুষমূর্তি সিদ্ধু নগরীগুলিতে প্রত্নোৎখননের সূত্রে পাওয়া গেছে ; এগুলিও অবশ্যই ধর্মপ্রত্যয়ের (যোগসাধনারও) নিদর্শ চিত্র।

মাতৃকা-উপাসনা, পিতৃদেবতা পূজা, যোনাঙ্গ আরাধনা এবং যোগসাধনার সূত্রে পরবর্তীকালের হিন্দুধর্মের ও সাংখ্যদর্শনের পুরুষ-প্রকৃতি-তত্ত্ব, শক্তি-তত্ত্ব, শিব-তত্ত্ব এবং যোগসাধনার পূর্ব-প্রতিভাস পাওয়া যাচ্ছে। লোকাযত মতের দর্শনচিন্তা উত্তরকালে প্রত্যক্ষভাবে বিলুপ্ত বলে মনে করা হয়ে থাকে যদিচ, তবু ভারতের বিভিন্ন লৌকিক ধর্মপদ্ধতির মধ্যে এবং তন্ত্রের কোনো-কোনো শাখার রীতি-আচার ইত্যাদিতে তার রূপান্তরিত কিছু-প্রকরণের অস্তিত্ব এখনো বিদ্যমান আছে—এমন কথা অনেক বিদ্বানই মনে করে থাকেন। এ অভিমত মানলে ‘লোকাযত’ মতেরও প্রাথমিক সন্ধান হরাম্পা-সংস্কৃতির ধর্মভাবনার মধ্যে প্রাপ্য—এটিও মেনে-নেওয়াই সুসঙ্গত হয়।

হরাম্পা-কৃষ্টির ধর্মালোচনায় শীলমোহরের গুরুত্ব যে অপরিসীম, উপরের বিভিন্ন বক্তব্যে সে-কথা স্পষ্টতই প্রতীত হয়েছে। ঐ তথাকথিত ‘শীল’গুলির নিজস্ব একধরনের মূল্যও ছিল যে, সেই কথাটা হরাম্পা-সংস্কৃতির ধর্মবিশ্বাস বিষয়ে আলোচনা করার সূত্রে একটু বলা দরকার। ঐ ‘শীল’গুলিতে নানা ধরনের মূর্তি এবং

ঘটনার দৃশ্য তক্ষণ করা ছাড়াও, এদের উপরে খোদাই করা বিভিন্ন জীবজন্তুর ছবিও দেখা যায়। পশু ও মানুষের সমন্বিত মূর্তিও অপ্রাপ্য নয়। এগুলিকে ‘টোট্টেম’ বা কুলপ্রতীক সংক্রান্ত সংস্কারের আনুষঙ্গিক হিসেবে গণ্য করা যায় অতএব। কিন্তু এ-প্রসঙ্গে আরো কিছু বলার আছে। সাধারণভাবে আমাদের অভ্যাস হয়ে গেছে এগুলিকে ‘শীলমোহর’-রূপেই গণ্য করাটা। কিন্তু সত্যিই যে এগুলির মাধ্যমে ‘ছাপ্পা’ মারা হতো, এমন কোনো প্রমাণও আমাদের আয়ত্ত নয়। কোনো কোনো পণ্ডিত এগুলিকে বাণিজ্যিক লেনদেনের মাধ্যম হিসেবেও মনে করেছেন ; কিন্তু তাও অপ্রমাণিত। পক্ষান্তরে, এগুলি সম্পর্কে অন্যান্য কিছু ভাববারও অবকাশ রয়েছে। প্রায় ক্ষেত্রেই এই চাকতিগুলির উপরদিকে একটি করে ছিদ্র দেখা যায় ; এর থেকে এগুলিকে তাবিজ হিসেবে ধারণ করা হতো—তেমনও ভাববার সুযোগ রয়েছে। তাহলে, এগুলিকে ধর্ম-উপকরণ বলে ধরাই যায়। সেক্ষেত্রে খোদিত অক্ষরগুলিকে সংশ্লিষ্ট দেবতা/ঘটনাকেন্দ্রিক কোনো বাক্য বা শব্দ (মন্ত্র?) বলেও ধরা যেতে পারে।

এত রকমের সম্ভাবনার বিষয়ে আমাদের ভাবতেই হতো না, যদি ঐ ‘শীল’ তথা চাকতিগুলিতে উৎকীর্ণ অক্ষরগুলির মর্মবিশ্লেষণ করে ফেলা যেত। রুশ এবং ফিনীয় প্রত্নলিপি-বিশেষজ্ঞরা কম্পিউটারের সহায়তা নিয়ে এই লিপির বিষয়ে একটি নিশ্চিত নির্দেশ করেছেন : যে-ভাষার লিপি ছিল এই ‘শীলমোহর’ খোদাই করা অক্ষর/চিহ্নগুলি—দ্রাবিড়বর্গীয় কোনো একটি প্রিস্থিত-ভাষার এক প্রত্নপ্রতিম রূপ হিসেবেই সেটি গ্রহণীয়। অর্থাৎ এই ভাষার ধরকরা প্রাক-বৈদিক (এক্ষেত্রে, প্রত্ন দ্রাবিড়) রূপেই মান্য ও গ্রাহ্য হবার দাবীদার। তাই এদের গায়ে খোদাই করা যেসব ছবিতে নানা কাহিনীর আভাস মিলছে, সেগুলিকে অ-বৈদিক এবং প্রাচীনতর কোনো ধর্মীয় পুরাণবৃত্ত অর্থাৎ মিথ অম্লস্বনে রূপায়িত বলে ভাবা চলে। বৈদিক পুরাণবৃত্তের সঙ্গে স্পষ্টতই এদের গরমিল, বরং, দু-একটি ফলকে ‘গিলগামেশ’-কাহিনীর অনুরূপ কোনো প্রাচীন-পুরাবৃত্ত উদ্দিষ্ট হয়েছে, কিন্তু লিপি অপঠিত থাকায়, এ-অবধি সেই বিষয়ে কোনো আলোকপাত করা সম্ভব হয়নি। সবটুকুই করতে হয়েছে শিল্প-নির্দেশের উপরে নির্ভর করে, প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্যের মাধ্যমে।

॥ ৪ ॥

হরাপ্পা-কৃষ্টির সম্পর্কে প্রত্ননির্দেশের মাধ্যমে পাওয়া ধর্মসম্পৃক্ত চিন্তাভাবনার পাশাপাশি, বৈদিক ধর্মধারার সম্পূর্ণতই সাহিত্য-সাক্ষ্য-নির্ভর ভাবনাগুলি অতঃপর বিচার্য। এদের দুটিকে পরস্পরের পরিপূরক বলেই গ্রহণ করা সঙ্গত। বৈদিক সাহিত্যের রচনা, বিকাশ এবং ব্যাপ্তি বিশাল। চারটি বেদ-গ্রন্থ, তাদের ব্রাহ্মণসমূহ এবং উপনিষদবর্গ—একত্রে বৈদিক সাহিত্যের পরিপূর্ণ পরিমাপ বিহিত করে। বহু শতাব্দী ধরে এগুলি নানান পর্যায়ে গড়ে উঠেছে। আদিম এবং তুচ্ছ সব সংস্কার থেকে শুরু করে অত্যন্ত জটিল ও-সূক্ষ্ম তত্ত্বচিন্তা পর্যন্ত নানাকিছুই এর অন্তর্গত। বহু

দেবতাবাদী ধর্মধারায় এর প্রাথমিক বিকাশ ; আর পূর্ণ ব্যাপ্তি একেশ্বরবাদে। প্রকৃতির বিভিন্ন বস্তু এবং ঘটনাকে মানবমূর্তিতে কল্পনা করে বৈদিক কোনো প্রত্ন-নির্দর্শন নেই। ১০২৮টি (এর থেকে প্রক্ষিপ্ত ১১টি বাদ দিতে হবে যারা ‘বালখিল্য সূক্ত’ বলে পরিচিত) সূক্তে ১০,৪৬২টি শ্লোকে ঋগ্বেদ রচিত হয়েছে। বশিষ্ঠ, গৃৎসমদ, বিশ্বামিত্র, ভরদ্বাজ, অত্রি, বামদেব, দীর্ঘতমা-প্রমুখ গোত্রঋষিদেরকে মনে করা হয় এগুলির রচয়িতা বলে। সামবেদের ১৫৪৯টি স্তবক (যার মধ্যে ৭৫টি মাত্র নূতন—অনাগুলি ঋক্-সংহিতা থেকেই গৃহীত) ; যজুর্বেদের প্রায় সব মন্ত্রই ঋগ্বেদ থেকে নেওয়া—নিজস্ব বলতে কিছু কিছু-গদ্যাভাষায় যজ্ঞনিষ্পন্নকারক নির্দেশ আছে ; আর অথর্ববেদে ৭৩১টি সূক্ত—যার মধ্যে ১০০ টির মতো ঋগ্বেদের সঙ্গে একেবারে মিলে যায়—অনাগুলি পৃথক। ঋগ্বেদ ছাড়া অন্য বেদগুলি আবার বহু শাখায় বিভক্ত ছিল—যাদের বড় অংশটাই লুপ্ত ; টিকে আছে একটি-দুটি মাত্র। এই জটিল-ও-বিশাল শ্লোকের মহারণ্য থেকে বৈদিক ধর্মধারার সঠিক কাঠামোকে খুঁজে বার করা দুরূহ কাজ ; এবং সেই কাজ করতে গিয়ে বিশ্ববিশ্রুত বিদ্বানেরাও এক-একভাবে এক-একজন অগ্রসর হয়েছে। তাঁদের ভাবনা, বহুক্ষেত্রেই পরস্পরের সঙ্গে বিপ্রতীপ। তবু, এই সমস্ত কিছুকে সামগ্রিকভাবে অন্বেষণ করে মোটামুটি কতকগুলি সিদ্ধান্তে আসা যায়, যাদের অনুষঙ্গে বৈদিক ধর্মের মূল-লক্ষণগুলি চিহ্নিত হতে পারবে।

দেবতাদের কাছে প্রার্থনার উপজীব্য : অন্ন, নারী, ভয়নিবারণ এবং শত্রুনিধন। এই মন্ত্রগুলি নাকি ঋষিরা ‘দর্শন’ করতেন (‘ভিসন্’?) এবং ‘দৃষ্ট’ মন্ত্রগুলি সক্রিয় করতে সঙ্গীত ও যজ্ঞের প্রয়োজন হতো। অর্থাৎ এক ধরনের ব্যাপক জাদুবিশ্বাস এদের পরিকাঠামো গড়ে তুলেছে। বেদকে ‘অপৌরুষেয়’ বলে যে-কথাই বলা হোক না কেন, এই লৌকিক ভিত্তিটা অনস্বীকার্য।

বৈদিক দেবতারা সংখ্যায় অজস্র। তবে অধিকাংশই পুরুষ দেবতা : স্ত্রী দেবতারা সংখ্যায় অত্যন্ত কম। এইখানে, হরাপ্পীয় কৃষ্টির দেবভাবনার সঙ্গে বৈদিক দেবভাবনার মৌলিক পার্থক্য। নগর-জনপদ-ভিত্তিক কৃষি-অর্থনীতির ওপর নির্ভর করে হরাপ্পীয় সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল : আর বৈদিক সংস্কৃতি প্রথমপর্বে ছিল যাযাবর গোষ্ঠীর পশুচারণ নির্ভর অর্থনীতির ওপর ভিত্তিশীল, পরে গ্রামনির্ভর কৃষিসভ্যতার স্তরে তার বিকাশ লাভ ঘটে। আবার অথর্ববেদের বহুলাংশই আদিম সংস্কার—ঝাড়-ফুঁক, মারণ-উচাটন বশীকরণ, মন্ত্র-তন্ত্র-ইত্যাদির দ্বারা গ্রস্ত। নাগরিক-হরাম্মা-সভ্যতার পূর্ববর্তী গ্রামীণ স্তরের সঙ্গে তার ভাবগত মিল থাকাটা খুবই সম্ভব।

বৈদিক দেবতাদের পণ্ডিতেরা তিনটি বর্গে ভাগ করেছেন—স্বচ্ছ, অর্ধস্বচ্ছ এবং অস্বচ্ছ। স্পষ্ট প্রকৃতি-দেবতা হওয়া সত্ত্বেও যাঁরা বর্ণনায় সম্পূর্ণ মানবিক—তাঁরা স্বচ্ছবর্ণীয় ; যেমন সূর্য, অগ্নি বা ঈশা। অর্ধস্বচ্ছ দেবতাদের প্রাকৃতিক প্রেক্ষিত আপাত প্রচ্ছন্ন ; যেমন বজ্রদেব ইন্দ্র, বর্ষদেব বরুণ ও পর্জন্য। অস্বচ্ছ দেবতাদের মূল

প্রাকৃতিক চরিত্রটি বিলুপ্ত ; যেমন, অশ্বিন্দ্বয় বা নাসত্য। আকাশ এবং পৃথিবী একত্রে দ্যাবাপৃথিবী বলে ঋগ্বেদে উল্লেখিত। এই ‘দ্যৌঃ পিতরঃ’—ইউরোপীয় আৰ্যভাষীদের কাছে ‘জুপিটার’। ‘বরুণ’ এবং গ্রীক দেবতা ‘উরানোস’ সমান। ‘পর্জন্য’ ও লিথুয়ানীয় দেবতা ‘পরিয়ানোস’ একই। বৈদিক ‘মিত্রদেবতা’র সঙ্গে আবেস্তীয় ‘মিত্রে’র কোনো মূল পার্থক্য নেই। ইন্দ্র ও টিউটোনীয় ‘ওডিন্’ অভিন্ন। ‘অগ্নি’ আর স্লাভ ‘অ্যাগ্ন’ একই দেবতার দুই নাম।

এই কথাগুলি বলার অর্থ এই যে, বৈদিক দেবতার মূলক, বহু-সংস্কৃতিতেই ছড়িয়ে আছে, একমাত্র ভারতই তাঁদের কর্মক্ষেত্র নয়—এটি বোঝানো। হরাপ্পীয় ধর্মধারার সঙ্গে সুপ্রাচীন মধ্যপ্রাচ্যের ধর্মধারার মিলগুলি (বিশেষত মাতৃকাদেবীর পূজার ক্ষেত্রে) যেমন একই বিশেষ ভাবনা-সম্মিলিত সুবিশাল অঞ্চলে ছড়িয়ে-পড়াকে সূচিত করে, ঠিক বৈদিক ধর্মধারার সঙ্গে অন্যান্য আৰ্যভাষী সংস্কৃতির ধর্মপ্রত্যয়ের সমানতা—তাদেরকে একটিই মূল উৎসজাত বলে সপ্রমাণ করে।

বৈদিক দেবতাদের মধ্যে প্রধানতম হলেন ইন্দ্র। অনেক সময়েই তাঁকে যুযুধান আৰ্যভাষী বাহিনীর নায়করূপে দেখা যায় যিনি—

- (ক) শতদ্বারযুক্ত প্রস্তরনির্মিত নগরীসমূহ ভস্মসাৎ করেছিলেন ;
- (খ) হরিয়ূপীয়া (হরাপ্পা) নগরের উপকণ্ঠে দাসবংশীয় রাজনাবর্গ ও সৈন্যদেরকে ধ্বংস করেছিলেন ;
- (গ) মুরদেবাঃ-শিশ্নদেবাঃদের নগরী লুণ্ঠন করেছিলেন ;
- (ঘ) দাসরাজাদের পুরনারীদেরকে গণপ্লবণে বিধ্বস্ত করার নেতৃত্ব করেছিলেন ;
- (ঙ) স্বয়ং উষাদেবীকে ধর্ষণ করেছিলেন ;
- (চ) বৃত্র নামক ত্রিশীর্ষ অসুরকে বধ করেছিলেন ;
- (ছ) কৃষ্ণত্বক দাস-অহি বংশীয়দের পৃষ্ঠত্বক উন্মীলন করেছিলেন ;
- (জ) দাসবংশীয়া গর্ভিনী নারীদের হত্যা করেছিলেন ;
- (ঝ) যতি-দের নিধন করে উল্লাস প্রকাশ করেছিলেন।

মহাদ্রষ্টা বৈদিক ঋষিরা এতসব ‘মহৎ’ কাজে ব্যাপৃত-থাকা ইন্দ্রদেবতার স্তুতিতে মুখরই হয়েছেন! সমগ্র ঋগ্বেদই এমন অরি-নিসূদন এবং বৈর-নির্যাতনের দলিল না হলেও, তার বৃহদংশেই এ-জিনিস দেখা যায়। বৈদিক ধর্মধারায় তাই একটি অবলীন হিংস্রতার ভাব যে ছিল, সে কথা অনস্বীকার্য। শত্রুকে হত্যা, শত্রুর নারীর উপর বলাৎকার, শত্রুর বাসভূমিতে অগ্নিসংযোগ এবং শত্রুর সম্পদ লুণ্ঠনের নির্মম আনন্দ এই হিংস্রতার মূল চারটি অভিব্যক্তি। মুখ্য বৈদিক দেবতা। (প্রায় ৩০০ সূক্ত তাঁরই উদ্দেশে নিবেদিত) ইন্দ্রেরই ‘মাহাত্ম্য’ যদি এই হয়, তাহলে বৈদিক ধর্মচিন্তা সম্পর্কে অনুরক্ত বোধ করার কোনো কারণ সম্ভবত নেই।

উষা-এবং-বৃত্র সম্পর্কে যে-উল্লেখগুলি উপরে করা হয়েছে, সে-বিষয়ে আরো কিছু বলার আছে। দামোদর ধর্মানন্দ কোশাশ্রী, উষাকে হরাপ্পীয় মাতৃদেবতার সঙ্গে

সমীকৃত করেছেন। তাঁর মতে ইন্দ্র-কর্তৃক উষার ধর্ষণ প্রকৃতপক্ষে আর্যভাষী সৈন্যদের দ্বারা হর্যাক্ষীয় নগরগুলির নারীদের উৎপীড়নের দ্যোতক। যাযাবর আর্যভাষী গোষ্ঠীগুলিতে স্বাভাবিকভাবেই আনুপাতিক হারে নারীর সংখ্যা কম থাকায় তাঁরা দেবতার কাছে প্রার্থনার মন্ত্রেও পরনারী সন্তোগের বাসনা প্রকাশ করেছিলেন এবং বাস্তবে তা ঘটেছিল। উত্তরকালের হিন্দু-কৃষ্টিতে স্বামীকে ‘আর্যপুত্র’ বলে সম্বোধন করাটা তারই সূচক (অর্থাৎ স্ত্রীরা আর্য নন)। প্রাক্-বৈদিক দেবদেবীরা ধীরে-ধীরে আর্যভাষী সমাজে মিশে গেছেন, প্রাগার্য (অর্থাৎ হর্যাক্ষীয়—এবং অন্যান্য প্রাচীন জাতিকোমগুলির) নারীরা আর্যভাষীদের ‘বধূ’ (যার প্রকৃতি-প্রত্যয়গত অর্থ—বহন করে আনা লুপ্তিভা নারী) হয়ে আসার সুবাদে। ইন্দ্র কর্তৃক উষা-ধর্ষণের কাহিনীটি তাই সবিশেষ সামাজিক তাৎপর্যময়; এবং ধর্মীয় গুরুত্বসম্পন্ন তো বটেই।

বৃত্তকে, সিদ্ধুর পূর্বোক্ত ‘শিব’-দেবতার সঙ্গে এক বলে ভাবার যথেষ্টই কারণ আছে। তাই উল্লেখযোগ্য এই যে, যে-ইন্দ্র বৃত্ত/শিবকে ‘বধ’ করলেন (এ-ও আর্যভাষীদের আক্রমণে হর্যাক্ষীয়দের পরাভবের সূচক), উত্তরকালে ‘হিন্দু’ ধর্ম যখন গড়ে উঠল—তখন শিবই সেখানে মহেশ্বর, দেবাদিদেবে পরিণতি পেলেন—আর সেই দেবরাজ ইন্দ্র পুরাণবৃত্তে যে-গুরুত্বই পান না কেন—ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তাঁর পরিণতি ঘটল (সম্ভবত) নগণ্য ‘ইন্দ’-ঠাকুরে! উষা-ইন্দ্র-বৃত্ত-সংক্রান্ত এই দুই বিবরণ একই সঙ্গে আমাদের দেশের সামাজিক এবং ধর্মীয় ইতিহাসের জঙ্গমতার পথদিশারী।

বৈদিক যজ্ঞ, সামগান-ইত্যাদিকে ‘যজি’ অর্থাৎ সৃষ্টিমূল বলে গণ্য করা হয়েছে। সম্ভবত এই ভাবনা পরবর্তীকালের ঋক্-সংহিতার যে-সব অংশ অর্বাচীন বলে সর্বজনস্বীকৃত—এই ভাবনা, সেই-সময়বর্তী। তখন সমাজে রাজার আবির্ভাব ঘটেছে—বহুজনের সঙ্গে সমবন্টনের প্রথা বর্তিত হয়েছে এবং এক-ও-অদ্বিতীয় ঈশ্বরের কল্পনা গড়ে উঠেছে একরাট শাসকের আত্মপ্রকাশের অনুপ্রাণেই। ঋক্-সংহিতার ১০ম মণ্ডলের ‘পুরুষসূক্তে’ সেই একেশ্বরের বন্দনা করা হয়েছে—যা পূর্বতন অংশে ঘটেনি কখনো, ইন্দ্র সেখানে প্রধান হলেও একেশ্বর নন। আর ঐ মণ্ডলের শেষতম সূক্তে (বিখ্যাত ‘সংগচ্ছধরম সংবদধরং সংবোমনাংসি জায়তাম্’-মন্ত্রে বলা হয়েছে ‘তোমরা একসঙ্গে চল, এক মন্ত্র বল, একমনা হও এবং পূর্বকালের দেবতারা যেমন সমানভাবে তাঁদের প্রাপ্য অংশ বণ্টন ও গ্রহণ করতেন—তাই কর।’ দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় একে নির্দেশ করেছেন সমকালীন সমাজে শ্রেণীগত ফারাক ঘটে যাবার দ্যোতকরূপে। এ-ব্যাখ্যা অনিবার্যভাবেই মান্য। সাম-ও-যজ্ঞদেবীর ‘সৃষ্টিক্ষম’ রূপ তখন বক্ষ্যা—পূর্বকালের ‘দেবতারা’ নূতন সমাজ-ব্যবস্থায় তখন গড়ে উঠেছেন নূতনতর আর্থনীতিক প্রেক্ষাপটে। পূর্বতন ‘সিদ্ধু’ ধর্ম ছিল মূলত নাগরিক ধর্ম; শ্রেণীবিভাজন সেখানে ছিল অবশ্যই। বৈদিক ধর্ম যখন পরাজিত কোমের গর্ভধারণ দ্বারা গ্রস্ত হয়ে গেল, তখন সেখানেও অনিবার্য হল ঐ শ্রেণীবিভাজন। আর,

সেই পথ ধরে কালক্রমে গড়ে উঠল—সেই ভাবনার মূল অভিব্যক্তি। প্রত্ন-ইতিহাসের ‘সিন্ধু’ ধর্ম পরিণতি পেল—প্রাচীন ইতিহাসে হিন্দুধর্মে। তার পরের ইতিহাস, সবার জানা।।

দ্বিতীয় অধ্যায়

অধ্যাপক দামোদর ধর্মানন্দ কোশাষী তাঁর ‘মিথ অ্যান্ড রিয়ালিটি’ বইতে একটি তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেছেন এই বলে : “The reluctance to admit the primitive roots of Indian religious philosophy and to face the survival of primitive beliefs in the country may stem in part from the normal reaction of the Indian intellectual to the long humiliation of a repressed colonial life which still remains a vividly unpleasant memory.” (P. 10)

অধ্যাপক কোশাষীর এই পর্যবেক্ষণ যথার্থ। বস্তুতপক্ষে প্রাচীন ভারতের আধ্যাত্মিকতা, ধর্মচেতনা এবং তত্ত্বসন্ধিৎসা নিয়ে আমাদের মানসিকতায় এমন একটি স্পর্শকাতর বিহ্বলতা রয়েছে যে, বহু ক্ষেত্রেই আদিম যুগের নানা প্রকরণের ধর্মাচরণের দ্বারা সেগুলি আচ্ছন্ন হয়ে আছে, সেই কথা অস্বীকার করতে পারলে যেন আমরা স্বস্তি লাভ করি!

অথচ ইতিহাসের সাক্ষ্য-প্রমাণ তো ঠিক বিপরীত কথাই বলে। আর্য-হিন্দু ধর্মবিশ্বাসের যে ‘সমুন্নত আধ্যাত্মিকতা’ নিয়ে আমাদের অনেকেই মনে-মনে উচ্ছ্বসিত হই, তারও মধ্যে পূর্ববর্তী প্রাগায় সিন্ধু সংস্কৃতির ধর্মচেতনার আদিমতর প্রকরণগুলিই যে প্রবলতর মূর্তিতে উপস্থিত সেই কথা অবশ্যই অনস্বীকার্য।

প্রাচীন পৃথিবীর সর্বত্রই মানুষের দেব-বন্দনার পিছনে ক্রিয়াশীল ছিল যে-দুটি প্রধান কারণ, তারা হলো : ভয়ের হাত থেকে আত্মরক্ষা এবং উর্বরতার পরিবৃদ্ধি। দেবতাকে তুষ্ট রাখলে তিনি বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করবেন যেমন, তেমনি উদ্বৃত্ত ফসল এবং অধিক সন্তান দান করে গোষ্ঠীর নিরাপত্তা এবং শক্তি বৃদ্ধি করবেন—এই ছিল প্রাচীন মানুষের দেবতা-বন্দনার অবলীন মূল দুটি সংস্কার। ভারতীয় ইতিহাসে এখনো অবধি যে-সভ্যতা প্রাচীনতম বলে গণ্য, সেই সিন্ধু সংস্কৃতির দেব-কল্পনা এবং ধর্মচিন্তার মধ্যেও এই দুই লোকাযত সংস্কারই প্রায় সামগ্রিকভাবে প্রতিভাসিত।

সিন্ধু-সভ্যতা, ইদানীন্তন কালে যা হরাপ্পা-সংস্কৃতি বলে কথিত হয়েছে, তার দেব-কল্পনার মধ্যে আদিমকালের ধর্মবিশ্বাসের সব ক’টি প্রকরণেরই সন্ধান যে খুঁজে পাওয়া যায়, একথা বিশেষভাবে উল্লেখনীয়। বৃক্ষ, পশু, কল্পিত আবাস্তব মূর্তিদারী প্রাণী, অর্ধপশু-অর্ধনর, মানবদেবী এমন কী আবাস্তব-কল্পনাসঞ্চার মানবমূর্তি সম্পন্ন দেবতাদেরও সন্ধান দিয়েছে সিন্ধু-সভ্যতার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সংগৃহীত অজস্র প্রত্নবস্তুগুলি। উর্বরতা-প্রার্থনা, প্রতীক-পূজা, নরবলি, যৌন-আচার-কেন্দ্রিক ধর্মবিধি-

পালন করা ইত্যাদি বিষয়ও হরাদ্বা-সংস্কৃতিতে অপ্রচলিত ছিল না। অদেহী এক ঈশ্বরের কল্পনা অবশ্য আরো পরের কথা : ঋক্বেদের অন্যতম অর্বাচীন অংশ বলে স্বীকৃত দশম মণ্ডলের পূর্বে সেই ধরনের প্রাণসর ধর্মচেতনার সন্ধান পাওয়া যায়নি।

সিদ্ধু-সংস্কৃতির যতগুলি ছোটবড় জ্ঞানপদের প্রত্নতাত্ত্বিক ভগ্নাবশেষ খুঁজে পাওয়া গেছে, তাদের কোনোটির মধ্যেই মন্দির বা সর্বজনীন কোনো উপাসনালয়-জাতীয় কিছু মেলেনি। হরাদ্বা, মহেঞ্জোদাড়ো, লহমজোদাড়ো, চনহুদাড়ো, সুতকাজেনদাড়ো, রোপার, লোথাল—কোনো অঞ্চলই এর ব্যতিক্রম নয়। মহেঞ্জোদাড়োর সর্বজনীন স্নানাগারটিকে সূর্য-উপাসনার ক্ষেত্র বলে নির্দেশ করেছেন কেউ-কেউ, কিন্তু উপযুক্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ নেই সে ধারণার পিছনে। এর থেকে একটি জিনিস মেনে নেওয়া হয়ত যেতে পারে যে, হরাদ্বা-সংস্কৃতিতে ধর্মাচরণ রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক পর্যায়েবদ্ধ ছিল না : বিষয়ীভূত ছিল পারিবারিক কিংবা ব্যক্তিগত স্তরে।

কিন্তু সেই সুদূর প্রাগৈতিহাসের কালে তা কি আদৌ সম্ভবপর ছিল? দেবালয় বা বৃহৎ দেবমূর্তি খুঁজে পাওয়া যায়নি ঠিকই, কিন্তু যে-অজস্রসংখ্যক শীলমোহর হরাদ্বা-সভ্যতার বিভিন্ন কেন্দ্রের ভগ্নাবশেষ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে, তাদের সাক্ষ্য তো সম্পূর্ণ বিপরীত। একাধিক শীলমোহর পাওয়া গেছে, যাদের মধ্যে গোষ্ঠীগতভাবে কোনো-এক বিশেষ ধর্মবিধি পালনের চিত্র অঙ্কিত রয়েছে। একটি মোহরেরই দুপাশে উৎকীর্ণ দুটি ছবির একটিতে দেখা যাচ্ছে যে, বিবসনা এবং শ্লথকেশা একটি নারীমূর্তি দুহাত তুলে প্রাণভিক্ষার জন্য আবেদন করছে এবং একটি নগ্নদেহী পুরুষ কাস্তে-জাতীয় কিছু একটা হাতে নিয়ে তাকে বধ করতে উদ্যত। অন্য পাশে দেখছি, নগ্ন নারীমূর্তির জরায়ু থেকে জন্মগ্রহণ করেছে একটি ফলবন্ত বৃক্ষ। উভয় চিত্রেই ঠিক একই লিপি (ঋক্বেদজো যথার্থভাবে অপঠিত), যাদের মধ্যে একটি চিত্রকে অন্তত ভারবহনকারী মানুষের মূর্তি হিসেবে গণ্য করা যায়।

স্পষ্টতই, এই চিত্রদুটি উর্বরতার প্রার্থনাসম্পৃক্ত অভিচারকে ব্যঞ্জিত করছে। নগ্নদেহা নারীকে কৃষিক্ষেত্রে নিয়ে গিয়ে হত্যা করার (বা বলি দেওয়ার) মাধ্যমে ক্ষেত্রের উর্বরতাশক্তি বৃদ্ধি পায়—এই বিশ্বাস পৃথিবীর বহু প্রাচীন জাতিকোমগুলির মধ্যে ছিল। এই শ্লথকেশা, বিবসনা, উর্ধ্বমুখ, উর্ধ্ববাহু নারীমূর্তির প্রাণভিক্ষার ছবি নব্যপ্রস্তরযুগের অনেক সভ্যতার প্রত্নাবশেষ থেকেই পাওয়া গেছে। তাম্র-প্রস্তর পর্বের সভ্যতা ঋক্বেদ-সংস্কৃতিও এর ব্যতিক্রম নয়। কাস্তে-জাতীয় একটি বস্তুর দ্বারা নারীর শিরশ্ছেদন একপিঠে, এবং অন্যপিঠে নারীর (এক্ষেত্রে অবশ্যই ভূ-দেবীর) জরায়ু থেকে ফলন্ত বৃক্ষের উদ্ভব হওয়ার এই যে-দুটি চিত্র এই মোহরটিতে খোদিত হয়েছিল, এ তো আর যাই হোক, বৃহত্তর গোষ্ঠী-চেতনাবর্জিত হতে পারে না! একক বা পারিবারিক ধর্মচেতনায় এ ধরনের ‘সর্বমাস্তলিক’ প্রকরণ আচরিত হয় না। আদিমকাল থেকেই নরবলির (বা নারীবলির) মাধ্যমে দেবী পৃথিবীকে তুষ্ট করে শস্য এবং খাদ্যসম্ভারকে প্রচুরভাবে পাওয়ার অভীক্ষা মানবসমাজে প্রচলিত এবং সেই

অভীঙ্গা সর্বদাই গোষ্ঠীভিত্তিক।

এই ধরনের ‘ফাটিলিটি-কাল্ট’-এর পরিচারণের সঙ্গে যে-যৌন-অভিচার-বিধিও যুক্ত থাকত অধিকাংশ ক্ষেত্রে, তারও অন্তর্নিহিত প্রেরণাটা ছিল গোষ্ঠীর মঙ্গল কামনায় অধিক সন্তান চাওয়া। প্রায়ক্ষেত্রেই, ‘ফাটিলিটি-কাল্ট’ সম্পৃক্ত নারীবলির প্রাক্কালে যৌন-আচারবিধি পালন করা হতো বধ্য নারীটির সঙ্গে ঐ কারণেই ; আদিম মানুষের বিশ্বাস ছিল যে এর ফলে শস্যের সঙ্গে সঙ্গে সন্তানেরও ফলন হবে ব্যাপক হারে! মহেঞ্জোদড়ো থেকে পাওয়া এই শীলমোহরের দু’পাশে অঙ্কিত দুটি নগ্ন নারীমূর্তিও ঐ যৌন-আচারবিধির দ্যোতক। অর্থাৎ এক্ষেত্রেও যে-ধর্মবিধি-পালনের চিত্র এখানে অঙ্কিত আছে, তার মৌল প্রেরণাটিকে গোষ্ঠীগত, বা সামাজিক বলেই গণ্য করতে হবে।

এই রকমের ‘ফাটিলিটি-কাল্ট’ বা উর্বরতা-প্রার্থনা-বিধি-সংশ্লিষ্ট আর একটি মোহরে উৎকীর্ণ দেখা যাচ্ছে যে, অশ্বখ গাছের ওপরে নগ্ন নারীমূর্তি, গাছের তলায় একটি নগ্ন পুরুষমূর্তি করজোড়ে প্রার্থনার ভঙ্গীতে উপবিষ্ট, তার পিছনে একটি বৃহদাকার মেঘ এবং সামনে একটি যুপকাষ্ঠ, এবং এই বৃক্ষ-নারী-পুরুষ-যুপ-মেঘের সামনে সাতটি সবস্ত্রা নারী। এখানে সর্বজনীন মঙ্গল-অভিপ্রায় আরো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে সপ্ত (যাদুবিশ্বাসসূচক সংখ্যা) মূর্তির উপস্থিতিতে। যুপকাষ্ঠ বলির ব্যঞ্জনাবাহী। নগ্ন নারী ও পুরুষমূর্তি স্পষ্টতই যৌন-আচার-বিধির সূচক। অশ্বখবৃক্ষ বৃক্ষোপাসনার প্রকরণসম্পর্কিত : সে আলোচনায় পরে আসছি।

সিন্ধু-সভ্যতায় যৌন-আচার-বিধি-কেন্দ্রিত ধর্মচিন্তার একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল। ঋগ্বেদের অন্তত দুটি শ্লোকে (৮/২১/৫ এবং ১০/৯৯/৩) কৃষ্ণবর্ণ দাস জাতিকে (অর্থাৎ সিন্ধু জনকোমকে) “শিশ্নুদেবাঃ” বলে দিক্কার দেওয়া হয়েছে। লিঙ্গপূজা ও যোনিপূজার বহু প্রত্ননিদর্শ খুঁজে পাওয়া গেছে হরাপ্পা, মহেঞ্জোদড়ো এবং অন্যান্য সিন্ধু-জনপদের ধ্বংসাবশেষ থেকে। এক অর্থে, এও ঐ ফাটিলিটি কাল্টের বিষয়ীভূত। পোড়ামাটির নির্মিত পৃথুলোদরা স্থূলস্তনী যেসব ক্ষুদ্রায়তন নারীমূর্তি পাওয়া গেছে বিভিন্ন সিন্ধুনগরে, সেগুলিও ‘ফাটিলিটি-কাল্ট’ সম্পর্কিত। প্রত্নতত্ত্ব এবং লোকবৃত্তের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে এই ধরনের মূর্তিমাট্রেই ‘মাতৃকামূর্তি’ (গর্ভবতী নারীর মূর্তি) বা ‘মাতৃকা দেবতা’ রূপে সর্বজনীনভাবে স্বীকৃত।

মহেঞ্জোদড়ো-হরাপ্পা-সংস্কৃতি বিলুপ্ত হয়ে যাবার বহু শতাব্দী পরেও যে সিন্ধু ও আরটু (পশ্চিম পাঞ্জাব) অঞ্চলের জনকোমগুলির মধ্যে উর্বরতাকেন্দ্রিক যৌন আচার-বিধির প্রচলন ছিল, ‘মহাভারত-এর কর্ণপর্বের ৪৫তম অধ্যায়ে তার উল্লেখ দেখা যায়। শুধু এইটুকুই নয়, সিন্ধুসংস্কৃতির দেব-কল্পনার অনেকাংশই পরবর্তীকালের আর্য-হিন্দুসংস্কৃতির মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিল। যে-“মুরদেবাঃ” অর্থাৎ মূর্তি উপাসকদের সম্বন্ধে ঋগ্বেদে বহুবিধ নিন্দাবাদ করা হয়েছে (৭/১০৪/২৪ ও ১০/৮৭/১৪), তাদেরই অনুসরণে আর্য-ধর্মচেতনার মধ্যেও মূর্তিপূজার সর্বব্যাপী প্রচলন শুরু হয়ে গিয়েছিল খ্রিস্ট জন্মের বহু শতাব্দী আগেই। বৈদিক-সংস্কৃতির

অশুভাচারী দেবতাকুল, যথা ইন্দ্র (বহু বিশেষজ্ঞের মতেই অবশ্য আদিতে ইন্দ্র 'দেব' ওথা আর্যভাষী যাযাবরদের গোষ্ঠীনেয়ক), অগ্নি, সূর্য, মিত্র, বরুণ, মরুৎ, যম, পুশ্য প্রভৃতির স্থান অধিকার করলেন শিব, ব্রহ্মা, বিষ্ণু প্রমুখ। ঋগ্বেদে বিষ্ণুর উল্লেখ থাকলেও তিনি অমূর্ত এবং নিম্নবর্গীয় দেবতা। মূর্তিহীন ঋগ্বেদীয় রুদ্র সমাবৃত হয়ে গেলেন প্রাগাৰ্য্য সিন্ধুজন-উপাস্য পশুপতি শিবের সঙ্গে। গৌণরূপে গণ্য ঋগ্বেদীয় নারী-দেবতা অদिति ও উষার পরিবর্তে মূর্তিধারিণী মুখ্য স্ত্রী-দেবতাদের (যথা চণ্ডী, শক্তি) ব্যাপক প্রসার ও প্রচলন ঘটল বৈদিক-পরবর্তীকালের আর্য-হিন্দুসমাজে।

পশুপতিরূপী ত্রিমুখ শিবের একাধিক মোহর মহেঞ্জোদড়ো এবং অন্যান্য সিন্ধুজনপদে খুঁজে পাওয়া গেছে। যোগাসনে উপবিষ্ট ত্রিমুখ দেবতার মাথার ওপরে দেবত্বসূচক মহিষশৃঙ্গ, তাঁকে ঘিরে রয়েছে হাতি, গণ্ডার, বাঘ, মহিষ এবং ছাগল ; লিপি-সঙ্কেতের মধ্যে অশ্বখ (বা পিঙ্গল) গাছের এবং মাছের চিহ্ন সুস্পষ্ট। পশুকুল পরিবৃত দেবমূর্তির এই মোহরটি ছাড়াও, আরও একাধিক মোহর পাওয়া গেছে যেখানে যোগাসনে আরুঢ় ত্রিমুখ দেবতার মূর্তি উৎকীর্ণ রয়েছে। বিশেষজ্ঞরা এই দেবতাকে আদিতম শিবমূর্তিরূপে গণ্য করেছেন এবং যোগসাধনারও প্রাচীন হৃদিশ এই বিশিষ্ট ভঙ্গীর আসনারুঢ় মূর্তি থেকেই পাওয়া যায় বলে মনে করা হয়। পশুপতির এই বিশেষ ভঙ্গিমাটিকে কুর্মাশন হিসেবে গণ্য করা চলে।

পরবর্তীকালে এই শিব একদিকে যেমন বৈদিক রুদ্রের সঙ্গে একত্রে সমন্বিত হয়েছেন, অন্যদিকে সিন্ধুজনের লিঙ্গপূজা এবং যোনিপূজার বিধিও তার সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে আর্য-হিন্দুসমাজে। দুয়েকজন সিন্ধুতত্ত্ববিদ তত্ত্বসাধনার আদি-উৎস হিসেবেও সিন্ধু-সভ্যতাকে নির্দেশ করেছেন। সিন্ধুতত্ত্বোক্ত বিভিন্ন চক্র, চিহ্ন ইত্যাদির সঙ্গে সিন্ধুলিপির কোনো-কোনো চিহ্নের সাযুজ্য থাকার জন্য। মাতৃকাদেবীর উপাসনাই যে শক্তিসাধনায় রূপান্তরিত হয়েছিল, এমনও মনে করেন তাঁরা। নগ্নিকা মাতৃকা মূর্তিই যে কালিকা-মূর্তির পূর্বসূত্র এ রকম সিদ্ধান্তও করেছেন এঁদের কেউ-কেউ।

কিন্তু এতদূর পর্যন্ত এগিয়ে সিদ্ধান্ত করার মতো উপযুক্ত প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ এখনো অনায়াস্ত। বরং, সংযত-সিদ্ধান্ত হিসেবে এটুকুই গ্রহণ করা চলে যে, শিবসাধনা হিন্দুধর্মে উৎসারিত হয়েছে হরাদ্বীপ-মহেঞ্জোদড়োর সভ্যতা থেকেই, তারই অনুবঙ্গ রূপে শিবলিঙ্গ ও গৌরীপট্টের পূজাবিধিও প্রচালিত হয়েছে এবং স্ত্রী-দেবতার উপাসনাও পৌরাণিক হিন্দুসংস্কৃতিতে ঐ সভ্যতা থেকেই সঞ্চারিত। পরবর্তী অধ্যায়ে শিব নামক এই বিশিষ্ট দেবতার বিস্তৃত আলোচনা প্রসঙ্গে দেখানো হয়েছে যে, অনামা ঐ 'সিন্ধু রাষ্ট্রের' প্রধান দুটি শহরই পরিচিত হয়েছে শিবের নামে ; এবং সেই পরিচয়ের আদি-উৎস বহু প্রাচীন, ঐ রাষ্ট্রের সম্ভবত সমসাময়িকই। এর থেকে তো একটি সিদ্ধান্তই অনিবার্য হয়ে ওঠে : সিন্ধু জনকোমের অন্যতম প্রধান ধর্মধারা ছিল শিব-উপাসনা এবং শিবের বাহনরূপে বৃষেরও একটা বিশেষ স্থান ছিল সেখানে। সম্ভবত বৃষই ছিল প্রধানতম কুল-প্রতীকী পশু বা 'টোটম'।

সিদ্ধ-সংস্কৃতিতে ককুদবান্ বৃষের একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল যে, সে তথ্য বিভিন্ন মোহর ইত্যাদির মধ্যে বৃষচিত্রের প্রাচুর্য দেখেই বোঝা যায়। অন্যান্য প্রাণীর মধ্যে হাতি, গণ্ডার, বাঘ, মহিষ, মেঘ, কচ্ছপ, সাপ, কুমীর, বাঁদর প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মোহর এবং পোড়ামাটির পুতুল, দুইভাবেই এদেরকে দেখতে পাওয়া গেছে। শুধুমাত্র পোড়ামাটির পুতুলরূপেই দেখতে পেলে নিছক খেলনা বলে এদেরকে হয়ত মনে করা চলত ; কিন্তু ঐ মোহরগুলি উৎকীর্ণ হয়েছিল অবশ্যই বিশেষ-বিশেষ প্রয়োজন সাধনের উপলক্ষে, সেজন্যে তাদের মধ্যে এত ব্যাপকভাবে পশুমূর্তির ব্যবহার ; নিঃসন্দেহে সিদ্ধ-সংস্কৃতিতে পশুর গুরুত্বপূর্ণ একটি স্থানকেই সূচিত করে এই ব্যাপারটি।

অর্ধ-পশু-অর্ধ-নর মূর্তি এবং একাধিক পশুর একত্রে সমন্বিত অদ্ভুতদর্শন মূর্তিও খুব কম নয়। নিজেদের গোষ্ঠীর আদি পিতা হিসেবে যে বিভিন্ন প্রাণীকে কল্পনা করতেন আদিম/প্রাচীন মানুষেরা, তাঁদের উত্তরপুরুষদের চিন্তায় সেই প্রাণীর সঙ্গে মনুষ্যমূর্তির সংমিশ্রিত একটা রূপ সৃষ্টি হয়েছে স্বাভাবিকভাবেই। চিত্রের অর্ধ-ব্যাঘ্র-নর মূর্তিটি লক্ষণীয় এ প্রসঙ্গে। এই ধরনেরই আর একটি অদ্ভুতদর্শন মূর্তি হল চিত্রের অশ্বথবৃক্ষ থেকে উদ্গত দুইমাথাওয়ালা কল্লিত জন্তুটি। জীববিদ্যা সম্পর্কে জ্ঞান বিকশিত হবার আগে অবধি আধুনিক মানুষের মনে একাধিক ভিন্ন প্রজাতির পশুর সংমিশ্রণজাত সম্পূর্ণ নূতন পশুর সৃষ্টি হওয়া সম্ভব এমন সংস্কার বদ্ধমূল ছিল বহু ক্ষেত্রেই।

শৃঙ্গবিশিষ্ট শিবমূর্তিটি (চিত্র : ৩) পুনরুৎপাদিত। হরান্নায় শৃঙ্গবিশিষ্ট মানবমূর্তি পাওয়া গেছে, এমন কি ব্যাঘ্রমূর্তিও। ছাগলের লেজ, বাঘের পিছনের পদযুগল, মেঘের দেহ এবং সম্মুখের দুটি পা, মহিষের শিং, হাতির গুঁড় এবং মানুষের মুখ একত্রিত করে একটি বিচিত্র ফলক পাওয়া গেছে ঐ হরান্নরাতেই। সম্ভবত, এটি বিভিন্ন ‘টোটেম’-সম্পন্ন গোষ্ঠীর একত্রে সংমিশ্রিত হবার ইঙ্গিতকেই সূচিত করছে। ঠিক এভাবে উৎকীর্ণ না-হলেও, আর একটি বহু ‘টোটেম’ মিশ্রণের ব্যঞ্জনাও মহেঞ্জোদড়োর শীলমোহরে আছে : বাঘ, সাঁড়, হাতি, গণ্ডার এবং একটি শিশু পাশাপাশি বিন্যস্ত হয়েছে সেখানে।

মাতৃকামূর্তির মতো, এধরনের অদ্ভুত কল্পনাজাত মূর্তিও সিদ্ধুর সমসাময়িক বা অচির-পূর্ববর্তী মেসোপটেমীয় সংস্কৃতির বিভিন্ন পর্যায়ে খুঁজে পাওয়া যায়। একটি মোহরে সুমেরীয় উপকণ্ঠার শৃঙ্গ-লাঙ্গুলবিশিষ্ট নরদেহধারী এক্সিডুর অনুরূপ একটি প্রাণীকে দেখা যায়। সিদ্ধুর দেবদেবীদের সঙ্গে প্রতিবেশী পশ্চিম এশিয়ার প্রাচীন দেবদেবীদের সাদৃশ্য থাকাটা খুব বিচিত্র কিছু নয়। পশ্চিম এশিয়ার একশৃঙ্গী ‘ইউনিকর্ন’-জাতীয় কল্লিত অদ্ভুত মূর্তিও সিদ্ধু-সংস্কৃতিতে সুপ্রচুর। দুটি সিংহের সঙ্গে এক্সিডুর প্রভু গিলগামেশের যুদ্ধ করার যে-কাহিনী প্রচলিত আছে সুমেরীয়ায়, ঠিক তারই অনুরূপ দুটি বাঘের সঙ্গে যুদ্ধরত একটি মানুষের মূর্তিও একটি মোহরে উৎকীর্ণ।

সিদ্ধ সংস্কৃতির দেবকল্পনার দেশতম প্রকরণ হল বৃক্ষোপাসনা, বিশেষতঃ অশ্বখগাছের উপাসনা। অশ্বখ বৃক্ষের ছবি অজস্র শীলমোহরে খোদিত হয়েছে এমনভাবেই যে, সিদ্ধ-সংস্কৃতিতে ঐ গাছের বিশিষ্ট একটি স্থানের বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকে না। সুনিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে পরবর্তী আর্য-হিন্দু সংস্কৃতিতে অশ্বখবৃক্ষের যে-বিশেষ মর্যাদা দেখা গেছে, তারও উৎস শৈব ও শাক্ত ধর্মোপাসনার মতো, সিদ্ধ-সংস্কৃতিই।

ব্যাবিলনীয় সভ্যতার 'জীবনতরু'-র সঙ্গে কোনো-কোনো বিশেষজ্ঞ সিদ্ধ সংস্কৃতির অশ্বখগাছের তুলনা করেছেন। খুব দুরাশ্রয়ী তুলনা নয়। অশ্বখ, পরবর্তীকালের আর্য-হিন্দুসমাজে ব্রহ্মতরু এবং বৌদ্ধসমাজে বোধিবৃক্ষরূপে গণ্য হয়েছে। গীতার বিভূতিযোগ অধ্যায় এবং কোনো-কোনো পুরাণে অশ্বখকে ঈশ্বরের সঙ্গে অভিন্নরূপেই কল্পনা করা হয়েছে। আদিম বৃক্ষোপাসনার উপরে পরবর্তীকালীন এই সুসংস্কৃত অধ্যাত্মচেতনার অভিক্ষেপণ নিঃসন্দেহে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

অশ্বখগাছের সামনে বিরাট পান-পাত্র জাতীয় একটা কিছু রেখে নতজানু ও করজোড় অবস্থায় বৃক্ষবন্দনারত মানুষের মূর্তি একটি মোহরে উৎকীর্ণ আছে। অশ্বখারুড়া বৃক্ষদেবীর মূর্তিও কল্পিত হয়েছে একাধিক শীলমোহরে। চনহুদডোতে পাওয়া একটি মোহরে দেখা গেছে মাঝে একটি অশ্বখগাছকে রেখে এক হাত দিয়ে সেটিকে স্পর্শ করে অন্য হাতটি কোমরে বেঁধে বিশেষ ভঙ্গীতে দুই পুরুষমূর্তি (পুরোহিত?) পরস্পরের সম্মুখীন হয়ে আছে। এটিও কোনো ধরনের পূজাবিধির সূচনা অবশ্যই।

পরবর্তীকালে ধীরে-ধীরে যখন 'হিন্দু' ধর্ম গড়ে উঠেছে, তার মধ্যে মিলেমিশে একাকার হয়ে থেকেছে পূর্বতন এই সমস্ত ধর্মধারা এবং প্রতীতি। নিছক জীবনধারণের প্রয়োজনে বিচিত্র আচার-সংস্কার যেমনভাবে বিশ্বের সমস্ত সংস্কৃতিবলেই গড়ে উঠেছে, সিদ্ধ জনকোমগুলির ক্ষেত্রেও তার ব্যত্যয় ঘটেনি। আর বৈদিক আর্যভাষীদের ধর্মধারাগুলিও ছিল সেই বিশ্বজনীন নিয়মেরই অধীন। ফলত, পরে 'হিন্দু' ধর্মের প্রাণসঞ্চার ঘটলে, তার কারণ স্বরূপ কোনো আধ্যাত্মিক, অতীন্দ্রিয়, ঐশী শক্তিই যে ছিল না—ছিল নেহাৎ, নিছক বেঁচে থাকবার অভীষ্টাই, বক্তব্য এইটেই।

ধর্ম, যেখানে ‘তলোয়ার পৌঁছয় না’

জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়

বইমেলায় মাঠে একবার এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখেছিলাম। জনাকয়েক তরুণতরুণী একটি পত্রিকার পাতার ওপর প্রবল উদ্যমে দাপাদাপি করছে এবং গলার শিরা ফুলিয়ে চিৎকার করছে; ‘মৌলবাদ নিপাত যাক!’ পদদলিত পত্রিকাটি মুম্বাই থেকে প্রকাশিত শিবসেনার মুখপত্র ‘সামনা’। পত্রিকাটি কীভাবে ওদের হাতে এবং শেষ পর্যন্ত ওদের পদতলে পৌঁছেছিল জানি না। কিন্তু দৃশ্যটি অনেকেরই মনে কীভাবে কৌতুক সৃষ্টি করেছিল।

অনেকদিন আগে আরেকটি দৃশ্য দেখেছিলাম। আমার এক আত্মীয়, ভয়ংকর নাস্তিক, তাঁর কিশোরী কন্যার খেলার সামগ্রী গল্পের বইটাই-এর মধ্যে ফ্রেমে বাঁধানো কালীমাতার একটি ছবি আবিষ্কার করে ভীষণ রেগে গিয়েছিলেন। রাগে প্রায় অন্ধ হয়ে কন্যার মুখের দিকে একবারও না তাকিয়ে ছবিটির কাঠের ফ্রেম, কাচ ভেঙেচুরে ছবিটি ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন উঠানে। তাঁর কন্যা প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে। ছবিটি তুলে নিয়ে বুকে আঁকড়ে ধরে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠেছিল। তার অশ্রু নাস্তিক পিতার ক্রোধ দমন করতে পারে নি, বরং উস্কেই দিয়েছিল। পরবর্তীকালে বিবাহোত্তর জীবনে সেই কন্যার কালীভক্তি ছিল কিনা, থাকলেও কী চেহারায় ও তীব্রতায় ছিল জানি না, তবে তার নাস্তিক পিতৃদেব প্রৌঢ়ত্বে পা দিয়েই দেওঘরের এক বাবার শরণ নেন এভং তাঁর চরণে মাথা রেখেই বাকি জীবন অতিবাহিত করেন। দেখে শুনে কন্যা নিশ্চয়ই কিছু কৌতুক অনুভব করে থাকবে। জীবনের ভাঁড়ারে আর যে অভাব থাক মজার কোনও অভাব নেই!

যত দিন যাচ্ছে ততই নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মাচ্ছে, সর্বম অত্যন্তম গর্হিতম। বাড়াবাড়ির ফল প্রায় অনিবার্যভাবেই উলটে ফলে। আর পাঁচটা ব্যাপারেও ফলে ধর্মের ক্ষেত্রেও ফলে।

ধর্মের ইংরিজি করা হয় ‘রিলিজিয়ন’, যদিও ইংরিজি শব্দটি ‘ধর্ম’কে ধারণ করার পক্ষে একটু ছোটই। সংস্কৃত কলেজ প্রকাশিত এবং গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় ও গোপিকামোহন ভট্টাচার্য কৃত ত্রি-ভাষা (সংস্কৃত বাংলা ইংরিজি) অভিধানে বলা হয়েছে ধর্ম-র (ধু-মন) অর্থ হলো শুভাদৃষ্ট, পুণ্য, শাস্তাচার, সংকর্ম, যজ্ঞ, স্বভাব, গুণ, রীতি ইত্যাদি। এ অর্থ রিলিজিয়নের নয়। অক্সফোর্ড অভিধানে রিলিজিয়নের নানা অর্থ করা হয়েছে। সেগুলির মধ্যে সম্ভবত প্রধানতম ও সর্বাপেক্ষা প্রচলিত

অর্থটি হলো : Action or conduct indicating a belief in, reverence for and desire to please, a divine ruling power ; the exercise or practice of rites or observances implying this.....also religious rites.

ধর্ম'র শুভাদৃষ্ট, পুণ্য ও শাস্তাচার যেন এই সংজ্ঞার মধ্যে খানিকটা পাওয়া গেল। বাকিগুলি এল না, যদিও এটাও ঠিক আমরা প্রচলিত অর্থে ধর্ম বলতে অক্সফোর্ডের সংজ্ঞাটির মতোই কিছু একটা বুঝি এবং সাধারণ মানুষ ধর্মকে এভাবেই দেখে, মানে ও চর্চা করে।

ত্রিভাষা অভিধানে নাস্তিকতারও সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। 'নাস্তি=অবিদ্যমানতা, না থাকা। নাস্তিক=যাঁহারা বেদের প্রামাণ্য, ঈশ্বর বা পরলোক স্বীকার করেন না। নাস্তিকতা=বেদের প্রামাণ্য, ঈশ্বর বা পরলোকের অস্বীকার।' এখানে ধর্মার্থে 'divine ruling power' যেন শুধু উঁকি মারছেন না, মঞ্চের একেবারে সামনে এসে মান্যতা দাবি করছেন।

বস্তুতপক্ষে 'নাস্তিকতা'-র এই অর্থই গৌতম বুদ্ধ বিদ্রোহ করে বৌদ্ধধর্ম স্থাপন ও প্রচার করেছিলেন। তাঁর ধর্ম ছিল 'নাস্তিকের ধর্ম'। সে ধর্ম বেদের প্রামাণ্যকে অস্বীকার করে, ঈশ্বরের (divine ruling power) অস্তিত্বকে নস্যাৎ করে, পরলোককে অগ্রাহ্য করে মানুষের ধর্মের কথা প্রচার করেছিল।

তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো, 'তুমি কি ঈশ্বর?' তিনি বললেন, 'না। 'তুমি কি দেবদূত?' তিনি উত্তর দিলেন, 'না'। 'তবে তুমি কি সন্ত?' এর উত্তরেও তিনি বললেন 'না'। 'তবে তুমি কী?' তিনি বললেন 'আমি জাগ্রত।'

মানুষের জাগরণ ও চেতনার কথাই গৌতম বুদ্ধের সব মন্ত্রের মূল। মানুষই সেখানে সব। মানুষই সেখানে ঈশ্বর। সব মানুষই সমান। এবং সব বোঝাপড়া, হিসেব নিকেষ ইহলোকেই শেষ। রাজন্যবর্গের সহায়তায় ব্রাহ্মণ্যবাদের পীড়ন ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে গৌতমের বাণী ছিল ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাসে বৃহত্তম ও মহত্তম প্রতিবাদ ও বিদ্রোহ, লক্ষ মানুষের হৃদয় স্পর্শ করা মানবধর্মের এক মহান বার্তা।

বেদ ও উপনিষদের জ্ঞান এবং রামায়ণ ও মহাভারতের মূল্যবোধ যে দেশে শত শত বছর ধরে মানুষের মন ও মননকে বৃদ্ধি করেছে, ধর্ম-র অর্থ এবং শব্দটির ব্যবহার ও চর্চা এবং তার ব্যাখ্যা সেখানে কিঞ্চিৎ জটিল হতেই পারে।

বাড়ি পৌঁছে রিকশাওয়ালাকে যে-ভাড়া দিলাম তা অন্যায্য মনে হলে সে যখন বলে, 'আপনার মতো লোকের কি এটা ধর্ম হলো', তখন সে কোনও 'বেদের প্রামাণ্য, ঈশ্বর, পরলোক, অথবা 'ডিভাইন রুলিং পাওয়ারের কথা বলে না। বলে ন্যায়, নীতি, বিচারবোধের কথা, এবং সম্ভবত আমার স্বভাব সম্পর্কে তার ধারণার কথা। ধর্ম শব্দটি তার গর্ভে বৃহৎ অর্থে নানা সামাজিক ও মানবিক মূল্যবোধ ধারণ করে আছে, অন্তত রামায়ণ-মহাভারতের এই দেশে।

আবার ছোট অর্থে এ শব্দের তেজ ও জ্বালা ভয়ংকর, একেবারেই অন্যরকম। শত মূল্যবোধ ও মানবতার কথা বলেও সে তখন ঈশ্বরের নামেই অসুর হয়ে ওঠে। নির্বাণের নামেই স্থূল ও ক্রুর হয়ে যায়, দেবতার নামে অমৃতের পুত্রকে গরল দেয়। ধর্ম এ-বিশ্বে যত অধর্ম করেছে তেমন আর-কেউ বা আর-কিছু করে নি।

মানুষের অসহায়তার সুযোগ নিয়ে ধর্মের নামে, ধর্মকে ব্যবহার করে দেশে দেশে যুগে যুগে মানুষের সঙ্গে যথেষ্টাচার করা হয়েছে। অশেষ লাঞ্ছনা, বঞ্চনা ও যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়েছে তাকে। আজও করতে হচ্ছে। এদেশে ধর্মের দণ্ড ব্যবহার করে জাতিভেদ প্রথা সৃষ্টি ও প্রতিষ্ঠা করে লক্ষ লক্ষ দলিতকে যে অসম্মান ও বেদনার জীবন যাপনে বাধ্য করা হয়, শত শত বছর ধরে করা হচ্ছে, তার তুলনা মেলা ভার।

অশিক্ষা, কুসংস্কার ইত্যাদির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে মানুষের মন ও আত্মাকে মুক্ত করার অঙ্গীকার করেই প্রত্যেক ধর্মের যাত্রা শুরু। ‘তোমার হৃদয়ে যে আলো আছে তা যদি অন্ধকারে পরিণত হয় তবে বড় ভয়ংকর সে অন্ধকার।’ সেই অন্ধকার দূর করাই সব ধর্মের ঘোষিত লক্ষ্য ও সাধনা। বাস্তবে হয় উলটো। ঈশ্বরের নামে, ধর্মের নামে কুসংস্কারকে শুধু প্রশ্রয় দেওয়া হয় না, প্রায়শই তাকে লালন-পালন করা হয়। এদেশে গড়ে প্রতিদিন দু’টি করে মানুষকে ‘ডাইনি’ ঘোষণা করে হত্যা করা হয়। ধর্মের নামে দাঙ্গায় গড়ে প্রতিদিন তিনজন করে মানুষ খুন হয়ে যায়। ১৯৯২সালের ৬ ডিসেম্বর অযোধ্যায় বাবরি মসজিদ ধ্বংস করে দেওয়ার পর ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দু মৌলবাদীরা কত মসজিদ ও গীর্জা আক্রমণ করেছে, ধ্বংস ও ক্ষতিগ্রস্ত করেছে, কত মৌলবী, যাজক-যাজিকাকে আক্রমণ আহত, ধর্ষণ ও হত্যা করেছে তা লিখতে গেলে তালিকা দীর্ঘই হবে।

শুধু এদেশে নয়, দেশে দেশে চলেছে এই কাহিনীরই পুনরাবৃত্তি। তার চেয়ে বেশি। ক্যাথলিক ধর্মের রাজধানী ভ্যাটিকানের ধারণা ও সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে গ্যালিলিও একটি সত্য উচ্চারণ করেছিলেন। বলেছিলেন, পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে না সূর্য। সূর্য স্থির। পৃথিবীই নির্দিষ্ট কক্ষপথে প্রদক্ষিণ করে সূর্যকে। একথা বলার জন্যে গ্যালিলিওকে কী নির্মম শাস্তি পেতে হয়েছিল তা সকলেরই জানা। পোপ থাকেন পৃথিবীর কেন্দ্রে, ভ্যাটিকানে। বলা যায়, ঈশ্বর, তাঁর পুত্র এবং ‘হোলি গোস্ট’ সবাই সেখানেই বিরাজ করেন। তাঁদের এবং তাঁদের বাসস্থান পৃথিবীকে কেন্দ্র করেই তো ঘুরতে হবে এবং ঘুরে থাকে সূর্য-চন্দ্র-গ্রহ-নক্ষত্র, সমস্ত সৌরজগৎ। সূর্য কি পোপের চেয়ে বড় যে তাকে কেন্দ্র করে পোপকে ঘুরতে হবে? পোপ, ধর্ম, ঈশ্বরকে অবমাননার দায়ে শাস্তি পেতে হয়েছিল গ্যালিলিওকে।

শত শত বছর পরে বহু ‘লেখাপড়া-গবেষণা’র পর গত শতাব্দীর শেষভাগে পোপের বৈজ্ঞানিক-দার্শনিকরা পুরাতন সিদ্ধান্ত বাতিল করে ঘোষণা করেন, গ্যালিলিও-ই ঠিক বলেছিলেন। পুরাতন সিদ্ধান্ত তো শুধু গ্যালিলিও ও তাঁর কাছের

জনদেরই যন্ত্রণা দেয় নি। বিজ্ঞানচর্চার ওপরেই আঘাত হেনেছিলো বিশাল।

যীশু প্রচার করেছিলেন দয়া-মায়া-প্রেম ও ক্ষমার ধর্ম। তার জন্যে তাঁকে প্রাণ দিতে হয়েছিল। তাঁর অসংখ্য অনুগামীকে অশেষ লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়েছিল তখনকার শাসকশ্রেণীর হাতে। বহু মানুষের প্রাণ গিয়েছিল। এক সহস্রাব্দেই যীশুর সেই প্রেম, দয়া ও ক্ষমার ধর্মের অন্তর্জ্বলি ঘটে গেল। জল থেকে উঠে এল যেন এক দানব। ইওরোপ থেকে খৃষ্টধর্ম একাদশ, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দী জুড়ে তিন শ বছর ধরে যে ধর্মযুদ্ধ চালিয়েছিল, তাতে মারা পড়েছিল নানা ধর্মের হাজার হাজার মানুষ। যুগের পর যুগ ধরে জ্বলেছিল যুদ্ধের আগুন, দুই মহাদেশে। এই ‘ক্রুশেড’ বা ধর্মযুদ্ধের লক্ষ্য ছিল অতি ‘মহান’। মুসলমানদের হাত থেকে পবিত্রভূমি পুনরুদ্ধার করা। খৃষ্টধর্মের জন্মভূমি দখলে রয়েছে বিধর্মী মুসলমানদের। সেই ভূমি উদ্ধারের পবিত্র যুদ্ধে যে প্রাণ দেবে সে সরাসরি চলে যাবে স্বর্গে। অতএব ধর্মের ডাকে অন্ধমনে প্রাণ নিতে ও দিতে এসেছিল এবং দিয়েছিলও সহস্র খৃষ্টান। এইসব যোদ্ধাদের অধিকাংশই ছিল দরিদ্র ও ক্রীতদাসপ্রায় কৃষক। নিরক্ষর অশিক্ষিত ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন। তাদের মালিক ভূস্বামীদের আদেশ তাদের কাছে ঈশ্বরের নির্দেশেরই মতো। ধর্মযুদ্ধে পেছনে পুরোহিত শ্রেণীর সঙ্গে সঙ্গে ভূস্বামী শ্রেণীরও একটা বড় ভূমিকা ছিল।

একাদশ-দ্বাদশ শতকে ইওরোপ থেকে যুদ্ধ করতে করতে এসে তারা জেরুজালেম কেড়ে নেয় মুসলমানদের হাত থেকে (১০৯৬-১১০৯)। সেখানে প্রতিষ্ঠা করে খৃষ্টান রাজত্ব। তৃতীয় পর্বায়ে (১১৮৯-৯১) ধর্মযুদ্ধে যোগ দেন ইংল্যান্ডের রাজা প্রথম রিচার্ড। সম্রাট ফ্রেডেরিগ বারবারোসা এবং ফ্রান্সের ফিলিপ অগাস্টাস। তাঁরা আক্রমণ করল নেন এবং প্রাচ্যের বুকে এক লাতিন রাজত্ব স্থাপন করেন। ইতিমধ্যে জেরুজালেম হাতছাড়া হয়ে যাওয়ায় নূতন উদ্যমে শুরু হয় ধর্মযুদ্ধ। ১২২৮-২৯ খৃষ্টাব্দে আবার জেরুজালেম দখল হয় কিন্তু আবার তা হাতছাড়া হয়ে যায়।

তিন শ বছরের এই যুদ্ধে যে ভয়ংকর ক্ষতি হয় মানুষের এবং মানুষের তৈরি সম্পদ, সৌধ ও শিল্পের, তা আর কোনওদিনই পূরণ করা সম্ভব হয় নি। এবং এ সর্বনাশ ঘটানো হয় ধর্মেরই নামে।

শুধু তাই নয়, বিধর্মী ও অবিশ্বাসীদের ওপর খৃষ্টধর্মের নামে ধর্মযুদ্ধের শেষভাগে, ত্রয়োদশ শতকে, ইওরোপে ‘ইনকুইজিশনে’ যে নির্মম অত্যাচার ও পীড়ন চালানো হয়, তার তুলনা ইতিহাসে আর নেই। আমাদের দেশের ‘ডাইনিনিধন’ সংখ্যাগত ও গুণগত দুদিক থেকেই তার তুলনায় নস। ইওরোপের নানা দেশের মধ্যে স্পেন ছিল এ ব্যাপারে সবচেয়ে ‘এগিয়ে’। তার গায়ের কাছে, দক্ষিণে ছিল মুসলমান মরোক্কো। অন্য দেশগুলিও তাল দিয়ে গিয়েছিল। জোয়ান অফ আর্কের কাহিনী তো সকলেরই জানা। যে-সহস্রাব্দই সবেমাত্র পেছনে ফেলে

এলাম আমার মতে জোয়ান ছিলেন, তার শ্রেষ্ঠতম নারী। তিনি ছিলেন ফ্রান্সের সন্তান। মাতৃভূমি স্বার্থেই তিনি লড়তে গিয়েছিলেন সর্বস্ব পণ করে। সেই মাতৃভূমি যাজকরাই তাঁকে ডাইনি ঘোষণা করে দন্ধে মেরেছিল।

মুসলিম ধর্মের পতাকা হাতে নিয়েও কম যুদ্ধ হয় নি। একসময় খৃষ্টান ইওরোপও পর্যুদস্ত হয়েছে তাদের হাতে। অটোমান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তুরস্কের এবং ইসলামের প্রভুত্ব স্থাপনের জন্যেই। দীর্ঘদিন সে সাম্রাজ্য ইওরোপের একটা বড় অংশকে শাসন করেছিল। তারই জের দেখা যায় আজকের আলবেনিয়া, বোসনিয়া, ক্রোয়েশিয়া হার্জে গোভিনা, ম্যাসিডোনিয়া, যুগোস্লাভিয়া ইত্যাদি দেশে। মুসলিম মৌলবাদ আজও দাপিয়ে বেড়াচ্ছে আরব, এশিয়া, আফ্রিকার নানা দেশে। তার তালিবানি আতংক সভ্যতার চাকাকে পেছন দিকে ঘুরিয়ে দিতে চেষ্টা করেছে এবং এই প্রক্রিয়ায় মারা পড়ছে মুসলিম-অমুসলিম অসংখ্য মানুষ। ধ্বংস হচ্ছে বহু সম্পদ থেমে যাচ্ছে জ্ঞানবিজ্ঞান, শিক্ষাচর্চার গতি। ক্ষতি হচ্ছে সমগ্র মানবতার।

ইতিহাসের এইসব কলংকের কতটা ঘটিয়েছে ধর্ম আর কতটা ঘটিয়েছে দেশে দেশে, যুগে যুগে বিভিন্ন স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী, ধর্মকে কাজে লাগিয়ে, ধর্মের প্রতি মানুষের অসহায় দুর্বলতাকে ব্যবহার করে, সে বিচার করা কঠিন। বস্তুত ধর্ম এবং স্বার্থান্বেষী ও প্রভুত্বকারী গোষ্ঠীর মধ্যে সম্পর্কটা একই সঙ্গে এমনই সরল ও জটিল, তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও মিল এমনই ছন্দোবদ্ধ, উভয়ে এমনভাবে উভয়ের পরিপূরক ও পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল যে ওভাবে আলাদা করে বিচার করা শুধু কঠিন নয়, অসম্ভবই প্রায়। ধর্ম না থাকলে ওইসব গোষ্ঠী তাকে ব্যবহার করে আপন স্বার্থ পূরণ করতে পারত না। এত নির্মমতা, এত ধ্বংস, ধ্বংস ও হত্যা দেখতে হতো না ইতিহাসকে। আবার ওইসব গোষ্ঠী না থাকলে ধর্মের এমন রমরমাও ঘটত না। তার নামে জয়ধ্বনি তোলার লোক জোড়াত কে?

সভ্যতার ইতিহাসে মানুষের মস্তিষ্ক অনেক কিছু উদ্ভাবন করেছে। তার আদি উদ্ভাবনগুলির মধ্যে একটি এবং প্রধানতমটি হলো ঈশ্বর সম্পর্কিত ধারণা। আদি মানবের অজ্ঞতা, ভয় ও লোভ, এবং সেই সঙ্গে নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধির আকাংখাই ছিল সে উদ্ভাবনার ভিত্তিভূমি। সম্ভবত সমস্ত ধর্ম ও সমস্ত দেবদেবী প্রসঙ্গেই কথাটি খাটে।

বৌদ্ধ, জৈন, শিখ বা বৈষ্ণব ধর্মের মতো প্রতিবাদী ধর্মগুলি আপন স্বভাব বজায় রাখতে পারে নি। এদেশের সনাতন ধর্ম, বিদেশীদের কল্যাণে যে-ধর্মের নাম হয়েছে হিন্দুধর্ম, শুধুমাত্র ‘ধর্ম’ নয়, বিপুল পরাক্রমের অধিকারী এক সংস্কৃতি। সে সংস্কৃতি ইতিহাস ও সভ্যতার মোড়ে মোড়ে দণ্ড হাতে প্রহরী বসিয়ে রেখেছে। এদেশের আদি বাসিন্দাদের প্রাচীন সংস্কৃতি প্রায় সম্পূর্ণ ধ্বংস করে আত্মপ্রতিষ্ঠা করেছিল বহিরাগত আর্যদের সঙ্গে আসা সংস্কৃতি। সেই আগ্রাসী সংস্কৃতিই আজকের হিন্দু সংস্কৃতির আদি উৎস ও প্রধানপুরোহিত। হিন্দুধর্মত্যাগী যে মানব ওইসব বিদ্রোহী

ধর্ম অবলম্বন করেছে তারা পুরাতন হিন্দু সংস্কৃতি সঙ্গে নিয়েই নূতন ধর্মে গেছে। ধীরে ধীরে সেই সংস্কৃতি প্রতিবাদী ধর্মের মূল পর্যন্ত পৌঁছে গিয়ে তার সারকে কুরে কুরে খেয়েছে। কালে কালে ওইসব ধর্ম তাদের প্রতিবাদী চরিত্র হারিয়ে হিন্দু ধর্মেরই ছায়ারূপ নিয়ে তারই মতো আর একটি ধর্মে পরিণত হয়েছে। দেবতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের নায়ক স্বয়ং গৌতম বুদ্ধকেই দেবতার আসনে বসিয়ে হিন্দু ধর্মাচরণের ঢঙে প্রদীপে ও চামরে আরতি করা শুরু হয়েছে। একই কাণ্ড ঘটেছে মহাবীরকে নিয়ে। নানকের বাণী মেনে জীবনাচরণের বদলে ‘গুরুগ্রন্থ’কে দেবচরিত্র দান করে, তাতে চামরের বাতাস খেলিয়ে ভজন করা শুরু হয়েছে। প্রতিবাদ পরাভূত হয়েছে। হিন্দু সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ জয়ী হয়েছে। সে সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ জাতপাতের ভেদাভেদও চলে এসেছে এইসব ধর্মে।

দুই

ধর্ম বা বিশ্বাসের (Faith) দুটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল এবং বহুল পরিমাণে আজও আছে।

এক, ধর্মের অন্তর্গত গোষ্ঠীকে বা বিশ্বাসী মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করা। এক ধরনের অদৃশ্য শৃঙ্খলে বেঁধে তাকে ঝড়-ঝঞ্ঝা-বিক্ষোভের অরাকজকত কালে সংহত রাখা। এ-বন্ধনের সবটুকু না হলেও অনেকটাই মানুষ মেনে নেয় স্বেচ্ছায়। হয়তো সে মেনে নেওয়ার পেছনে দার্শনিক মন ফিটটা কাজ করে তার চেয়ে বেশি কাজ করে সৃষ্টির রহস্যময় আদিকাল থেকে চলে আসা ভয়, লোভ এবং অসহায় বিপন্নতার মতো কিছু ব্যাপার। ঈশ্বর, বোধি বা মোক্ষ লাভের আকাংখার চেয়ে স্থূলতর কিছু জাগতিক আকাংখার হয়ত এক্ষেত্রে একটা বড় ভূমিকা থাকে।

ঈশ্বরচেতনা তথা ধর্মের আরও একটি ভূমিকা ছিল এবং আজও আছে। সেই আদিকাল থেকেই বিশ্বচরাচরের রহস্যের সামনে মানুষ যেন শিশু। তার বিশ্বাসের অন্ত নেই, জিজ্ঞাসারও শেষ নেই। আপন প্রতিভাবে জগতের রহস্য সে একে একে নিজ হাতে উন্মোচিত করেছে। সভ্যতার রথ এগিয়ে চলেছে সামনে। কিন্তু তার জানার জগত ক্রমাগত প্রসারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সে আবিষ্কার করেছে কত কম জানে সে, কত জানা এখনও বাকি। তার চেয়ে বড় কথা, তার আদি প্রশ্নের উত্তর আজও, এত কিছু আবিষ্কারের পরেও, সভ্যতার এত অগ্রগতি সত্ত্বেও, তার অজানাই রয়ে গেছে। মানুষ কোথা থেকে এল, কোথা থেকে আসে, কেন আসে? কোথায় চলে যায় সে, কেনই বা যায়? অসীম অজ্ঞানতা যেন অন্ধ, বিপন্ন ও অসহায় করে তোলে মানুষকে।

এবস্থিধ দার্শনিক তাড়না যার নেই, সেই দিন-আনা দিন-খাওয়া মানুষটির মনেও কাজ করে কিছু বিপন্ন বিশ্বয় কিছু সে জানে, কিছু হয়ত তার না বোঝাই। তবু বিপন্নতার বোধ নিরাপত্তাহীন, অসহায় করে তোলে তাকে।

ধর্ম বা বিশ্বাস এই বিপন্নতা, অসহায়তা ও নিরাপত্তাহীনতা থেকে মানুষকে যেন আড়াল করে, এক ধরনের আশ্রয় দেয়।

সংকট ও বিপদের মুহূর্তে ‘বিশ্বাসী মানুষ’ স্থিতধী থাকতে পারেন ‘তাঁর’ ওপর সব ভার ছেড়ে দিয়ে। ‘আমরা তো এ জগতের রঙ্গমঞ্চে পুতুলমাত্র, তিনি যেমন খেলান তেমনই খেলি এই সংকটও তাঁর সৃষ্টি, এ সংকট পার করে দেওয়াও তাঁর দায়। আমি কেন মিছিমিছি ভেবে মরি!’

এই ধরনের নির্ভরতা একজন অসহায় ও সংকটাপন্ন মানুষকে শুধু সান্ত্বনা জোগায় না, তাকে যথেষ্ট বল, সাহস, এমনকি উৎসাহও দেয়। কীভাবে এবং কতটা দেয় তা তিনজন বিশ্ববিখ্যাত ক্রিকেটারের জীবনের একেবারে সাম্প্রতিক কাহিনী থেকে বোঝা যায়। অবিশ্বাসী নাস্তিক এই ‘আশীর্বাদ’ থেকে বঞ্চিত। ১০ মে ১৯৯৯ তারিখে আনন্দবাজার পত্রিকায় নিম্নোক্ত সংবাদটি প্রকাশিত হয় :

ঈশ্বরের খোঁজে তিন ক্রিকেটার

হায়দ্রাবাদ, ৯ মে—হ্যাপি ক্রেনিয়ের গাড়ির উল্লাসে চাপা পড়েছিল এক কৃষ্ণাঙ্গ বালিকা। দুঃস্বপ্নের মতো সেই স্মৃতি তাড়াহুড়োয় দক্ষিণ আফ্রিকার অধিনায়ককে। স্বাভাবিক জীবন যাপনের আশাই ছিল তাঁর জন্মি রোডসের। বিশ্বসেরা ফিল্ডারের অসুখটা ছিল মৃগী। ৩৭টি উইকেট পাওয়া ইয়ান বিশপের অবস্থাটা হয়েছিল পাগলের মতো। আধুনিক জীবনের টেনশন আর বারবার চোট পেতে পেতে বিশপের নিজস্ব জগতটাই তালগোল পাকিয়ে গিয়েছিল। ক্রেনিয়ে, জন্মি আর বিশপের অঙ্ককার থেকে আলোয় ফেরার পেছনে রহস্য একটাই, ‘বিশ্বাস’। যে-বিশ্বাসকে বলা হয় আধ্যাত্মিকতা, আরও সহজ করলে, ‘ঈশ্বরের কাছে নিজেকে সম্পূর্ণ সমর্পণ করা।’ ক্রেনিয়ের কথায়, ‘সেই কিশোরীর জীবন নষ্ট করার পর নিজেকে প্রশ্ন করতাম, আজ এই মুহূর্তে যদি আমিও মরে যাই তা হলে কোথায়, কার কাছে যাব? বলতে পারেন, সে-দিন থেকেই নিজেকে সম্পূর্ণ নিবেদন করলাম যিশুর কাছে।’ জন্মি বলছেন, ‘নব্বই দশকে আমার জীবনের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল, যিশুর সঙ্গে আমার সম্পর্ক।’ বিশপের অভিজ্ঞতা, ‘শত ঝড়ঝাপটায় আমি লড়ে যেতে পেরেছি, যিশুর প্রতি আমার সুগভীর বিশ্বাসের জন্য। অন্য কোনও রহস্য নেই। না হলে কবে কোথায় ছিটকে যেতাম আমিও জানতে পারতাম না।....

এঁরা তিনজন বিশ্ববিখ্যাত বলে এঁদের বিশ্বাস ও অনুভূতির কথা কাগজে লেখা হয়। বিখ্যাত নন, কাগজে নাম ছাপা হয় না, কোনও দিন হবেও না, এমন কোটি

কোটি মানুষ আছেন এই পৃথিবীতে যাঁরা এঁদের মতোই বিশ্বাসী এবং এঁদের মতোই অনুভূতি তাঁদেরও। তাঁরাই এ বিশ্বের বিপুল সংখ্যা-গরিষ্ঠ অংশ। অবিশ্বাসী নাস্তিক সংখ্যায় অতীব নগণ্য। একজন আন্তিক তাঁর বিশ্বাস থেকে যে সান্ত্বনা পেতে পারেন, সংকটের সময় যে-সাহস এমনকি উৎসাহ ও ভরসা পেতে পারেন, একজন নাস্তিক তা থেকে বঞ্চিত।

বিপন্ন সময়ে নাস্তিক জানেন নিজের ওপর এবং সম্ভব হলে সহমানবদের ওপর নির্ভর করা ছাড়া, নিজ হাতে সংকটের টুটি চেপে ধরা ছাড়া আর কোনও পথ নেই। এখানেই পথের শেষ, এইটেই শেষ স্টেশন। এইসব সময়েই বোঝা যায় নাস্তিকের আত্মবিশ্বাসের দৌড় ; যেমন বোঝা গিয়েছিল কালীভক্ত সেই বালিকার নাস্তিক পিতার ক্রুদ্ধ বিস্ফোরণের পরেই অসহায় দৌড় দেখে।

কলকাতা বইমেলায় প্রগতিশীল পরিবেশের নিরাপত্তায় সহজেই দু'পায়ে খেলানো যায় মৌলবাদ বিরোধী সাহস। সে সাহস আসল পরীক্ষায় পড়ে খিদিরপুর বা ট্যাংরা অথবা তপসিয়ার দাঙ্গা থামানোর আহ্বানের সামনে দাঁড়িয়ে। অথবা মীরাটে দিল্লিতে, অযোধ্যায়, কানপুরে, ভাগলপুরে কিংবা মুম্বাইয়ে। সত্যিকারের সাহস বাক্যে নয়, নৃত্যে নয়, কৃত্যে। সত্যিকারের সাহস যদি থাকে তবে সে থাকে সংকটকালে নিজের বুকের ভেতরে। যার সে সাহস আছে সে নাস্তিক হয়েও বেঁচে গেল, যার নেই সে গেল!

AMARBOL.COM

তিন

এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলে রাখা প্রয়োজন। সর্বদেশে সর্বকালে সব ধর্মের ভূমিকা এক নয়, সমান নয়। সব ধর্ম একই রকম প্রতিষ্ঠানভিত্তিক, সুশৃংখল কিংবা নিয়মানুবর্তীও নয়। ক্যাথলিক খৃষ্টানদের ভ্যাটিকান আছে, পোপ আছে, আছে নানা স্তরে বিন্যস্ত সুশৃংখল নেতৃত্ব ও কঠোর নিয়মের সর্বব্যাপী শাসন। সে শাসনে গ্যালিলিওকেও বিজ্ঞানের সত্য বলার 'অপরাধে' দুটি চোখ খোয়াতে হয়। বিজ্ঞানের সত্য, পৃথিবীই সূর্যের চারদিকে ঘোরে, পোপের পৃথিবী এবং পৃথিবীর পোপকে কেন্দ্র করে সূর্য আবর্তিত হয় না, এই সত্য মেনে নিতে কয়েক শ বছর সময় লাগে ভ্যাটিকানের। তখন 'পুনর্বাসিত' হন গ্যালিলিও।

ইসলামের মক্কা আছে। ধর্মীয় ঐক্য ও শৃংখলা আছে সে শৃংখলা ক্যাথলিকদের মতো কঠোর নয়। সব মুসলমান তালিবানদের হুকুম মানেন না। সব মুসলমান দিনে বহুবার নমাজ পড়েন না। অনেকে শুক্রবারেও মসজিদে যান না। তবু তাঁরা ধার্মিক ও মুসলমানই থাকেন। হয়তো একটু 'খারাপ মুসলমান' কিন্তু মুসলমান বটেই।

হিন্দুদের না আছে ভ্যাটিকান, না আছে পোপ। রবি বা শুক্রবারে নিয়মিত অন্য কোনও দিন ধর্মস্থানেও যান না প্রায় কেউই। দুর্গাপূজা, গণেশ পূজা, জন্মাষ্টমী, কার্তিক পূজা বা সরস্বতী পূজার মতো অনুষ্ঠানে বছরে দু-একবার মাথা নোয়ানো ছাড়া কেউ কেউ সারা জীবনে আর ধর্মার্চনা করেন না। তাতে হিন্দু থাকতে কোনও বাধা হয় না।

ক্যাথলিক ধর্মের নিয়মকানুন না মানার অপরাধে ক্যাথলিককে শাস্তি পেতে হয়। জার্মানিতে কর্মস্থলে নিজের ধর্ম ঘোষণা করতে হয়। সেই ধর্মের কোষাগারে জমা দেওয়ার জন্যে কর্মীর বেতন থেকে কর্তৃপক্ষই ‘দান’ কেটে নেন। যেমন প্রভিডেন্ট ফান্ড, নানা ট্যাকস কিংবা সোশ্যাল সিকিওরিটির টাকা কেটে নেন। আমার পরিচিত এক জার্মান তরুণী, সরকারি স্কুলের শিক্ষিকা, তাঁর ধর্ম ঘোষণা করতে রাজি হন নি। তিনি আসলে নাস্তিক, যদিও কড়া ধাতের এক ক্যাথলিক পরিবারের সন্তান। ফলে, কোনও ‘দান’ তাঁর বেতন থেকে কাটা হয় নি। বেশ চলছিল। এক দুঘটনায় তাঁর কোলের শিশুটির করুণ মৃত্যুর পর বোঝা গেল ‘বেশ চলা’র তলায় তলায় কী সাংঘাতিক জটিলতার খেলা চলছিল। মেয়েকে কবর দেওয়ার জন্যে সমগ্র জার্মানির কোনও কবরস্থান এক ইঞ্চি জমি দিতে রাজি হলো না। ও তো ক্যাথলিক নয়। ও তো ধর্মহীন! ঠাণ্ডা বাকস ভাড়া করে অনেকদিন ফেলে রাখতে হয়েছিল মৃত সন্তানকে।

আবার এই খৃষ্ট ধর্মই অন্য সময় অন্য এক ভূমিকা পালন করেছে যেমন সে-ধর্মের আদি পর্যায়ে, তেমনি আমেরিকার কৃষ্ণ ক্রীতদাসদের মতো নির্যাতিত মানুষের জীবনে। জীবন যখন খরার যন্ত্রণায় একেবারেই শুকায়ে যায়, বাঁচাই অসহ্য বোধ হয়, তখন আশার প্রতীক হয়ে এসেছে খৃষ্টের ক্রস। ক্রীতদাসদের খড়ের চালার চার্চ থেকে জন্ম নিয়েছে বিশ্বজনের চিরকালীন প্রতিবাদের গান, অবসন্ন জীবনে আশার সঙ্গীত, ‘উই শ্যাল ওভারকাম সাম ডে!’ ধর্ম তখন আর শুধু জনগণের আফিম থাকে নি, সেই সঙ্গেই হয়ে উঠেছে, ‘হার্ট অফ দ্য হার্টলেস, হোম অফ দ্য হোমলেস।’

ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ ‘অ্যান্টিড্যুরিং’-এ লিখেছেন, “খৃষ্টানী জগতে প্রথমে ছিল ঈশ্বরের সমীপে পাপী হিসেবে সমস্ত মানুষের নঞর্থক সমতা, আর আরও সংকীর্ণ অর্থে খৃষ্টের করুণা এবং রক্ত দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করা ঈশ্বরের সমস্ত সন্তানের সমতা। উভয় রূপেরই ভিত্তি হল দাস, নির্বাসিত, অধিকারচ্যুত, নির্যাতিত, উৎপীড়িতদের ধর্ম হিসেবে খৃষ্টধর্মের ভূমিকা।”

বলা বাহুল্য এই ভূমিকা বেশিদিন বজায় থাকে নি। কালে খৃষ্টধর্মের দশাও হয়েছে বৌদ্ধধর্মের মতোই, যেমন হয়েই থাকে নানা আদর্শের হাল, শোষণভিত্তিক, শ্রেণীবিভক্ত সমাজে। এঙ্গেলসকে তাই এর পরেই লিখতে হয়। ‘খৃষ্টধর্মের বিজয়ের’ সঙ্গে সঙ্গে এই অবস্থাটাকে পেছনে ঠেলে দেওয়া হয়েছিল আর তার পরে

মুখ্য গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল ধর্মবিশ্বাসী আর পেগ্যান এবং ‘গোঁড়া আর বিরুদ্ধ বিশ্বাসীদের বিরুদ্ধ-অবস্থানকে।’

মার্কিন মূলুকে দখলদারী শ্বেতসমাজের চাবুকে চাবুকে বিক্ষত কৃষ্ণকীর্তিদাসরা দু-এক প্রজন্মের মধ্যেই তাদের আদিভূমি আফ্রিকায় আচরিত ধর্ম ভুলে যেত। তখন খৃষ্টধর্মই তাদের জীবনে হয়ে উঠত ‘নির্যাতিত, উৎপীড়িতদের ধর্ম’, তাদের আশ্রয়, তাদের আত্মা, যেমন ছিল যিশুর ধর্ম তার আদি পর্বে।

ধর্ম-র বিরুদ্ধে যাদের জেহাদ, ধার্মিক তাঁদের বিনীতভাবে বলতেই পারেন, আমার কাছ থেকে ধর্ম কেড়ে নেওয়ার অর্থ আমার আশ্রয়টুকু কেড়ে নেওয়া। সে আশ্রয় হয়ত নিতান্তই মানসিক এবং একেবারেই বানানো। তবু সে আশ্রয় আমাকে সংকটে সাহস দেয়। সে দেওয়াও হয়ত নিতান্তই মানসিক এবং বানানোই, তবু আমি অনুভব করি, মাথার ওপর ‘তিনি’ আছেন এবং তিনিই আশ্রয়। এ আশ্রয় তোমার নাস্তিকতা দিয়ে যদি ভেঙে দিতেই হয়, দাও! কিন্তু আমাকে কী দেবে তার বিনিময়ে? অসহায় মানুষ তো আশ্রয় ছাড়া বাঁচতে পারে না, আর মানুষ তো খুবই অসহায়। ঈশ্বরের আশ্রয়ের বদলে কোন আশ্রয় তুমি দিতে পারো তাকে?

এ প্রশ্নের উত্তর খোঁজার আগে একটা বিষয় বুঝে নিতে হয়। ধর্ম অসহায় মানুষের যত বড় আশ্রয়ই হোক, তার যত কল্যাণেই লাগুক, ধর্ম এবং ঈশ্বর বিশ্বাসের ভিত্তিটি কিন্তু নড়বড়ে। যুক্তির কোনও স্থান নেই সেখানে। ভক্তিই সব। বিশ্বাসই (Faith) সব। ‘বিশ্বাসে মিলায় হৃদি তর্কে বহুদূর।’ রামকৃষ্ণদেব বলেছেন, তাঁর কাছে প্রার্থনা করতে হয়, আমাকে ভক্তি বিশ্বাস দাও। বিশ্বাস হয়ে গেলেই হল। বিশ্বাসের চেয়ে আর জিনিস নাই।

এই ‘বিশ্বাস’ এর ভূমিকা মাঝে মাঝে বড় ভয়ংকর হয়ে ওঠে, মানুষের পক্ষে, এমনকি মানুষের ধর্মবিশ্বাসের পক্ষেও ভয়ংকর। অযোধ্যায় বাবরি মসজিদের জায়গায় কোনও মন্দির কখনও ছিল কিনা জানা যায় নি। ছিল এমন কোনও প্রত্নতাত্ত্বিক বা ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় নি। রামচন্দ্র যে ঠিক ওই জায়গাটিতেই জন্মেছিলেন তার কোনও তথ্য বা প্রমাণ নেই। বরং বিপরীত তথ্যই আছে। রামের জন্ম রামায়ণে। হিন্দি রামায়ণ রচনা করেন তুলসীদাস, ওই বাবরি মসজিদ চত্বরে আশ্রয় নিয়েই। উচ্চবর্ণের হিন্দুরা তাঁকে সমাজচ্যুত করেছিল। তাঁর তখনকার জীবন সম্পর্কে তুলসীদাস নিজেই লিখেছেন, ‘মাস্তকে খাইবো ঔর মস্তিমে শোইবো। রামায়ণই যদি রামের জন্মক্ষেত্র হয় তবে তাঁর জন্ম হয়েছিল বাবরি মসজিদেই।

কিন্তু কিছু হিন্দুর ‘বিশ্বাস’ এই জায়গাতেই রামের জন্ম হয়েছিল। সেই ‘জন্মভূমির কাঠামো’ ভেঙেই মুসলমানরা তৈরি করেছিল মসজিদ। এটা তাদের ‘বিশ্বাসই’ (Faith), সুতরাং যুক্তি-তথ্য-প্রমাণের প্রয়োজন কি? সুপ্রীম কোর্ট এ বিবাদে কী ভূমিকা পালন করতে পারে? ‘বিশ্বাস’ নিয়ে কি কোনও মামলা হয়, না

হতে পারে যে সুপ্রীম কোর্ট রায় দেবে এবং সে রায় মানতে হবে সকলকে? এই বিশ্বাসে বলীয়ান হয়েই তাদের অগ্রণী অংশ বজরং দল, বিশ্বহিন্দু পরিষদ ইত্যাদি রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘের সংগঠনের ‘করসেবকরা’ বাবরি মসজিদের কাঠামোটা ধুলোয় গুঁড়িয়ে দিয়ে সেই ধ্বংসস্তূপের মধ্যে অস্থায়ী হলেও একটি মন্দির বানিয়ে সেখানে রামলালার মূর্তি বসিয়ে তবে ছাড়ল।

এইভাবে অন্ধ এক বিশ্বাস শুধু মহান এক কবির অমর সাহিত্য সৃষ্টির স্মৃতিজড়িত একটি সৌধই ধ্বংস করল না, নিজে ‘বিশ্বাস’ হয়ে আর এক ‘বিশ্বাসকে’ প্রবল ও ভয়ংকর আঘাত হানল। মুসলমানদের ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে জড়িত আবেগে এমন আঘাত করল, আসমুদ্র হিমাচল কেঁপে উঠল। ভারত জুড়ে ধর্মীয় দাঙ্গায় হাজার হাজার মানুষ মারা পড়ল, শত শত কোটি টাকার সম্পত্তি বিনষ্ট হলো। একই সঙ্গে কালিমালিপ্ত হলো হিন্দু ধর্মও। জগত জুড়ে তার যে কৃষ্ণ মুখচ্ছবি ফুটে উঠল তার দায়িত্বও ‘বিশ্বাসে উন্মত্ত’ ওই হিন্দুদেরই।

চার

ধর্ম নিয়ে, যুক্তিভিত্তিহীন, অবৈজ্ঞানিক ‘বিশ্বাস’ নিয়ে তবে কী করা যায়? অসহায় মানুষের মনে তার বিপন্ন সময়ে মানসিক আশ্রয় ও বল যোগানোর যে-ভূমিকাই (Psychotherapy) সে পালন করুক না কেন, তাকে তো প্রশ্রয় দেওয়া চলে না। আরও চলে না এই কারণে যে এই ‘বিশ্বাস’ মানব সভ্যতার নানা স্তরে, নানা দেশে ক্ষতিকর ও ভয়ঙ্কর এক ভূমিকাও পালন করেছে, নানা ভাবে, নানা ভঙ্গিতে। মানুষের পক্ষে সে ভূমিকার অবসান হয় নি আজও, কিন্তু কী করা যায় একে নিয়ে?

যিনি বা যাঁরা আর পাঁচটা প্রাচীন সংস্কারের মতো এই ‘বিশ্বাসকেও ত্যাগ করতে পারেন এবং আত্মবিশ্বাসী হয়েই এ-জীবনের সব ঝড়ের মুখোমুখি হতে পারেন, তাঁরা তো, মুক্ত মানুষ। গৌতম এবং চার্বাকদেরই উত্তরসূরী তাঁরা, এ যুগের বীর তাঁরা। যদি তাঁদের ‘অবিশ্বাসটা’ বানানো না হয়।

এঁদের মধ্যে একদল আছেন, তাঁরা স্থিতধী বীর। এ নিয়ে বড়াই করা, দেখানাই ভাব করা, কালীর ছবি মাটিতে ফেলে ভাঙা, কিংবা ধর্ম বা মৌলবাদ সমর্থক বই-পত্র-পত্রিকা পা দিয়ে মাড়ানোর মতো কাজ করতে তাঁদের রুচিতে বাধে।

আর এক দল ‘অবিশ্বাসী’ নিজেদের অবিশ্বাসকে অন্যদের মধ্যে চারিয়ে দিতে চান। প্রতিবেশীর মনকে মুক্ত করতে চান। এঁরা সবাই একরকম নন। কেউ কেউ স্টুয়ার্ট মিলের কথাটা মনে রাখেন, ‘অ্যান আইডিয়া ক্যান বি ফট ওনলি উইদ অ্যান আইডিয়া’। তাঁরা নানা কুসংস্কার, সংস্কার, ঈশ্বর ও ধর্মবিশ্বাসের অসারতা যুক্তি বুদ্ধি

বোধ দিয়ে প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করেন।

শিক্ষার প্রসার চেতনার উন্মেষ একাধারে তাঁদের লক্ষ্য ও-সাধনা। আবেগকে অসম্মান করে মনকে প্রয়োজনে বুদ্ধদেব, শ্রীচৈতন্য বা বিদ্যাসাগরের মতো ‘বিশ্বাসের শাস্ত্র’কেও তাঁরা কাজে লাগান। এঁরা একই সঙ্গে সমাজ ও সমাজের মানুষের মনের সংস্কারক।

এঁদের মধ্যে কেউ কেউ আবার বিশ্বাস করেন বাহ্যবলে এবং অস্ত্র করেন ব্যঙ্গ বিদ্রূপ তামিল্যকে। ধর্মবিশ্বাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে পরম পবিত্র এক কর্তব্য পালন করেছেন, এই বিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে তাঁরা একটা নৈতিক জোর অনুভব করেন। ভাবেন, ওদের বিশ্বাস একেবারেই অসার এবং অশ্রদ্ধেয়, যত সার সব তাঁদের অবিশ্বাসে, এই জোরই একসময় উৎসাহিত করেছিল এদেশের ইয়াং বেঙ্গল-এর প্রতিভাবান তরুণদের। এই জোরই নৈতিক শক্তি যুগিয়েছিল সেই বুলডোজারগুলির চালক ও তাদের নেতাদের, যে বুলডোজারগুলি ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছিল অনবদ্য শিল্পরূপ শরীরে ধারণ করে ক্রেমলিন চত্বরে দাঁড়িয়ে থাকা গীর্জাটিকে, রুশ বিপ্লবের কিছুকাল পরে, লেনিনের মৃত্যুর পর। অযোধ্যায় বিশ্বাসের মৌলবাদের মতো সে-ও ছিল অবিশ্বাসের এক মৌলবাদ।

ইয়াং বেঙ্গলের হিন্দু ধর্ম বিরোধী লক্ষ্যমণ্ডল পাল্লা শেষ হওয়ার পর দেখা গেল, কেউ কেউ খুঁটান হয়ে গেলেও নাস্তিক কেউ একটা কেউ হয় নি। বরং নতুন একটা ধর্মের জন্ম হয়েছে, ব্রাহ্মধর্ম, আর খুঁটাবড় করে যেটা ঘটেছে তা হলো রানী রাসমণি থেকে রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের মতো নানা বিশিষ্টজনের উদ্যোগে এবং সহায়তায় হিন্দুধর্মের এক পুনরুত্থান। তাঁর কেন্দ্রে আছেন দক্ষিণেশ্বরের রামকৃষ্ণদেব যাকে অবতার মেনে তাঁর কাছে গিয়ে আশ্রয় খুঁজছেন সমাজের বহু বিশিষ্টজন এবং সমাজের নানা স্তরের মানুষ, শিল্পী, পণ্ডিত বৃদ্ধ, তরুণ, ধনী, নির্ধন, পণ্ডিত, মুখ আরও কতজন।

আর বিপ্লব সম্পন্ন হয়ে যাওয়া মস্কোতে? সেই গীর্জাটি ভেঙে দেওয়ার সাত দশক পরে সেই মস্কো ভেসে গেল এবং আজও ভেসেই চলেছে অর্থোডক্স গীর্জারই পথে। এখন বোঝা যাচ্ছে, কালাপাহাড় কোনও কালেই ইতিবাচক কাজে লাগে না। সব কিছুই বাড়াবাড়ি সর্বদাই গর্হিত এবং তার ফল হয় বিপরীত, প্রায় অনিবার্যভাবেই।

একই অভিজ্ঞতা সমগ্র পূর্ব ইয়োরোপের এবং যতটুকু জানা যায় চীনেরও। সম্ভবত এইসব অভিজ্ঞতা থেকে যা গ্রহণীয় তা ‘জ্বলন্ত অবিশ্বাসে’ ছুঁড়ে ফেলে দিতে চাননি বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী ফিদেল কাস্ত্রো। ভ্যাটিকানের পোপকে তিনি তাই নিজের নাস্তিকতা সত্ত্বেও অনায়াসেই স্বাগত জানিয়েছেন কিউবাতে। কিউবার অধিবাসীদের অধিকাংশই ক্যাথলিক। তাদের অবৈজ্ঞানিক ধর্মবিশ্বাসকে আঘাত হানার চমৎকার সুযোগ পেয়েছিলেন কাস্ত্রো। রাষ্ট্রক্ষমতা হাতে ছিল। তাকে কাজে

লাগিয়ে অনায়াসে আঘাতটি হানা যেত। তার বদলে পোপকে অভ্যর্থনা! প্রকাশ্যে, তাঁর হস্তচুম্বন! দেশের মানুষের অর্থনৈতিক দুরবস্থা কাটিয়ে উঠতে নির্মম ‘অর্থনৈতিক সাংশন’ প্রত্যাহারের জন্যে পোপের শুভেচ্ছাকে কাজে লাগানোর প্রয়াসই বড় হবে, অন্ধ ধর্মবিশ্বাসকে আঘাত করার চেয়ে? এ কেমন বিপ্লবীর কাজ? কেমন ‘র্যাডিকাল’ এই কান্ডো?

ডুয়ারিং, বাকুনি, ব্ল্যাংকিপন্থী ও নৈরাজ্যবাদীদের ধর্মবিষয়ক তত্ত্ব ও নাস্তিকতার ধারণা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্বেষের তীক্ষ্ণতায় ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস ‘প্রবাসিত সাহিত্য’-তে লিখেছিলেন,

“প্রসঙ্গত বলি, লক্ষ্যের ব্ল্যাংকিপন্থীরা বাকুনি পন্থীদের বিরোধিতা করার সঙ্গে সঙ্গে উপায়ের ব্যাপারে অনেক সময়ে তাদের সঙ্গে একমত হয়....কাজেই নাস্তিকতা প্রসঙ্গে আর সবার চেয়ে র্যাডিকাল হবার প্রশ্ন আসে! সৌভাগ্যক্রমে, নাস্তিক হওয়া আজকাল বেশ সহজই। ইউরোপীয় শ্রমিক পার্টিগুলিতে নাস্তিকতা কমবেশি আপনা থেকেই উপলব্ধ, যদিও কোন কোন ইউরোপীয় দেশে এটা সেই স্পেনীয় বাকুনিপন্থী নাস্তিকতার মতো, যিনি বলেছিলেন : ঈশ্বরে বিশ্বাস করা সমস্ত সমাজতন্ত্রের বিরোধী, কিন্তু ভার্জিন মেরীতে বিশ্বাস করা একেবারে অন্য ব্যাপার, তাই প্রত্যেকটি উপযুক্ত সমাজতন্ত্রী তাঁর প্রতি বিশ্বাস থাকা উচিত স্বভাবতই।

“....নিজেদেরকে সবচেয়ে র্যাডিকাল বলে প্রমাণ করার জন্যে ১৭৯৩ সালের তারিখ দিয়ে ডিক্রি জারি করে ঈশ্বরের অস্তিত্ব নাকচ করে দেওয়া হল!

“অতীত দুর্দশার ভূত’ (ঈশ্বর) থেকে, তাদের বর্তমান দুর্দশার এই কারণটা থেকে’ (অস্তিত্বহীন ঈশ্বর একটা কারণ!) ‘বিশ্বমানবকে চিরতরে উদ্ধার করবে কমিউন।—কমিউনে যাজকদের কোন স্থান নেই ; সমস্ত রকমের ধর্মীয় অনুষ্ঠান, সমস্ত রকমের ধর্মীয় সংগঠন অবশ্যই নিষিদ্ধ করতে হবে।’

অতীব ‘র্যাডিকাল’ ডিক্রি থেকে এই উদ্ধৃতিটি দিয়েই এঙ্গেলসের মন্তব্য, “Par order du mufti (মুফতির হুকুমে বা উপর-থেকে দেওয়া হুকুমে) জনগণকে নাস্তিক করার এই দাবিতে সই দিয়েছেন কমিউনের দু’জন সদস্য, তাঁদের নিশ্চয়ই যথেষ্ট সুযোগ ছিল এটা আবিষ্কার করার জন্যে যে, এক, যে কোন কিছু কাগজে ডিক্রি করা যায়, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে সেটা কার্যে পরিণত হবে, দুই, যে কোন আবাসিত প্রত্যেকে জোরদার করার সেরা উপায় হল নিগ্রহ! এটুকু নিশ্চিত: বর্তমানে ঈশ্বরের যে খিদমৎ এখনও করা যেতে পারে সেটা হল নাস্তিকতাকে একটা বাধ্যতামূলক উপদেশবাক্য করে তোলা, আর সাধারণভাবে ধর্মকেই নিষিদ্ধ করে বিসমার্কের যাজকতন্ত্রবিরোধী কুলটুরকান্স আইনকেও ছাড়িয়ে যাওয়া।”

ধর্মের বিরুদ্ধে ‘ধর্মযুদ্ধের’ নামে মস্কোর সেই ঐতিহাসিক গীর্জাটিকে গুঁড়িয়ে দেওয়া আসলে যে সাধারণভাবে ঈশ্বর ও ধর্মের, এবং নির্দিষ্টভাবে রুশ অর্থোডক্স

গা-গারই খিদমত করা তা আজ, এতদিন পরে স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ‘অবাস্তিত প্রত্যয়কে
সেঁচাদার করার সেবা উপায় হল নিগ্রহ।’

এনসাধারণের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই ঈশ্বরবিশ্বাসী এবং ধর্মভীরু। তাঁদের
বিশ্বাস, আবেগ ও অনুভূতির কোনও মূল্যই নেই, মূল্যবান শুধু আমার অবিশ্বাসটুকু,
এমন ভাবনা পাড়ার মাস্তানকে যতই মানাক, সত্যিকারের বিপ্লবীকে মানায় না।
ফিদেলের চেয়ে বড় বিপ্লবী এখন এ-বিশ্বে আর কে আছেন? সেই জন্যেই একদিকে
তিনি তাঁর দেশের মানুষের ‘বিশ্বাসের’ প্রতি অশ্রদ্ধা দেখাতে চান নি, অন্যদিকে
রাষ্ট্রক্ষমতার গা-জুয়ারি খাটিয়ে এখন কিছু করতে চান নি যা আপাতদৃষ্টিতে যতই
মলমলে র্যাডিকাল দেখাক, আসলে ঈশ্বর ও ধর্মবিশ্বাসের ‘খিদমত’ খাটারই সামিল।
পেটের খিদে, ওষুধপথ্যহীন ব্যাধি, অশিক্ষিত মানুষের অসহায়তা ইত্যাদি সামাজিক
রোগ মানুষকে ঈশ্বরের অলীক আশ্রয়েই ঠেলে দেয় একথা তাঁর অজানা নয়।

বাস্তববাদী বিপ্লবী ফিদেল কাস্ত্রো জানেন, কিউবাবাসীর আশু প্রয়োজন বই,
রুটি, ওষুধ ও কাপড়। এগুলি সংগ্রহ করার জন্যে যা কিছু প্রয়োজন তা করাটাই
বিপ্লবী কাজ। ঈশ্বরের সঙ্গে লড়াইয়ের ভূমি প্রস্তুত করাই এখন প্রয়োজন, লড়াইটা
পরেও হতে পারবে। আর এই ভূমি প্রস্তুত করার জন্যে কীভাবে সর্বস্ব পণ করতে
হয় তা তিনি শিখেছেন লেনিনের কাছে।

রুশ বিপ্লবের প্রধান তিনটি স্লোগানের একটি ছিল শান্তি। জার্মানির সঙ্গে
শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরের জন্যে বিপ্লবের পর লেনিন জার্মানিতে পাঠিয়েছিলেন ট্রটস্কিকে।
চুক্তি স্বাক্ষর না করেই ফিরে আসতে হয়েছিল ট্রটস্কিকে। জার্মান পররাষ্ট্রমন্ত্রী
‘শ্রমিকের পোশাকপরা লোকটা’র সঙ্গে টেবিলে বসা দূরের কথা, দেখা করতেই
রাজি হন নি। ট্রটস্কিও ‘উপযুক্ত পোশাক’ পরে আলোচনায় যেতে রাজি হননি। সেটা
হতো শ্রমিকশ্রেণীর অসম্মান! লেনিন তাঁকে তুলোধোনা করেছিলেন। বিপ্লবীর
‘র্যাডিকাল অহম বড়, না বিপ্লবকে রক্ষা করাটা জরুরি? লেনিন বলেছিলেন,
বিপ্লবকে রক্ষার স্বার্থে প্রয়োজন হলে অন্তর্বাস পরেও যেতে হবে আলোচনার
টেবিলে। ‘উপযুক্ত পোশাকেই’ ট্রটস্কি জার্মানিতে গিয়েছিলেন এবং ব্রেস্ট
লিটভস্ক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। বিপ্লব দেশ পুনর্গঠনের সুযোগ পেয়েছিল।

কিউবার বিপ্লবী রাষ্ট্রকে রক্ষার স্বার্থে পোপকে অভ্যর্থনা জানানো কি অন্তর্বাস
পরে আলোচনার টেবিলে যাওয়ার চেয়েও বেশি অবিপ্লবী, বেশি অসম্মানের, না
বেশি প্রতিক্রিয়াশীল?

কিন্তু এইভাবে ‘বাস্তববাদী’ হতে হতেই একসময় বিপ্লবী কি তাঁর লক্ষ্য ভুলে
যান না? আদর্শচ্যুত হন না? মহানাস্তিক কিন্তু ‘ভার্জিন মেরীর প্রতি ভক্তিতে অটল’
এক অচল সমাজতন্ত্রী হয়ে যান না? যুক্তিভিত্তিহীন, অবৈজ্ঞানিক এক বিশ্বাস
বস্তুত শোষণভিত্তিক ও শ্রেণীবিভক্ত সমাজের কাঠামোকে বজায় রাখতে, আর
শক্তিশালী করতে সাহায্যই করে, তার বিরুদ্ধে লড়াই কি তবে শুরু হবে না?

ধর্ম ব্যাপারটা আসলে ঠিক কী? এর জন্ম ও উত্থানের ইতিহাসই বা কী? সমাজ ও ব্যক্তির জীবনে এর কী ভূমিকা অতীতে ছিল এবং আজও আছে? মানুষের মনে ধর্মবিশ্বাস কি চিরস্থায়ী? কীভাবে এর অবসান ঘটতে পারে? কীভাবে ঘটানো যায়?

ঈশ্বর ও ধর্মবিশ্বাসের ভূমিকা মূলত এবং আসলে নেতিবাচক একথা ধরে নিয়েই এইসব প্রশ্নের অবতারণা। এইসব প্রশ্ন নিয়ে দর্শনের জগতে বিস্তারিত বিতর্ক হয়েছে এবং এখনও হয়ে চলেছে। দার্শনিকরা কোনদিনই, কোনও বিষয়েই সহজে সহমত হন না, বলা ভালো আদৌ হন না। এ বিষয়ে হওয়া আরও কঠিন। তবে এইসব প্রশ্ন নিয়ে আধুনিক বিশ্বে অন্যদের তুলনায় জার্মান দার্শনিকরা অনেক বেশি মাথা ঘামিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে একজন ড্যুরিং। অন্যজন ‘অ্যান্টিড্যুরিং’ রচয়িতা ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস। দু’জনেই নাস্তিক কিন্তু কতো ভিন্ন চরিত্রের নাস্তিক। ড্যুরিং-এর লেখার একটি অংশ এই রকম :

“সঠিক ধারণা অনুসারে নির্ধারিত সমাজভিত্তিক ব্যবস্থাকে কাজে কাজেই অবশ্যই....লোপ করতে হবে ধর্মীয় ইন্দ্রজালের যাবতীয় আনুষঙ্গিক উপাদান। আর তার সঙ্গে ধর্মানুষ্ঠানের সমস্ত মূল উপাদান।”

বড় হরফে ‘অবশ্যই’ লিখে ড্যুরিং ধর্মানুষ্ঠান লোপ করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করছেন....‘লোপ করতে হবে’! বুঝতে অসুবিধা হয় না তিনি ব্ল্যাকি, বাকুনি, নৈরাজ্যবাদপন্থীদের মতোই বলপ্রয়োগপন্থী।

এই উদ্ধৃতিটি উল্লেখ করেই এঙ্গেলস চলে যেতে চান ধর্মের মূলে, তাকে ‘লুপ্ত’ করার প্রসঙ্গে আসার আগে। লেখেন,

“ধর্ম নিষিদ্ধ হচ্ছে।

কিন্তু সমস্ত ধর্মই আর কিছুই নয়, যে সব বহিঃশক্তি মানুষের দৈনন্দিন জীবন নিয়ন্ত্রণ করে, মানুষের মনে সেগুলোর উদ্ভূত প্রতিচ্ছায়া, যে-প্রতিচ্ছায়া পার্থিব শক্তিগুলি ধারণ করে অতিপ্রাকৃত শক্তির রূপ।....ক্রমবিকাশের আরও একটা অগ্রসর পর্বে বহুতর দেবতার সমস্ত প্রাকৃতিক এবং সামাজিক গুণ পাত্রান্তরিত হয় এক সর্বশক্তিমান ঈশ্বরে, এই ঈশ্বর হল বিমূর্ত মানুষের প্রতিচ্ছায়া মাত্র। এইভাবে হয় একেশ্বরবাদের উদ্ভব....যেসব পরক (Alien) প্রাকৃতিক এবং সামাজিক শক্তির আধিপত্য চলে মানুষের উপর, সেগুলোর সঙ্গে মানুষের অব্যবহিত অর্থাৎ ভাবপ্রবণ

রূপের সম্পর্ক হিসেবে এই উপযোগী সুবিধাজনক এবং সর্বব্যাপী অভিযোজনীয় রূপে ধর্মের অস্তিত্ব বজায় থাকতে পারে যতকাল মানুষ ঐসব শক্তির নিয়ন্ত্রণাধীন থাকে।

.... কাজেই ধর্মের উদ্ভব ঘটায় যে-প্রতিফলনক্রিয়া সেটার বাস্তব ভিত্তি বজায় থেকে যায়, আর তার সঙ্গে সঙ্গে বজায় থাকে খাস ধর্মীয় প্রতিফলনই।....এটা এখনও সঠিক যে, মানুষ পরিকল্পনা করে এক, আর ভগবানের (অর্থাৎ পূজিতাত্ত্বিক উৎপাদনপ্রণালীর পরক আধিপত্যেরা) ফয়সালা হয় ভিন্ন।”

কিন্তু ধর্ম কি চিরস্থায়ী? এর ইতি ঘটবে না কোনওদিন? ঘটলে কবে এবং কী অবস্থায় ঘটবে? এঙ্গেলস ওই নিবন্ধেই লিখছেন,

“সমাজ যখন উৎপাদনের সমস্ত উপকরণ দখল ক’রে এবং পরিকল্পিত ভিত্তিতে সেগুলিকে ব্যবহার ক’রে তাদের নিজেদেরই উৎপাদনের উপকরণ যা একটা পরক শক্তি হিসেবে তাদের সম্মুখীন সেটার যে-দাসত্বে তারা এখন আবদ্ধ সেটা থেকে সমাজ নিজেকে এবং তার সমস্ত সদস্যকে মুক্ত করবে, কাজেই মানুষ যখন শুধু পরিকল্পনা করবে তাই নয়, ফয়সালাও করবে, একমাত্র তখনই এখনও ধর্মে প্রতিফলিত শেষ পরক শক্তি মিলিয়ে যাবে, আর তার সঙ্গে মিলিয়ে যাবে খাস ধর্মীয় প্রতিচ্ছায়াও, তার সহজ-সরল কারণ হল এই যে তখন প্রতিফলিত করার মতো আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না।

“কিন্তু ধর্মের এই স্বাভাবিক মৃত্যু অর্থাৎ অপেক্ষা করতে পারছেন না হের ড্যারিং। তিনি এগোচ্ছেন আরও গভীর প্রসঙ্গ কায়দায়। তিনি বিসমার্কেও ছাপিয়ে যাচ্ছেন; তিনি আরও কঠোর মে আইন জারি করছেন [১৮৭৩ সালের মে মাসি ক্যাথলিক চার্চের বিরুদ্ধে কুলটুরকাফের সময় যে-আইন বিসমার্ক বলবৎ করেন] ক্যাথলিকতন্ত্রের বিরুদ্ধেই শুধু নয়, যে-কোন এবং সমস্ত ধর্মের বিরুদ্ধে; নিজ ভবিষ্য জ্ঞান্দার্সদের তিনি লেলিয়ে দিচ্ছেন ধর্মের বিরুদ্ধে, আর ঐ ভাবে সেটার শহিদত্ব এবং দীর্ঘায়ুর সহায়ক হচ্ছেন।”

উদ্ধৃতি কিছু দীর্ঘ হলো। এটা আমার লেখার স্বভাববিরুদ্ধ। কিন্তু একটি কারণেই এমন উদ্ধৃতির সহায় নেওয়া। এর আর ব্যাখ্যার কোনও প্রয়োজন নেই। অধ্যায়ের শুরুতে উত্থাপিত জরুরি প্রশ্নগুলির উত্তর অন্ততঃ উত্তরের ইঙ্গিত, এই উদ্ধৃতির মধ্যেই পাওয়া যায়। (খটমট ভাষা কিছু বাধা হতে পারে। তার দায়িত্ব এঙ্গেলসেরও নয়, আমারও নয়, সোভিয়েত প্রকাশনা সংস্থার অনুবাদকের।)

এঙ্গেলসের লেখা পড়তে পড়তে মনে হয় ধর্ম যেন রাষ্ট্রের মতো। নানা কারণে দুটি প্রতিষ্ঠানই গড়ে তোলেন মানুষ। এখন প্রতিষ্ঠানদুটি কমবেশি সর্বত্রই শোষণপীড়নের সহায়ক ভূমিকা পালনেই বাস্তব। কিন্তু কোনও ইচ্ছাশক্তি বা পেশীশক্তি দিয়েই এদের অন্ত ঘটানো যাবে না। যে-মাটির ওপর এরা দাঁড়িয়ে আছে

সেই ভিত্তিভূমি সরিয়ে নিতে পারলেই এরা চলে যাবে বিলুপ্তির পথে, অনিবার্যভাবেই।

ভারতের কবি-দার্শনিক, রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাটক ‘অচলায়তন-’এ পেশীশক্তির এই বৃথা আশ্বাশ্বলনের কথাই লিখেছিলেন।

অচলায়তন ভেঙে শোনপাংশুর দল ঢুকে পড়েছে ভেতরে। মহাপঞ্চকের মুখোমুখি তারা। মহাপঞ্চক ভীত নন, মাথা উঁচু করেই তিনি তাদের সম্মুখীন।

“মহাপঞ্চক।

কিসের ভয় দেখাও আমায়। তোমরা মেরে ফেলতে পার, তার বেশি ক্ষমতা তোমাদের নেই।

প্রথম শোণপাংশু।

ঠাকুর এই লোকটাকে বন্দী করে নিয়ে যাই—

আমাদের দেশের লোকের ভারি মজা লাগবে।

দাদাঠাকুর। ওকে বন্দী করবে তোমরা? এমন কী বন্ধন তোমাদের হাতে আছে।

দ্বিতীয় শোণপাংশু। ওকে কি কোনো শাস্তিই দেব না।

দাদাঠাকুর। শাস্তি দেবে! ওকে স্পর্শ করতেও পারবে না। ও আজ যেখানে বসেছে সেখানে তোমাদের তলোয়ার পৌঁছয় না।”

সেদিন মস্কোতে বুলডোজার দিয়ে বিশ্বাসের গীর্জা ভেঙে মাটিতে গুঁড়িয়ে দিচ্ছিল যারা, দিতে দিতে ভাবছিল, চিরকালের জন্যে মুছে ফেলা গেল ঈশ্বর ও ধর্মবিশ্বাস, সেই শোণপাংশুদের বুঝিয়ে বলার মতো কেউ সেখানে ছিল না। না এঙ্গেলস, না লেনিন, না রবীন্দ্রনাথ, না অন্য কোনও দাদাঠাকুর। ফলে, গীর্জা গুঁড়িয়ে গিয়েছিল, কিন্তু শহিদের মর্যাদা পুণ্যে গিয়েছিল ধর্ম। সাত দশক পরে তাই প্রথম সুযোগেই ফিরে এসেছে সাতগুণ হয়ে।

নাস্তিকতার পূজারী ও অবতারের দল যখনই গলার কিংবা গায়ের জোরে বিশ্বাসের বিরুদ্ধে নিজেদের অবিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠা করতে চান, তাঁরা আসলে তখন বুদ্ধ-চার্বাক-ডু্যারিং এবং নৈরাজ্যবাদীদের পথে চলতে আরম্ভ করেন। ফলে তাঁরা ধর্মের অবসান ঘটাতে গিয়ে বা অবসানের নামে আসলে ‘সেটার শহিদত্ব এবং দীর্ঘায়ুর সহায়ক’ হয়ে ওঠেন।

মানুষ মাত্রেরই ভয়ংকর অসহায়। কোনও-না-কোনও সময়ে কোনও-না-কোনও কারণে (হয়তো বা অকারণেও) প্রায় প্রত্যেক মানুষেরই জীবনে এই অসহায়তা অসম্ভব তীব্র হয়ে ওঠে। মনে হয় যেন ডুবেরি যাচ্ছে সে। তখন নিরুপায় মানুষ আঁকড়ে ধরতে চায় খড়কটোকেও। আর ঈশ্বর তো ‘সর্বশক্তিমান।’ রণে-বণে-জলে-জঙ্গলে সর্বত্রই তিনি মানুষের আশ্রয়, তার রক্ষাকর্তা। আর ধর্মের সৃষ্টি ও অস্তিত্ব সেই ঈশ্বরকে পাওয়ার জন্যেই।

আসলে ঈশ্বরের অস্তিত্ব মানুষেরই মনে। প্রকৃতি ও পারিপার্শ্বিকদের নানা

কালক্রমে মানুষের মনোভূমিতেই ঈশ্বরের সৃষ্টি ও বৃদ্ধি। মনকে তরবারি দিয়ে জয় তো দেয়া কথা, স্পর্শও করা যায় না। ঈশ্বরে বিশ্বাসী মন যেন অচলায়তনের মতাপস্রক।

সুতরাং সত্যিকারের নাস্তিক ও বস্তুবাদীর কাজটা সহজ নয়। মানুষের মনকে দলে দিতে হবে। প্রকৃতির রহস্য এমনভাবে উদঘাটন করে দিতে হবে তার সামনে যাতে সব না হোক অনেক প্রজন্মের উত্তর সে পেয়ে যায়। তার অজ্ঞতাজনিত অসহায়তার অনেকখানিই দূর হয়ে যায়। এস্কেলস লিখেছেন, ‘প্রকৃতির শক্তিগুলো সম্বন্ধে একমাত্র সত্যিকার জ্ঞানই দেবতাদের কিংবা ঈশ্বরকে একটার পর একটা অবস্থান থেকে উচ্ছেদ করে।’ সেই সঙ্গে তার পারিপার্শ্বিক ও সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও সম্পর্কগুলিকে এমনভাবে পালটে ফেলতে হবে যাতে মানুষ অন্য এক মানুষ হয়ে ওঠে। সে বাস করতে থাকে একেবারে অন্য এক ধরনের সমাজে। যেমন সমাজের ইঙ্গিত এস্কেলসেই পেয়েছি আমরা। তখন তার অসহায়তার প্রায় সবটুকুই লুপ্ত হয়ে যাবে। সমাজব্যবস্থার জটিল প্যাচগুলির ওপর নির্ভর করেই। মানুষের অসহায়তার পটভূমিতে ঈশ্বর ও ধর্মের জন্ম। সেইসব প্যাচ এবং সেই পটভূমি সরিয়ে দিতে পারলে, একেবারে ভিন্ন চরিত্রের পটভূমির আশ্রয় পেয়ে গেলে অসহায়তার তীর তাকে আর বিদ্ধ করতে পারবে না। তখন ঈশ্বর এবং ধর্মের প্রয়োজনও আর থাকবে না। মানুষের পূর্বপুরুষের দেহের অবিচ্ছেদ্য অংশ তার লক্ষ্যল যেমন অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ায় অব্যবহারে অব্যবহারে একদিন বিলীন হয়ে গিয়েছিল, অপ্রয়োজনীয় এবং অব্যবহার্য ঈশ্বর ধর্মেরও দশা হবে তেমনি।

মানুষের এই পৃথিবী ও সমাজকে এবং পৃথিবীতে বাসকারী মানুষের মন বদলে দিতে হবে আগে। তারপরে শুরু করা যাবে কল্প স্বর্গবাসী ঈশ্বরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ। আগের কাজটা সেরে নিতে পারলে পরের কাজটা কঠিন হবে না আদৌ।

এই কাজে যাঁরা মন দিতে চান তাঁদের আবশ্যই মনে রাখতে হবে মানুষের আবেগকে—ধর্মীয় আবেগকেও—অসম্মান করে, আঘাত দিয়ে নাস্তিক আপন মনে যতোই আরাম পান, তাতে মানুষের মনকে স্পর্শও করা যায় না, সে মন মুক্ত করা তো বহু দূর।

কিন্তু ধর্মের এই স্বাভাবিক মৃত্যু অবধি অপেক্ষা করতে পারছেন না আজকের অতি উৎসাহী ড্যারিং-এর দলও। আগের কাজ না করে তাঁরা মেতে উঠতে চান পরের কাজে। ফলে পরের কাজও হয় না, বরং তাঁদের লক্ষ্যবস্তুর ফলে ঈশ্বরের ও ধর্ম নূতন জীবন, দীর্ঘতর আয়ু পেয়ে যায়। সত্যিকারের যুক্তিবাদী ও বস্তুবাদীকে ধৈর্যশীল, সহনশীল হতেই হয়।

পেশী আশ্ফালনকারী নকল নাস্তিকদের থেকে দূরে সরে দাঁড়িয়ে, সং কিন্তু অধৈর্য নাস্তিকদের ধৈর্য ধরে বোঝাতে হবে, ‘আগের কাজ আগে তো তুমি সারো

পরের কথা ভাবিও পরে আরও।’

ইতিমধ্যে চলতে থাকবে বৈজ্ঞানিক ভাবনা, যুক্তিবাদী বিচার, মনের সঙ্গে মনের চুক্তি-সংঘাত-চুক্তি এবং এই ভাবেই মুক্তির পথসন্ধান, আর এই সমগ্র প্রক্রিয়া জুড়ে চলবে ক্রমাগত জাগ্রত হওয়া ও ‘জাগ্রত’ করার যুদ্ধ। কিন্তু যুদ্ধ একা একা করা যায় না। এ যুদ্ধ তো একেবারেই না। তাই, সংযম শরণম গচ্ছামি।

AMARBOL.COM

ধর্মের অনুপ্রবেশ : এশিয়ায় আন্তঃরাষ্ট্র

সম্পর্কের রদবদল

রাধারমণ চক্রবর্তী

আলোচনার ক্ষেত্র নিয়ে নিবন্ধের শিরোনাম যাতে প্রমাদ না ঘটায় সেজন্য শুরুতেই এর চৌহদ্দি চিহ্নিত করে দেওয়া ভালো। আসলে এই জাতীয় বিষয় নিয়ে নানা প্রসঙ্গ নানাভাবেই উত্থাপিত হতে পারে। সমগ্র এশিয়া ভূখণ্ড ব্যাপী কোনো সাধারণ পর্যালোচনা প্রার্থিত হলেও সীমিত পরিসরে সেটা সম্ভব নয় ; বরং এই মহাদেশের বিশেষ সংবেদনশীল এবং কিছু পরিমাণে উপদ্রুত এলাকাগুলিতে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে একটা প্রেক্ষিত রচনা করা চলে। সেই প্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় বিচার্য বিষয়টি এভাবে স্থির করা যাক—অতি সাম্প্রতিক কালে রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারণ ও পরিচালনায় ধর্মাশ্রয়ী শক্তিগুলির ক্রমেই যে ধরনের প্রভাব স্পষ্ট হয়ে দেখা দিচ্ছে বিদেশনীতি তার থেকে কতোটা মুক্ত থাকতে পারে সেটা বুঝে নেওয়া দরকার। যেখানে পারছে এবং যেখানে পারছে না, সেখানে প্রতিষেধক ব্যবস্থা কিভাবে কতোটা কার্যকরী সে প্রশ্ন একই সঙ্গে এসে যায়।

বৈদেশিক সম্পর্ক পরিচালনায় ইদানীং লক্ষ্য করা যাচ্ছে, ধর্ম একটি সংবেদনশীল মাত্রা আরোপ করেছে এবং ক্রমেই বৈধতা পাওয়ার দিকে এগোচ্ছে। যে কারণে বিদেশনীতির প্রয়োগ কৌশলের মধ্যে ধর্মের আবেদন ক্রমেই বেশি পরিমাণে ব্যবহার করা হচ্ছে। সুতরাং অনুসন্ধান করে দেখা যেতে পারে ধর্মের মুখোমুখি বিদেশনীতিকে দাঁড় করানো এবং উন্মোচিত করার পদ্ধতি-প্রকরণ কি ধরনের। সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রগুলির পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে কি এর প্রতিফল সেটাও বিশ্লেষণ করা দরকার। এই আলোচনায় যেহেতু সমকালীন অভিজ্ঞতা থেকেই তথ্য প্রমাণ ও নিদর্শন আহরণ করা হবে, সেহেতু দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী বিচারের যদি মতপার্থক্য ঘটে তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। তবে যে ঘটনার যে ব্যাখ্যাই দেওয়া হোক না কেন তার বাস্তব ভিত্তিকে উপেক্ষা করা মারাত্মক ভুল হবে। বর্তমান আলোচনায় যে দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করা হয়েছে তাতে প্রধানত জোর দেওয়া হয়েছে নিম্নোক্ত কয়েকটি বিষয়ের ওপর।

(এক) যদি মনে করা হয় রাজনীতি বা তৎসম্পর্কিত সমস্ত কার্যকলাপ থেকে ধর্মকে নির্বাসন দেওয়া যায় তাহলে সেটা বাস্তবের চূড়ান্ত বিকৃতি ঘটাবে। অন্য সমস্ত

সামাজিক শক্তিগুলির মত ধর্মেরও রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি হয়ে যায় নানাভাবেই। সম্পূর্ণভাবে ধর্ম থেকে বিল্লিষ্ট রাষ্ট্রব্যবস্থার এখনও কল্পনার বাইরে কোথাও অস্তিত্ব নেই। প্রকৃতপক্ষে প্রাচীন থেকে আধুনিক স্তরে উত্তীর্ণ হওয়ার সময় কোনো সমাজই জনস্বার্থ রক্ষার কাজে ধর্মকে অস্বীকার করতে পারেনি—কোথাও কোথাও ধর্মকে বড়জোর প্রান্তিক অবস্থানে রেখে দেওয়া হয়েছে। আধুনিক সমাজের চরিত্র কোনো অর্থেই অধ্যাত্মবিরোধী কিংবা ধর্মবৈরী নয়। বরং বলা যায় উন্নত বা স্বল্পোন্নত উভয় সমাজেই পরিশীলিত আচরণের অথবা স্বার্থজয়ী মনোভাবের উদ্বোধনের ধর্মীয় মূল্যবোধের আশ্রয় অনেকসময়ই ফলপ্রসূ হয়েছে।

(দুই) রাষ্ট্রের সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় ধর্মের অনুপ্রবেশ ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রে যদি হয় সরাসরি, পরোক্ষভাবে হতে পারে অন্যত্র ধর্মনিরপেক্ষতা বজায় রাখা সত্ত্বেও। সরকারিভাবে যেখানে ধর্মনিরপেক্ষতার নামাবলী জড়ানো হয়ে থাকে, সেখানে ধর্ম সংশ্লিষ্ট বিষয়ের মোকাবিলায় প্রশাসন খানিকটা চাপের মধ্যে থাকেই। বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায়ের দাবিদাওয়ার সামনে রাষ্ট্রনেতাদের প্রায়ই অস্বস্তির মধ্যে পড়তে হয়। তুলনামূলকভাবে ধর্মভিত্তিক কিংবা প্রকাশ্য সাম্প্রদায়িক পক্ষপাত নিয়ে চলা রাজ্যপাট এ ব্যাপারে আদৌ বিব্রত হয় না। বরং এ ধরনের রাষ্ট্র কোনো বিশেষ একটি ধর্মের ধ্বজাধারী হিসেবে কাজ করাকে তার স্বাভাবিক ক্রিয়াকর্ম, এমনকি দায়বদ্ধতার অঙ্গ বলেই মনে করে। উদারপন্থী ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র এরকম ডাहा সাম্প্রদায়িক ভূমিকার জন্য প্রস্তুত থাকে না। যদি কোনো কারণে ধর্মের ডাকে সাড়া দিতেই হয়, তাহলে সেটা ঘটবে অতি সতর্কভাবে এবং যথাসম্ভব অলক্ষ্যে। প্রসঙ্গত যে রাষ্ট্র মার্কসবাদী সমাজতন্ত্রের পথ অনুসরণ করতে চায় সে রাষ্ট্র অন্তত তত্ত্বগতভাবে, দেশের আভ্যন্তরীণ প্রশাসনে অথবা বৈদেশিক নীতি নির্ধারণে ধর্মকে এতটা প্রশ্রয় দিতে বাধ্য থাকেনা। কারণ সেখানে মানুষের মধ্যে ধর্ম বিশ্বাসের অস্তিত্ব সত্ত্বেও সকলেই আনুষ্ঠানিক ধর্মের চেয়েও বৈপ্লবিক কিছু সম্পন্ন করায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ধর্ম যাতে সেই বৃহত্তর বৈপ্লবিক লক্ষ্যসাধনের প্রতিবন্ধক না হয় সেজন্য সচেতন হয়ে ওঠা সমাজতান্ত্রিক সমাজের অন্যতম দায়িত্ব। সেই অর্থে প্রকৃত সমাজতান্ত্রিক দেশের বিদেশ নীতি অনেকাংশেই জটিলতা-মুক্ত থাকতে পারে। তাসত্ত্বেও সেখানে ধর্মের ওপর রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন চলতে থাকলে, বিক্ষুব্ধ মানুষের পক্ষে বৈরী বহিঃশক্তির হস্তক্ষেপ বেশিদিন ঠেকানো যায় না, যেমন হয়েছিল হাঙ্গেরি (১৯৫৬) কিংবা পোল্যান্ডে (১৯৮০ দশকে)।

(তিন) আন্তঃরাষ্ট্র সম্পর্ককে প্রভাবিত করলেও ধর্ম শেষপর্যন্ত তার উর্ধ্বে উঠতে সফল হয় না। সাময়িকভাবে ধর্মীয় শক্তিসমূহের সঙ্গে সমঝোতা করে চললেও রাষ্ট্রের চূড়ান্ত কর্তৃত্বমূলক মনোভাব তার ফলে দীর্ঘকাল বশীভূত হয়ে থাকবে এমন ভাবার কোনো কারণ নেই। জাতিতে জাতিতে রাজনৈতিক সম্পর্ক রচনায় ধর্মের অনুপ্রবেশ তখনই এবং ততদূর সম্ভব যতোটা রাষ্ট্রের সায় থাকে। রাষ্ট্র মধ্যস্ততা

করতে রাজি হয় বলেই ধর্মতার পক্ষপূট বিস্তার করতে পারে জাতীয় সীমানার বাইরে। আবার ধর্মকে আন্তর্জাতিক রাজনীতির আঙিনায় টেনে আনলে যেসব জটিলতার উদ্ভব হয়, তার সমাধানও দিতে হয় প্রশাসনিক ও কূটনীতিক কাঠামোর মধ্যে। সাম্প্রতিককালে এর সবচেয়ে শিক্ষণীয় উদাহরণ ভারতবর্ষে মন্দির-সমজিদ বিতর্কের নিরসনে রাষ্ট্রের ভূমিকা। ভারতবর্ষের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শাসক গোষ্ঠীর ঝামেলা দেখা দিয়েছে হিন্দু ও মুসলিম ধর্মাবলম্বী মানুষের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক সাম্প্রদায়িকতায়। রাষ্ট্রনেতারা ক্ষমতাসীন হওয়ার আয়োজনে এর কোনো গোষ্ঠীরই সমর্থন হারাতে চায় না ; আবার প্রকাশ্যে পক্ষপাতমূলক অবস্থান নেওয়াও বিপজ্জনক। অথচ নিষ্ক্রিয় নিশ্চূপ হয়ে থাকাও চলে না যখন রাষ্ট্রীয় নীতি নির্দেশ (অথবা তার অভাব) বিদেশে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার জন্ম দেয়, বিশেষত সেই প্রতিক্রিয়া যদি পাকিস্তান বা বাংলাদেশের বৃহত্তম জনগোষ্ঠীর পক্ষ থেকে প্রকাশ পেয়ে থাকে। ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তাবিধান, যা নাকি আসলে অভ্যন্তরীণ প্রশাসনের মাথাব্যথা, সেটি এভাবে ক্রমেই আন্তঃরাষ্ট্র কূটনীতির অঙ্গ হয়ে ওঠে। যে সম্পর্ক অন্য নানা কারণেই বিদ্বেষ-ভাবাপন্ন তার সঙ্গে ধর্মীয় সংখ্যালঘুর প্রশ্রয় জুড়ে গিয়ে সংঘাত বাড়িয়ে তোলে। নতুন করে বোঝাপড়ার প্রয়োজন দেখা দেয় সাম্প্রদায়িক অশান্তি ঠেকাতে। নীতি-নির্ধারক এবং কূটনীতিকরা এজন্যই বাধ্য হন ধর্মীয় অসন্তোষ ঘটিত বিষয়গুলিকে অন্য বিরোধমূলক বিষয়ের থেকে আলাদা করে দেখতে।

এবার সামগ্রিকভাবে আন্তঃরাষ্ট্র সম্পর্কের পটভূমিতে রাষ্ট্র ও ধর্মের সংযোগের প্রশ্নে আসা যাক। আজকের দিনে সুকলেরই কাছে এটা পরিষ্কার যে বিশ্বরাজনীতিতে রাষ্ট্রই একমাত্র এবং সর্বসর্বা ভূমিকা পালন করে না ; তারা সহযোগী ও প্রতিযোগী অনেক সংস্থাই এখন আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সক্রিয়। বর্তমান প্রেক্ষিতে অসংখ্য অরাষ্ট্রীয় (non-state) সংস্থা বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছেন। কোনো কোনো সংস্থা অর্থনৈতিক ও অন্য ক্ষমতার জোরে এতই প্রবল যে দুর্বল রাষ্ট্রগুলি তাদের রীতিমত সমীহ করে চলতে বাধ্য হয়। এর থেকে রাষ্ট্রকেন্দ্রিক আন্তর্জাতিক আলোচনা ক্রমেই প্রাসঙ্গিকতা হারাচ্ছে। পক্ষান্তরে তার জায়গা অনেকাংশ গ্রহণ করছে রাষ্ট্রের বিভিন্ন সংস্থা ও গোষ্ঠী। এইসব সংস্থা ও গোষ্ঠীর যে কিছু পরিমাণ কর্ম স্বাভাব্য রয়েছে সেটাও অস্বীকার করার উপায় নেই। প্রয়োজনে এরা রাষ্ট্রকে উপেক্ষা করে কিংবা পাশ কাটিয়ে গিয়ে নিজেদের কার্যসিদ্ধি করতে পারে। আবার ক্ষেত্র বিশেষ তারা রাষ্ট্রকে নিজেদের কর্মকাণ্ডে ব্যবহার করতে পারে। কাজেই বর্তমান দুনিয়ায় ভালোমন্দ যা কিছু ঘটানো হচ্ছে তার সবটাই রাষ্ট্রের একক ইচ্ছায় ঘটছে সেটা মনে করার তেমন কারণ আর থাকছে না। আজকের আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা বহু-কেন্দ্রিকতায় বিশেষিত। উৎপাদন ও বাণিজ্যে নৃজাতিক সংস্থা, ধর্ম-সংস্থাপনে গীর্জা-গুরুদ্বার-মন্দির-মসজিদের বিশ্বজোড়া

‘নেটওয়ার্ক’, সবুজায়নের পক্ষে তামাম দুনিয়ার আন্দোলনের জোয়ার এখন শুধু নজর কাড়ছে না ; ক্রমেই পরিচিত দৃশ্য হয়ে উঠছে। তবে ধর্মের ক্ষেত্রে এটুকু বিশেষ করে লক্ষ্য করার যে অন্য সংস্থা বা আন্দোলনের তুলনায় রাষ্ট্রের সঙ্গে এর কোনো ষড় থাকলে সেটা ধরে ফেলা তুলনামূলক ভাবে সহজ। রাষ্ট্রের পরোক্ষ/প্রত্যক্ষ মদত ছাড়া কোনো ধর্ম সম্প্রদায় দেশের সীমানা পেরিয়ে অন্যত্র সমধর্মীয় সম্প্রদায়গুলির সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে কাজে নামতে স্বস্তি বোধ করে না। এজন্য বলা হয়ে থাকে : “It is not religion-qua-religion that acts in the field but religion with a definite back-up of state power that ultimately does the trick”.

*

*

*

সমকালীন আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ধর্মের অনুপ্রবেশ ও জাল বিস্তারের টাটকা উদাহরণ মিলবে এশিয় মহাদেশের তিনটি বিস্তীর্ণ অঞ্চলে দক্ষিণ, মধ্য ও পশ্চিম এশিয়ায়। অন্য মহাদেশেও এর নজীর ছড়িয়ে থাকতে পারে, যেমন যুগোস্লাভিয়ার রাষ্ট্রিক ভাঙনের পথ ধরে সেখানে ধর্ম ও জাতিসত্তার নামে রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধের দীর্ঘ মহড়া কিংবা উত্তর আয়ারল্যান্ডে ক্যাথলিক ও প্রটেস্ট্যান্ট গোষ্ঠীর প্রায় অনন্ত কাল ধরে চলতে থাকা সংঘর্ষ। এসব ইয়োরোপীয় ঘটনাপ্রবাহ অবশ্যই লক্ষ্য করার ও বিশ্লেষণের উপযুক্ত বিষয়। তবে এশিয়ায় ঘটমান ধর্মীয় উপদ্রবের ব্যাখ্যা দিতে হলে একই দৃষ্টিকোণ নিলে চলবে না। দক্ষিণ এশিয়ার এক অতি বৃহৎ ভূখণ্ড জুড়ে রয়েছে পুরোন ঐতিহ্য আবদ্ধ একাধিক মানব সমাজ যারা ধর্মকে এখনও প্রাধান্য দেয়। সেসব সমাজে জাতিগত ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে এক ধরনের মিশ্র-সংস্কৃতিও বহু সম্প্রদায়-ভিত্তিক পটভূমিতে। এসব সমাজে যখন সাম্প্রদায়িক বিরোধ ও দাঙ্গাহাঙ্গামা দেখা দেয়, তখন উদ্ভূত পরিস্থিতি বেশিদিন স্থানীয় গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকতে পারে না। বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাসী মানুষ যেমন একদেশে বসবাস করছে তেমনই সমধর্মাবলম্বী মানুষ ছড়িয়ে রয়েছে দেশ থেকে দেশান্তরে। কোথাও তারা সংখ্যাগুরু, অন্য সর্বত্র তারাই আবার সংখ্যালঘু। কাজেই কোনো একটি দেশে সংখ্যালঘু ধর্মসম্প্রদায় রাষ্ট্রীয় ও পৌর কর্তৃত্বের কাছে কি ধরনের ব্যবহার পেয়ে থাকে বা আশানুরূপ স্বস্তি অনুভব করে বা করেনা তার প্রচার সংলগ্ন রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রসমূহে অবস্থানকারী ঐ ধর্মাবলম্বী সংখ্যাগুরু মানুষদের আলোড়িত করবেই। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলি, বিশেষ করে ভারতীয় উপমহাদেশে অবস্থিত দেশগুলি এ ধরনের সাম্প্রদায়িক সংবেদনশীলতার (communal reflex) স্থায়ী নিদর্শন হয়ে রয়েছে। এ অঞ্চলের অনেকগুলি দেশেই আবার ধর্মীয় মৌলবাদের হাতে বন্দী হয়ে পড়ছে। এই মৌলবাদকে সাধারণ অর্থে ধর্মীয় অনুগত্য থেকে পৃথক করে দেখতে হয় কেননা ব্যক্তিমানুষের ধর্মীয় অনুগত্য নিয়ে আন্তঃরাষ্ট্র সম্পর্ক তত বেশি বিচলিত হয়নি যতোটা আজ বাধ্য হচ্ছে মৌলবাদের চাপে পড়ে।

এটা তো স্পষ্ট যে হাজার হাজার বছর ধরে নানা জাতের মানুষ নানা ধর্ম অবলম্বন করে বসবাস করেছে। তা নিয়ে এক রাষ্ট্রের সঙ্গে আর এক রাষ্ট্রের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হওয়া বা তিক্ত হওয়া তেমন অনিবার্য ছিল না। অন্তত আরব-ইহুদীদের সংঘাতের কিংবা ইয়োরোপীয় ক্রুজেড্-এর পর্বে পৌঁছনর আগে পর্যন্ত। পুরোন সাম্রাজ্যবাদের পর্বে বিজয়ী শক্তিগুলি পদানত মানবগোষ্ঠীর ওপর নিজেদের ধর্ম চাপিয়ে দেওয়ার যে চেষ্টা চালিয়েছিল সেটা প্রধানত অভ্যন্তরীণ শাসন কায়ম রাখার-স্বার্থে। আরও পরবর্তীকালে খ্রিষ্টধর্ম সংস্কার নিয়ে ইয়োরোপজুড়ে আলোড়ন এবং ত্রিশবছরের যুদ্ধশেষে আন্তঃরাষ্ট্র সম্পর্কের পুনর্বিন্যাস ধর্ম নিয়ে মাতামাতি কমিয়ে আনে। তুলনায় আজকের পৃথিবীতে ধর্মীয় পার্থক্য যে এক বিস্ময়কর শক্তি হিসেবে দেখা দিতে চলেছে তার প্রধান কারণ মৌলবাদী ব্যাখ্যায় ধর্মের এখন সম্পূর্ণ ভিন্ন চেহারা। সম্পূর্ণ ভিন্ন বাধ্যবাধকতা।

মৌলবাদ মূলত এক বাধ্যতামূলক মনোভঙ্গীর প্রকাশ। জীবন সম্বন্ধে এর থেকে এমন এক দৃষ্টিভঙ্গী সঞ্চারিত হয় যা পরিবর্তনশীলতাকে গ্রহণ করতে চায় না। যার ফলে সমাজকে আধুনিক জীবনচর্যার উপযুক্ত করে তোলা অসম্ভব হয়ে পড়ে। কতকগুলি অনড় বিশ্বাস ও অভ্যস্ত আচরণের ঘোরাটোপে ধর্মকে এভাবে বেঁধে ফেলা হয়। কিন্তু মৌলবাদীরা পরিবর্তন বিরোধী হলেও গতিশীল বিশ্বসংসার যেহেতু থেমে থাকছে না মৌলবাদীর কাছে সেটাই আরও একটা উদ্বেগের কারণ। ফলে তার একটা দ্বিতীয় স্বভাবতই দাঁড়িয়ে যায় সমস্ত রকম সংস্কার ও পরিবর্তনপন্থী শক্তি ও আন্দোলনকে সন্দেহের চোখে দেখা এবং প্রতিহত করা। যে কোন ধর্মের প্রবক্তা বা আচার-সর্বস্ব পুরোহিত সম্প্রদায় যখন এইরকম একটা মানসিকতা সৃষ্টি করতে সফল হয় তখনই আক্রান্ত হয় বহু-ধর্মের সহাবস্থানে বিশ্বাসী মানবসভ্যতার সূস্থিতি। এক অসহনীয়তার মনোভাব এভাবেই তৈরি হয় যা নিজের সাম্প্রদায়িক চৌহদ্দির মধ্যে বিন্দুমাত্র বিচ্যুতি বরদাস্ত করে না এবং অন্য যেকোনো ধর্মীয় ঐতিহ্যের প্রতি ঔদ্ধত্যপূর্ণ অবজ্ঞা বৈরিতাকে প্রশ্রয় দেয়। প্রায় সব ধরনের প্রতিষ্ঠিত ধর্মই-খ্রিষ্টান, মুসলিম, ইহুদী অথবা হিন্দু—এই প্রবণতা দেখা দিতে পারে, বিশেষত যখনই সেখানে আত্মবিশ্বাসের অভাব জাগতে শুরু করে। জীবনের নিত্যনতুন চ্যালেঞ্জগুলির জবাব দিতে যখনই কোনো প্রতিষ্ঠিত ধর্ম-সংস্থান বা ধর্মীয় নেতৃত্ব ব্যর্থ হয় তা সে সামাজিক অনগ্রসরতা দূরীকরণের প্রশ্নেই হোক কিংবা অর্থনৈতিক বিকাশ পরিচালনার তাগিদেই হোক, তখনই একধরনের তীব্র প্রতিক্রিয়ার জন্ম হল। ধর্মবিশ্বাসের যারা ধারক-বাহক বলে আশ্ফালন করে এসেছে তারা অন্য সব সফল এবং গতিময় ধর্মীয় সমাজের সামনে ক্রমেই নিজেদের আক্রান্ত বলে মনে করতে থাকে। এরা তখন অস্থির হয়ে পড়ে কি ভাবে ভিতর থেকে আসন্ন সাংস্কৃতিক বিপ্লবকে ঠেকিয়ে রাখা যায়। জনমানসে স্বধর্মের প্রতি একরকমের কৃত্রিম গর্ববোধ জাগ্রত করা এবং এক অভূতপূর্ব কল্লরাজ্যের দিকে তাদের দৃষ্টি ফিরিয়ে

দেওয়া তখন মৌলবাদের অন্যতম প্রাথমিক কার্যক্রম হয়ে দাঁড়ায়।

এশিয় ভূখণ্ডের বিগত কয়েক দশকের পরিস্থিতির ওপর নজর রাখলে দেখা যাবে মৌলবাদের সবচেয়ে বেশি প্রসার ঘটেছে ইসলাম ধর্মাবলম্বী সমাজগুলিতে। অথচ ইসলামের আদি ও অকৃত্রিম চেহারার সঙ্গে এর প্রভূত গরমিল। ধর্মগ্রন্থ কোরান কিংবা সামাজিক নীতিশাস্ত্র শরিয়তের যেসব বিধান দেওয়া আছে তার বিভিন্ন ভাষ্যের মধ্যে যেমন আছে গভীর রক্ষণশীলতা তেমনই আছে ধর্মগুলির সচলতা ও নবীকরণের গুরুত্ব প্রয়াস। এই কারণেই ঐশলামিক ধর্মবিশ্বাসের ছত্রছায়ায় নানা সম্প্রদায়ের উদ্ভব ও স্থায়িত্ব সম্ভব হয়েছে। যেখানে শাস্ত্র গ্রন্থের ব্যাখ্যায় বৈচিত্র্য এসেছে সেখানেই দেখা গেছে সমাজজীবনের কাম্য পরিবর্তনের হাওয়া এসে নতুনের সন্ধান জানিয়েছে। যতদিন ধ্রুপদী শাস্ত্র ভাবনা পরিবর্তনকে স্বীকার করে এসেছে ততদিন ধর্মীয় গোঁড়ামি মাথা চাড়া দিতে পারেনি। এমনকি সমাজের মঙ্গলবিধানে ধর্মের আধুনিকীকরণও কিছু পরিমাণে সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু যখনই আর্থসামাজিক পরিবর্তন বিদ্যমান ভারসাম্য তথা কায়েমী স্বার্থে আঘাত হানতে থাকল তখনই দেখা গেল ধর্মের অনুশাসন আর রাষ্ট্রের শাসন অদ্ভুত মিল খুঁজে পেয়েছে।

মৌলবাদকে সে অর্থে এক ধরনের রাষ্ট্রিক ব্যবস্থাপনার ধর্মীয় জোটসঙ্গী বলা চলে—যে ব্যবস্থা অন্য উন্নততর ব্যবস্থা থেকে আগত চ্যালেঞ্জের উপযুক্ত জবাব দিতে সক্ষম নয়। এর থেকেই বোঝা যায় বিদ্যমান বন্দোবস্তকে টিকিয়ে রাখার ব্যাপারে মৌলবাদীরা কেন এত উৎকর্ষিত এবং কেন অন্য কোনো বিকল্প তাদের কাছে পরিত্যজ্য। বিজাতীয় ব্যবস্থাকে খাদের কাছ থেকে ঠেকিয়ে রাখার কথা সেই অনুগামীদেরই স্বাতন্ত্র্য হরণ করে গিয়ে মৌলবাদ ক্রমে নিজের মধ্যেই একটা ‘টেনশন’ সৃষ্টি করতে থাকে। যে কালপর্বের সূত্র ধরে এই নিবন্ধের পটভূমি নির্ধারিত, সেই সময়ে এই ‘টেনশন’ সর্বাধিক প্রকট হয়েছে মধ্যপ্রাচ্যের ইরানে ধর্মীয় বিপ্লব ঘটে যাওয়ার ফলে। পশ্চিমী মতাদর্শ ও সমাজ ব্যবস্থা উভয়তই আক্রমণ হেনেছে ইরান বিপ্লব। ধর্মীয় উন্মাদনা সেখানে এতদূর গড়িয়েছিল যে, যে দেশের শাসনব্যবস্থায় কোরান সমাদৃত নয় সে দেশকে ইরান শত্রুভাবাপন্ন ছাড়া অন্য কিছু মনে করতে অস্বীকার করে। কোরানের বিকৃতি ঘটানোর দায়ে সলমান রুশদির কী হাল হয়ে ছিল তা সকলেরই জানা। আত্মরক্ষার জন্য সলমানকে শেষপর্যন্ত পশ্চিমী খ্রিস্টীয় সমাজের দ্বারস্থ হতে হয়েছিল। ইসলাম ও খ্রিস্টধর্মের মধ্যে এ অবশ্য এক প্রতীকী বিরোধমাত্র; আসলে এর গভীরে রয়েছে দুটি বিপরীত সংস্কৃতির সংঘাত যার একটিতে স্বচ্ছতার আবাহন উত্তরোত্তর প্রকট আর অন্যটিতে ফ একেবারেই বরদাস্ত নয়।

সে যাই হোক, ইসলামী মৌলবাদের ইরানই একমাত্র জনক নয়। বরং ইরানের মুখোমুখি মৌলবাদীরা দুটি বিবদমান শিবিরে বিভক্ত। একদিকে রয়েছে শিয়াপন্থী

মোম্বাদার সমর্থনপুষ্ট ইরানের জনগোষ্ঠী ; অন্যদিকে রয়েছে আরব দেশগুলিতে সুন্নি মতাবাদীদের প্রাবল্য। এই দুই ধারার মধ্যে একটিই মিল, তাহ'ল ক্ষমতার গুণাবল্যাসকে সমর্থন করে যাওয়া। ইরানের বাইরে শিয়া সম্প্রদায়ের তেমন জোর থাকে না। লেবানন, ইরাক কিংবা পাকিস্তানে শিয়াপন্থী মুসলমানেরা নিতান্তই দুর্বল সংখ্যালঘু (সমগ্র জনসংখ্যার ১২ থেকে ১৫ শতাংশ মাত্র)। তা সত্ত্বেও মৌলবাদী ক্রিয়াকলাপ ঘটিয়ে উভয় সম্প্রদায়ই অভ্যন্তরীণ বিবাদ-বিসংবাদ তীব্র করে তোলে এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মুসলিম দুনিয়ায় এক বিভাজনের সৃষ্টি করে। প্যালেস্তিনিয় মুক্তিমোর্চার মধ্যে যে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব আছে তার একটি অংশ (হেজবুলা নামে যারা পরিচিত) তারা এই সুযোগে তেহরানের কাছ থেকে মোটা অংকের অর্থসাহায্য ও অন্য প্রকার সমর্থন পেয়ে থাকে।

যদিও আরব দুনিয়ায় তুলনামূলকভাবে কয়েকটি প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গীসম্পন্ন শাসকগোষ্ঠী এখনও ক্ষমতাসীন (মিশর, সিরিয়া কিংবা ইরাক), তা সত্ত্বেও মৌলবাদ যে ভাবে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে এবং ক্রমেই অধিক সংখ্যায় মানুষকে আচ্ছন্ন করছে তাতে মনে হয় না এই কয়েকটি দেশের রাষ্ট্রনেতার পক্ষে সম্ভব হবে তার গতিরুদ্ধ করা। যেমন, সরকারি স্তরে এখনও নাসের অনুসৃত ধর্মনিরপেক্ষতা বজায় থাকলেও মিশরেই দেখা যাচ্ছে a stark and simplistic interpretation of Islam is capturing the popular imagination including even urban professionals. রাষ্ট্রপতি হোসনি মুবারকের মনোবল অটুট থাকবে যতদিন ততদিনই কেবল বিশ্বের এই বৃহত্তম আধুনিক মনোভাবসম্পন্ন আরব দেশে মুসলিম সেকুলারিজম-এর নিরাপত্তা। অন্যত্র যেমন সিরিয়া কিংবা ইরাকে, ক্রমাগত অর্থনৈতিক চাপের মধ্যে থাকার ফলে প্রক্রিয়াশীল শক্তিগুলিকে ঠেকিয়ে রাখা সরকারের পক্ষে দিন দিন কঠিন হয়ে পড়ছে। আরও পূর্বে সরে এলে, পাকিস্তান ও তৎসংলগ্ন আফগানিস্তানে তো মৌলবাদী ধর্মীয় নেতাদের ক্ষমতার চূড়ায় অবস্থান এক অর্থে সরকারিভাবেই নিশ্চিত করে তোলা হয়েছে। তালিবান সুলভ তাগুব না ঘটালেও পাকিস্তানের মোম্বাদা-মৌলবাদীদের এক বড় অংশ গণতন্ত্র তথা ধর্মনিরপেক্ষ আধুনিকতার পুনঃপ্রতিষ্ঠার পথে যে বিরাট বাধা তাতে সন্দেহ নেই। জিয়া-উল-হকের সময় দেশের সংবিধান ও আইন যেভাবে ইসলামায়িত হয়েছে পরবর্তীকালে জনসমর্থনে নির্বাচিত হয়েও প্রধানমন্ত্রী বেনজির ভুট্টো কিংবা নওয়াজ শরিফের সরকারের পক্ষে তার চিহ্ন মুছে ফেলা সম্ভব হয়নি। এখন উভয়েই ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতিতে দেশান্তরী কিংবা দেশ থেকে নির্বাসিত। ব্যক্তিগত জীবনের স্টাইল পশ্চিমী ধাঁচের হলেও সে দেশের বর্তমান সামরিক শাসনকর্তা মুশারফ সাহেব মৌলবাদ হটিয়ে ধর্মনিরপেক্ষতাকে ঠাই করে দেবেন, তার ক্ষীণতম সম্ভাবনাও চোখে পড়ছে না। অন্যদিকে ভারতবর্ষ পেছিয়ে বাংলাদেশে পৌঁছেলে নতুন গণতন্ত্রের জোয়ার এখন যেভাবে বইতে শুরু করেছে, তাতে মনে হয় মুজিবর রহমানের

নিধনের পর জঙ্গীশাসনকালে প্রবর্তিত ইসলামআশ্রয়ী রাষ্ট্রবিধান এখন কোণঠাসাই থাকবে। এর ফলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ভাবমূর্তিই শুধু উজ্জ্বল হবে না ; বিদেশনীতি নির্ধারণেও অনেক বেশি স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বাভাবিকতার লক্ষণ দেখা দেবে।

সাম্প্রতিক কালের এই মৌলবাদী ইসলামীকরণের পাশাপাশি ভারতভূখণ্ডে হিন্দুত্ব নিয়ে যে, রাষ্ট্রিক আলোড়ন চলছে, যিনি যেভাবেই দেখুন না, চূড়ান্ত অর্থে সেটি যতো না ধর্মীয় উন্মাদনা তার চেয়ে বেশি রাজনৈতিক ক্ষমতা বণ্টনের প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের তৎপরতা হিসেবেই উঠে এসেছে। এখানে সংখ্যালঘুদের ধর্মাচরণের স্বাধীনতা খর্ব করার প্রশ্ন ওঠেনি ; প্রশ্ন উঠেছে সংখ্যাগুরু হিন্দু সম্প্রদায়ের একাংশ প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি ও সনাতন মূল্যবোধের নিজস্ব ভঙ্গীতে সংজ্ঞায়িত করে দেশের সামগ্রিক জীবনচর্যায় একটি সাধারণ মডেল উপস্থাপনার ভূমিকা নিতে পারে কিনা। পক্ষে-বিপক্ষে যাই বলা হোক না কেন, এদেশের সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষিত থেকে এই প্রবণতাকে আলাদা করে দেখা ঠিক হবে না। মানতেই হবে যে নানা বিপদ-আপদ, অভাব অনটন, বাইরের হানাদারি সম্বন্ধেও ভারতবর্ষে গণতন্ত্র মজবুত হয়ে বসেছে। সেই গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার অন্যতম উপজাত দ্রব্য শুধু ব্যক্তি-স্বাধীনতার সচেতনাই নয়, বহুবিধ-বহুবিধ পুরসমাজ—যেখানে বিবিধের মিলন না ঘটুক সহজ সহাবস্থান সর্বস্তরেই অভিপ্রেত এবং যেখানে রাজনৈতিক ক্ষমতাবিন্যাসে শত কেন্দ্রীকরণ উপেক্ষা করেও আঞ্চলিক ও স্থানিক রাজনীতিক দাবিয়ে রাখা যায়নি, সেখানে জীবনচর্চার আদর্শ কোনো প্রতিরূপ (মডেল) রাষ্ট্রের উঁচু মঞ্চ থেকে চাপিয়ে দেওয়া চলে না। যদি কোনো প্রতিরূপ শেষ পর্যন্ত স্থায়ী-স্বীকৃতি পায় তাহলে বুঝতে হবে বহুবিধ-গোষ্ঠীর পরম্পরা এবং পারস্পরিক আদান-প্রদানের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা সেটি এক আশ্চর্য সমন্বয়। ভারতবর্ষের চিরন্তন সত্তার মধ্যেই এই সমন্বয়ের বীজ বহুযুগ আগে থেকেই উদ্ভূত হয়ে আছে। যখনই তার উপযুক্ত লালন সম্ভব হয়েছে তখনই এদেশে সভ্যতার গরিমা স্বয়ংপ্রকাশিত হতে পেরেছে। সেই অনুকূল পরিবেশ তৈরি করে দিতে পারলেই ভারতবর্ষের মত দেশের উপযুক্ত শাসক হওয়া সাজে। এর জন্য কেন্দ্র রাজ্য উভয় স্তরেই যে কোনো রকমের সাম্প্রদায়িক তোষণ-সংখ্যাগুরু কিংবা সংখ্যালঘু কোনো দিকেই যেন প্রকাশ না পায়। একালের রাজনীতি, দুর্ভাগ্যজনকভাবেই, এই একদিকে ঝুঁকে পড়ার-প্রবণতা থেকে মুক্ত হতে পারছে না।

তবে ভারতবর্ষের একটা সুবিধা এই যে এখানে বহুবিধ ধর্মবিশ্বাসের এক বিচিত্র সমাবেশ এবং সেই কারণে কোনো একটি সম্প্রদায়কে নিয়ে রাজনৈতিকস্তরে মাতামাতির খেসারৎ দিতে হবে যে কোনো রাজনৈতিক দলকেই। কারণ, আজকের রাজনীতি সুবিধা-সুযোগ বাঁটোয়ারার রাজনীতি। আর সাম্প্রদায়িকতার পাশাপাশি প্রায় সমান তালে উস্কানি পেয়ে চলেছে আঞ্চলিকতা। 'একজাতি একপ্রাণ একতা'

এই অভিধার উপযুক্ত হতে পারার সিরিয়াস এবং ফলপ্রসূ কোনো প্রয়াস স্বাধীনোত্তর পর্বে সেভাবে দান বাঁধেনি-যার ওপর সংখ্যাগরিষ্ঠের সাংস্কৃতিক প্রাধান্য-স্থিত হতে পারে এবং যাকে অবলম্বন করে রাষ্ট্র নেতারা একমুখী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হওয়ার দুঃসাহস দেখাতে পারেন। ঘটনাচক্রে যুক্তরাষ্ট্রীয় ভারতে এখন বেশকিছুকাল বহাল থাকবে সেই ধরনের শাসনব্যবস্থা যা অঞ্চল থেকে উঠে আসা সক্রিয় রাজনৈতিক শক্তিগুলির সমাহার—অর্থাৎ জোটবদ্ধ সরকার। সুতরাং মৌলবাদী রাষ্ট্রের যে চেহারা এশিয় মহাদেশের অন্যত্র দেখা দিয়েছে ভারতবর্ষে—তার প্রতিরূপ গড়ে ওঠার সম্ভাবনা এখনও তেমন প্রকট হতে পারেনি। পছন্দ হোক, না হোক, অনেক কিছু মেনে নিয়ে—অন্তত ধর্ম-সংস্কৃতি-ভাষা ইত্যাদি ব্যাপারে, না-চলতে পারলে কোনো জোট সরকারই এখানে বেশিদিন টিকে থাকতে পারবে না। মাঝেমাঝে গরমিল হয়তো হবে, উত্তেজনাও দেখা দেবে অবস্থা বিশেষে—কিন্তু ধর্মের ধ্বজা ধরে শাসনকার্য চালনার বাতুলতা মনে হয় জোটসরকারের প্রধান শরিকও দেখাতে চাইবে না।

সেক্ষেত্রে ভারতবর্ষের বিদেশনীতি পরিচালনায় একটা ধর্মনিরপেক্ষ মনোভাব যেমন কার্যকর থাকছে ও থাকবে, তেমনই মৌলবাদী প্রতিবেশ থেকে আগত সংক্রমণের অভিঘাতও তাকে সামলাতে হবে। এদেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘু মানুষের নিরাপত্তা প্রতিবেশী দেশগুলি তুলনায় যথেষ্ট উচ্চমানের এবং কোথাও কোনো আক্রমণাত্মক ঘটনা ঘটলে দেশবাসী সোচ্চার প্রতিবাদ এখনও বিফলে যায় না। এই অবস্থার যাতে অবনতি না হয় সেজন্য প্রতিটি সম্প্রদায়কেই প্রস্তুত থাকতে শুধু দেশের মধ্যে সুসম্পর্ক নয় বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও একটা স্পষ্ট দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনে। সেখানে অকারণে বারবার কোনো প্রতিবেশী রাষ্ট্র সম্মুখযুদ্ধে পরান্মুখ হয়ে পরিকল্পিতভাবে চোরাগোপ্তা আক্রমণ চালিয়ে যায়, সেখানে দেশের সংহতিরক্ষায় সংখ্যালঘু সমস্ত সম্প্রদায়ের এক অতিরিক্ত দায়িত্ব এসে পড়ে সামগ্রিকভাবে দেশের সাধারণ স্বার্থকে সমস্ত সংকীর্ণ স্বার্থের ওপর স্থান দেওয়ার। ঐতিহ্যগতভাবে মনোনীত কিংবা স্বনির্বাচিত ধর্মগুরুদের বক্তব্য ও আচরণে এক্ষেত্রে খুবই সতর্কতার পরিচয় থাকা দরকার। মৌলবাদ এমনই এক মারাত্মক বস্তু যে অতিসহজেই তার সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ে—যেমন হয়েছে পাকিস্তান থেকে আফগানিস্তান ঘুরে ভারতবর্ষ ও মধ্য এশিয়ার কোনো কোনো প্রান্তিক অঞ্চলে। ভেসে যাওয়া সোভিয়েত ইউনিয়নের মুসলমানপ্রধান গণপ্রজাতন্ত্রগুলিতে তাই পাকিস্তানসহ পশ্চিম এশিয়ার কয়েকটি দেশ, এমন কি ইরানও সক্রিয়ভাবে কূটনৈতিক উদ্যোগ চালিয়ে যাচ্ছে। সেখানে কিছু একটা সুযোগের প্রত্যাশায় ঘোরাঘুরি এখন অনেক দেশেরই—ব্যবসায়িক প্রয়োজনে ভারতবর্ষও তাতে যোগ দিতে পারে। সোভিয়েত আমলের পুরোন মৈত্রী পরিবর্তিত পরিস্থিতিতেও বজায় থাকে কিনা সেটা নির্ভর করছে ঐ সব বিচ্ছিন্ন-হয়ে-যাওয়া প্রাক্তন সাম্যবাদ-অনুযায়ী

প্রজাতন্ত্রগুলি মানুষের মন ধর্মীয় সংকীর্ণতাকে কতটা প্রতিহত করতে পারবে তার ওপর।

সামগ্রিকভাবে দেখলে একবিংশশতকের বিশ্বরাজনীতির চালিকাশক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে ধনতন্ত্রের তথা মুক্ত অর্থনীতি বিশ্বায়ন—যার কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে সমাসীন পুঁজিবাদী অতি শক্তিদ্বার কয়েকটি পশ্চিমী রাষ্ট্র। তাদের সঙ্গে আজকের মৌলবাদে আক্রান্ত দেশগুলির সম্পর্ক কি ধর্মের দ্বারা নির্দিষ্ট রেখা অনুসরণ করে এগোতে থাকবে অথবা অধিপথ ও অধীনতার সেই সুপরিচিত সমীকরণই এখানে প্রতিষ্ঠিত হবে সেটাও লক্ষ্য করার বিষয়। যেমন ইরান এখনও মৌলবাদী শিয়াপন্থী রাষ্ট্র হিসেবেই পরিচিত। তবু সেখানে রফসানজানি গোষ্ঠী ক্ষমতায় আসার পর থেকে বিদেশনীতিতে কঠোরতা অনেক শিথিল হয়েছে। কমুনিষ্ট এবং পরে অকমুনিষ্ট উভয় রাশিয়ার সঙ্গেই তাদের সুসম্পর্ক আগাগোড়াই লক্ষ্য করা গেছে। সম্ভবত পশ্চিমী শিবিরে জার্মানী ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গেও ভিতরে ভিতরে সমঝোতার কূটনীতি অনেকদূর এগিয়েছে। পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতবর্ষের বিরোধ ও সংঘর্ষের প্রেক্ষিতেও ইরানের ভূমিকা কেবলমাত্র শিয়া-সুন্নি বিভেদরেখা অনুসরণ করেই স্থির হয়েছে এরকম মনে করাও অতি সরলীকরণের পর্যায়ে পড়বে। গোটা আরব দুনিয়াতেও দেখা যাচ্ছে ইজরায়েলের সঙ্গে স্থায়ী শত্রুতার কঠিন মনোভাব ক্রমেই শিথিল হচ্ছে পশ্চিমী ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির আনুকূল্য বজায় রাখতে। এর জন্য কতকাংশে দায়ী সেখানকার মধ্যযুগীয় ধর্মপ্রাণতার লালিত সমাজগঠন এবং অভিজাত-নিয়ন্ত্রিত-রাজ্যশাসন ব্যবস্থা। শেফোক্ত ব্যবস্থার সুবিধাভোগী শ্রেণী একাধারে তৈলসম্পদের বাণিজ্য ও অন্যদিকে আধুনিক ক্রয়ের কারবারে এমন ভাবে জড়িয়ে আছে যে পশ্চিমী আধিপত্যের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার নৈতিকশক্তি তারা অনেক আগেই হারিয়ে বসেছে। পশ্চিমের গণতন্ত্র প্রেমী, রাষ্ট্রনেতাদেরও কোনো নৈতিক অসুবিধা হচ্ছে না এইসব মৌলবাদী গোঁড়া পরিবর্তন-বিরোধী শাসকদের সঙ্গে সম্পর্ক চালিয়ে যেতে। বরঞ্চ তারা কড়া নজর রেখে চলেছে যাতে ইসলামী দুনিয়ায় যারা আধুনিকতার হাওয়া বইয়ে দিতে চান—তারা যেন কোনক্রমেই ক্ষমতায় আসতে বা থাকতে না পারেন।

ধর্মকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করতে গিয়ে পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর অভিজ্ঞতাও এক্ষেত্রে সমান প্রণিধানযোগ্য। দেশের মধ্যে ধর্মীয় গোঁড়ামি যেমন সাধারণ মানুষের অসন্তোষ ও উচ্চশিক্ষিত বিত্তবানের উপেক্ষার কারণ হয়েছে বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও এই অবস্থান দেশের পক্ষে কোনভাবেই মঙ্গলকর হয়েছে মনে করার কারণ নেই। ইসলামকে রাষ্ট্রীয়ক্ষেত্রে টেনে আনার দু'টি উদ্দেশ্য (১) আরবভূমি পশ্চিম এশিয়ার সঙ্গে পাকিস্তানের স্বাভাবিক বন্ধনকে দৃঢ় করা এবং (২) পাকিস্তানের চোখে একমাত্র শত্রুপক্ষ ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে কূটনৈতিক লড়াইয়ে আরও শক্তিসংগ্রহ করা। প্রথম লক্ষ্যবস্তু নিয়ে কোনো প্রতিক্রিয়ার কথা ওঠে

১৥ নারায়ণ ভৌগোলিক সাযুজ্য ও সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার তাকে ঐ দিকেই টানবে সুতরাং পাকিস্তান কতোটা SAARC-এর দিকে ঝুঁকবে এবং কতোটা OIC-র-প্রতি আনুগত্য রাখবে সেটা তার জাতীয় স্বার্থের ব্যাপার। তার সেই ঝোঁক দেখেই অবশ্য পাকিস্তানী দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলির স্থির করার কথা তারাই বা পাকিস্তানের বিদেশনীতি ও আচরণকে কি চোখে দেখবে। ধর্ম সেখানে এসে দৃষ্টিকে অস্বচ্ছ অথবা বোধকে আচ্ছন্ন করতে পারে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে। কারণ সেখানে এখনও বেশ কিছু প্রভাবশালী গোষ্ঠী আছে যারা রাষ্ট্রকর্তৃত্বের সঙ্গে ধর্মীয় আনুগত্যকে জুড়ে দিতে সর্বদাই প্রস্তুত। সাম্প্রতিককালে সংসদীয় সমাজতন্ত্রের পুনরাবির্ভাব এবং নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক বিতর্কে ভারতবিরোধী যে মনোভাব প্রকাশ পেয়েছিল সেটা অস্বীকার করার নয়। প্রতিষেধক হিসেবে ঢাকার বর্তমান সরকারের পক্ষে ধর্মনিরপেক্ষতার দৃঢ় অস্বীকার অবশ্যই এখন খানিকটা সদর্থক প্রভাব ফেলেছে। কিন্তু পাকিস্তানের যে ব্যাপারটি নিয়ে ভারতের সঙ্গে চিরশত্রুতা, সেই কাশ্মীর প্রশ্নের মীমাংসার জন্য যে পথ সেদেশের সরকার বেছে নিয়েছে এ পর্যন্ত কোনো মুসলমানপ্রধান দেশ সে পথ প্রকাশ্যে সমর্থন করেনি। এমনকি OIC (Organisation of Islamic Conference) তে অযোধ্যা সংকটের সময় যে কড়া মনোভাব দেখা গিয়েছিল পরবর্তীকালে দ্বিতীয় পরমাণু বিস্ফোরণের সময়, এমন কি কারগিল সংঘর্ষের সময়ও মনে হল তখন উদ্ভাপ অনেকটাই কম। আসলে OIC-কে দিয়েও যে খুব বেশি সুবিধা হবে না সেটা DAWN পত্রিকার সেই সময়ের একটি সংখ্যাতে বলা হয়েছিল :

“The OIC has a long way to go before if can hope to grow into a solidly unified and cohesive force...it has to be substantially more than a debating forum to qualify as a fraternity”

পাকিস্তান ইসলামিক রাষ্ট্র বলেই যে OIC-র কাছ থেকে খুব বেশি আমল পাবে তারও স্থিরতা নেই। পাকিস্তান চিরকালই পশ্চিমঘেঁষা বিদেশনীতি অনুসরণ করে এসেছে। এখন আবার মাদক চালান এবং আতঙ্কবাদ পোষণের অভিযোগে পশ্চিমী দেশগুলির কাছেই সে অভিযুক্ত। সুতরাং সতর্ক সকলকেই হতে হয়। সমধর্মাবলম্বীদের প্রতি পাকিস্তান সরকারের আচরণও যে সবসময় সমর্থনযোগ্য হয়েছে তাও বলা যায় না। পূর্ব পাকিস্তানের মানুষদের ওপর অত্যাচার যে পুরনো ইতিহাস হয়ে যায়নি তা সম্প্রতি বাংলাদেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে সাহসদীপ্ত বক্তৃতাতেই প্রকাশ। আর করাচী প্রদেশে আহমদিয়া মুহাজিরদের দুর্দশা তো টাটকা স্মৃতি। একথাগুলি উল্লেখ করার প্রয়োজন এই কারণে যে ধর্ম নিয়ে রাজনীতি যদি দু-মুখো তরবারির মত কাজ করে, একই ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে ভেদ-বিভেদকে বড়ো করে তোলা এবং দুর্বলতর কোনো অংশের ওপর খগড়হস্ত হওয়া যদি কোনো শাসকগোষ্ঠীর স্বভাবধর্ম হয়ে ওঠে, তাহলে বৈদেশিক সম্পর্ক নির্ধারণে ধর্মের ব্যবহার সম্পূর্ণ বিপরীত প্রতিক্রিয়ার জন্ম

দিতে পারে। ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা মধ্যে সুস্থ বিরোধী শক্তিকে জাগ্রত হতে বাধা দিতে গিয়ে জনমতকে শুধু বিভ্রান্তই করে না, তাকে দ্বিখণ্ডিত করে তোলে অথচ সফল বিদেশনীতির একটি পরীক্ষিত পূর্বশর্তই হল সাধারণভাবে পুরসমাজের জোরালো সমর্থন। অভ্যন্তরীণ সামাজিক অসন্তোষ বৃদ্ধি পেতে পেতে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক গোষ্ঠীর বিশ্বাসযোগ্যতাই ক্রমে ক্ষীণ হতে থাকে। সে অবস্থায় কোনো দীর্ঘস্থায়ী বা বড়োমাপের চুক্তিবদ্ধতার মধ্যে প্রবেশ করতে চাইলে সে দেশের প্রতি অন্য দেশের মনোভাবে সন্দিগ্ধতা আসতেই পারে। তার ফলে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে সংশ্লিষ্ট দেশের ধর্মোন্মদনা তার সরকারকে বেকায়দায় ফেললে অবাক হওয়ার কিছু নেই। সুতরাং দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে মনে হয় ধর্মকে বিদেশনীতির হাতিয়ার করতে যাওয়ার অভ্যাস থেকে ঐ সব দেশের বিরত হওয়ার সময় এসেছে।

প্রাসঙ্গিক কয়েকটি গ্রন্থ/প্রবন্ধ/দলিল

Dhirendra Vajpeyi and Yogendra K. Malik (eds), Religions and Ethnic Minority Politics in South Asia, Mandhar, New Delhi 1989.

Shamir Amin, Maldevelopment, Zed Books, London 1990.

B.L. Smith (ed) Religion and the Legitimation of Power in South Asia, Eg Brill, Leuden 1978.

Public opinion Trends No. 105, May 7\1993, New Delhi.

Charles E Kennedy, Towards the definition of a Muslim in an Islamic State, Vajpeyi & Malik, op it.

Bhabani Sengupta, Economic not Islam in Monthly Public Opinion Survey vol. 38 No.2+3, New Delhi 1992.

ভাষা, চৈতন্য ও চিন্তাদর্শনের প্রাকযুগ

অসিত চক্রবর্তী

সংস্কৃত ব্যাকরণ শাস্ত্রে ভর্তৃহরির নাম পাণিনির পরেই উল্লেখযোগ্য। চীনা পরিব্রাজক ইৎসিং বা ইচিং তার ভারত ভ্রমণ বৃত্তান্তে ভর্তৃহরি সম্বন্ধে লিখছেন, “আমার ভারত পৌঁছানোর প্রায় চল্লিশ বছর আগে এক বৈয়াকরণের মৃত্যু হয়, যিনি ভারতীয় ব্যাকরণ শাস্ত্রের অস্তিম মৌলিক কৃতি বাক্যপদীয়ে লেখক ছিলেন।” ইৎসিং ভর্তৃহরি সম্বন্ধে কয়েকটি মজার কথা বলে গেছেন। এই ভদ্রলোক নাকি মাঝে মাঝেই সংসারের ওপর বিরক্ত এবং গৃহস্থ জীবনের ওপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠতেন—তারপর সন্ন্যাসজীবন যাপনের জন্য তখন তিনি মঠে ঢুকতেন। কিছুকাল পরেই গৃহী জীবনের সমস্ত ভোগকামনা আবার তাকে মঠ জীবনের গৈরিক রিক্ততা থেকে ফিরিয়ে এনে সংসারবাসী করে তুলত। প্রায় একমাস সাতবার তার জীবনে ঘটে ছিল। একবার এই দোদুল্যমানতা এমন চরম সীমায় পৌঁছেছিল যে ভর্তৃহরি সেবার মঠের দরজায় তার ছাত্রকে রথ নিয়ে অপেক্ষা করতে বলেছিলেন—কেননা কিছুক্ষণের পরই হয়ত আবার তার সংসার জীবন যাপন স্পৃহা সন্ন্যাস জীবন যাপনের দুঃসাধ্য ব্রতচ্ছাকে দাঁড়িয়ে দেবে; আবার তাকে ফিরে যেতে হবে সংসারে।

ইৎসিংএর মতে ভর্তৃহরি ছিলেন বৌদ্ধ। কিন্তু অধিকাংশ বর্তমান গবেষকদের মতে তিনি ছিলেন ভাববাদী বেদান্তী। আমাদের আলোচ্য কিন্তু ভর্তৃহরির বুদ্ধ বা বেদান্ত অনুগামীতা নিয়ে নয়—আলোচনার সূত্রপাত ভর্তৃহরির একটি বক্তব্য নিয়ে। বাক্যপদীয়তে ভর্তৃহরি বলছেন, “বাণীই প্রাণীদের মধ্যে চেতনাশক্তি যোগায় যা বাহ্য লোকব্যবহারের সাধন এবং অন্তঃকরণের সুখ দুঃখের জ্ঞান করায়। এমন কোন প্রাণী নেই যেখানে চৈতন্য আছে, কিন্তু বাস্তবতা নেই। সমস্ত প্রাণীদের কার্যো প্রবৃত্ত করবার জন্যে বাণীই প্রেরক এবং এই বাণী রুদ্ধ হলে এই দেহ কাষ্ঠখণ্ডের মতই মৃত ও চৈতন্যবিহীন হয়ে যায়।” বেদান্তবাদী ভাববাদী ভর্তৃহরি বাণী অর্থাৎ ভাষার সঙ্গে তার বাক্যপদীয়তে, জীবচেতন্যের সম্বন্ধ নির্ধারণ করেছেন। ভর্তৃহরির কাছে বাক্যরূপী শব্দতত্ত্বই ব্রহ্ম। এই ব্রহ্ম অনাদিনিধন—যার আদি নেই ও শেষ নেই, তার অগ্রপশ্চাৎ উৎপাদনের ক্রমও নেই—তবুও সে ককারাদি অক্ষর বা বর্ণের কারণ হয়ে ঘট, পট ইত্যাদি অর্থরূপে ভাসিত হয় (মনে রাখা দরকার, শব্দ বা পদে ককারাদি বর্ণের উৎপত্তি ক্রমিক, অগ্রপশ্চাৎ উৎপন্ন)—এতেই জগৎ প্রক্রিয়া চলে।

ব্রহ্ম একটি মহাজাগতিক সংজ্ঞা বা চৈতন্য—এই ব্রহ্মই আবার বাক্ অথবা গায়ত্রী—আপাত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ ও তার প্রক্রিয়া তারই আভাস মাত্র। ভাববাদীরা চৈতন্য বা মনকে আদি মনে করেন—জড় ও তার গুণাগুণ, বস্তু সবকিছু সৃষ্টি এই মনে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন “আমারই চেতনার রঙে পাল্লা হোল সবুজ, চুণী উঠল রাঙা হয়ে...ইত্যাদি।” বাইবেলে রয়েছে আরম্ভে ছিল শব্দ, সেই শব্দই হোল ভগবান, তারপর সেই ভগবানই শব্দ হলেন। ভাববাদীরা মূলত চেতনা থেকেই জড়ের আবির্ভাব হয়েছে বলে মনে করেন—চেতনা বস্তু সৃষ্টি করে। ভাববাদীরা আইডিয়ালিস্ট। ভারতীয় ব্রহ্মবাদী ভর্তৃহরি ভাববাদী। ভর্তৃহরির কাছে এই চেতনা আদি থেকেই শব্দরূপ, বাক্যরূপ। এই বাক্যের অপ্রকাশিত তিনটি রূপ পরা, পশ্যন্তি ও মধ্যমা। প্রকাশিত রূপ বৈখরী। একমাত্র গলায় জিভে লেগে লেগে ধ্বনি উচ্চারণ পূর্বক যে বাক্—দেহ ও ইন্দ্রিয় বিখর বা ঘাতজনিত—তাই মানুষের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, ব্যক্ত শ্রোতব্য ও দৃষ্টব্য (লেখা) ভাষা। সেই চতুর্থ ভাষাই মানুষের মুখের ভাষা যা তারা বলে। ভাববাদীরা মনে করেন চেতনাই বস্তু সৃষ্টি করে—চেতনাই আদি, চৈতন্য থেকে বস্তুর উদ্ভব। চৈতন্যজগৎ-ভাষা-ঈশ্বর-ব্রহ্ম ইত্যাদি—অর্থাৎ সবকিছুর মূলে এক আধ্যাত্মিক উৎস। ভাববাদের আরেক নাম তাই ঈশ্বরবাদ, যাজকবাদ, ব্রহ্মবাদ। ব্রহ্মবাদী ভর্তৃহরি ভাষা ও চৈতন্যকে সমার্থক মনে করেছেন এবং সৃষ্টির আদিতে বাস্তব চৈতন্য রয়েছে একথা ভাবছেন।

লোকায়ত দার্শনিক চার্বাক বস্তুকেই একমাত্র বাস্তব বলে মনে করেন। তারা ম্যাটিরিয়ালিস্ট, তারা ম্যাটারকে, বস্তুকেই প্রাথমিক জ্ঞান করেন। তারা বস্তুবাদী। বস্তুবাদী বলে বস্তুই চেতনার জন্মদাতা, চৈতন্যের উৎস। চৈতন্য সেজন্য জীবন্ত বস্তুর একমাত্র গুণ। বৌদ্ধ, জৈন ও হিন্দু দার্শনিকেরা এই বস্তুবাদের ত্রুটি বের করতে খুব তাড়াতাড়ি সফল হন। কারণ তখনও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের তেমন উন্নতি ঘটেনি। প্রাচীন বস্তুবাদীরা জৈব ও অজৈব বস্তুর মধ্যে প্রকৃত গুণগত পার্থক্য নির্ধারণ করতে জানতেন না। জ্ঞানের মূল কোথায়, জ্ঞানের সঙ্গে ভাষার সম্বন্ধ কি, বহু ঘটনার মধ্যে দ্বন্দ্ব এসব সম্বন্ধে তাদের জ্ঞান ছিল না। বেদকে নাকচ করার তাগিদে ভাষা থেকে লব্ধ জ্ঞান ও চেতনা সম্বন্ধে তাদের প্রকৃত ধারণা হতে পারেনি—প্রত্যক্ষই শুধু জ্ঞানের একমাত্র উপায় মনে করার ফলে অনুমান, ভাষা ইত্যাদি থেকে লব্ধ জ্ঞানকে তারা নাকচ করে দেন। মনে হয় যেন চার্বাকবাদীদের চৈতন্যচিন্তা থেকে ভাষাচিন্তার ওপর প্রত্যক্ষ যোগশীল কোন মৌলিক ভাবনা আমরা দেখতে পাই না।

মধ্যযুগীয় ফরাসী দার্শনিক দেকার্তে আবার মনে করেন চেতনা ও বস্তু বা বাস্তব দুইএরই অস্তিত্ব আছে—এ দুটি স্বয়ং সম্পূর্ণ, একটি আরেকটি থেকে আলাদা—অথচ বাস্তব আবার চেতনায় প্রতিফলিত। তবুও একই চিন্তাশীল মানুষের দেহে চৈতন্য ও বস্তুগত প্রক্রিয়া একত্রিত হলো কি করে, সমাবিষ্ট হলো কি করে? তার উত্তর—কে জানে? দেকার্তে আত্মসমর্পণের ভঙ্গীতে বললেন, “ভগবানই

জানেন" বাইবেল বেশি দূরে নয়, দোকাতের শিষ্য কার্তেসীয় পণ্ডিতদের মত তিনিও বলেন চৈতন্য ও বস্তু এই একে অন্যের বহিষ্কারী, মিউচিউয়ালি এক্সক্লুসিভ, দু'জনের যোগ একমাত্র ঈশ্বরের সাহায্যেই সম্ভব। মোটামুটি ভারতীয় ন্যায় ও নৈশৈমিক দর্শনও এই তত্ত্বকেই সমর্থন করে।

ভাববাদীদের হাত থেকে বস্তু ও চৈতন্য, চিন্তা ও ভাষা সবাইকে মুক্তি দিলেন প্রথম বিদ্রোহী দার্শনিক স্পিনোজা। জীবন্ত, বাস্তব সচেতন চিন্তাশীল, মানব দুটি কার্তেসীয় (দেকার্ত থেকে বিশেষণ কার্তেসীয়) অর্ধাংশ দ্বারা তৈরী নয়—যার একটি হোল দেহহীন চেতনা ও অপরটি চিন্তাহীন দেহ—এই ছিল স্পিনোজার বক্তব্য। এখানে একটি মাত্র বস্তুই আছে বাস্তব মানুষের চিন্তাশীল দেহ।

চিন্তা ও চিন্তার বাইরের দেশে (স্পেসে) বা স্থানে প্রসারিত বস্তুতন্ত্রের জগৎ নিয়ে স্পিনোজার সিদ্ধান্ত যুগান্তকারী। চিন্তা ও দেশের বিস্তার (থট এন্ড এক্সটেনশন অব স্পেস) একই পদার্থের অর্থাৎ বস্তুর, বাস্তবের দুটি গুণ মাত্র। তার ফলে আত্মা ও দেহ, চৈতন্য ও জড়ের দ্বন্দ্ব সমাধান অযোগ্য বলে মনে হয় না, দুর্ভেদ্য রহস্য থাকে না। স্পিনোজার মতে দেহহীন চিন্তা সম্ভব নয়। ভাববাদীরা যে কথাটা বলেন তার সাদামাঠা রূপ এই :—মূর্তিহীন (বিমূর্ত) চিন্তাভাবনা প্রথম থেকেই রয়েছে—সে ঘুরে বেড়াচ্ছে রক্ত-মাংসের সন্ধানে, মূর্তি পরিগ্রহের তালে—সুযোগ পেয়ে সে মানুষের দেহ ও মস্তিষ্ক দখল করল—চিন্তার উদ্ভব হলো, এবার সে ভাষায় রূপ পেল, দেহ ধারণ করল, পদে ও বাক্যে প্রস্ফুটিত হলো—এ সমস্তই স্পিনোজার কাছে অর্থহীন, ঠাকুরমার ঝুলি থেকে বের করা উদ্ভট তত্ত্ব, প্রাচীন ধর্মীয় কুসংস্কারের সুরম্য ভাষায় জ্ঞানবুদ্ধি বৈজ্ঞানিকের ভঙ্গিতে উক্তি মাত্র।

আমি চিন্তা করি অর্থ আমি দেহ চিন্তা করে। আমার দেহ জড় থেকে উদ্ভূত—তাই আমরা বলতে বাধ্য জড়ই চিন্তা করে, বস্তুই চিন্তা করে। ম্যাটার থিংকস্। স্পিনোজার এই সিদ্ধান্ত আমাদের চিন্তার একটি বিশেষ সংজ্ঞার দিকে অনুপ্রাণিত করবে :—চিন্তক দেহীর ক্রিয়াকর্মের একটি বিশেষ ধরণ, মুড, ভাবই হচ্ছে চিন্তা। চিন্তা নিয়ে গুরুতর চিন্তা করার অর্থ হোল চিন্তাশীল দেহের কার্যপদ্ধতি, ফাংশন ভাল করে বোঝা। অতএব চিন্তক দেহের ক্রিয়াহীন অবস্থায় তার সংগঠন, তার দেশে বা স্থানে প্রসারিত যৌগিকতার অবধারণা থেকে আমরা চিন্তার, মনের, চিন্তের অবধারণা করতে পারি না। কারণ নিষ্ক্রিয় অবস্থায় চিন্তাশীল দেহ শুধুমাত্রই একটি 'দেহ'—মৃত, অনড়, জড় ও অবোধ।

মানব মস্তিষ্কের স্নায়ুতন্ত্রের ব্যবচ্ছেদ, মস্তিষ্কের শারীরবৃত্তিক গুণাবলীর পরীক্ষা নিরীক্ষা যতই বৈজ্ঞানিক দিক দিয়ে কৌতুহলোদ্দীপক হোক না কেন, 'চিন্তা কি' এ কথাটার উত্তর দিতে অপারগ। চিন্তার বস্তুগত যন্ত্রের সাহায্যে উৎপন্ন প্রক্রিয়াই হলো চিন্তা কিন্তু তাই বলে তারা এক নয়। মস্তিষ্কের কর্ম, তার প্রক্রিয়া হলো চিন্তা কিন্তু তাই বলে চিন্তা ও মস্তিষ্ক একই জিনিস নয়। পাকস্থলির সাহায্যে দেহ হজম

করে কিন্তু হজম ও পাকস্থলি এক নয়, ঠিক তেমনি দেহ মস্তিষ্কের সাহায্যে চিন্তা করে কিন্তু মস্তিষ্ক ও চিন্তা এক নয়। এক ক্ষেত্রে রয়েছে একটি দেহ যন্ত্রের সংস্থান ও সংগঠন—অপর ক্ষেত্রে রয়েছে তার কাজ।

দেকার্তে ও তদনুগামী কার্তেসীয়রা একটি জিনিস লক্ষ্য করে গিয়েছিলেন— চিন্তাশীল দেহ দেশে বা স্থানে যে গতিশীল ভ্রমণ রেখা, যে ট্রাজেকটরি তৈরি করে তা অন্যান্য দেহ বা বস্তুর চেহারা, আকার, সংস্থান ও সমাবেশের ওপর নির্ভর করে।

যন্ত্রও এমনি গতিশীল ভ্রমণরেখা তৈরি করে তবুও যন্ত্র আর মানবের মধ্যে মূলগত পার্থক্য রয়েছে—সে পার্থক্য কোথায়? মানুষ সব ধরনের কাজ করতে পারে, তার মধ্যে রয়েছে এক সার্বজনীনত্ব, একটি ইউনিভার্সালিটি। যন্ত্রের কার্যাবলীর পরিধি সীমিত; যদিও এই সীমিত পরিধিতে তার শক্তিমত্তা ও কুশলতা মানুষের চাইতে অনেক বেশি। অসংখ্য ধরনের বিভিন্নধর্মী ক্রিয়াপ্রক্রিয়া চিন্তাশীল মানবের পক্ষে সম্ভব। মানুষের হাত যেমন পারে বৃত্ত আঁকতে তেমনি পারে আয়তক্ষেত্র আঁকতে—যে কোন জটিল জ্যামিতিক রেখা এই হাতের অধিগম্য। অথচ এই হাতটি সাংগঠনিক, শারীরবৃত্তিক কোন দিক দিয়েই এই ধরনের জ্যামিতির সম্পাদ্য রচনার জন্য নির্মিত হয়নি। হাতের এই দুর্বলতাই তাকে সর্ব-কর্ম-দক্ষ করে তুলেছে, এই অযোগ্যতাই তাকে সব কাজে যোগ্য করে তুলেছে। কিন্তু কাঁটা কম্পাস বৃত্ত আঁকতে সিদ্ধহস্ত—হাতের থেকে তার বৃত্ত অনেক বেশি বৃত্তাকার। সে হাজার হাজার ছোট বড় অসংখ্য বৃত্ত আঁকতে পারে, আঁকতে গিয়ে ক্লান্ত হয় না। কিন্তু সে শুধু বৃত্তই আঁকতে পারে—সে শুধু বৃত্তের বিশেষজ্ঞ। কাঁটাকম্পাস ত্রিভুজ বা বর্গক্ষেত্র আঁকতে গেলে গোম্মা পারে, কাঁটাকম্পাস বৃত্ত আঁকতে পারে, চাঁদা অর্ধবৃত্ত আঁকতে পারে এইজন্য, যে তাদের দেহ নির্মাণ ও সংগঠন ঠিক সেই ভাবেই, সেই জনেই হয়েছে।

বস্তুত অচিন্তক, চিন্তাহীন দেহ বা বস্তুর ক্রিয়া তার আভ্যন্তরীণ নির্মাণ ও সংগঠন দ্বারা নির্দিষ্ট, তার তথাকথিত, “প্রকৃতি” দ্বারা সীমায়িত, এবং অন্যান্য বস্তু বা দেহে যাদের মধ্য দিয়ে তার গতিশীলতা তাদের আকার প্রকারের সঙ্গে তার কোন সম্বন্ধই নেই। ফলে অচিন্তক, চিন্তাহীন বস্তু হয় ‘পদ্ববনে হস্তীর’ মত অন্য বস্তু ও পদার্থের আকার প্রকারকে ধ্বংস করে নতুবা অনতিক্রমণীয় বস্তুর, দেহের সংঘর্ষে এসে নিজেই ভেঙে চূরে আটখানা হয়। বাধা হয় সে গুঁড়োয়, নয় সে বাধাপ্রাপ্ত হয়। সে বাধা কাটাতে পারে না, বাধা এড়াতে পারে না, বাধার চারধারে তার গুণগুণানো সম্ভব হয় না।

চিন্তাশীল দেহ বা মানুষ অনড় বস্তু, দেহের চারধারে তার গতিরেখা নির্মাণ করে। চিন্তাশীল দেহ স্বচ্ছন্দে একটি জটিল আকৃতির বাধার চারপাশে ঘুরে বেড়াতে পারে, ফুলের চারধারে ভ্রমরের মত বাধার চারধারে গুণগুণানো তার পক্ষে সম্ভব। যে কোন বস্তুর আকার অনুযায়ী নিজের ক্রিয়াকর্মের সক্রিয় মূর্তনই চিন্তাশীল দেহের বিশেষ

ক্ষমতা। চিন্তা এই বিশেষ গুণের দিকে স্পিনোজা দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

অতএব চিন্তাশীল মানবদেহের বাইরের বস্তুপুঞ্জের চতুর্দিশে মানবের বিভিন্ন ক্রিয়া থেকেই মানব-মানসের সংগঠন উপলব্ধি করা যায়। অনন্ত ও বহুল এই পৃথিবীর বস্তুপুঞ্জের চারধারে তার বিষয়গত, বিষয়াভিমুখী (অবজেকটিভ) প্রক্রিয়াই তার চিন্তার বাস্তব অবজেকটিভ রূপ। অতএব চিন্তা ও মানব মানসের স্বরূপ বুঝতে হলে মানব দেহের ব্যবচ্ছেদ ও শারীরবৃত্ত তত প্রয়োজনীয় নয় যত না প্রয়োজনীয় চিন্তার ব্যবচ্ছেদ-সেই মানবের চিন্তার বাস্তব রূপের, বস্তুগত রূপের ব্যবচ্ছেদ—সেই মানবের “অজৈব দেহের” ব্যবচ্ছেদ। শারীর তাত্ত্বিক ব্যবচ্ছেদ; শারীরবৃত্তির জ্ঞান, যেমন দরকার তেমনি দরকার তার ভৌতিক ও আধিভৌতিক সংস্কৃতির জ্ঞান; দরকার সেই সব ‘জিনিসের’ যা সে তার ক্রিয়াকর্মের সাহায্যে উৎপাদন ও পুনরুৎপাদন করে, তাহলে চিন্তার প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি করা যাবে।

আমাদের ধারণা আমরা প্রত্যেকে এককভাবে, ব্যক্তিগতভাবে চিন্তা করি। স্পিনোজার মতে একটি বিশিষ্ট মস্তিষ্ক চিন্তা করে না এমন কি একটি বিশিষ্ট মানব তার সমগ্র দৈহিক যন্ত্রাদি যেমন মস্তিষ্ক, হৃদয় হাত ইত্যাদি সব কিছু নিয়ে চিন্তা করে না। এ কথাটি প্রথম দৃষ্টিতে আমাদের বিস্মিত করবে। চিন্তা শুধুমাত্র এবং এক মাত্রই সামগ্রিকভাবে প্রকৃতির সঙ্গেই জড়িত, প্রকৃতিই চিন্তা করে হয়ত এই “চিন্তাশীল আমাদের” মাধ্যমে। প্রকৃতির সমগ্রতার মধ্যেই চিন্তার কার্যকারণ সম্বন্ধ বর্তমান। কার্যকারণ সম্বন্ধে শৃঙ্খলপুঞ্জ ঘন সন্নিহিত, বিপর্যস্ত বা সমাবিষ্ট হয়ে যে “প্রতীত্য সমুৎপাদের” সৃষ্টি করে (কোন ঘটনা ঘটানোর জন্য কার্যকারণ সম্বন্ধের শৃঙ্খলাগুলির উপস্থাপনাই বৌদ্ধদর্শনে “প্রতীত্য সমুৎপাদ” বলা হয়) তাই চিন্তাশীল আমার দেহ সৃষ্টি করেছে; অন্য ক্ষেত্রে অন্য ‘প্রতীত্য সমুৎপাদ’ হয়ত একটা পাথর, একটা পাহাড় গাছ বা আরেকটা শরীর বানাতে। কাজেই প্রকৃতির বস্তুরই সামগ্রিক ভাবে চিন্তার গুণাগুণ বর্তমান।

বস্তুবাদী স্পিনোজা কি আবার তাহলে আমাদের রহস্যবাদের দিকে নিয়ে যাচ্ছেন? হেগেলে আপাতদৃষ্টিতে এই রহস্যবাদের চূড়ান্ত দেখতে পাবো। হেগেলের মতে চিন্তা সৃষ্টি হয় মানবের বাইরে, মানব স্বতন্ত্ররূপে, মানবের ইচ্ছা-অনিচ্ছার তোয়াঙ্কা না রেখে, তার মাথার ওপর দিয়ে।

এই চিন্তা হোল ‘প্রকৃত চিন্তা’ চিন্তা যে রকম ‘থট অ্যাজ ইট ইজ’, ‘সত্যিকার চিন্তা।’ এই অমানবীয় চিন্তার গতি ও প্রকৃতির কাছে মানবমন ক্রীড়নক মাত্র, মানবমনের চিন্তা প্রকৃতির চিন্তার আংশিক প্রতিফলন মাত্র। আমরা সাধারণভাবে যখনই চিন্তা সম্বন্ধে চিন্তা করতে যাই তখন এ তত্ত্ব আমাদের সামনে আসতে পারে না—অনেক বাধা থাকার জন্য। সাধারণভাবে চিন্তা করা বললে আমরা কি বুঝি? প্রথম দৃষ্টিতে এ কথাই মনে হওয়া স্বাভাবিক যে চিন্তা হচ্ছে মানবের বিষয়ীগত, সাবজেকটিভ, মাথার মধ্যকার মানসিক ক্ষমতার সমাহার তার ভূয়োদর্শন, তার

সংবেদন, স্মৃতি ইচ্ছা ইত্যাদির সমাহার? আরও : চিন্তা বলতে বুঝবো এক ধরনের বিশেষ ‘মানসিক কর্ম’ যেখানে ভাবনাগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া হচ্ছে একটি বিশেষ ব্যক্তির চেতনায় যেন চলছে এক নানা ছবির শোভাযাত্রা এক চলচ্চিত্র চলচ্চিত্র চমৎকার, চলছে নতুন নতুন তাসের বাজী। অথবা আরও, যে চিন্তা হলো এইসব ছবিগুলোর নাম দেওয়া—আইডিয়াগুলোকে ভাবনাগুলোকে ভাষার আকার দান—শব্দে ও পদে রূপ দিয়ে তাদের ধারণা বা কনসেপ্ট বানানো। তারপর এই মাথার মধ্যে বা ভেতরে এই ধারণা, ভাবনামৌল নিয়ে নাড়াচাড়া, নানাভাবে সাজানো গুছানো—এই হল চিন্তা। কিন্তু মাথার বাইরে এই বাস্তব জগতে যখন জিনিসপত্র নিয়ে নাড়াচাড়া করি তখন আর সেই নাড়া-চাড়ার ক্রিয়াকে আমরা চিন্তা বলে মনে করি না। আমরা তাকে মনে করি চিন্তা অনুযায়ী চলা কিছু কার্য মাত্র। ফলে আমাদের মনে হবে চিন্তা শুধু একটি প্রতিফলন মাত্র, একটি মানস ক্রিয়া যার মধ্য দিয়ে মানুষ, সে কি করছিল এবং কেমন করে করছিল তার একটা বর্ণনা নিজের কাছে দাখিল করে এবং যে সমস্ত আইন কানুন মেনে সে কাজটি করছিল সে সম্বন্ধে অবহিত হয়। হেগেল তার পূর্ববর্তী কান্ট ও অন্যান্য দার্শনিকদের চিন্তা সম্বন্ধে এই চিন্তায় অসন্তুষ্ট হলেন। এই চিন্তাকে তিনি কুসংস্কার বলে উপহাস করলেন।

এই কুসংস্কারটি খুব প্রাচীন ও বিখ্যাত। কুসংস্কারটির ভারতীয় প্রবক্তা ভট্টহরি আমরা প্রবন্ধের প্রারম্ভেই তা দেখলাম। গ্রীক দার্শনিক প্লেটো এই কুসংস্কারের পাশ্চাত্য প্রতিষ্ঠাতা। লজিক তাই তার কাছে লগস বা শব্দ থেকে এসেছে। চিন্তা শাস্ত্র, ন্যায় শাস্ত্র অতএব ভাষা চিন্তা ছাড়া কিছুই নয়—প্লেটো লগসকেই মনে করলেন চিন্তা। দেকার্তেও তাই ভাবতেন, চিন্তার একমাত্র প্রতিফলন হলো ভাষা। নয়া পজিটিভবাদীরা যাদের নেতা ইলেন বার্টান্ড রাসেল, ভিদগেনস্টাইন, কারনাপ তারাও এই কুসংস্কারটিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাদের কাছে এই চিন্তা মানেই নীরব বা সরব ভাষায় ব্যবহার। স্ফোটবাদ, রসবাদ, বেদান্তবাদ, প্রতীকবাদ, রবীন্দ্রবাদ, জীবনানন্দবাদ ইত্যাদি নন্দনতত্ত্বেরও দার্শনিক ভিত্তিভূমি এই কুসংস্কারটি অক্ষুণ্ণ রেখেছে। একে এরা বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক চিন্তার শেষ নিদর্শন বলে তুলে ধরতে চাইছেন। এবং শিল্পকলার নামে নানা মার্কসবাদ বিশ্বাসীদের লেখাপড়ায় এই বিষয় গত ভাববাদের (অবজেকটিভ আইডিয়ালিজমের) অনুপ্রবেশ ঘটেছে। কুসংস্কারটি সবলে ছুঁড়ে দিলেন হেগেল—ফিরে গেলেন স্পিনোজার কাছে।

এই কুসংস্কারটিই মন্ত্রশক্তিতে বিশ্বাস নিয়ে আসে। এই জন্যে বেদকে মনে হয় অপৌরুষেয়। মনে হয়, বেদের সৃষ্টি নেই, আদি নেই, অনন্ত যুগ ধরে চলছে। এ শেষ পর্যন্ত এমন একটি দর্শন তৈরি করে যাকে মনে হয় খুবই সফিস্টিকেটেড। অথচ যুগে যুগে এ আবার বেশ-ও পালটেছে। সেই বেদের যজ্ঞবাদীরা তারপর মীমাংসা দর্শনের জৈমিনি থেকে আজকের দেরিদা’র পোস্ট-মর্ডার্নিজম্। শব্দ আর অর্থের নিত্য সম্বন্ধ এরা মেনে নিয়েছে। আপনি ‘গরু’ উচ্চারণ করলেন। আপনার সামনে

গরু আবির্ভূত হলো। অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত শব্দই বিশ্বজগৎকে সৃষ্টি করে, বিশ্বজগতের ৭৬৭ ভাগে সৃষ্টি করে। প্রাচীন নৈয়ায়িকরা এদের ঠাট্টা করে বলেছিলেন, তাহলে তো 'শু'র উচ্চারণ করলে, আমার জিভ কেটে যাওয়ার কথা। অর্থাৎ যত কিছু জাদু-অনুষ্ঠান আছে, যা সমস্ত ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মূল, সেখানে মন্ত্র উচ্চারণের আসল অর্থ এখানেই। শেষ পর্যন্ত 'শব্দ' ওদের কাছে পরম ব্রহ্মের রূপ নেয়। বাইবেলে 'শব্দ' ঈশ্বর হয় এবং ঈশ্বর আবার শব্দ হয়। একটু ভেবে দেখলে, এটা আবার আদিম মানুষের কাছে এক ধরনের সত্যিও। যজ্ঞ যদি আগুন এবং শিকারের সঙ্গে সংপৃক্ত হয়, এবং যজ্ঞফল অর্থাৎ সমবেত শিকার ও উৎপাদনলব্ধ দ্রব্যাদি সঠিকভাবে কুলমাতা বা কুলনেতার তত্ত্বাবধানে সমবেত গোষ্ঠীর সবার মধ্যে বন্টিত হয়, তবে তো যজ্ঞ ফল এবং সেই অনুযায়ী মন্ত্র উচ্চারণের ফলও দৃষ্ট হয়। হাতে হাতে মেলে।

কিন্তু শ্রেণীবিভক্ত সমাজে যজ্ঞফল দৃষ্ট নয়। অতএব মন্ত্র উচ্চারণও দৃষ্ট নয়। উৎপাদন ভাগও লুকিয়ে ফেলা হয়। এর অ-দৃষ্ট অধিকাংশ মানুষের অদৃষ্ট হয়।

আদিম সমাজে যজ্ঞ ছিল সম্মিলিত উৎপাদন ও বণ্টনকে ব্রহ্মের কাছে, অর্থাৎ সমাজের কাছে ('ব্রহ্ম'-এর আদি অর্থ হলো সমাজ) চলে আসে। ফলে শব্দই ব্রহ্ম হয়ে যায়। শব্দ সব সময় অর্থবান হয়। শব্দ কখনই অনর্থক হয় না (আদিম মানুষ সব সময় সত্যি কথা বলতো। মিথ্যা বলতে পারতো না)।

পরবর্তীকালে সংগঠিত পুরোহিততন্ত্র সংস্কৃত গীর্জা, মসজিদ, মঠাধীশ সন্ত-সন্ন্যাসীর দল, পরোজীবী হয়ে এই শব্দের অর্থহীনতা, যজ্ঞের ফলের অ-দৃষ্টতা, অ-দর্শন এবং তার সচেতন বা অচেতন শিক্ষা ভাষণকে আপাত-বিজ্ঞান ও আপাত-দর্শনের রূপ দেয়। বাস্তবে যা ঘটে-মা। এরাই মন্ত্রশক্তির ব্যাখ্যা দিতে ওস্তাদ। ওস্তাদিটা করে গুরুগভীর চালে সাধারণ ওঝা, ঝাড়ফুককরী, জ্যোতিষীদের যতটা হেসে উড়িয়ে দিতে পারতেন, ততটা সহজে, পারবেন আপনি রামকৃষ্ণ মিশন বা অরবিন্দ আশ্রমের সিন্ধের গুরুাধারী বা শ্বেতাম্বরী অমুকস্বামী, অমুক আনন্দ, অমুক মহারাজকে উড়িয়ে দিতে। অথবা ক্যাথলিক চার্চের শ্বেতাম্বরী ফাদার যখন বলবেন, “গড সেড, লেট দেয়ার বি লাইট, অ্যান্ড দেয়ার ওয়াজ লাইট”, তখন সেই সৃষ্টি তত্ত্বকে আপনি কি ‘বিগ ব্যাঙ্ক’ থিয়োরি দিয়ে হাস্যকর প্রমাণ করতে পারবেন?

হেগেল দেখালেন মানবচিন্তা কেবল মাত্র ভাষার মাধ্যমেই একমাত্র ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপ হিসাবে ব্যক্ত হতে পারে না। মানুষ যখন কাজ করে তখন সেগুলো চিন্তাশীল মানুষেরই কাজ। সেগুলি মানব চিন্তারই আরও কয়েকটি বহিরঙ্গীয় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ব্যক্তরূপ। একমাত্র মানুষ যখন কথা বলে তখনই কি সে চিন্তা করে। ভাষা—কথা বলা, বাক্—চিন্তার একটি সীমিত আংশিক রূপ—এই কথাটাই হেগেল তুলে ধরলেন সমগ্র মানব ব্যবহারে, তার প্রয়োগে ও প্রযুক্তিতে এই চিন্তা বিধৃত, এই চিন্তা শিলীভূত-সংরক্ষিত তার শিল্পোদ্যোগে, তার কৃষিকর্মে। এই চিন্তা দেহায়িত হয়েছে তার রাষ্ট্র সংগঠনে ও তার ধর্মাচরণে। এই চিন্তা বলসে উঠেছে তার অস্ত্রশস্ত্রে,

ঘঘরিত হয়েছে তার যন্ত্রে ও হাতিয়ারে। এই চিন্তাই মৃন্ময়ী মূর্তি ধরেছে তার তৈজসপত্রে, মূর্তিকলায়, প্রোজ্জ্বল হয়েছে তার চিত্রশিল্পে। এই চিন্তা দীর্ঘ উচ্চারিত হয়েছে তার আইন আদালতে, পেয়েছে প্রার্থিত অবয়ব তার মন্দিরে মসজিদে। অতএব হেগেল এই দাবি করলেন : চিন্তা সম্বন্ধে চিন্তা করার অর্থ হলো সমগ্র মানব ব্যবহার, তার বহিরঙ্গ সৃষ্টি, তার অন্তরঙ্গ সৃষ্টি, তার সভ্যতার ও সংস্কৃতির আলোচনা। পদাবলীর সমাহার এই মানব ভাষার মধ্যে, এই যুক্তি শৃঙ্খলের মধ্যে যত না চিন্তা রয়েছে, তার চেয়ে ঢের বেশি দৃঢ় ও শক্তিশালী চিন্তা সংগঠিত হয়েছে সমাজের প্রকৃত বাস্তব ব্যবহারের মধ্যে ; মানবের চিন্তার প্রকৃষ্ট আকার প্রকার সম্বন্ধে বাস্তব তথ্য সেখানেই পাওয়া যাবে—তাদের বর্ণনার বাহন ভাষার মধ্যে ততটা কিন্তু পাওয়া যাবে না। মানবের কর্ম, তার কর্মের ফল, মানবসৃষ্ট বস্তুপুঞ্জ, তার মানসকুঞ্জ—এগুলিই মানবের চিন্তা—অতএব চিন্তার সমস্ত ধরনের প্রকারভেদ নিয়ে আলোচনাই হবে প্রকৃত ন্যায্যশাস্ত্রের কাজ—চিন্তা তত্ত্বের উদ্দেশ্য—সর্বাধুনিক ন্যায়ের উপস্থাপনা।

এখানেই হেগেল তার আপাত অতীন্দ্রিয়বাদকে উল্লম্বন করে প্রকৃত বস্তুবাদের কাছে পৌঁছে গেলেন—একদিকে যেমন মার্কস এঙ্গেলস তত্ত্বের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন, তেমনি মানবমন ও ভাষা নিয়ে প্রকৃত বিজ্ঞান সৃষ্টি করতে সাহায্য করলেন।

মার্কস ও এঙ্গেলস অবিসংবাদিতরূপে প্রতিষ্ঠা করলেন যে শ্রমই চিন্তা ও চিন্তাই শ্রম।

বামিয়ান ও তালিবান, হিন্দু তালিবান... ..

গৌতম রায়

আফগানিস্তানের বামিয়ান প্রদেশে গৌতম বুদ্ধের দেড় হাজার বছরের প্রাচীন পাথুরে মূর্তির উপর তালিবানদের কামান দাগার সংবাদে গোটা বিশ্ব শিহরিত এবং ক্ষুব্ধ। এই ক্ষোভ স্বাভাবিক। প্রাচীন সভ্যতা-সংস্কৃতির নিদর্শন এমন বর্বরতার সঙ্গে একবিংশ শতাব্দীতে ধ্বংস হতে দেখলে ক্ষোভ জাগবে বৈকি! নিন্দায় মুখর সকলেই। ইউরোপের মধ্যযুগীয় কালাপাহাড় ‘বার্বার’দের সঙ্গে তুলনা টানা এ ক্ষেত্রে অনিবার্য। অনিবার্য ছন নরপতি অ্যাটীলা, চেঙ্গিজ খান, তৈমুর লঙ, নাদির শাহ, আহমদ শাহ আবদালি ও গজনির সুলতান মামুদের সঙ্গে তুলনাও।

তুলনা কিন্তু অপেক্ষাকৃত সভ্যদের সঙ্গেও টানা দরকার। জানা দরকার, রোমানরা কী ভাবে জেরুজালেমে ইহুদিদের সিনাগগ ধ্বংস করেছিল। খ্রিষ্টানরা কী ভাবে ধ্বংস করেছিল স্পেনের ইসলামি স্থাপত্যকে। সুসভ্য ও সংস্কৃতিগর্বি ফরাসিরা কী ভাবে মিশর অভিযানের সময় স্ফিংসের মূর্তিকে লক্ষ্য করে চাঁদমারি চালিয়েছিল, নেপোলিয়ন বোনাপার্টের হস্তক্ষেপে যা কোনওক্রমে রক্ষা পায়, সে-ইতিবৃত্তও প্রসঙ্গত স্মরণ করা দরকার। কী করে ভুলে যাওয়া সম্ভব দক্ষিণ ও মধ্য আমেরিকায় সমৃদ্ধ ঐতিহ্যশালী ইনকা, মায়া ও অ্যাজটেক সভ্যতা ধ্বংসকারী স্পেনীয়দের বর্বরতার কথা? অ্যাপাচি ইন্ডিয়ানদের সভ্যতা যে নৃশংস অমানবিকতায় মুগ্ধ দুনিয়ার স্থপতিরা ধ্বংস করেছিলেন, তালিবান বর্বরতা তার কাছে নিতান্তই তুচ্ছ। হাইতি-সহ ক্যারিবীয় দ্বীপপুঞ্জে এবং আফ্রিকায় ফরাসি ভাগ্যান্বেষীরা যে বর্বরতার স্বাক্ষর রেখেছিল, পোর্তুগালের জেসুইট যাজকরা ব্রাজিল ও আফ্রিকায় ভূমিপুত্রদের ধর্মান্তরিত ও ‘সভ্য’ করতে যে বীভৎস শ্মশানশয্যা রচনা করেছিল, তালিবানদের বর্বরতা কি তার চেয়েও হিংস্র? বিধর্মী বা বিজাতীয় সভ্যতী-সংস্কৃতির নিদর্শন ধ্বংস করা বা চুরি সভ্যতাভিমানেরই উল্টো পিঠ। সভ্যতাই এই বর্বরতাকে তার জঠরে প্রসবিত করে। যে বিজিত, বিজেতা যদি সভ্যতায় তার থেকে নিকৃষ্ট হয়, তবে এই ধ্বংস ও তাণ্ডব আরও রুদ্রমূর্তি ধারণ করে। তালিবানরা এ ক্ষেত্রে তাদের সব পূর্বসূরিদের চেয়ে নিজেদের উৎকৃষ্ট ও উন্নততর গণ্য করে। তারাই চূড়ান্ত বিজেতা। অন্তত তাদের ধারণা সে রকমই। অবশিষ্ট বিশ্বের কাছে যা সমগ্র মানব সভ্যতার মূল্যবান সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার, তালিবানদের কাছে তা বিজিত

পৌত্তলিকদের নিকৃষ্ট সভ্যতার বর্জনীয় আবর্জনা মাত্র। তাদের কী দায় আছে সেই আবর্জনাকে রক্ষা করার?

বর্বরতার জন্য তালিবানদের সঙ্গে যাদের তুলনা করা হচ্ছে, তাদের প্রায় কেউই ধর্মের দোহাই দিয়ে মূর্তি বা ধর্মস্থান ধ্বংস করেনি। বরং বিজিতের মনে ত্রাস সৃষ্টিই ছিল তাদের তাণ্ডবের প্রধান লক্ষ্য। অনেক ক্ষেত্রেই ধর্মস্থান আক্রান্ত হতো ধর্মস্থান বলে নয়। ধর্মীয় কারণে নয়, সোনাদানার মতো ঐহিক ঐশ্বর্যের মজুত ভাণ্ডার হিসাবে। সুলতান মামুদ তো অন্তত সেই কারণেই সোমনাথ মন্দির সহ একের পর এক হিন্দু উপাসনাগৃহ ধ্বংস করেছিলেন। উপাসনা ছাড়া আরও অনেক কিছুই সেখানে হতো, কিংবা বলা যায়, উপাসনা ছাড়া আর সব কিছুই সেখানে হতো। অধিকাংশ ক্ষেত্রে হিন্দু পুরোহিতদের বঞ্চিত, বিক্ষুব্ধ অংশই লুণ্ঠনকারীদের পথ দেখিয়ে নিয়ে আসত, চিনিয়ে দিত গর্ভগৃহের অবস্থান, তার নীচে বানানো চোরা কুঠুরির হদিশ। সুলতান মামুদ আর যাই হোন, খুব ধর্মপ্রাণ মুসলমান ছিলেন না, অন্তত ইসলামের প্রসারের জন্য তিনি এই লুণ্ঠরাজ চালাননি। তাঁর লুণ্ঠনকর্মে অমুসলিমরা ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হবে এমন মূর্খ তিনি ছিলেন না। পরবর্তী কালে ঔরঙ্গজেব কিছু মন্দির ধ্বংস করেছিলেন বটে, তবে সেটাও ধর্মের কারণে নয়। ঠিক যে জন্য ধর্মপ্রাণ মুসলমান হয়েও তিনি বেশ কিছু মসজিদও ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। মন্দির হোক বা মসজিদ, তা পূজার্চনার পবিত্র কেন্দ্র থেকে বিচ্যুত হয়ে রাজদ্রোহ, আমির-ওমরাহদের রাষ্ট্রবিরোধী ষড়যন্ত্র কিংবা নির্ভেজাল পুরুত-পাণ্ডার যৌন ব্যভিচারের কেন্দ্র হয়ে উঠেছে, এমন সংবাদ পেলে তবেই ঔরঙ্গজেব ফৌজ পাঠাতেন। অনেক ক্ষেত্রে হিন্দু রাজারাই মন্দির ধ্বংস করার জন্য তাঁকে অনুরোধ করেছেন। তাই এই ঔরঙ্গজেব যখন একাধিক বিখ্যাত মন্দির-মঠকে নিষ্কর জমি দান করেন, রক্ষণাবেক্ষণ বা সংস্কারের অর্থ জোগান, তাতে উগ্র হিন্দুত্ববাদীদের অবিশ্বাস জাগলেও ইতিহাসের ছাত্রদের খটকা লাগে না।

তথাকথিত হিন্দু ভারতে কিন্তু ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার জন্য প্রতিধর্মীয় ধর্মস্থান ধ্বংস করার ভুরি-ভুরি নজির রয়েছে। বীরশৈবরা লিঙ্গায়েতদের মন্দির ভেঙেছে, শাক্তরা বৈষ্ণবদের মন্দির ভেঙেছে, শৈব শাক্ত ও বৈষ্ণবরা মিলে বা আলাদাভাবে বৌদ্ধ ও জৈনদের মঠ, আশ্রম, সংঘ, স্তূপ ভেঙেছে। ব্রাহ্মণ্য হিন্দু ধর্মের প্রতি ভারতেতিহাসের বৃহত্তম চ্যালেঞ্জ যে বৌদ্ধদের কাছ থেকেই এসেছিল, যেমন এসেছিল অসংগঠিত চার্বাকপন্থীদের কাছ থেকেও। এই চ্যালেঞ্জকে যে নৃশংসতায় হিন্দু কট্টরবাদীরা দমন করেছে, তালিবানদের লজ্জা দেবার পক্ষে তা যথেষ্ট। প্রাচীন কাশ্মীরের ইতিহাসকার কল্হন রচিত আখ্যায়িকা ‘রাজতরঙ্গিনী’তে এক শ্রেণীর রাজকর্মচারীর কথা আছে, যাদের নামই ছিল ‘দেবোৎপাটননায়ক। নামেই প্রকাশ, এরা দেবালয় ধ্বংস করতো। হিন্দু রাজার রাজকোষ শূন্য হয়ে পড়াতেই মন্দিরে

আমা পনঃ লুঠ করে কোষাগার পূর্ণ করার এই উদ্যোগ। এ সবই, বলা নিষ্প্রয়োজন, নীতান্ত্র আগতিক কারণে ধর্মস্থানে আক্রমণের নমুনা, বিধর্মীর ধর্মবিশ্বাসে আঘাত করা যার উদ্দেশ্য নয়। তুলনায় হিন্দু মৌলবাদী ধর্মগোষ্ঠীগুলির পরস্পরের বিরুদ্ধে আক্রমণ কিংবা অন্য ধর্মাবলম্বীদের মঠ-মন্দির ধ্বংসের তাণ্ডব অনেক বেশি সাম্প্রতিক প্ররোচনাপ্রসূত। নিজের গোষ্ঠী-ধর্মের প্রসার কিংবা পরধর্মের পীড়ন যার পেরণা।

অধর্মে নিধনং শ্রেয়, পর ধর্মো ভয়াবহ—এ ধরনের কোনও সুভাষিত কি ইসলামে আছে? বলা বাহুল্য নেই। তবে তালিবানরা বামিয়ান বুদ্ধের মূর্তি ভাঙার প্রেরণা কোথায় পেল? তালিবান প্রধান মোল্লা মহম্মদ ওমর বলছেন, ইসলামই তাঁদের প্রেরণা। এ কথা ঠিক যে বহু দেবতার পূজা বন্ধ করে কেবল ‘আল লাট’-এর আরাধনা চালু করার জন্য হজরত মহম্মদ ৩৬৪টি মূর্তি ভেঙে দিয়েছিলেন। ঘোষণা করেছিলেন—এক আল্-লা-ই-সত্য, আর সব মিথ্যা। কিন্তু ওই একবারই। তাঁর গোটা ধর্মীয় জীবনে আর কখনও তিনি পৌত্তলিকতাবাদীদের উপর খড়গহস্ত হননি। বরং কোরানে সর্বদাই অন্যের ধর্মবিশ্বাসকে শ্রদ্ধা করতে, সহ্য করতে বলা হয়েছে। ‘কোরান স্পষ্ট বলেছে—‘তোমার ধর্ম তোমরা কাছে, আমার ধর্ম আমার কাছে’। ইসলামে মূর্তিপূজা নিশ্চয় নিষিদ্ধ। মুসলমানের পক্ষে মূর্তি পূজা নিন্দনীয়। কিন্তু অমুসলমানকে মূর্তিপূজা থেকে নিরস্ত করার কিংবা তার পূজিত বা নির্মিত মূর্তি ভেঙে দেওয়ার নির্দেশ মহম্মদ কখনও দেননি। বরং মহম্মদের প্রয়াণের পর দ্বিতীয় খলিফা ওমর ফারুখ প্যালেস্টাইনকে জয় করার পর চুক্তি স্বাক্ষর করেছিলেন যে, খ্রিস্টানদের গির্জা, মা মেরি ও যিশুর মূর্তি বা ম্যুরাল, ক্রুশ কিছুরই কোনও ক্ষতি করা হবে না। এক ইহুদির শব্দার্থার সময় মহম্মদ শ্রদ্ধাবশত উঠে দাঁড়ালে তাঁর সঙ্গীরা যখন অবাক বিস্ময়ে প্রশ্ন করেছিল, ও তো মুসলমান নয়, তিনি তাদের পাল্টা প্রশ্ন করেছিলেন, তা বলে তো ও কম মানুষ নয়? অন্য ধর্ম ও ধর্মাবলম্বীর প্রতি এই সম্মান ও শ্রদ্ধা মহম্মদ আগাগোড়া অনুশীলন করেছেন। আর সে জন্যই তাঁর জীবৎকালেই ইসলাম আফগানিস্তানে প্রবেশ করলেও এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগী খালেদ ইবন ওয়ালিদ সদলে আফগানিস্তানের বহু মানুষকে ইসলামে দীক্ষিত করলেও বামিয়ান বুদ্ধরা কখনও বিপন্ন বোধ করেনি। খ্রিস্টীয় দশম শতকেই কার্যত গোটা আফগানিস্তান তার বৌদ্ধ অতীত পিছনে ফেলে মুসলিম হয়ে যায়। তার পরে হুনা ছাড়াও চেঙ্গিজ, তৈমুর, মামুদ, মহম্মদ ঘোরি, নাদির শাহ, আহমদ শাহ আবদালি, সকলেই আফগানিস্তান শাসন করেছে। কেউই কখনও পৌত্তলিকতার বিরোধিতা করতে গিয়ে বুদ্ধমূর্তি বা বৌদ্ধ সংঘারাম ধ্বংস করেনি। কারণ ইসলামে তেমন কোনও নির্দেশ ছিল না। ‘মূর্তিপূজা ক’রো না’—এমন নির্দেশ বিশ্বাসীদের প্রতি নিশ্চয় ছিল। কিন্তু ‘যারা মূর্তি পূজো করে, তাদের মূর্তি ভেঙে দাও’—এমন

ফতোয়া কোরান-হাদিশে কোথাও নেই। সে জন্যই ইরান, মিশর, এমনকী পাকিস্তানও কিছুটা বিলম্বিত প্রতিক্রিয়ায় বামিয়ান বুদ্ধের উপর তালিবানি তাগুবের নিন্দা করেছে। ভারতের একের পর এক মুসলিম নেতা ও ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব, অসংখ্য মসজিদের ইমাম, মুসলিম পার্সোনাল ল' বোর্ডের চেয়ারম্যান তালিবানি হামলার কঠোরতম নিন্দা করেছেন। শায়ের রচনা করে উর্দু কবি বলেছেন—‘জমিন পর গির রহে হ্যায় ঘর খুদা কে, ফরিস্তে আসমান পর রো রহে হ্যায়।’ চুপি-চুপি নয়, সাংবাদিকদের বৈঠকখানায় ডেকে নয়, এই ধিক্কার জ্ঞাপনের জন্য মসজিদের ইমামরা বেছে নিয়েছিলেন ইদের নমাজের লগ্নটিকে, যখন কোটি-কোটি মুসলমান ইমামের কথা শুনতে মসজিদে প্রাঙ্গণে সমবেত। তালিবানি অপকাণ্ডকে ইসলামবিরোধী আখ্যা দিয়ে তাঁরা যে আধ্যাত্মিক সততা ও সাহসের পরিচয় দিয়েছেন, তা অনুকরণীয়। মুসলিম বিশ্ব যে তালিবানদের পাশে নেই, সেটাই যেন এর ফলে আরও প্রকট হয়ে গেছে।

তা সত্ত্বেও যে তালিবানরা তাদের মূর্তি ধ্বংসের সিদ্ধান্তের অবিচল থেকেছে, তার কারণ ইসলামের পবিত্রতা সম্পর্কে তাদের ভ্রান্ত ধারণা। মূলত পাকিস্তানের বিভিন্ন মাদ্রাসায় কোরান-হাদিশের পাঠ নেওয়া এই অধিশিক্ষিত উলেমাদের মনে হয়েছে, ইসলামের শুদ্ধতা রক্ষা করতে গেলে বিশ্বকে পৌত্তলিকতামুক্ত করতে হবে এবং তা করার দায়িত্ব যথার্থ মুসলমান হিসাবে তাদের উপরেই বর্তেছে। ইরান, সৌদি আরব বা পাকিস্তান যে ইসলাম অনুশীলন করে, তালিবানদের মতে তা পশ্চিমী প্রভাবে দূষিত, বিকৃত হয়ে গেছে, তার আদিম শুদ্ধতা, সারল্য হারিয়ে গেছে। উদারনৈতিক ইসলাম তাদের মতে ইসলামই নয়। কেবল তারাই পারে নবির সময়কার অপাপবিদ্ধ, সরল ইসলামকে অবিকল পুনরুজ্জীবিত করতে। এজন্য তারা এমনকী দেশীয় ঐতিহ্যের বিরোধিতায় দাঁড়াতেও প্রস্তুত, প্রস্তুত অনৈসলামিক ঐতিহ্যকে ধ্বংস করতেও।

তাদের আফগান পূর্বপুরুষরাই যে হেরাট, কান্দাহার, বামিয়ান ও কাবুলের বৌদ্ধ মূর্তি ও সংঘারামগুলি দীর্ঘ সাধনায় গড়ে তুলেছিলেন, এগুলির সঙ্গে যে জড়িয়ে রয়েছে সেই পূর্বসূরিদের আধ্যাত্মিক সাধনা, তাঁদের শিল্পী ও কারিগরদের অতুলনীয় দক্ষতা ও অনুপম নন্দনচেতনা, এ সব কথা তালিবানদের বলে কোনও লাভ নেই। যদি তালিবানরা কোনও ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা হতো, যদি গৃহযুদ্ধে বিধ্বস্ত আফগানিস্তানের অর্থনৈতিক উজ্জীবন ও পুনর্গঠনের ব্রত হতো সেই নবজাগ্রত জাতীয়তাবাদের মর্মবস্তু, তবে দেশের সভ্যতা-সংস্কৃতির ঐতিহ্য তাদের কাছে মূল্যবান পরিগণিত হতো। তখন দেখা দিত ঐতিহ্য সম্পর্কে স্পর্শকাতরতা, ঐতিহ্যরক্ষায় সংগঠিত ও পরিকল্পিত উদ্যোগ। অতীত ঐতিহ্য তখন আফগান জাতীয়তাবাদের ভবিষ্যৎ বিকাশ ও অগ্রগতির প্রেরণা হয়ে উঠত। কিন্তু তালিবানরা

সে ধর্মের কোনও ধর্মনিরপেক্ষ এজেন্ডা নিয়ে কাবুলের মধ্যে অবতীর্ণ হয়নি।
আদের কাছে তাই ইতিহাসচেতনা বা ঐতিহ্যানুরাগ প্রত্যাশা করে লাভ নেই।

তালিবানদের বর্বরোচিত ধ্বংসলীলার নিন্দায় বিশ্বব্যাপী ঐকতানে ভারতের, বিশেষত ভারতীয় পার্লামেন্টের গলা মেলানো অনেকের কাছেই বিসদৃশ ঠেকেছে। ভারতীয় সংসদ একটি সর্বসম্মত প্রস্তাব নিয়ে বামিয়ান বুদ্ধমূর্তি সহ যাবতীয় আফগান প্রত্ননিদর্শন নিরাপদ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ভারতে নিয়ে আসার প্রস্তাবও রাষ্ট্রপুঞ্জের কাছে দিয়েছে। আট বছরের কিছু বেশি আগের এক দিন এই নির্বাচিত ভারতীয় সংসদই কিন্তু মাত্র সাড়ে চার ঘণ্টায় সাড়ে চারশো বছরের প্রাচীন একটি ইসলামি স্থাপত্যের ধূলিসাৎ হওয়া নীরবে প্রত্যক্ষ করেছে, সেই ধ্বংসযজ্ঞে প্রকারান্তরে পৌরোহিত্য করেছেও বলা যায়। যারা সরাসরি অকুস্থলে হাজির থেকে সে দিন ধ্বংসোন্মাদ উগ্র হিন্দু করসেবকদের বাবরি মসজিদ গুঁড়িয়ে দিতে উৎসাহ দিয়েছিল, মসজিদ ধ্বংসের পর প্রকাশ্যে উল্লাস ও হর্ষ প্রকাশ করেছিল—নিয়তির কী বিচিত্র পরিহাস—তরাই আজ ভারতীয় সংসদে তালিবানদের নিন্দাপ্রস্তাবের বয়ান রচনা করেছে। আরও চমকপ্রদ ঘটনা, ধর্মনিরপেক্ষ বামপন্থীরা সেই প্রস্তাব অনুমোদনও করেছেন। একুশ শতকের সূচনায় বামিয়ান বুদ্ধের মূর্তি ধ্বংস করার চেয়ে বিংশ শতকের শেষে বাবরি মসজিদ ধ্বংস করা কি কম বর্বরতা? যে নিজে বর্বর, অন্যের বর্বরতার নিন্দা তার মুখে শুনব কেন? এমনকী বামপন্থী সাংসদদেরও মনে এ প্রশ্ন জাগেনি। তাঁরা সংসদীয় প্রস্তাবে কোনও সংযোজনী বা প্রতিবাদ নথিভুক্ত করাবার চেষ্টা করেননি, বরং মুসলিম মৌলবাদের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক হিন্দুত্বের বঙ্কনির্ঘোষে গলা মিলিয়েছেন।

যে হিন্দুত্ববাদীরা আজ ভারতভাগ্যবিধাতা, তাদের অনেক কর্মসূচিই অথচ তালিবানদের কাছ থেকে সরাসরি ধার-করা বলে মনে হয়। তালিবানদের মতো তারাও চায় না মহিলারা পর্দা ছেড়ে পুরুষের পৃথিবীতে সমান মর্যাদা ও দক্ষতায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করুক। তাদের মতে, যেমন তালিবান এবং নাৎসিদের মতেও, মেয়েদের স্থান রান্নাঘরে এবং স্বামীশয়্যা। শিক্ষা মেয়েদের জন্য নয়, চাকরি তো নয়ই। রাস্তা-ঘাটে মেয়েদের বেশি ঘোরাঘুরি না করাই ভাল, খোলামেলা পোষাক তো একেবারেই পরা উচিত নয়। এই গরমের দেশেও ওতে নাকি ছেলেদের প্রবৃত্তিকে উস্কে দেওয়া হয়। আধুনিক শিক্ষা অর্থাৎ বেদে-উপনিষদে-পুরাণে-সংহিতায় নেই এমন শিক্ষা না দিলেই ভাল, মৃত ভাষা সংস্কৃত এবং হিন্দু নৈতিকতার চর্চাই হওয়া উচিত ভারতীয় শিক্ষার মেরুদণ্ড, সেই সঙ্গে বৈদিক গণিত। তা বলে আবার বাৎসায়ন, কালিদাস, মাঘ, ভাস, জয়দেব পড়লে চলবে না, ওতে আবার চরিত্র নষ্ট হয়ে যাবে! তালিবানরা যেমন কোরান-হাদিশের বাইরে পাঠ্য কিছুর অস্তিত্বই স্বীকার করে না। সংস্কৃতির ব্যাপারে কোনও উদারনৈতিক বহুত্ববাদ তালিবানদের

মতোই হিন্দু মৌলবাদীদেরও ভয়ানক অপছন্দ। সামাজিক আচরণেও সনাতনপন্থী হওয়া ভাল, জন্মদিনের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন, কার্ড পাঠানো, বিবাহবার্ষিকী উদ্‌যাপন উত্তরবৈবাহিক মধুচন্দ্রিমা যাপন ইত্যাদি পাশ্চাত্য অবক্ষয়ের লক্ষণ, ছেঁটে ফেলতে পারলেই ভাল। আর প্রাক-বৈবাহিক সহবাস, বিবাহ-বহির্ভূত সহবাস, নারীর যৌন স্বাধীনতা—এ সব কথা শুনলেও পাপ!

দৃষ্টিভঙ্গির এত স-যুজ্যের জন্যই তালিবানদের সঙ্গে গোঁড়া হিন্দুদের তুলনা শুরু হয়েছে এবং ‘হিন্দু তালিবান’ শব্দটি জনপ্রিয় হচ্ছে। ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার ব্যাপারে তালিবানদের সঙ্গে হিন্দু গোঁড়াদের এমনকী পরিমাণগত পার্থক্যও নেই, গুণগত পার্থক্য তো ছিলই না। গুজরাতে যে ভাবে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, বজরঙ দল ও আর এস এস খ্রিস্টধর্মে অন্তরিত জনজাতীয়দের নিগ্রহ করেছে, তাদের বাইবেল পুড়িয়েছে, গির্জা ভেঙেছে, পাদ্রি ঠেঙিয়েছে, সন্ন্যাসিনী ধর্ষণ করেছে, তাতে অহিন্দুদের কাছে হিন্দু কতখানি আকর্ষণীয় ও গ্রহণীয় হয়েছে কে জানে, তবে হিন্দুত্বকে যে ভারতের রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসাবে প্রতিষ্ঠা করা গেছে, তাতে সংশয় নেই। ওড়িশায় হিন্দুত্বের এই আত্মপ্রতিষ্ঠা খ্রিস্টান মিশনারিদের জীবন্ত আঙুনে পুড়িয়ে মারার মধ্য দিয়ে অর্জিত। সেই পৈশাচিক হত্যাকাণ্ডের নায়ক যখন হিন্দু সমাজে পুরাণপুরুষের মর্যাদা পেতে থাকে, নিরক্ষর গ্রামবাসীদের মধ্যে রটিয়ে দেওয়া হয় তার অবতারত্বের মহিমা, তখন ভারতীয় তালিবানদের স্বরূপ চিনে নিতে অসুবিধা হয় না। অচিরেই অধর্ম থেকে ধর্মকে রক্ষা করতে ধরাধামে অবতীর্ণ দারা সিংহ শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী হয়ে ফুটপাথের ক্যালেন্ডার শিল্পে স্থান পেল বলে!

অন্য ধর্ম এবং সেই ধর্মাবলম্বীদের সম্পর্কে তালিবানি অসহিষ্ণুতা প্রকাশ পেতে দেখেছি মকবুল ফিদা হুসেন চিত্রিত নগ্নিকা সরস্বতীর বিরুদ্ধে বজরঙ্গ আশ্ফালনে, কাওয়ালি গায়ক নসরত ফতে আলি খান এবং গজল গায়ক গুলাম আলির অনুষ্ঠান ভঙুলে শিবসৈনিকদের জঙ্গিয়ানায়। তালিবানরা আফগানিস্তানের বৌদ্ধ ঐতিহ্য সম্পর্কে শ্রদ্ধাশীল নয় বলে তাদের সে সমালোচনা হচ্ছে, ভারতের ইসলামি ঐতিহ্য সম্পর্কে বিদ্বেষ ও ঘৃণার মনোভাব পোষণ করার জন্য একই ধিক্কার তো হিন্দু মৌলবাদীদেরও প্রাপ্য। ভারতের ইতিহাসকে কেবল হিন্দু গৌরবের ইতিবৃত্ত বলে ভেবে নেওয়ার ফলে মধ্যযুগের সমৃদ্ধ ইসলামি সংস্কৃতি-সভ্যতার ঐশ্বর্যকে এড়িয়ে যাওয়া হয়। এতে যে ভারতীয় সভ্যতাই আরও রিক্ত হয়ে পড়ে, মৌলবাদীদের তা কে বোঝাবে? ভারত থেকে কেড়ে নেওয়া হোক তার ছশো বছরের মুসলিম শাসনের ইতিহাস, সুলতানি ও মুঘল স্থাপত্য, মুঘল চিত্রকলা, হিন্দুস্তানি মার্গসঙ্গীত, ফার্সি ও উর্দুতে রচিত অনুপম কাব্যসাহিত্য, শের শাহ-টোডরমল্লের রাজস্বনীতি। ভারতীয় সভ্যতাই কি তাতে আরও দরিদ্র হয়ে যাবে না? এ সব কেড়ে নিলেও তো কেড়ে নেওয়া যাবে না সত্য পির, মানিক পিরকে, সেলিম চিঙ্গি,

ইতমদউদ্দৌলাকে, পায়জামা-পাঞ্জাবিকে, উর্দু শায়েরিকে, বিরিয়ানি-কোর্মাকে। তবু ১৮৫৭ মুসলিম ইতিহাস থেকেও হিন্দু অর্জন ও কৃতিত্বের কণা খুঁটে বের করার, মুসলিম শাসকদের বিরুদ্ধে হিন্দু বিদ্রোহীদের বীরগাথা রচনার। আর তা থেকেই শিৱাজি, রানা প্রতাপ, গোবিন্দ সিংহের পুরাণকথার সৃষ্টি, আকবর-মান সিংহের ১৭৫৬ বারো ভূঁইঞার কাল্পনিক প্রতিরোধের অতিরঞ্জিত উপাখ্যান, আর তা নিয়ে দ্বাদশ তুর্কি অশ্বারোহীর বিক্রমে পরাস্ত বাঙালি রাজবৃন্দের (লক্ষণ সেন) গ্লানি অপনোদনের জন্য রচিত আত্মরতি!

তালিবানদের নিন্দায় ভারত যত উচ্চকণ্ঠই হোক, ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার বিরুদ্ধে কথা বলার নৈতিক অধিকার অটলবিহারীর ভারতের নেই। বামিয়ান বুদ্ধের ভগ্নাবশিষ্ট মূর্তি সংরক্ষণের প্রস্তাবও সুদর্শন-আডবাগীর ভারতের নেই। কেননা তাঁরা যখন এই প্রস্তাব দিচ্ছেন, তখনই দিল্লির কুতব মিনার চত্বরে একটি প্রাচীন মসজিদ প্রাঙ্গণে সংঘ পরিবারের লেঠেলরা গণেশমূর্তির সামনে যজ্ঞ আয়োজন করছে। কাশী ও মথুরা থেকে মসজিদ অপসারণ বা ভাঙার কর্মসূচি সংঘ পরিবার এখনও বাতিল করেনি, কেবল বি জে পিকে সংসদীয় গরিষ্ঠতা টিকিয়ে রাখতে সাহায্য করার জন্য সাময়িকভাবে মূলতুবি রেখেছে। ভারতের শাসক দল বি জে পিও কখনও হিন্দুত্বের এজেন্ডা, রামমন্দির নির্মাণ বা কাশী-মথুরার মসজিদ ধ্বংসের কর্মসূচি খারিজ করার শপথ নিচ্ছে না, কেবল ক্রোয়ালিশন রাজনীতির বাধ্যবাধকতার জন্য তা স্থগিত রাখার কথা বলছে। এর মধ্যে কোনও লুকোছাপাও নেই, যেমন নেই তালিবানদের পৌত্তলিকতা-বিরোধিতায়। সুতরাং এমন একটি সাম্প্রদায়িক শাসক গোষ্ঠীর হাতে প্রাচীন সভ্যতার স্মারক নিরাপদ থাকবে, এ বিষয়ে নিঃসংশয় হওয়া কঠিন। অবশ্য বুদ্ধমূর্তি বলেই হিন্দুত্ববাদীরা এত দরদি হয়ে পড়েছে। একদা বুদ্ধ ও তাঁর ধর্মের সঙ্গে যত প্রবল সংঘাতই হয়ে থাক, এখন তো আর ভারতে যথেষ্ট সংখ্যক বৌদ্ধ নেই, শিখদের মতো যাঁরা হিন্দু ধর্ম থেকে স্বাতন্ত্র্যের বেয়াড়া দাবি তুলে বসবেন, বিষ্ণুর অবতারে রূপান্তরিত করেও যাঁদের তুষ্ট করা যাবে না। যদি পরিস্থিতি তেমন হতো কিংবা যদি আশ্বেডকর অনুগামী নয়া-বৌদ্ধরা শক্তিশালী সামাজিক-অর্থনৈতিক ও ধর্মীয়গোষ্ঠী হিসাবে এ দেশে প্রতিষ্ঠিত থাকত, তবে কিছুতেই আডবাগী-যোশীরা ভগ্ন বুদ্ধমূর্তির শোকে এত উতলা হতেন না কিংবা তালিবানদের প্রতি পবিত্র ক্রোধে এত উদ্দীপ্ত বোধ করতেন না। বামিয়ানের আক্রান্ত স্মারকগুলি যদি কোনও ইসলামি সভ্যতার প্রত্ননিদর্শন হতো, বাজপেয়ীদেব বয়েই যেত সেগুলির সুরক্ষার জন্য বিচলিত হতে! বামিয়ানের ঘটনায় ভারত সরকারের উদ্বেগ ও নিন্দাবাদকে অতএব গুরুত্ব দেওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই।

ইউরোপ-আমেরিকার সুসভ্য, শ্বেতাঙ্গ পাশ্চাত্য জনমতেরও কি অধিকার আছে তালিবানদের ভর্ৎসনা করার? এরাই না এই সে দিনও কৃষ্ণাঙ্গদের ক্রীতদাস বানিয়ে

খাটিয়েছে, মেরেছে, উজাড় করেছে? এরাই তো বর্ণবৈষম্যকে রাষ্ট্রনীতি হিসাবে অনুশীলন করার অমানবিকতা দেখিয়েছে। এখনও কু-ক্লক্স-ক্ল্যান কিংবা স্কিনহেড-এর মতো বর্ণবিদ্বেষী সন্ত্রাসবাদীদের পৃথিবীর মাটি থেকে নির্মূল না করে প্রশ্রয় দিয়ে চলেছে, 'এথনিক ক্লিনজিং' চালিয়ে আস্তে জনগোষ্ঠীকে 'নেই' করে দিচ্ছে। এদের কণ্ঠে সভ্যতাভিমানের উচ্চারণ, সভ্যতার অমূল্য নিদর্শন নষ্ট হওয়ার সন্তপ্ত শোকগাথা অরওয়েলীয় প্রতারণার মতো নির্মম ঠেকে না?

AMARBOL.COM

অনীশ সংস্কৃতি—আধুনিক জীবনের অপরিহার্য সংস্কৃতি

সমীরণ মজুমদার

মানুষের ভাবনায় ঈশ্বরকেন্দ্রিক চিন্তা বহুবিচিত্র পথে, বহুবিচিত্র রূপে সঞ্চারিত হয়ে বিশ্বের প্রায় সমস্ত ধ্যান-ধারণাতেই প্রভাবিত করে এসেছে। ঈশ্বরচিন্তা মানব প্রজাতির একাকী দীর্ঘ পথ চলার পর এক অভিনব চেতনার ফলশ্রুতি। একেশ্বর চিন্তা জটিল সমাজজীবনের বুদ্ধিবাদী চৈতন্যের। সামাজিক জীবনে জটিলতা দেখা দেবার পূর্বে লক্ষ লক্ষ বছরের অরণ্যজীবনে মানুষ একমাত্র নিজের কর্মক্ষমতাকেই অবলম্বন করেছে। কোন দয়ালু ঈশ্বর তার হাত ধরতে এগিয়ে আসে নি। মাত্র কয়েক হাজার বছর হল মানুষ তার সীমাবদ্ধতা, অক্ষমতা, আকাঙ্ক্ষার উত্তরে বিভিন্নভাবে দৈব শক্তির কল্পনা করেছে। দার্শনিক বিশ্লেষণের অনেক নিরুত্তর প্রশ্নে ঈশ্বর বর্ণনা নানা শূন্যস্থান পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় হয়ে দেখা দিয়েছে। অবাস্তব ঈশ্বরকে আবিষ্কার করা সম্ভব ছিল না বলে ব্যক্তির প্রয়োজনীয় এক ঈশ্বরকে কল্পনা করে নিতে হয়েছে। ক্ষমতায় দুর্বল, সম্পদে দরিদ্র, অক্ষরজ্ঞানহীন মানুষেরা অভাবের সান্ত্বনার আশ্রয় রূপে ধর্মের ঈশ্বরকে অবলম্বন করেছে। সচ্ছল শিক্ষিতেরা আকাঙ্ক্ষার উত্তরে ঈশ্বরে বিশ্বাস স্থাপন করেছে। স্বত্ববানের অধিকারের স্বার্থে ঈশ্বর ক্রমশ প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের প্রতিভূ হয়ে উঠেছে। তাই লক্ষ লক্ষ বছরের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক যুগে প্রয়োজন না হলেও বিগত কয়েক হাজার বছরের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে ঈশ্বরের একচ্ছত্র অধিকার।

অস্তিত্বহীন ঈশ্বর যেহেতু এক চিন্তা-আপাতন তাই ঈশ্বর চিন্তার আবির্ভাবের পাশাপাশিই অনীশ ভাবনারও আগমন। সেই চিন্তা এসেছে সমাজ বাস্তবতার উর্ধ্ব থেকে ব্যক্তিগত মননের ফলশ্রুতিতে। ইতিহাসে সে স্বাক্ষর যথেষ্ট গভীর।

মানুষের সর্বাপেক্ষা সুগভীর মননের ক্ষেত্র হল দর্শন। দর্শন-চিন্তায় সূত্রপাত থেকেই ঈশ্বরের প্রয়োজনীয়তার কথা উপলব্ধি হয়। যদিও সে চিন্তা সমাজ-জীবনের আচার-অনুষ্ঠান প্রধান প্রাতিষ্ঠানিক ঈশ্বর-চিন্তাকে তেমন প্রভাবিত করতে পারে নি। এই চিন্তাসূত্রের ক্রমবিকাশে এক সময় দর্শনের জগতেই ঘোষণা করতে শোনা যায় ‘ঈশ্বর মৃত’। আর বিংশ শতাব্দীর আধুনিক দর্শন তো চার্বাকেরই কণ্ঠস্বর।

মানবসমাজের রাষ্ট্রব্যবস্থায় রাজা ঈশ্বরের প্রতিনিধির মুকুট পরেই শাসনদণ্ড

তুলে নেয়। তবুও ধর্ম ও রাজশক্তির ভিতর একটা প্রাধান্যের টানাপোড়েন সব সময়েই লক্ষ্য করা যায়। ভারতীয় সমাজে ধর্মের প্রতিনিধি মুনি-ঋষি এবং শাসক রাজার ভিতর দ্বন্দ্ব থাকলেও সখ্যতার সম্বন্ধ স্থাপিত হয়ে এসেছে। ইসলাম ধর্ম ও রাজনীতির অভিন্ন অবস্থা গড়তে গিয়ে খলিফার ধারণা সৃষ্টি করেছে। কিন্তু খ্রীষ্টান পোপ আর পশ্চিমী রাজাদের ভিতর ক্ষমতা নিয়ে দ্বন্দ্ব প্রকট ও সংঘাতময় হয়ে উঠেছে বারবার। লৌকিক ধর্ম, রীতি-নীতি আচার-অনুষ্ঠান যখন নীরবে বিশ্বাসের অচলায়তন ধরে রেখেছে, প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম তখন বারেবারে ফরমানের থাবা উঁচু করে ধরে শাসন করে এসেছে সাধারণ মানুষকে আর বারবার চেষ্টা করেছে রাজমুকুটকে স্পর্শ করবার।

আধুনিক ইউরোপে নিত্য-প্রয়োজনীয় সম্ভারের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং যুক্তি বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতি ধর্মশাস্ত্র ও ধর্মীয় বিধানের উপস্থিতিকে প্রতিবন্ধক রূপে উপলব্ধি করল। এর আগে রাজা না পোপ—প্রাধান্যের এক স্বত্ব আত্মপ্রকাশ করে। বিজ্ঞান ও রাষ্ট্রশক্তি এই পরিস্থিতিতে ‘নো পাসারণ’ বলে ধর্মকে তার সামনে পা বাড়াতে দিল না। রাজকার্যে ধর্মের হস্তক্ষেপের অবসান সূচিত হল। সমাজের অন্তত একটি ক্ষেত্রে চিহ্নিত হল ধর্মের প্রথম পরাজয়। আবির্ভূত হল অনীশ রাষ্ট্র। আক্ষরিক অর্থে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। রাষ্ট্রের কার্যকলাপে কোনরকম ধর্মীয় হস্তক্ষেপ থাকবে না—রাষ্ট্র চলবে নাগরিক পৌর নিয়মে স্বাভিজ্ঞানবোধের স্বাধীনতার রক্ষাকবচ হবে গণতন্ত্র।

কয়েক হাজার বছর পর এই প্রথম পৃথিবীতে এমন একটা পরিবেশ দেখা দিল যেখানে অনীশ সংস্কৃতির বিকাশ অনিবার্য হয়ে উঠল। আধুনিক যুগ এই ধারাবাহিকতার ফলশ্রুতি।

বর্তমান পৃথিবী এমন এক সময়ের মধ্যে প্রবেশ করেছে যেখানে অনেকগুলি প্রত্যয়কে আর পাশ কাটিয়ে চলার উপায় নেই। ধর্মবোধ তার প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হয়ে উঠছে। সেই চিন্তা ও চেতনামূল্যই চিহ্নিত করে দেয় একটা সমাজ যথেষ্ট আধুনিক কিনা। অর্থনৈতিক অগ্রসরতার তারতম্য এবং ধর্মীয়-শাসন-মুক্তির স্তর-তারতম্য দেশে দেশে আধুনিক মানুষের বৈশিষ্ট্যে পার্থক্য গড়ে দেওয়া সত্ত্বেও আজকের পৃথিবীর আধুনিক জীবনে এমন কতকগুলি প্রত্যয়কে অবলম্বন করতেই হয় যাকে বাদ দিয়ে মানুষের সার্বিক বিকাশ ভাবাই যায় না।

লক্ষ লক্ষ বছর আগের মানুষের চিন্তা নির্দিষ্টভাবে জানার উপায় নেই। তবে প্রত্ন স্বাক্ষর থেকে বলাই যায় যে তখনকার চিন্তার প্রাধান্যে ছিল ‘অস্তিত্বরক্ষা’। নিরাপত্তা ও আহার নিয়ে ভাবনাই ছিল প্রধান। সংস্কৃতির রূপান্তরে আহার্য সংগ্রহের উপায় ও নিরাপত্তা ব্যবস্থার বিবর্তনই ছিল মূল। সৌন্দর্য চিন্তা—অস্ত্রের অঙ্গসজ্জা, দেহ-চিত্রণ, বস্ত্র, গৃহ, ব্যবহার্য সামগ্রীর সৌন্দর্য বিধানকে ঘিরেই বিকশিত হয়েছে। কোন ধর্মবোধ ঐ সময়ের সাংস্কৃতিক যুগগুলিকে আচ্ছন্ন করে নি।

ঈশ্বর ও মানুষ—এই দ্বৈতবোধ দেখা দেবার পর থেকে চিন্তামূল নানাভাবে বর্ণিত হয়েছে। ঈশ্বর কেন্দ্রিক ভাবনায় মানব জীবনের লক্ষ্যই হয়ে উঠেছিল ঈশ্বরকে তৃপ্ত করা। তারই, সার্বিক প্রভাবে মানুষ বিবেচিত হয়েছে দৈবশক্তির ক্রীড়নক। এই পার্থক্য জীবন ও মৃত্যু পরবর্তী জীবন ঈশ্বরের কৃপাধীন।

মধ্যযুগের পর থেকে প্রধানত পাশ্চাত্য চিন্তায় আলোড়ন দেখা দেয়। এক সময় গান-বিজ্ঞান চর্চাই মানব সমাজের কেন্দ্রীয় কর্তব্য বলে চিহ্নিত হয়। ‘জ্ঞানই শক্তি’ বলে ঘোষিত হয়। দর্শনও বিজ্ঞান চিন্তাকে অবলম্বন করে।

ভাবনা এল, উৎপাদন ব্যবস্থার পর্যালোচনা ও তা থেকে মানুষের জন্য এক সম্পদশালী ভবিষ্যৎ নিয়ে আসার। এই চিন্তার কেন্দ্রে এসে দাঁড়াল সমাজ উৎপাদন ব্যবস্থা ও উৎপাদন সম্পর্ক। ঘোষিত হল ‘শ্রেণী-অবসান’।

এল, ঈশ্বরকে দূরে সরিয়ে রেখে মানবকেন্দ্রিক ভাবনা। শোনা গেল, ‘সবার উপর মানুষ সত্যের ঘোষণা। এ-চিন্তা এতদূর প্রসারিত হল, যে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির লক্ষ্যই ছিল মানব প্রজাতির আবির্ভাবকে সম্ভব করে তোলা, তাও বলা হতে লাগল। পৃথিবীকে কর্ষণ করা হতে থাকল অন্য কোন শর্তকে গণ্য না করে সব কিছুই মানুষের জন্য সংগ্রহের দৃষ্টিভঙ্গিতে। অলীক ঈশ্বর প্রতিস্থাপিত হল চৈতন্যের সর্বোচ্চ উন্নত রূপ মানুষের দ্বারা।

সর্বাধুনিক যুগে দাঁড়িয়ে অনীশ সংস্কৃতির ক্রমাগত পরিবেশে আজ চিন্তামূল হয়ে উঠছে প্রাণ ও প্রকৃতির এক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক-বোধ। এখন পর্যন্ত মানুষের জানা ব্রহ্মাণ্ডে প্রাণ হল সর্বাপেক্ষা দুর্বল। এককোষী প্রাণ থেকে মানুষ পর্যন্ত। প্রাণী উদ্ভিদ মানুষ এবং তার জড় পরিবেশ সহযোগে এক অভিন্ন অস্তিত্বকে সমস্ত চিন্তার কেন্দ্রে স্থাপন করাই হবে এ-যুগের বৈশিষ্ট্য। অনীশ সংস্কৃতির এটাই চিন্তামূল। সৃষ্টির জন্যও ঈশ্বরের দিকে তাকানো নয়, এই প্রকৃতির রসায়নে সৃষ্টির স্রষ্টাও হবে বিকশিত চৈতন্যের মানুষ। সৃষ্টি রহস্য আবিষ্কারের শক্তিতে।

বর্তমানে গোটা পৃথিবীর বিশ্বমানবের বসবাসের উপযোগী হয়ে ওঠার জন্য যে নিরন্তর প্রয়াস চলছে তার কর্মপ্রবাহের নানা রূপতা লক্ষণীয়। সেগুলি পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত আবার স্ববৈশিষ্ট্যসম্পন্ন। আধুনিক এ-যুগের সেই ধারাগুলি দশটি প্রধান রূপে চিহ্নিত হতে পারে। আধুনিক সংবেদনা এই চিন্তা উদ্ভূত কর্মধারার পরিস্ফুটনের উপর নির্ভরশীল। সেই দশটি বিষয় হল : যুক্তি-বিচারবোধ, বিজ্ঞানমনস্কতা, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, মানবতা, সামাজিক ন্যায়, পরিবেশ চেতনা, নারীমুক্তি, ব্যক্তিমুক্তি ও বিশ্ববোধ। এই বিষয়গুলিই হল এ যুগের পরিশীলিত ধারণার অন্তর্নিহিত জ্ঞানমূল। বর্তমান যুগের ভবিষ্যৎ উত্তরণের চরিত্র নির্ধারিত হবে এই জ্ঞানমূলের উপর ভিত্তি করে করণীয়ের সাফল্যের উপর। অনীশ সংস্কৃতি হল এই দশটি জ্ঞানমূলের চিন্তা-প্রভাবিত সংস্কৃতি। অনীশ যে চেতনার উন্মেষ-প্রত্যাশী তা হল প্রাণ-প্রকৃতির অঙ্গাঙ্গী গুরুত্বের চিন্তামূল। এককোষী প্রাণ থেকে মানুষ পর্যন্ত

এবং তার সাথে সম্পর্কিত এই জড়-প্রকৃতির সামগ্রিক অস্তিত্ব-বোধই হল অনীশ সংস্কৃতির চিন্তামূল। মানুষের অস্তিত্বের অনুকূল বিশ্বভাবনা থেকে গোটা প্রাণ প্রজাতির অনুকূল বিশ্বভাবনা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

অনীশ সংস্কৃতির সাথে ঈশ্বরের বিচ্ছেদ এবং ক্রমাগত দূরত্ব রচনা অনিবার্য। ঈশ্বরকেন্দ্রিক ধর্মের স্বভাবতই দশটি জ্ঞানমূলের সাথে দ্বন্দ্বময় সম্পর্ক। এই দশটি জ্ঞানমূলের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা কার্যক্রম যা আধুনিক জীবনের আরম্ভ ধারা তা ধর্মের অপ্রয়োজনীয়তা ও অপসূয়মানতাকে অনিবার্য করে তুলবে।

যুক্তিবিচারবোধ

মানুষের জ্ঞান তার পারিপার্শ্বিকের সাথে সক্রিয়তা-লব্ধ। জড় ও চৈতন্যের গতি-প্রকৃতি ও তার আচরণের সাথে মস্তিষ্কের প্রতিক্রিয়া থেকেই প্রাথমিক যুক্তিবোধ গড়ে ওঠে। যুক্তির সূক্ষ্মতা ও বিস্তার বুদ্ধিবাদী, বিচারবাদী মন গড়ে তোলে। যুক্তি এক অর্থে প্রকৃতির পর্যবেক্ষণে মস্তিষ্ক-ক্রিয়া। ভাষার বাক্যবিন্যাস ব্যাকরণের যুক্তিসিদ্ধতার পথ ধরে অগ্রসর হয়। যুক্তিহীন ব্যাকরণে অক্ষর ও শব্দবিন্যাস কখনও অর্থবহ হয়ে ওঠে না। চিন্তার প্রাণ হল যুক্তি ও বিচারবোধ।

একসময় মন্ত্র, যাগযজ্ঞ, তাবিজ, কবজের ব্যাপক প্রচলন ছিল। এই কাজের পিছনে যুক্তি ছিল প্রত্যাশা পূরণ। মৃত্যুকে পরিস্কারের কোন উপায় না পেয়ে স্বর্গে গিয়ে বেঁচে থাকার যুক্তি হিসাবে পরলোকের ধারণা গৃহীত হয়। ঈশ্বর থেকে নৈতিকতা আসে সেই যুক্তিতে ঈশ্বর প্রয়োজনীয়।

যুক্তির পথেই নতুন যুক্তি আসে। যুক্তির পথেই কোন এক সময় যা-ছিল যুক্তিপূর্ণ তা অযৌক্তিক বলে চিহ্নিত হয়। যুক্তির মধ্য দিয়েই গ্রহণ বর্জনের ধারা বহমান থাকে। যুক্তির বাক্য বিন্যাসেই তর্কশাস্ত্র গড়ে ওঠে, প্রতিপক্ষকে যুক্তি দিয়েই পরাজিত করা হয়। যুক্তিই প্রকৃতিকে বিজ্ঞানের গবেষণাগার হিসাবে উপস্থিত করেছে। এই যুক্তি গ্রহণের সাথে বিচারধারার সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ। একাধিক যুক্তি সম্পন্ন প্রক্রিয়ায় বিচারধারাই গ্রহণীয় যুক্তিটি নির্ধারণ করে দেয়।

ধর্ম যে শিথিল যুক্তির উপর মানুষের শিশু-জ্ঞানের স্তরে গড়ে উঠেছে তা যুক্তির সম্মুখীন হলেই ভেঙে পড়তে বাধ্য। তাই ধর্ম বিশ্বাসকে আশ্রয় করে। একবার কথিত হয়ে শাস্ত হবার দাবি করে। যুক্তি পক্ষান্তরে ক্রমাগত তথ্যের আলোয় বদলিয়ে এক সত্য থেকে নতুনতর সত্যের সন্ধান দেয়।

যুক্তিসম্পন্ন মানুষ জানে, যে যীশু স্পর্শ করেই কুষ্ঠরোগীকে সারাতে পারে না। মহাম্মদের কাছে কোন সময়েই পর্বত এগিয়ে আসতে পারে না। মানুষ তথ্য ও জ্ঞানের যুক্তি থেকে জানে যে বৈদেহী গডের দেহধারী পুত্র হওয়া সম্ভব নয়। নিরাকার আল্লাহর কণ্ঠস্বর শোনা যায় না। তাই বলে ধর্ম নিশ্চয়ই যুক্তির পথ ধরে বাইবেল কোরানের নতুন নতুন সংস্করণ করবে না। এখানেই ধর্মের যুক্তি-

অগ্রাহ্যতার চরিত্র।

ধর্ম তবুও যুক্তির সবল প্রকাশের কাছে একেবারেই যুক্তিহীন আচরণ বর্জন করতে বাধ্য হয়। মঘা-বারবেলার ‘যাত্রানাস্তি’ বাস-রেলের ধার্মিক যাত্রীরাও মেনে চলতে পারে না। বিমানযাত্রাপথে, যুদ্ধক্ষেত্রে পরম ধার্মিকও দিনে পাঁচবার নমাজ পড়তে পারে না। কিন্তু এই জাতীয় অবশ্যম্ভাবী পরিস্থিতিতে অযৌক্তিক আচার-আচরণ-রীতি-নীতি স্থগিত থাকলেও যুক্তি-বিরোধী বলে ধর্ম নিজেকে সংস্কার করতে পারে না। কারণ তা হলে অযৌক্তিক খোসা ছাড়াতে থাকলে ধর্ম নিছক বিশ্বাস-অতিরিক্ত কোন অবয়বই ধরে রাখতে পারবে না। তাই ধর্ম শেষ পর্যন্ত গোঁড়া, যুক্তি-বিরোধী অবস্থানই বেছে নেয়।

অনীশ সংস্কৃতি বিপরীতে যুক্তির পথ ধরে ধর্মীয় অচলায়তনে পরিবর্তনের ঢেউ তুলতে চায়। যুক্তির পথে ভ্রম হত্যা করে স্বীকার করে নিয়ে পরিবার পরিকল্পনাকে গ্রহণীয় করে তোলে, বোরখা ছেড়ে নারীকে কর্মজগতে পা বাড়াবার আহ্বান জানায়, বৈধব্যের অনুশাসন ছিঁড়ে ফেলে বিধবা রমণীকেও বিবাহে উৎসাহিত করে।

যুক্তির চলমানতাকে গ্রহণ করা ও তাঁর আলোয় চলার সংস্কৃতি হল অনীশ সংস্কৃতি।

বিজ্ঞানমনস্কতা

বিজ্ঞান মানব সমাজের অপরিহার্য সঙ্গী। বিজ্ঞানমনস্ক না-হয়েও হাজার হাজার বছর মানুষ বিজ্ঞানের পথেই হেঁটেছে।

চাকার আবিষ্কার বিজ্ঞান। চাকার অপর্যয় অনুধাবন বিজ্ঞানমনস্কতা। মহাকালের জ্ঞান বিজ্ঞান। মহাকালকে জেনে গ্রহ-নক্ষত্র ও ভাগ্যের সম্পর্ক ছিন্ন করা বিজ্ঞানমনস্কতা।

সমুদ্রের জল বাষ্প হয়ে উঠে—পাহাড় চূড়ায় বরফ ও জল হয়ে নদী সৃষ্টি করার প্রক্রিয়া-অনুধাবন বিজ্ঞান। নদীর জলের সাথে মাহাত্ম্যের সম্পর্ক অগ্রাহ্য করা হলে বিজ্ঞানমনস্কতা।

বিজ্ঞান দিয়ে প্রযুক্তির উন্নতি ঘটে, জ্ঞান প্রসারিত হয়। কিন্তু নিছক বিজ্ঞানের জ্ঞান দিয়ে চিন্তাধারাকে সমৃদ্ধ করা যায় না। বিজ্ঞানের জ্ঞান চিন্তাকে সমৃদ্ধ করে বিজ্ঞানমনস্কতায়।

বিজ্ঞানের জানার পদ্ধতির মধ্যে আছে যুক্তি ও কল্পনা, পর্যবেক্ষণ ও প্রমাণ, গ্রহণ ও বর্জনের শক্তি। অজ্ঞানের দাবিদার ভ্রান্ত প্রমাণিত হলে বিজ্ঞানে রয়েছে তার অকপট অস্বীকৃতি। বর্জন ও গ্রহণের মানসিকতাই হল বিজ্ঞানমনস্কতা। বিজ্ঞানে তত্ত্বের ভুল তৈরি হয় না, বিজ্ঞানে মতবাদী গোষ্ঠী সৃষ্টি হয় না, বিজ্ঞানে বিশ্বাসীদের মতো সম্প্রদায় তৈরি হয় না।

ধর্ম কখনও বিজ্ঞানমনস্ক হতে পারে না। তা হলে প্রাচীনকালের নবী-

মহাপুরুষদের সীমাবদ্ধ জ্ঞানে জাহির করা সত্যের দাবি কয়েকশবার অগ্রাহ্য হয়ে নতুন করণীয় গৃহীত হত। অনগ্রসর সমাজের বিধান শাস্ত্রসম্মত হয়ে আজও থেকে যায় বিজ্ঞানমনস্কতার অভাবের কারণে। ধর্ম অন্যমত সম্পর্কে অঐর্ষ্য, এমন কি অন্য ধর্মমত সম্পর্কেও অঐর্ষ্য। নানা মত শোনা ও বিচার করার ক্ষমতার অভাবেই ধর্মকে ঘিরে সম্প্রদায় সৃষ্টি হয় যারা যুগপৎ ভিন্ন বিশ্বাসকেই সত্য বলে প্রতিষ্ঠিত করতে আগ্রহী হয়।

এমন যে রক্ষণশীল ধর্ম তারও বিজ্ঞানের বিকাশের পথে পরিবর্তন ঘটে যায়। বিজ্ঞানচেতনার বিচারের সম্মুখে অলীক বিশ্বাসের এক একটি পাথর খসে পড়ে। অভ্যাস ও বিশ্বাসের শক্ত ভিত্তি বিজ্ঞানমনস্কতা টলিয়ে দিতে পারে। বদল, পরিবর্তন, বর্জন ও নতুনকে গ্রহণ হল বিজ্ঞানমনস্কতার সৃজনশীল অস্তিত্বের ভিত্তি পক্ষান্তরে ধর্ম হল কঠোরভাবে রক্ষণশীল। ধর্মীয় ধারায় যা-কিছু পরিবর্তন অবশ্যজ্ঞাবী রূপে দেখা দিয়েছে তা ধর্মের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের ফল নয়, তা ঘটেছে সমাজের বিকাশশীলতার বাধ্যতামূলক শর্তে।

পরিবর্তনশীলতাকে ধারণ করা এবং সেই মর্মে সংস্কৃতির রূপান্তরের পথ খুলে দেওয়ার সংস্কৃতি হল অনীশ সংস্কৃতি।

ধর্মনিরপেক্ষতা

রাষ্ট্রব্যবস্থার সাথেই ধর্মনিরপেক্ষতার সম্পর্ক। ধর্ম-রাষ্ট্র পরিহার্য। রাষ্ট্র-ধর্ম পরিত্যাজ্য। রাষ্ট্রীয় কাজে ধর্ম বর্জনীয়। রাষ্ট্র চলবে সমস্ত নাগরিকের অভিন্ন স্বার্থে পৌরবিধি অনুসারে। ধর্ম সম্পর্ক রাষ্ট্র থাকবে নিরপেক্ষ। কোন ধর্ম সম্পর্কে রাষ্ট্রের কোন করণীয় থাকতে পারে না। দুটি পক্ষ থেকে নিরপেক্ষ থাকার অর্থ কোন পক্ষেই না-থাকা, একাধিক ধর্ম সম্পর্কে নিরপেক্ষ থাকা অর্থ কোন ধর্মের পক্ষেই না-থাকা।

অতীতে ধর্ম-নিয়ন্ত্রিত, চার্চ-পরিচালিত, খলিফা-শাসিত রাষ্ট্রে ধর্মের যে-জোর ছিল আধুনিক রাষ্ট্র-আবির্ভাবে, বিজ্ঞান-প্রযুক্তি ও পুঁজি প্রবাহের প্রবল আধিপত্যে সে-জোর ও নিয়ন্ত্রণ শিথিল হয়ে যায়। বহুধর্মের রাষ্ট্রে তো বটেই বৃহত্তম নাগরিক, একই ধর্ম অনুসরণকারী রাষ্ট্রেও ধর্মনিরপেক্ষতা আধুনিকতার শর্ত হয়ে উঠেছে।

ধর্মীয় আইন, ধর্মীয় ফতোয়া, ধর্মীয় রীতি-নীতি রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করতে এলে, সমাজজীবনে চলমানতায় বাধা সৃষ্টি করলে রাষ্ট্র তা গ্রাহ্য করতে পারে না। রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব, নাগরিক আইন, পৌরব্যবস্থা, প্রযুক্তি-প্রধান পরিচালনা, পুঁজি ও পরিকল্পনাচালিত অর্থনীতি, জ্ঞানান্বেষণ ও কর্মদক্ষতা লাভের জন্য শিক্ষা প্রভৃতি আবশ্যকীয় ব্যবস্থা ধর্ম-প্রভাবিত রাষ্ট্রপরিচালনাকে প্রতিস্থাপন করেছে। এই প্রতিস্থাপন যতো সম্পূর্ণ হবে নাগরিক জীবন ততো আধুনিক হয়ে উঠবে। সংস্কৃতি ততো সর্বজনীন রূপ লাভ করবে। অনীশ সংস্কৃতি ততো পূর্ণতা পাবে।

মানব ইতিহাসে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের কাছেই ধর্ম প্রথম মাথা নত করে। রাষ্ট্র

ঘোষণা করে ধর্মকে অপ্রয়োজনীয় বলে চিহ্নিত করে। রাষ্ট্রব্যবস্থা, সমাজব্যবস্থা ও ব্যক্তি জীবনের তিনটি পর্যায়ের ভিতর একটি স্তর ধর্মকে পরিহার করে ধর্মনিরপেক্ষ হয়ে উঠেছে। ইতিহাস তাকে গ্রহণ করেছে। ধর্মের এই প্রস্থানপর্ব দ্বিতীয় পর্যায়ে উপস্থিত। ধর্ম থেকে সামাজিক জীবনকে ক্রমশ মুক্ত করতে হবে। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ধর্মনিরপেক্ষ সমাজ গঠনের আরম্ভ পথ নির্মাণ করে দিয়েছে।

ধর্মনিরপেক্ষতা অনীশ সংস্কৃতির এক সবল শর্ত।

গণতন্ত্র

গণতন্ত্র একটা শাসনপদ্ধতি হলেও গণতন্ত্র তত্ত্ব হিসাবে তার প্রসারিত অর্থে এক গাণিক গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছে। গণতন্ত্র বলতে এখন যে-কোন সংঘবদ্ধ প্রয়াসে সকলের কণ্ঠস্বরের গুরুত্ব প্রদানের কথাই বোঝানো হয়ে থাকে। অধিকাংশের মত গ্রহণ যেমন গণতন্ত্র সংখ্যালঘিষ্ঠের বক্তব্যের নিশ্চয়তাও তেমনি গণতন্ত্র। গৃহীত ব্যবস্থাকে মেনে চলা যেমন গণতন্ত্র। গৃহীত ব্যবস্থার বিরুদ্ধতাও তেমনি গণতন্ত্র। সম্মিলিতকে মেনে নেওয়া যেমন গণতন্ত্র এক জনের মত প্রকাশের অধিকারও তেমনি গণতন্ত্র। গণতান্ত্রিক উপায়ে আজ যে-মত স্বীকৃত, সেই গণতান্ত্রিক উপায়েই কাল সে মত বর্জিত হতে পারে।

স্বভাবতই গণতন্ত্র ধর্মের পক্ষে গ্রহণযোগ্য নয়। ধর্মীয় ধারার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। ধর্মকে ঘিরে বেশি প্রশ্ন করলে ‘মাথা খুঁসে পড়ার’ ভয় আছে। মোক্কা-পুরোহিত-পোপের ফরমানের বিরোধিতা করলে শাস্তির ভয় আছে। অতি আধুনিক সময়েও মত প্রকাশের বিরুদ্ধে ধর্ম মৃত্যুদণ্ড ও দেশত্যাগের মতো মধ্যযুগীয় দণ্ড দানের ধৃষ্টতা দেখাতে পারে।

গণতান্ত্রিক অধিকারবোধ প্রতিষ্ঠিত হবার আগে থেকেই এমন সমস্ত ধর্মীয় ব্যবস্থা প্রচলিত হয়েছে আজ তা অকপটে অগণতান্ত্রিক বলে বাধা নেই। ধর্মীয় বর্ণ ব্যবস্থা অগণতান্ত্রিক। ধর্মীয় বিধানে নারীর নির্ধারিত স্থান অগণতান্ত্রিক। সমস্ত পুরাণে দেব-দেবীর কাণ্ডকারখানা অগণতান্ত্রিক। রাষ্ট্রীয় সংবিধান গণতান্ত্রিক উপায়ে সংশোধন করা যায়। কোরান-বাইবেল-বেদের বিধান গণতান্ত্রিক উপায়ে সংশোধন করা যায় না। ধর্ম নিজেই ভয়ঙ্করভাবে অগণতান্ত্রিক।

আধুনিক যুগে গণতন্ত্রের প্রভাব এতই সর্বতোমুখী যে ধর্মকে তার কাছে নতিস্বীকার করতেই হয়। জনতার নিশ্চুপ দাবির কাছে নতিস্বীকার করে জোয়ান অফ্ আর্ককে সেন্ট ঘোষণা করতে হয়। কয়েক শতাব্দী কাটিয়ে এসেও জনতা যে গ্যালিলিওকে গ্রহণ করেছে ধর্মের পক্ষে তাকে স্বীকার না করে উপায় থাকে না। বৃহত্তর মানুষের গণতান্ত্রিক বোধকে গ্রহণ করেই মিতাক্ষর দায়ভাগ সংশোধিত হয়ে নতুন আইন-সংহিতা গড়ে ওঠে। গণতন্ত্রের নীরব দাবির কাছে নতিস্বীকার করেই শরিয়ত বদলায় যুগের সাথে সাথে। গণতান্ত্রিক মানুষের দাবির শর্তেই গড়ে ওঠে

ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। গণতান্ত্রিক ন্যায়ের পথ ধরেই নারী-পুরুষ অধিকারের সাম্য প্রতিষ্ঠা কর্তব্য হয়ে ওঠে।

আধুনিক সমাজে গণতন্ত্র অপরিহার্য। মতামতের অবাধ সঞ্চালন এ-সমাজের অস্তিত্বের সাথে যুক্ত। ধর্ম মতামত থেকে ফরমানকে বড় মনে করে, গণকণ্ঠ থেকে ঈশ্বরের কণ্ঠকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করে, ব্যক্তির অধিকার থেকে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের অধিকারকে অনুসরণীয় মনে করে। ধর্মের কাছে 'জনগণের কণ্ঠই ভগবানের কণ্ঠ' হয়ে ওঠে না।

সর্বজনীনতা গণতন্ত্রের পথেই সম্ভব। অনীশ সংস্কৃতি সর্বজনীন বোধেরই সংস্কৃতি। গণতন্ত্র হল অনীশ সংস্কৃতি গড়ে ওঠার পরিবেশ।

মানবতা

'সবার উপর মানুষ সত্য' ঘোষণা হল ঈশ্বরের উপর প্রথম সোচ্চার অনাস্থা। 'মানব পরিচয়েই মানুষের সর্বোচ্চ পরিচয়' বলে মনে করা হল ধর্ম-ধর্ম বিভাজিত ধর্মপরিচয়ের এক পা সরে দাঁড়ানো। মানুষের নিজস্ব শক্তির উপর নিজের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা হল ঈশ্বর নির্ভরতার সমাপ্তি।

মনুষ্য পরিচয় সর্বোচ্চ হয়ে ওঠার মধ্য দিয়েই মানবতার ধারণার আবির্ভাব। প্রতিটি মানুষের অভিন্ন অধিকারের স্বীকৃতি হল মানবতার এক বিরাট পদক্ষেপ। মানুষ-মানুষে পার্থক্য, মানুষের প্রতি অবমাননা, মানুষের উপর অত্যাচার, মানুষের আত্মপ্রকাশের উপর আক্রমণ প্রভৃতি সবই মানবতা-বিরোধী।

ধর্ম মানুষকে কোনদিন মর্যাদা দেয় নি। পুরুষকে ঈশ্বর-কৃপাধীন যেটুকু মর্যাদা দেওয়া হয়েছে, নারীকে তাও দেওয়া হয় নি। মানুষকে ধর্ম অসহায়ভাবে ঈশ্বরের উপর নির্ভরশীল করে রেখেছে। আত্মায় ভয় দেখিয়েছে। শয়তানের ভীতি গড়ে তোলা হয়েছে। পাপের অভিশাপের কথা বলা হয়েছে। কল্লিত স্বর্গের প্রলোভন দেখিয়ে গডের কাছে অনুশোচনার কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছে। পূর্বজন্মের বানানো কর্মফল শুনিয়ে বর্ণঅত্যাচার সংগঠিত করেছে। ধর্ম অলীক ঈশ্বরকে মুকুট পরাতে গিয়ে মানুষকে অপমান করেছে।

কাফের বানিয়ে 'নিরীশ্বরবাদী ও ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের হত্যা করেছে ধর্ম। বর্ণব্যবস্থার নামে বংশগত অত্যাচারের খোঁয়ারের সমর্থন দিয়েছে ধর্ম। নারীর প্রতি ধর্মের প্রতিটি উচ্চারণ মানবতার প্রতি অপমান।

স্বর্গ ছেড়ে পৃথিবী, ভাগ্য ছেড়ে কর্ম, ঈশ্বর ছেড়ে মানুষের প্রতি আস্থার পথ ধরে দেখা দিয়েছে মানবতা। মানবতাই মানুষকে প্রকৃত সম্মান দিয়েছে। মানবতাই নারীকে মানুষ হিসাবে দেখার দৃষ্টি দিয়েছে। খোলা ঘর ছেড়ে নারীকে কর্মজগৎ চিনিয়েছে।

মানুষ যদি ঈশ্বর-সৃষ্ট, ঈশ্বর নিয়ন্ত্রিত ও ব্রহ্মালাভের পরিণতি-সম্পদ জীব হয়

তাহলে মানবতার ধারণার কোন অর্থ থাকে না। মানবতার ভাবনায় ‘মানুষ’ সত্তা হিসাবে এত স্পষ্টভাবে উপস্থিত যে অন্য কোন নিয়ন্ত্রকের উপস্থিতি সেখানে নিশ্চয়োৎপাদন। প্রকৃতির নিয়মের ছন্দে প্রাণের উদ্ভব। মানুষ তারই বিকশিত রূপ। এই নিয়ম বিচ্ছিন্ন কোন বিমূর্ত সত্তা কল্পনা ভিন্ন বাস্তবে সম্ভব বলে ভাবার কোন ভাষা ও ন্যায় মানুষের নেই। মানুষ তাই মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধিতে সর্বশ্রেষ্ঠ জীব রূপে জানা যায়। অন্য কিছু ভাবার উপায় নেই। মানবতা সেই মানুষেরই সর্বোচ্চ স্বীকৃতি।

বিশ্বাসী মানুষের ভিতরও ভিন্ন অর্থে মানবতার প্রকাশ সম্ভব। এই মানবতার দৃষ্টিভঙ্গিতে জাতি-পরিচয়, ধর্মপরিচয়, ভাষা পরিচয় প্রভৃতির উপরে সর্বোচ্চে স্থাপিত মানব পরিচয়। কোন পরিচয়ের নামেই মানব-পরিচয় লঙ্ঘিত হতে পারে না। সমস্ত মানুষকে সমান দৃষ্টিতে দেখা, মানুষের উপর মানুষের অত্যাচারে কুণ্ঠিত হওয়া, কোন পরিচয়ই মানব পরিচয় বড় বলে তুলে না—ধরার ভিতরেই মানবতার অবস্থান।

মানবতার দৃষ্টিভঙ্গিতে গড়ে ওঠা সংস্কৃতিই হল অনীশ সংস্কৃতি। অনীশ সংস্কৃতি কোন ধর্ম-সংস্কৃতি নয়, কোন জাতি-সংস্কৃতি নয়—অনীশ সংস্কৃতি হল সর্বজনীন মানবতার সংস্কৃতি।

সামাজিক ন্যায়

সমাজবদ্ধ মানুষ সমাজের কাছে ন্যায় প্রার্থনা প্রার্থনা করে। এই ন্যায় স্বভাবতই সামাজিক অবস্থান, সময় ও দৃষ্টিভঙ্গির উপর নির্ভর করে। মূল্যবোধের ধরনের উপর ন্যায় নির্ভরশীল। তবুও ন্যায়বোধ সমস্ত যুগেরই চালিকাশক্তি।

কোন কাজ, কোন আচরণ, কোন বস্তুব্য ন্যায় কি অন্যায় তার চরম কোন মাপকাঠি নেই। ন্যায়কে অবশ্যই কোন না কোন প্রত্যয়ের সাথে সম্পর্কিত হতে হয়। কোন না কোন দৃষ্টিভঙ্গী ন্যায়ের উপলব্ধি ও ন্যায় আচরণ নির্ধারণ করে।

ধর্মীয় বিশ্বাসের কাছে শূদ্রকে স্পর্শ করা অন্যায়, নারীর বোরখা পরিত্যাগ অন্যায়, ক্রীতদাসের প্রভুকে অমান্য করা অন্যায়। কিন্তু বর্তমান সামাজিক মূল্যবোধের কাছে অস্পৃশ্যতা বে-আইনী, তুরস্কে বোরখা-পরা শান্তিযোগ্য অপরাধ, দাসব্যবস্থা সমস্ত দেশেই নিষিদ্ধ। সেদিনের ন্যায় বর্তমানে অন্যায়। সেদিনের বোধ আজ এর বোধ এক নয়। একই বোধ বা প্রত্যয়ের পরিবর্তন।

বর্তমান যুগে সামাজিক ন্যায়বোধের পিছনে আছে গণতান্ত্রিকতা, মানবতা, বিজ্ঞানমনস্কতা, ধর্মনিরপেক্ষতা প্রভৃতি ধারণার স্বীকৃতি। এই সমস্ত জ্ঞান-মূলের প্রতীতি-লব্ধ-প্রত্যয় ক্ষুণ্ণ হলেই সামাজিক ন্যায় ব্যাহত বলে গণ্য হয়। এই সমস্ত মূল্যবোধকে অবলম্বন করেই সামাজিক ন্যায়ের প্রত্যাশা গড়ে ওঠে।

ধর্ম যাকে ন্যায়সম্মত বলে মনে করে আধুনিক যুগ তাকে ন্যায় বলে গ্রহণ নাও করতে পারে। সুদ নেওয়াকে ধর্ম অন্যায় মনে করতে পারে। কিন্তু বর্তমান অর্থব্যবস্থা

সুদ গ্রহণ ছাড়া অচল। ভ্রূণ-হত্যা ধর্ম অন্যায্য মনে করতে পারে। কিন্তু পরিবার পরিকল্পনা ও নারীমূর্তির স্বার্থে এ-কাজ ন্যায্যসঙ্গত। আধুনিক চোখে এমনি বহু ন্যায্যসঙ্গত আচরণ ধর্মের দৃষ্টিতে অন্যায্য।

অর্থনীতিগত দিক থেকে সৃষ্ট পশ্চাদ্দপদতা ও সংগঠিত বৈষম্য বহু সময়েই এক জাতীয় সামাজিক ন্যায়ের বঞ্চনা প্রতিফলিত করে। সম্পদবৃদ্ধি ও বণ্টনে-সাম্যর পথে তার প্রতিবিধান প্রত্যাশিত। কিন্তু ভেদ-বিভেদের একটা শক্তিশালী সমর্থন রয়েছে ধর্মীর বিধানে। একই ধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায় পরস্পরকে ঘৃণার চোখে দেখে। এক ধর্ম অন্য ধর্মাবলম্বীকে সম-অধিকার দিতে অনিচ্ছুক। নারী-পুরুষের অধিকার-বৈষম্য ধর্মীয় বিধানে ন্যায়কে দুর্লভ করে তুলেছে। আধুনিক যুগের জ্ঞানমূলের মূল্যবোধই পারে সামাজিক ন্যায়ের দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে দিতে।

অনীশ সংস্কৃতির মানস-ক্ষেত্র সামাজিক ন্যায়ের দৃষ্টিভঙ্গি জাত।

পরিবেশ চেতনা

বিশ্বপ্রকৃতি—নদী, সমুদ্র, অরণ্য, পর্বত, মহাকাশ কোন আধ্যাত্মিক অবদান নয়। প্রকৃতির নিজস্ব নিয়মেই এর সৃষ্টি। এবং সেই নিয়মেরই ফলে বহু সৃষ্ট প্রাণীও উদ্ভিদপ্রজাতি কালের গতিতে অপসৃত হয়ে গিয়েছে।

মানুষের বুদ্ধিমান হয়ে ওঠা ও পৃথিবীর উপর তার প্রাণীগত নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার পর প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণের অধীন না থেকে মানুষ এক অর্থে প্রকৃতির দ্রষ্টায় উপনীত হয়েছে। এ হল অংশেরই সম্পূর্ণের উপলব্ধি। মানুষ প্রকৃতিকে জেনে তাকে সংরক্ষণ, সমৃদ্ধ ও ধ্বংসের দক্ষতা অর্জন করেছে। বলাই বাহুল্য সে-ক্ষেত্র হল এই পৃথিবী। প্রকৃতির নিয়ম বিজ্ঞানের চোখ দিয়ে অধ্যয়ন করেছে মানুষ। সেই জ্ঞানে প্রকৃতির ব্যাপক পরিবর্তন ঘটানোর দক্ষতা অর্জন করেছে। এই পরিবর্তন কখনও সৃজনশীল কখনও ধ্বংসাত্মক।

মানুষ এখন আর পরিবেশের মধ্যে রহস্যজনক কোন শক্তির কল্পনা করে না। নদী-পর্বত-গাছপালা-পাথর-বাতাসকে পূজা না করে ব্যবহারের চোখ দিয়ে দেখে। নদী বাঁধ দিয়ে উন্নত ফসল, নানা প্রজাতি থেকে শঙ্কর প্রজাতি, উপকারী প্রাণের সাহায্যে অপকারী প্রাণের ধ্বংস, প্রভৃতি প্রক্রিয়ায় প্রকৃতি আজ পরিবর্তনশীল। অন্যদিকে নিজস্ব প্রয়োজনে উদ্ভিদ ও প্রাণীর স্বাভাবিক অস্তিত্ব বিপন্ন করে তুলছে। রাসায়নিক দ্রব্যের হ্রাস-বৃদ্ধির বিষম অনুপাত প্রাকৃতিক ভারসাম্যকে বিঘ্ন করে তুলছে। পৃথিবীর এই পরিবর্তন এখন মানুষ নামক প্রজাতির কার্যকলাপের ফলে এক বিচিত্র মাত্রা লাভ করেছে। প্রকৃতি-সৃষ্ট উদ্ভিদ ও প্রাণীকুলসহ মানুষের অস্তিত্বের সামগ্রিক চিন্তা এখন মানুষের। কোন স্রষ্টা ঈশ্বরের দিকে তাকিয়ে থাকলে মানুষের অবিমূষ্যকারীতার পরিণাম থেকে অব্যাহতি পাওয়া যাবে না।

এই সামগ্রিক চেতনাই হল পরিবেশ চেতনা। পৃথিবীর জড় ও জীবনের প্রকৃতি

এমন নিয়মে আবদ্ধ যে কেবল কোন এক প্রজাতির স্বার্থের কথা মনে করলে একাংশের ধ্বংসের সূচনা করে পরিণামে সামগ্রিক অস্তিত্বকেই বিপন্ন করে তুলবে।

সাধারণত পরিবেশ বলতে পারিপার্শ্বিককেই বোঝানো হয়ে থাকলেও আজ পারিপেশ বাসস্থানের পরিমণ্ডলে সীমাবদ্ধ হয়ে নেই। সুদূর উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরু, এক কোষী প্রাণী থেকে তিমি, মৃত্তিকা, সমুদ্রতল থেকে বায়ুমণ্ডলের ওজনস্তর পারিপেশ চেতনার ক্ষেত্রে পরিণত। বলতে গেলে দৃষ্টি প্রসারিত করলে সৌরলোক ও মহাবিশ্ব আজ পরিবেশের সীমায় ধরা দিয়েছে। জোয়ার ভাটায় চাঁদ-সূর্যের প্রভাব। বিচিত্র ধরনের মহাজাগতিক রশ্মি ও তরঙ্গ, উষ্ণা, পতনশীল ধূমকেতু পৃথিবীর পরিবেশের সাথে যুক্ত। মহাকাশের ক্রম উন্মোচিত আকাশ জগৎ তাত্ত্বিক অর্থে মানুষের বিশ্বপরিবেশ।

এই বিশ্ব পরিবেশ চেতনায় ধর্মের কোন রাহস্যিক নিয়ন্ত্রক শক্তির অনুসন্ধানের কোন স্থান নেই। এই পরিবেশের আনুকূল্যভের জন্য কোন পূজা-প্রার্থনায় দ্বারস্থ হতে হয় না। বরং জানার চেষ্টা করা হয় প্রকৃতির কোন আচরণ কোথায় কী-ভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে। পৃথিবীর প্রাণ-উপযোগী পরিবেশ কোথায়, কী-ভাবে স্থায়িত্ব পেতে পারে।

আজ পরিবেশ চিন্তায় রয়েছে প্রাণ প্রকৃতির অভিন্ন চিন্তামূল। নিরীশ্বর এই প্রকৃতির মননশীল অনুধাবন থেকে উদ্ভূত সংস্কৃতিই হল অনীশ সংস্কৃতি।

নারীমুক্তি

মানব সমাজের অর্ধেক মস্তিষ্ক কায়ত দীর্ঘকাল ধরেই সুপ্ত হয়ে আছে। পুরুষ তাত্ত্বিকতার কারণে, ধর্মের কারণে, ধর্মের দৃষ্টিতে নারী পুরুষের অনুসঙ্গ। সেই অবস্থার রেশ এখনও বহমান। এখনও পুরুষের জীবনের পরিপূর্ণতার জন্য নারী তার উপকরণ। নারীর সার্থকতা পুরুষের সার্থক উপকরণ হয়ে ওঠার মধ্যে নির্দিষ্ট। এ ছাড়া নারীর জীবন বলে কোন কিছু নেই। নারী-পুরুষের পারস্পরিক পূর্ণতার কোন জীবনবোধ আজও অলভ্য।

আধুনিক সময়ে এসে নারীর আত্মচেতনার সূত্রপাত ঘটেছে। সমাজও সচেতন হয়েছে মানবসমাজের অর্ধেক অঙ্ককার দূর করার জন্য। নারীর পূর্ণতা ছাড়া পরিপূরক পুরুষও অসম্পূর্ণ। ধর্মীয় কোন রক্ষণশীল বা উদার চিন্তাতেই নারীর এই অবস্থান অনুধাবন সম্ভব নয়। নারীমুক্তির তাৎপর্য অনুধাবনে ধর্ম সম্পূর্ণভাবে অক্ষম।

এমন কোন ধর্মগ্রন্থ নেই যেখানে নারী দিকৃত নয়। এমন কোন ধর্মতত্ত্ব ও ধর্মশাস্ত্র নেই যেখানে নারী অবজ্ঞাত হয় নি। ব্যক্তিগতভাবে নিজের মতো করে নিয়ে ধর্ম-পালন না করলে শাস্ত্রসম্মত ধর্ম নারীর পক্ষে পালন করাই সম্ভব নয়। ধর্ম এত ঘৃণা বর্ষণ করেছে নারীর উপর যে সেই ধর্মকে শ্রদ্ধার সাথে অনুসরণ তার পক্ষে সম্ভবই নয়। ধর্মের বাণী সম্পর্কে অজ্ঞ থেকে, শাসন ও নির্যাতনে আবদ্ধ থেকেই কেবল

নারীর পক্ষে ধর্মপালন সম্ভব।

ঈশ্বর নিরাকার। যার দেহ নেই তার যৌন আসক্ত থাকতে পারে না। বায়ুর কোন লিঙ্গ থাকা সম্ভব নয়। সৎ-চিৎ-আনন্দের কোন দেহী যৌন অঙ্গ থাকা অসম্ভব। কিন্তু ধর্মের নিরাকার ঈশ্বর হয়ে আছে পুরুষ। আর ঈশ্বরের দূত, নবী, অবতার ; ঈশ্বরের সাক্ষাৎ প্রতিনিধি পোপ-পুরোহিত-ইমাম সর্বদাই পুরুষ। অনেক দেব-দেবী থাকলেও সর্বোচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন তিন দেবতা পুরুষ। এইভাবে ধর্ম নামাস্তুরে পুরুষতন্ত্র।

নারীমুক্তির জন্য নারীর প্রথম সংঘাত তাই ধর্মের সাথে। সামাজিক পুরুষতন্ত্রের সাথে নারীমুক্তির সংঘাত আরো গভীর আরো ব্যাপক।

এই ধারাবাহিকতায় মানুষের ইতিহাসের সমস্ত ধারায় নারীকে প্রায় অদৃশ্য করেই রাখা হয়েছে। এই অদৃশ্য অধ্যায়ে প্রথমত নারীকে খুঁজে দেখা আবশ্যিক। দ্বিতীয়ত প্রয়োজন বর্তমানের জীবনযাত্রায় নারীর অবস্থান অনুসন্ধান। তৃতীয়ত নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে এই প্রথম তার বিকাশের সূত্রটি গড়ে তোলা। নারীর মুক্তি হল পুরুষতন্ত্রের অবসান আর ধর্মের বিরাটভাবে ধ্বংসে পড়া। স্বভাবতই আধুনিক সময়েও নারী-মুক্তির ভাবনা ও করণীয় অত্যন্ত প্রতিবন্ধকতামূলক।

অনীশ সংস্কৃতি নারীমুক্তিকে মানব সমাজের বিকাশের পক্ষে এক অপরিহার্য করণীয় হিসাবে গ্রহণ করে এমন এক সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল সৃষ্টি করে যেখানে নারীর অপরূপ নিশ্বাসের অবসান হবে। পৃথিবী নারী-পুরুষ এই জোটবন্ধনের মিলিত আত্মপ্রকাশের ক্ষেত্র। তার বিকাশ সম্পূর্ণ হতে পারে, অবাধ হতে পারে ধর্ম ও পুরুষতন্ত্রের জোটবন্ধনের সম্মিলিত অবরোধ মুক্ত হলেই। নারীমুক্তি মানবমুক্তির এক প্রয়োজনীয় ধাপ। অনীশ সংস্কৃতি তারই পরিবেশ।

ব্যক্তি-মুক্তি

‘নিজেকে জানো’ এই উক্তিে ব্যক্তির আত্ম বলে বলীয়ান হয়ে ওঠার চেতনা সঞ্চার হয়েছে। ‘আমিই সেই’ বলে নিজের বিশ্বাসকে উত্তুঙ্গ করে তোলার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেছে মানুষ। ব্যক্তি-মুক্তির চিন্তাতেই গোটা ইতিহাসে মানব মনীষা নানা শাখায় বিকশিত হয়ে উঠেছে। কেন্দ্রীয় প্রশ্নটা সর্বদাই রয়ে গিয়েছে ব্যক্তি।

সমষ্টির মুক্তিতেই ব্যক্তির মুক্তি। ব্যক্তি সমষ্টির অধীন—এই দৃষ্টিভঙ্গিতেও লক্ষ্যে রয়েছে ব্যক্তি। লাঞ্ছনা, অত্যাচার, শোষণ, নিপীড়ন প্রভৃতি মানবতার অপমান ব্যক্তিকে ঘিরেই। ধর্ম, স্বৈরতন্ত্র, নিয়ম, বন্ধন, যাকে ঘিরে শৃঙ্খল রচনা করে সে মূল ব্যক্তি।

ধর্ম ব্যক্তির মুক্তি নির্ধারণ করেছে মৃত্যুর পর, পরলোকে কাল্পনিক পরিণতির মধ্যে। মুক্তি নির্ধারিত হয়েছে নির্বাণের শূন্যতায়। পৃথিবীর জীবন সীমায়। মুক্তির দিশা ধর্মতে অনুপস্থিত। পার্থিব ব্যক্তি-জীবনে রীতি-নীতি-আচার-অনুষ্ঠানের

শাওক নামা : অনুশোচনা, স্বীকারোক্তি, প্রায়শ্চিত্তের শতক বোঝা চাপানো ছাড়া ধর্ম কোন মুক্তির পথ দেখাতে পারে নি।

চেতনার অবস্থান ব্যক্তি মস্তিষ্কে। সমস্ত চেতনাই ব্যক্তিমনে প্রতিফলিত। ব্যক্তি-চেতনা আত্মমুক্তি প্রত্যাশী। ব্যক্তির যত যত্নগা এই মুক্তির আকাঙ্ক্ষা থেকে। ব্যক্তির চরম স্বাধীনতার প্রত্যাশাতেই গণতন্ত্রের সাফল্যের স্বপ্ন। ব্যক্তির স্বস্তির পথ চেয়েই সামাজিক ন্যায়ের প্রত্যাশা। ব্যক্তি-চেতনার কুয়াশা দূর করতেই যুক্তি বিজ্ঞান মনস্তাত্ত্বিকে উসকিয়ে দেওয়া। ব্যক্তির ধ্যান দূর করতেই মানবতার পথ চেয়ে থাকা। ব্যক্তি মানুষের জীবনের অস্তিত্বের নিরাপত্তার জন্যই পরিবেশ চেতনার স্ফূরণ। নারী মুক্তি তো নারী-পুরুষ দুই প্রজাতি সত্তার বিকাশের শর্ত।

ব্যক্তি-মুক্তির ভাবনার নানা স্রোত। মানুষকে বাধ্যতামূলক শ্রম করতেই হয়। বহু ধরনের প্রতিকূলতা মানুষের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা। এই বাধ্যতামূলক শ্রম থেকে অব্যাহতি মুক্তি বলে পরিগণিত। প্রতিকূলতার অন্তর্হিতিও মুক্তির শর্ত হিসাবে বিবেচিত। এই শর্তে মানুষ এক বিশেষ অবস্থায় উপনীত হয়ে মুক্তির সম্ভাবনা অনুসন্ধান করে।

বুদ্ধিমান মানুষের ক্রমাগত বিকশিত হওয়া কিংবা মানুষের নিজস্ব সত্তার ক্রম উন্মুক্তিকেও ব্যক্তি-মুক্তি বলে দেখা হয়। প্রতিটি ক্ষেত্রেই মানুষকে মানুষ হিসাবে আরো সার্থক, আরো সদর্থক আরো আত্মজ্ঞানী হওয়ার মধ্যে মুক্তির সন্ধান করা হয়েছে। পার্থিব মানুষের আরো বড় মাপের মানুষ হয়ে ওঠা আরো স্বস্তির জীবনে প্রবেশ করাই হল ব্যক্তি-মুক্তির দিশা।

পার্থিব মানুষের আরো ক্ষুদ্র, দুর্বল, অসহায় হয়ে অলীক ঈশ্বরের কাছে সমর্পণের মধ্যে মুক্তি সন্ধান এক অবাস্তব প্রস্তাবনা। ধর্মের এই ধারণায় ব্যক্তি মুক্ত হয় না, ব্যক্তির আত্মিক মৃত্যু ঘটে।

অনীশ সংস্কৃতি ব্যক্তি-মুক্তির প্রত্যাশী। এই ব্যক্তি পার্থিব, বাস্তব। এই মুক্তি নারী-পুরুষকে পারস্পরিক জানার মধ্য দিয়ে মানসিক দিক থেকে আরো বিকশিত হয়ে মানুষে-মানুষে দ্বন্দ্বকে ক্রম-পরিহারের পথ ধরে এই পৃথিবীতেই সম্ভব হয়ে উঠতে চায়। এমন এক মুক্তির পরিবেশের সংস্কৃতি হল অনীশ সংস্কৃতি।

বিশ্ববোধ

দশটি জ্ঞান-মূল যে-প্রাণ-প্রকৃতির চিন্তামূলকে রূপ দিয়ে চলেছে তার এক অপরিহার্য শর্ত হল বিশ্ববোধ। একমাত্র অনীশ সংস্কৃতিই বিশ্ববোধ ধারণ করতে পারে। গোটা পৃথিবীর মানুষকে অভিন্ন মনে করা, সারা পৃথিবীকে মানুষের বিচরণের অভিন্ন ক্ষেত্র হিসাবে বিবেচনা করা, বিশ্বপ্রকৃতির সাথে মানুষের একাত্ম হয়ে ওঠার মধ্যেই আধুনিক মানুষের নতুন তাৎপর্য লুকিয়ে আছে।

ধর্ম সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতায় মানুষকেই খণ্ডিত করে তোলে, ধর্মের বিশ্বতত্ত্ব

কখনই সর্বজনীন হয়ে উঠতে পারে না। ধর্ম-ধর্ম পার্থক্য বোধজাত ধর্মীয় আত্মপরিচয় এক অতি প্রাচীন প্রত্যয়। এই খণ্ডিত পরিচয় ও তার শক্ত গণিবদ্ধতা বিশ্ববোধের পরিপন্থী। ধর্ম-ভিত্তিক বিশ্ববোধ যে-ভাবেই গড়ে তোলার চেষ্টা হোক তা রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব জাতিগত দূরত্ব কিংবা ভাষাগত পার্থক্যকে কখনই অতিক্রম করতে পারে না। ধর্মের নিজ বৈশিষ্ট্যে এতই খণ্ডিত চেতনার প্রাধান্য যে একই ধর্মে গোষ্ঠীগত, সম্প্রদায়, উপসম্প্রদায়গত পার্থক্য বহুসময় বৈরীতার পর্যায়ে পৌঁছে যায়। বিশ্ব, বিশ্বমানব বিশ্ববোধ প্রভৃতি শব্দবিন্যাস ধর্মের কণ্ঠে সোচ্চারে উচ্চারিত হলেও নানা-ধর্মের মিলিত বিশ্ববোধ বলে কিছু গড়ে উঠতে পারে না।

বর্তমান পৃথিবীতে গণতান্ত্রিক চেতনায়, মানবতার আকাঙ্ক্ষায়, ধর্মনিরপেক্ষতার প্রত্যয়ে, পরিবেশ চেতনার চেতন্যে, যুক্তি-বিজ্ঞান-মনস্কতার আলোকে, নারীমুক্তির প্রত্যাশায়, সামাজিক ন্যায়ের প্রতিষ্ঠায় এবং ব্যক্তি-মুক্তির লক্ষ্যে এতই এক-বিশ্বকেন্দ্রিক চিন্তার প্রাধান্য যে জাতিবৈশিষ্ট্য, ভাষাগত পার্থক্য এমন কি সার্বভৌমত্ব পর্যন্ত বিশ্ববোধের অনুসারী।

অনীশ সংস্কৃতির চিন্তা জগতে অখণ্ড বিশ্ব বিধৃত। প্রকৃতির রূপ দেশ থেকে দেশে ভিন্ন। কিন্তু বিশ্বপ্রকৃতি অবিভাজ্য বোধে বিবেচিত। ভাষা, জাতি বৈশিষ্ট্যে মানুষ বিভাজিত। কিন্তু মানব-প্রকৃতি বিচারে গোটা বিশ্বমানব এক। এই বিশ্বমানবের পরিচয়ে আজ ক্রমশ দেশগত সার্বভৌমত্ব থেকেও বড় হয়ে উঠছে বিশ্ববোধ।

কোন ভাবনা, কোন করণীয় আজ জাতিপুঞ্জের মাধ্যমে সারা পৃথিবীতে পৌঁছে যায়। প্রজাতি রক্ষা, পরিবেশ সুরক্ষা এমন কি স্থাপত্য যা কোন সার্বভৌমত্বের এক্তিয়ার তাও বিশ্ববিবেচনায় আজ বিশ্বদায়িত্বের অধীন। উল্লেখযোগ্য লেখা কোনদেশের তা বিবেচ্য না হয়ে বিশ্ব-গ্রন্থ হয়ে উঠছে। অর্থনীতি, রাজনীতি, বিজ্ঞান এমন কি সংস্কৃতি পর্যন্ত বিশ্ববোধে নতুন নতুন মাত্রা লাভ করছে।

সর্বনিয়ন্ত্রা ঈশ্বর মানুষকে ধর্মীয় মানুষ বানিয়ে রেখেছে। বিশ্বমানব হয়ে ওঠার কোন পথ দেখাতে পারে নি। ঈশ্বর বর্জিত মানুষই কেবল বিশ্ববোধে একত্রিত হতে পারে। বিশ্ববোধ মানববোধেরই চেতনা।

অনীশ সংস্কৃতি বিশ্ববোধের সংস্কৃতি। সর্বজনীন সংস্কৃতি। ধর্ম-উর্ধ্ব সংস্কৃতি। আলোচ্য দশটি জ্ঞানমূল হল বর্তমান বিশ্বের সমাজ বিকাশের ভিত্তি। স্বাভাবিক কারণেই তার চরিত্র অনীশ। এই দশটি ক্ষেত্রের প্রতিটির স্ব-স্ব ভাবে বিকাশের অর্থই হল ধর্মের নিগড় থেকে ক্রমশ অব্যাহতির দিকে মানুষের অগ্রসর হওয়া। এই অনীশ যাত্রার পথেই মানুষ নিজেকে খুঁজে পাবে। প্রকৃতি সাথে তার সম্পর্কের বাস্তব অবস্থা উপলব্ধি করতে পারবে। অতিপ্রাকৃতিক শক্তির রহস্য ছেড়ে প্রাকৃতিক নিয়মের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে বাস্তব সত্যকে জানতে পারবে।

ঈশ্বর যে-দিন যে-ভাবে যে-প্রয়োজনে মানুষের জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে কাল্পনিক শক্তিরূপে সৃষ্ট হয়েছিল সে-দিন, সে-প্রয়োজন আজ আর নেই। মানুষ তার

আত্মপরিচয়ে, আত্মশক্তিতে দাঁড়াতে শিখেছে। প্রকৃতিকে তার নীড় রূপে বুঝতে শিখেছে। প্রাণীজগৎকে তার অস্তিত্বের সম্প্রসারণ রূপে উপলব্ধি করেছে। এই প্রাণ-প্রণীতি বোধের চিন্তামূল ভিত্তিক জীবন দর্শন যে সংস্কৃতির উন্মোচন ও রূপদান করেছে তাই হল অনীশ সংস্কৃতি।

দশটি চিন্তামূলের বিকাশকে প্রতিহত করার শক্তি আজ আর কোন সমাজেরই নেই। কোন কোন কারণে তা বিলম্বিত হতে পারে মাত্র।

একটু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে ধর্মকে এখনও যে-সমস্ত দেশ সমাজের দিশা হিসাবে কঠোরভাবে অনুসরণ করে সেখানকার সমাজ আধুনিকতার যাত্রা পথে পশ্চাদপদ। এক শ্রেণীর অতিধনী বিলাসী মানুষ নিজেদের ভোগবিলাসী জীবন গড়ে তুললেও সমাজের অচলায়তনকে অবলম্বন করে থাকা বৃহত্তর সমাজে সেই দেশে জঙ্গমত্বের ঢেউ তোলা সুদূর পরাহত। ধর্ম এই সমস্ত দেশে পশ্চাদপদতার শৃঙ্খল। দশটি জ্ঞানমূল তরঙ্গ সৃষ্টি করলেও এই সব দেশে তা ঢেউ হয়ে ওঠে নি।

গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতায় যে-সমস্ত দেশ অভ্যস্ত সেখানে ধর্ম সামাজিক জীবন থেকেও প্রস্থানের সঙ্কেত পেয়ে গেছে। ধর্মের এই আরব্ধ প্রস্থানকে অস্বীকার করতেই কোন কোন রাষ্ট্রে ধর্ম মধ্যযুগীয় গৌড়ামীর সবল প্রতিষ্ঠার আশায় মৌলবাদী চরিত্রে আবির্ভূত হচ্ছে। অপেক্ষাকৃত অগ্রসর এইসব আধুনিক সমাজে ধর্ম বনাম ধর্মনিরপেক্ষতা এক দ্বন্দ্বময় রূপ ধারণ করেছে। সাময়িকভাবে ধর্ম প্রাধান্য পাবার চেষ্টা করলেও শেষ পর্যন্ত দশটি জ্ঞানমূলের কম বেশি প্রভাবে সমাজের আধুনিকতার গতির কাছে তার পরাজয় অনিবার্য।

প্রকৃত অর্থে আধুনিক সমাজে এই দশটি জ্ঞানমূল ক্রমবিকাশমান। বিকাশের এই অব্যাহত ধারায় ধর্মের অবস্থান স্পষ্টতঃ আচার-অনুষ্ঠানের কিছু অবশিষ্ট অভ্যাস এবং মানসিক জগতের দুর্বল বিশ্বাস হয়ে এই পরদেশে ধর্ম রয়ে গেছে। সেখানে ধর্মের মৌলবাদী চরিত্র নিয়ে ইতিহাসের পশ্চাদগমনের চেষ্টা চালানোর শক্তি নিঃশেষিত। কেবলমাত্র অস্তিত্ব রক্ষার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে আধুনিক জীবনের সাথে সামঞ্জস্য ঘটিয়ে ধর্মকে টিকে থাকতে হয়।

এই বিশ্বপটভূমিকায় অনীশ সংস্কৃতি কোন তাত্ত্বিক ধারণা নয়। অত্যন্ত বাস্তব এবং বিকাশশীল সংস্কৃতি হল অনীশ সংস্কৃতি। এই দশটি জ্ঞানমূলের বিকাশ সাধনের সমাজ দার্শনিক পটভূমি হল অনীশ সংস্কৃতি। অনীশ সংস্কৃতি বর্তমান বিশ্বের সংস্কৃতি। অনীশ সংস্কৃতি আগামী দিনের সংস্কৃতি।

ধর্ম ও নারী

কৃষ্ণ বসু

আমাদের এই পৃথিবীতে যত ধর্ম আছে, যত ধর্ম গ্রন্থ রয়েছে তার সবই পুরুষের রচনা,—এই কথাটি সবচেয়ে বেশি করে মনে রাখবার মতো বিষয় বলেই মনে করি। কি পুরাণ, কি রামায়ণ মহাভারত, কি বাইবেল, কি কোরান, কি বৌদ্ধধর্মের গ্রন্থরাজি,—সমস্ত ধর্মগ্রন্থই পুরুষের সৃষ্টি। যে সমাজে আমরা বাস করি, জন্মগ্রহণ করি, নিঃশ্বাস নিই, শিক্ষিত ও পালিত হয়ে উঠি, জীবন যাপন করি, আত্মীয়-পরিজন সন্তানদের সঙ্গে পারিবারিক জীবন অতিবাহন করি,—তার সমস্তটাই তৈরি করেছেন পুরুষরা, স্বভাবতই তাই, পুরুষের স্বার্থে, পুরুষের নিজের প্রয়োজনে সমস্তরকম বিধিব্যবস্থা সকল মূল্যবোধ এবং আচরণ-বিধি-পুরুষেরাই নির্মাণ করে দিয়েছে তা। সেখানে সমস্ত ধর্মে মেয়েদের হেয় করা হয়েছে, হীন চোখে দেখা হয়েছে, দমিত করে রেখে দেওয়া হয়েছে; কোথাও আত্মসম্মানে মাথা উঁচু করে বাঁচতে দেওয়া হয়নি। ‘মনু’ নামক বিধান কর্তাটির দ্বারা আমাদের পৌরাণিক যুগের ভারতীয় সমাজের বিধান যা তৈরি হয়েছিল, তার প্রতিটি পদক্ষেপে নারীর প্রতি চূড়ান্ত অপমান, দুরন্ত লাঞ্ছনার মনোভাব সূতীব্রভাবে প্রকাশ পেল, ‘মনু’ থেকেই মানব কথাটির জন্ম, আমরা এও জানি। সেই মনু তাঁর বিধানে নারী জাতি সম্পর্কে স্পষ্ট দ্বিধাবিহীন নির্দেশ দিচ্ছেন,—

‘পিতা রক্ষতি কৌমরে ভর্তা রক্ষতি যৌবনে।

রক্ষন্তি স্থবিরে পুত্রা ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমহতি।।’

—কুমারী কালে রক্ষা করবেন পিতা, যৌবনকালে রক্ষা করবেন নারীকে তার স্বামী তার বার্ষিক্যে তাকে রক্ষা করবেন পুত্রেরা, স্ত্রী জাতির কোন স্বাধীনতা বা স্বাতন্ত্র্য নেই।—এই হল মহামতি মনুর নির্দেশ মানবপ্রজাতির প্রতি, সমস্ত নারীদের সম্পর্কে। নারীর জীবনের সমস্ত অধ্যায়কে পুরুষ দ্বারা পূর্ণ, নিয়ন্ত্রিত রাখার, তার সর্বপ্রকারের স্বাধীনতাকে হনন করার এই ছিল ধর্মীয় নির্দেশ হিন্দুদের। মনু আরো বিচিত্র নির্দেশ দিয়েছেন নারী প্রজাতির সম্পর্কে তার বিধানে, সে সমস্ত বিধান পর্যালোচনা করলে আত্মমর্যাদাসম্পন্ন যে কোন আধুনিক শিক্ষিত নারীর আমূল বিস্মিত ও ব্যথিত হবারই কথা। মনু তাঁর বিধানে সর্বপ্রকারে নারীকে পুরুষের কাছে কুণ্ঠিত, দয়াপ্রাপ্ত, হীন এবং অপমানিত দেখতে চেয়েছেন, ধারাবাহিকভাবে পুরুষের প্রতি প্রবল পক্ষপাত এবং নারীকে দমিত, সংকুচিত করে রাখার চক্রান্ত তাঁর বিধানের

ছাএ ৮এ ৯ড়িয়ে রয়েছে। মনুর নির্দেশ এর একটি তো উল্লেখ করেইছি, আরও
 বেশ কিছু নির্দেশ, আসুন, পাঠক আমরা অনুধাবন করি,—আরো একটি
 নির্দেশ —“শত দোষ থাকা সত্ত্বেও বিশ্বস্ত স্ত্রীর কাজ হবে সর্বদা স্বামীকে ভগবান
 প্রদত্ত পূজা করা”—হে সংবেদনশীল, হৃদয়বান পাঠক অনুভব করুন, যে স্বামীর
 শত দোষ, অনেক ভুল যার, সেই স্বামীকে চোখ বুজে অন্ধের মতো সেবা শুধু নয়,
 পূজাও করতে নির্দেশ দিলেন মহামান্য মনু, যাঁর রচিত সংহিতা, ‘মনুসংহিতা’ হিন্দু
 সমাজে পবিত্র গ্রন্থরূপে সম্মানিত ও সম্ভ্রান্ত হয়ে রয়েছে। মনু আরো বলছেন
 “স্বামীকে ভগবান মানে পূজা না করলে, ঐ নির্দেশ লঙ্ঘন করলে এই বিশ্বে স্ত্রীদের
 মর্যাদার হানি হবে, পরের জন্মে শিয়ালের গর্ভে প্রবেশ করবে এবং ঐ পাপের জন্য
 বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে নারীরা শাস্তিভোগ করবে।” শুধু স্বামীর শত দোষ
 সত্ত্বেও তার কাছে ক্রীতদাসীর মতো পূজাও সেবা নিয়ে উপস্থিত থাকাই নয়, তা
 না করলে সেইসব নারীদের শিয়ালের গর্ভে জন্ম হবে বলে অভিশাপ দিলেন মনু,
 এতখানিই, এত সুতীব্র ভাবে নারীবিরোধী তিনি। এই মনুই হিন্দুধর্মের আচরণবিধির
 প্রধান প্রবক্তা ছিলেন। এর পূর্বে আদি বৈদিক যুগে অবশ্য নারীর কিছু স্বাভাবিক ও
 মর্যাদা ছিল, নারী ঋত্বিকাও ছিলেন সেই বেদের যুগে। মনু আরও বলছেন, লুপ্ত
 করছেন নারী জাতিকে এই বলে যে,—“যে মহিলা নিজের চিন্তা, কাজ ও কথাকে
 সংযত করে ভগবানরূপী স্বামীকে কখনোও উপেক্ষা করে না, মৃত্যুর পর সে স্বামীর
 সঙ্গে স্বর্গবাস করবে এবং গণ্য হবে ধার্মিক নারী হিসেবে।”—ভেবে দেখুন পাঠক,
 নারীর ধার্মিকতার একটি মাত্র ক্ষেত্র, তাহলে শত দোষ যুক্ত স্বামীকে সেবা ও পূজা
 করে যাওয়া! কী অপমানকর, হীন প্রস্তাব, একবার হে আধুনিক পাঠক, আপনি
 ভাবুন! যে সর্ব অর্থে অশ্রদ্ধার পাত্র, তাকে অশ্রদ্ধা না করে তাকে পূজা করলে
 স্বর্গবাস ও ধার্মিক সুনাম কেনা যাবে; এই-ই ছিল নারীদের প্রতি মনুর বিধান। মনু
 আরও কী কী বিধান দিয়েছেন, আসুন পাঠক, আমরা তার পর্যালোচনা করি,—মনু
 বললেন, “—পরিবারের পুরুষেরা ভোগ-বাসনায় লিপ্ত থাকলেও মহিলারা দিনে
 রাতে সর্বসময় সেই পুরুষদেরই অধীনে এবং শাসনে থাকবে।”—কামনা বাসনায়,
 বহুগামিতার স্রোতে ভাসমান পুরুষটির পূর্ণ কর্তৃত্ব থাকবে তার পরিবারের নারীদের
 মুঠার মধ্যে পুরে রাখবার শাসন ও পীড়ন করবার,—এই যে পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থার
 চূড়ান্ত নির্দেশ, এই যে নারীকে পুরুষের অধীন করে রেখে দেবার গুঢ় প্ররোচনা
 মনু রচনা করলেন, তাকে মাথায় করে রেখেছিল আমাদের হিন্দু সমাজ-ই এতদিন
 ধরে। মনু অন্য পরবর্তী নির্দেশে বলছেন, “স্বামী সুদর্শন অথবা কুৎসিত হলেও
 নিজের বয়স আর সৌন্দর্যের প্রতি মহিলারা দৃষ্টি রাখবে না,—” পুরুষ মানুষ হল
 সোনার আংটি তার আবার বেঁকা টেরা,—এই প্রবচনও তো আমাদের সমাজেরই
 তৈরি করা। মাননীয় মনুর মতে নারী তার স্ত্রী সৌন্দর্য সম্পর্কে-ও সচেতন থাকবে
 না, পুরুষটি সুন্দর বা কুৎসিত যাই হোক, নারীর নিজের সৌন্দর্যের সঙ্গে তার প্রতি

তুলনা করবে না। যে বিজিত এবং হয়, সামাজিক ভাবে যাকে হীন এবং নিকৃষ্ট জীব বলে দেখতে দেখানো হয়েছে, সে তার ভর্তা, যিনি ভরণ পোষণ করেন, সেই রক্ষাকর্তা স্বামীর সঙ্গে নিজের তুলনা করবে কোন্ সাহসে? এইসব তো নারীর করণীয়, আর তার বিপরীতে ধর্মবেত্তা সংহিতা রচয়িতা কী বলছেন পুরুষদের করণীয় বিষয় সম্পর্কে? মনু বলছেন,—“স্বামীর কর্তব্য হল স্ত্রীর প্রতি কড়া নজর রাখা ; তার কারণ দেখাতে গিয়ে মনু জানাচ্ছেন,—“পরপুরুষের প্রতি আসক্তি, অস্থির মেজাজ আর নিষ্ঠুর হৃদয়ের জন্যে স্বামীর প্রতি তাদের আনুগত্য থাকে না,—” অর্থাৎ যে নারীকে দয়া এবং মমতার উৎস রূপে আমরা জেনেছি, সেই নারীই মনুর মতে নিষ্ঠুর হৃদয়ের অধিকারী, পরপুরুষের প্রতি আসক্ত এবং অস্থির মেজাজের মানবী, এসবই তাদের ওপর পুরুষের প্রবল প্রতাপকে প্রতিষ্ঠিত করার ব্যবস্থা, একথা বুঝতে খুব বেশি বুদ্ধিরও দরকার হয় না। মনুর সংহিতার অনুসরণে তৈরি হল যে সমাজ, সেই সমাজেই শুধু নারীকে হয় ও হীন করা হয়নি, হত্যা এবং হেলাফেলার চক্রান্তে ফেলে দেওয়া হয়নি, পৃথিবীর সব ধর্মেই নারীকে অপমানিত, লাঞ্চিত, দমিত করে রাখার সুপরিকল্পিত ব্যবস্থার খবর আমরা পাই।

যে বৌদ্ধ ধর্ম সম্পর্কে আমাদের শ্রদ্ধা ও বিনতির অন্ত নেই ; পরবর্তী কালের কাব্যে সাহিত্যে সর্বত্র যে বৌদ্ধধর্মের প্রতি শ্রদ্ধার অঞ্জলি নিবেদন করা হয়েছে সেখানেও নারীজাতি সম্পর্কে, মাতৃ জাতি সম্পর্কে অশ্রদ্ধার মনোভাবের শেষ নেই। এমনকি স্বয়ং গৌতম বুদ্ধ স্ত্রীলোকদের নির্বাণলাভের যোগ্য বলেও বিবেচনা করেন নি। বুদ্ধ এও মনে করতেন, স্ত্রীলোকদের সংসর্গে পুরুষেরাও নির্বাণের স্বর্গ থেকে দ্রষ্ট ও বঞ্চিত হবে। বুদ্ধ তার শিষ্যদের স্ত্রীজাতির প্রতি মনোযোগ, তাদের দিকে তাকানোও নিষেধ করেছিলেন। নারীর প্রতি মনোযোগী হলেই, নারীর দিকে তাকালেই যেন পুরুষের বিচ্যুতি ঘটবে, বুদ্ধ বলেছিলেন যে শ্রমণ নারীকে নারী হিসাবে দেখে, নারীকে নারী হিসাবে স্পর্শ করে, সে কখনো বুদ্ধের শিষ্য হবার যোগ্যও নয়। হিন্দুধর্মে যে বলা হয়েছিল ‘নারী নরকের দ্বার’ সেই কথারই যেন একটু ভিন্ন রকমের প্রতিধ্বনি শুনলাম আমরা, করুণাঘন বুদ্ধের কণ্ঠে! আমরা একথাও কি ভুলতে পারি যে এই গৌতম-ই আপন স্ত্রী ও পুত্রকে পরিত্যাগ করে গিয়েছিলেন, এবং তার বিহারে নারী ও পুরুষের জন্য সম মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত ছিল না। নারীর সঙ্গে সম্পর্কের স্বাভাবিকতাকে হয় চোখে দেখাই ছিল এইসব ধর্মপ্রচারক ব্যক্তিত্বদের কাজ।

সুপ্রাচীন ইহুদি ধর্মেও নারীকে চূড়ান্ত হীন ও তুচ্ছ করে দেখা হয়েছে, যে নারীর থেকে পুরুষের জন্ম ও বিকাশ, সেই নারীর প্রতি তার কৃতজ্ঞতার অন্ত থাকার কথা নয়, সেই নারীকে ঘৃণা করতে শিখিয়েছে ইহুদি ধর্ম। জুডাইজম-এ বলা হয়েছে ‘নারীর থেকেই পাপের জন্ম’।—যে নারী সর্ব অর্থে পুরুষের জীবনে প্রয়োজনীয় ও পূজনীয়, যে নারী মা ও ধাত্রী, যে নারী প্রেমিকা ও পত্নী, যে নারী ভগ্নী বা

কন্যা, সেই নারীকেই ইহুদি ধর্মে বলা হয়েছে,—“নারীই হচ্ছে মৃত্যুর দূত”। যে নারীকে বলা হয়েছিল মৃত্যুর দূত সেই নারীকেই, বহু নারীকেই বহু বিবাহে গ্রহণ করে সেদিনের পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বাধা ছিল না। ইহুদিধর্মে বলা হয়েছে ‘নারী হচ্ছে সমাজের নিকৃষ্ট জীব’,—সমস্ত প্রাচীন ধর্মে নারীকে নিকৃষ্ট জীবরূপে দেখার ঐ যে আয়োজন এর থেকে বোঝা যায় পিতৃপ্রাধান্যের সমাজে পুরুষকে বড় করে দেখানোর, পুরুষের সব দোষ উপেক্ষা করার, পুরুষের মহিমা ও পৌরুষকে প্রতিষ্ঠার করার জন্য এইসব মানবীবিরোধী, মানবতাবিরোধী কথা প্রচার করা হত।

বাইবেল নামের খ্রীষ্টানদের সর্বমান্য ধর্ম গ্রন্থে,—‘তাদেরই ভালো মেয়ে বলা হয়েছে যারা অনুগত, বিশ্বাসী, গৃহরক্ষা ও সন্তান পালনে ইচ্ছুক,’ অর্থাৎ নারীর ক্ষেত্রটি সবধর্মেরই শুধু পরিবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দেখা হয়েছে, বৃহৎ জগৎসংসার তার কাছে অনায়ত্ত, অনধিগম্য এবং অপ্রবেশ্য। আদম এবং ইভের গল্পে বলা হয়েছে পুরুষের শরীর থেকেই নারীর জন্ম হয়েছে, নারীর শরীর থেকে পুরুষের নয়; কী আশ্চর্য! সমস্ত প্রকৃতি জগৎ, এমনকি, মানবসমাজেও নারীর শরীর থেকেই পুরুষের জন্ম হয়, এই সত্যকেও উল্টে দেবার কী অদ্ভুত ধর্মীয় চক্রান্ত। হিন্দুধর্মেও বলা হয়েছে সৎ, চিত্ত এবং আনন্দ এর সমন্বয়ে যে সচ্চিদানন্দ পরম ব্রহ্মের সৃজন, তিনি তাঁর হুাদিনী অর্থাৎ আনন্দ শক্তিকে বিশ্লিষ্ট করে শ্রীরাধিকাকে নির্মাণ করলেন ও মিলন লীলায় রত হলেন। সমস্ত অনিবার্য প্রাকৃতিক অমোঘ সত্যের বাইরে গিয়েও ধর্মবেত্তারা দেখাতে চাইলেন, পুরুষের একটা অংশ থেকেই নারীর সৃষ্টি! পুরুষের প্রয়োজনে নারীকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

আমাদের এক হাজার বছরের বাঙলা সাহিত্যের দিকে তাকালে আমরা দেখি ধর্মীয় বাতাবরণ সমগ্র বাঙলা সাহিত্যকে ঘিরে রেখেছে সেই সু-প্রাচীন কাল থেকেই। সেই যে রক্ষণশীল হিন্দু রাজাদের প্রতাপে ঘরছাড়া, তাড়া-খাওয়া বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা লুকিয়ে লুকিয়ে সন্ধ্যা-ভাষায় ধর্মীয় সাধন-ভজনের কথা লিপিবদ্ধ করে গেলেন, সেখানে তো দেখছি, ধর্মই ধর্মীয় সাধনভজনের বাণীই বাঙলা ভাষার সাহিত্যের প্রথম সূচনার কারণ হয়ে দেখা দিয়েছিল। প্রকৃত সত্যের দিকে তাকালে এই কথাটিই বলবার হয়ে দাঁড়ায় যে সমগ্র প্রাচীন ও মধ্যযুগের এমন কি প্রাক-আধুনিক যুগের সাহিত্যটাই ছিল ধর্ম নির্ভর, সামান্য দু একটি ব্যতিক্রম ছিল না তা নয়, তবে তা শতাংশের হিসাবেও আসে না। এই ধর্ম-নির্ভরতা সাহিত্যের মূলভূমি হয়ে দাঁড়িয়েছিল, এখানে নারী সম্পর্কিত যাবতীয় দৃষ্টিভঙ্গি ও লেখালেখি ছিল, সামস্ত সমাজের মূল্যবোধ দ্বারা চালিত ও প্ররোচিত। তবে নর-নারীর সম্পর্কের মধ্যে যেহেতু প্রেম একটি প্রবল অনুভূতি হয়ে দেখা দেয়, আর প্রেমেও পুরুষ তন্তু তার প্রতাপ ও প্রতিপত্তি বিস্তার করতে কিছু কম যায় না, তবুও একমাত্র প্রেমাতুর পদগুলিতেই নারীকে পাবার আশায় সম্ভবত পুরুষ তার বিনতি ও আকৃতিকে কিছুটা প্রকাশ করে ফেলেছে। চর্যাকার যেখানে বলছেন

“উঁচা উঁচা পাবত তহিঁ বসই সবরী বালী
 মোরদিঁ পীচ্ছ পরহিণ সবরী গিবত গুঞ্জরী মালী। * * *
 উমত সবরো পাগল সবরো মা কর গুলী গুহাডা তোহোরি
 নিঅ ঘরনী নামে সহজ সুন্দরী।
 নানা তরুবর মৌউলিল রে গঅনত লাগেলী ডালী
 একেলী সবরী এ বন হিঁডুই কর্ণকুণ্ডলবজ্রধারী।
 তি অ ধাউ খাট পড়িলা সবরো মহাসুখে সেজি ছাই লী
 সবরো ভূজঙ্গ নৈবামনি দারী পেমভ রাতি পোহাইলী।
 হিঅ-তাবোলা মহাসুখে কাপুর খাই
 সুন নৈরামনি কঠে লইয়া মহাসুখে রাতি পোহাই।”

—এই যে বর্ণনা, এখানে বর্ণিত আদিরস, যে ধর্মীয় প্রণোদনায় সৃজিত হোক না কেন, তাতে নরনারীর সম্পর্কের প্রেমবাসনার দিকটি উদ্ভাসিত হয়েই উঠেছে,—উঁচু উঁচু পর্বতে থাকে শবর কন্যাটি। মাথায় তার ময়ূর পুচ্ছ, গলায় তার গুঞ্জা ফুলের মালা, সুতীত্র রূপমোহে, আসঙ্গ লিঙ্গায়, এই শবরী যে নিজস্বী তা ভুলে তাকে পরস্বী মনে করে শবর উন্মাদ হয়ে ওঠে। পুষ্পে পত্রে গাছগুলি ভরে ওঠে, শবরী একাকিনী বনে বনে বিচরণ করে। তখন খাট পাতা হল, শয্যা বিরচিত হল, কর্পূর বাসিত তাম্বুল সেবন করে দুজনেই অনুরাগে রক্তিম হয়ে উঠল। নিবিড় মিলনসুখে রাত্রি অতিবাহিত হল।—এই বিবরণে কোথাও ধর্মের পূজাচর্চার স্তবস্তুতি নেই, রয়েছে জীবনের প্রতি আদিরসাত্মক আকৃতির বাস্তব নির্ভর বর্ণনা। এখানে ধর্ম প্রচ্ছদ মাত্র হয়ে থেকেছে, ভিতরে পাণ্ডুলিপি জন্ম কথ্য বলে। ধর্মনির্ভর এই সাহিত্যকর্মে আদিরসের আসঙ্গ লীলায় কোনো বাধা ছিল না, কিন্তু এসব পদে নারীর যথার্থ সামাজিক অবস্থানটিকে চিনে নিতে পারা যায় না, ঐ যে চর্যাকার বললেন, ‘একেলী সবরী এ বন হিঁডুই কর্ণকুণ্ডল বজ্রধারী’—একাকিনী নারীটির অরণ্যচারিতা তার স্বাধীন সত্তার কথাই কিছুটা জানায় আমাদের। আর একথা আমাদের তো মনেও রাখতে হবে যে সম্পদের উচ্চশ্রেণীর মানুষদের জীবনে নারীরা পরনির্ভরশীলা ছিল, তাদের কোনো অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, স্ব-উপার্জন ছিল না, কিন্তু নিম্নবর্গের মানুষদের মধ্যে নারীরা অর্থনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করেছিল ; কৃষিতে, পশুমাংস বিক্রয়ে, সম্পন্ন ঘরের গৃহকর্মে সহায়তায় এইসব নারীরা স্বাধীন উপার্জনের উপায় খুঁজে নিয়ে ছিল, তাদের একক চলাচল নিষিদ্ধ ছিল না, যা ছিল সম্ভ্রান্ত ও অভিজাত ঘরের, বনেদী ঘরের মহিলাদের ক্ষেত্রে একেবারেই নিষিদ্ধ বস্তু।

চর্যাপদ লেখা হয়েছিল আনুমানিক নবম দশম শতাব্দীতে, এরপর তুর্কিবিজয় মুসলমান শাসনের প্রথম পর্বে এ দেশে, এ ভাষায় এমননিই এক সংকট সময় সূচিত হয়েছিল যে সাহিত্য-সৃজনের কাজ প্রায় বন্ধই ছিল, অন্তত দুশো বছরের মতো সময় ছিল অন্ধকারে ঢাকা। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন বা শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্ভ নামের যে গ্রন্থটি এরপর

আদিপু.৩ ৩৭, তার আদিঅন্ত খণ্ডিত পুঁথিটিতে কবি বাসুলিসেবক বড়ু চণ্ডীদাস
 ৩৭টি খণ্ডে রাধা নাম্নী একটি গ্রামকন্যাকে গোপবালককৃষ্ণ কীভাবে প্রেমে
 নিমগ্ন করে পরে প্রত্যাখ্যান করেন তারই কাহিনী নিবেদন করেছেন। যতই ধর্মীয়
 ৩৭ তাৎপর্য দিয়ে এই কাহিনীকে অলৌকিক মহিমা দেওয়া হোক না কেন, ধর্ম
 এখানে প্রচ্ছদ হয়ে থেকেছে, প্রচ্ছদ হয়ে থেকে ভিতরের পাণ্ডুলিপিকে আড়াল
 করেছে। ধর্ম প্রাচীন পর্যায়ের ও মধ্যযুগের সব শিল্পসাহিত্যে প্রয়াসকেই আচ্ছন্ন করে
 দাঁড়িয়ে রয়েছে এবং এই ধর্মই, মূল্যবোধ থেকে সব মানবিক প্রয়াস,—সকল
 কিছুই সার্থকতা নিরূপণ করতে চেয়েছে। ধর্ম এক প্রধান নিয়ামক শক্তি রূপে দেখা
 দিয়েছে। মানুষের সমস্ত আচরণের অভিভাবক সেজে বসেছে এই ধর্ম, ধর্মের যে
 তাত্ত্বিক দিক তার থেকে অনেক বেশি করে ভূমিকা রচনা করেছিল ধর্মের প্রায়োগিক
 দিকটি, আর সেই ধর্ম, সর্বক্ষেত্রে কি হিন্দু কি মুসলমান, কি বৌদ্ধ কি খৃষ্টান,—সর্বত্র
 প্রায় নিয়ন্ত্রণের ভূমিকায় দাঁড়িয়ে পড়েছিল। এমনকি আগেকার দিনের মানুষের বাঙলা
 সাহিত্যের প্রাচীন বা আদি মধ্য অস্ত্র যুগেও ধর্মীয় তাৎপর্য ছাড়া, ধর্মীয় যুক্তি ছাড়া,
 ধর্মীয় প্রচ্ছদ ছাড়া কিছু রচনা করাও অসম্ভব ও অসাধ্য ব্যাপার ছিল। গ্রাম গোপবালক
 ও গোপকন্যার প্রণয় কাহিনী তাই ধর্মীয় তাৎপর্যে যুক্ত হয়ে পরিবেশনের যোগ্য
 হয়ে উঠেছিল। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন নাটক নাট-গীতি-কাব্য টিতে রাধা-বড়াই-কৃষ্ণের
 সংলাপ ও সঙ্গীতের সবচেয়ে বড় মহিমাই ছিল এইটি যে সেটি লেখা হয়েছিল
 লীলাপটু বিষয়ের নব্য অবতার রূপ কৃষ্ণের প্রেমকে কেন্দ্র করে, মানুষ সেখানে বড়
 নয়, মানুষকে ছাড়িয়ে অনেক অনেক বড় হলেন মানুষেরই তৈরি করা দেবতারা।
 রাধা যখন অন্তরতর আকুলতার থেকে বলেন

“বন পোড়ে আগ কুঁজায় জগজনে জানী

মোর মন পোড়ে যেহ কুন্তারের পনী।

তখন শ্রীরাধিকার এই হৃদয় দহনকে লৌকিক রমণীর হৃদয়দাহ বলে বিশ্বাস করতে
 ইচ্ছে করে, পথ জুড়ে দাঁড়িয়ে থাকে ধর্মের শাসন। শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক কাব্যকলার
 সূত্রপাত বাঙলায় বড়ু চণ্ডীদাসকে কেন্দ্র করে হলেও এই বাঙলায় কৃষ্ণ বিষয়ক
 পদাবলী সাহিত্যের ক্ষেত্রে যে ব্যক্তিটির ব্যক্তিত্বের অভিঘাত সবচেয়ে বড় হয়ে
 দেখা দিয়েছিল তিনি শ্রীচৈতন্যদেব। কৃষ্ণ নামক মানুষটিকে তিনি মানবাধিক দৈবী
 মহিমায় বৃত্ত ও আবৃত্ত করে তুললেন, এবং রাধিকা নামের মানবীটিকে-ও সেই
 মানবাধিক দেবতারই একটি বিশিষ্ট অংশ বলে চিনিয়ে দিতে চাইলেন সকল সাহিত্য-
 অনুরাগী মানুষ জনদের কাছে। চৈতন্যদেবের নামক চরিত্রটির মজাই হল এই-ই যে
 তিনি একই সঙ্গে অন্তজ, সমাজের প্রান্তবাসী মানুষ জনকে কোল দিয়েছেন, নাম
 সংকীর্ণতার ভাববিহীন কর্মকাণ্ডে সকলকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছেন আবার রাধা
 কৃষ্ণ নামক দুটি লৌকিক চরিত্রকে অলৌকিক মহিমায় আবৃত্ত আচ্ছন্ন ও উত্তীর্ণ
 করেছেন, ব্যক্তি মানুষ হিসাবে, ধর্ম-প্রচারক, নাম-গান-প্রচারক হিসাবে তিনি নেমে

এসেছিলেন সাধারণ, অতি সাধারণ মানুষের স্তরে, আর গোপবালক কৃষ্ণ ও গোপকন্যা রাধাকে তুলে নিয়ে গিয়েছিলেন দৈবী মহিমার লোকাতীত স্তরে, আমি বলতে চাইছি, মধ্যযুগের এই সাংঘাতিক জরুরী ধর্ম-ব্যক্তিত্বটি যার গভীর প্রভাব সেদিনের ও পরবর্তী মানুষ জনের ওপর পড়েছিল, তিনি একই সঙ্গে আচরণীয় পালনীয় ধর্মকে নামিয়ে এনেছিলেন উচ্চকোটির থেকে নিম্নকোটির অগণ্য সাধারণ মানুষের স্তরে, আবার সেই সঙ্গে লোকাযত চরিত্র রাধা কৃষ্ণকে তুলে নিয়ে গিয়েছিলেন লোকোত্তর মহিমার স্তরে-ও। ধর্মীয় এই প্রক্ষেপ চরিত্র দুটিকে আমাদের কাছের চেনা লোক করেও দূরের বস্তু করে রেখে দিয়েছে একইসঙ্গে। রাধা আর কৃষ্ণ সাধারণ নারী আর পুরুষ নয়, কৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ পরম ব্রহ্ম আর রাধা তাঁরই একটি অংশ। তাঁরই হুাদিনী শক্তি এটা জানবার পর স্বভাবতই তাদের সম্পর্কে একটি ধর্মীয় দূরত্ব তৈরি হয়, রক্ত মাংসের নর ও নারীরূপে তাদের ভাবতে সুনির্দিষ্ট ভাবে নিষেধ করেছিলেন সেই সময়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব শ্রীচৈতন্যদেব। ফলে চৈতন্য সমকালীন ও চৈতন্য পরবর্তী সমস্ত বৈষ্ণব পদসাহিত্যের ওপর যাঁর সবচেয়ে বেশি প্রভাব সেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুই প্রধান ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব হয়ে সমস্তটাকে আচ্ছন্ন করে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তবুও ধর্মীয় বাতাবরণ ভেদ করে, ধর্মের প্রবল মুষ্টি ছাড়িয়ে মানবিক সংবেদনায় রাধা নামক নারীটি যখন পুরুষ কৃষ্ণের অন্যান্যনুরাগের বহুগামিতার জ্বালা পোড়ায় জর্জরিত হতে হতে কেঁদে ওঠেন, তখন তাঁর কান্নাভরা উচ্চারণের মধ্য দিয়ে হাতে এসে লাগে তাঁর লবণ অশ্রু, ধর্মের ওপরে জীবনের জয় এইখানেই রাধা বলছেন, চণ্ডীদাসের রাধা,

‘যুবতী হইয়া/শ্যাম ভাঙাইয়া/এমতি করিল কে?

আমার পরাণ/যেমতি করিছে/তেমতি হউক সে!

উদ্ধৃতিতে এই প্রশ্ন চিহ্নটি ছিল না, আমরা সংযুক্ত করে দিলাম, অর্থের যথার্থতার জন্যই। বিদ্যাপতির শ্রীরাধিকা, কৃষ্ণ তাকে ত্যাগ করে যাবার পরে যে হাহাকার-ভরা কান্না কেঁদেছেন তাতে দৈবী ও ধর্মীয় মহিমা আরোপ করে আমরা চুপ করে থাকি, প্রতারক কৃষ্ণের প্রতি বিস্মৃতিপরায়ণ কৃষ্ণের প্রতি আমাদের কোনো অভিমান হয় না, অভিযোগ হয় না, সর্বটাকেই ধর্মীয় তাৎপর্যে দেখে তার মানবিক প্রবঞ্চনার দিকটুকুকে ভুলে যাই আমরা, এমনই আমাদের ধর্মানুরাগ। রাধা যখন কাঁদছেন,

“হরি গেড মধুপুর হাম একাকিনী।

ঝুরিয়া বুঝিয়া মরি দিবস রজনী।।”

অথবা

“সুন ভেল মন্দির সুন ভেল নগরী।

সুনভেল দশদিশ সুন ভেলা সগরী।।”

তখন রাধার সেই দিবসরজনী ব্যাপি কেঁদে কেঁদে মরা আর সমস্ত জীবন ব্যাপি

শুনাও। ওপর ধর্মীয় মহিমা আরোপ করে তাকে মানবিক সংক্ষেভের জায়গা থেকে পরিণে নোওয়া হয়, এক কাল্পনিক ভাব সম্মেলনের পদ সৃষ্টি করে বিচ্ছিন্না, প্রবন্ধিতা রাশার রঙমাংসের মানবিক কষ্টকে ঢেকে দেওয়া, চেপে দেওয়া হয় ; প্রবন্ধক, নিষ্ঠুর, পঞ্চারীতে-নিরত, কামুক ক্ষণকে দেওয়া হয় ধর্মীয় মহিমা ও গরিমা।

ধর্ম সমস্ত সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক কর্মকাণ্ডের ওপর তার প্রবল থাবা বিস্তার করে এসে ছিল, একথা তো আগেই বলেছি বারে বারে ; তুর্কিবিজয়ের পরে যে নবাবী আমল ও মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠিত হল, তাতে বাঙলার সামাজিক জীবনে এক বিপর্যয় ও বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়ে উঠেছিল, দীর্ঘ দু-শো বছর ছিল তার অন্ধকার ছায়া, আমাদের সামাজিক জীবনের ওপর। উচ্চবর্ণের হিন্দুরা যাঁরা এই মুসলমান শাসনের আগে সেন রাজাদের রাজত্বকালে অহংকৃত ও উদ্ধত ছিলেন, নিম্নবর্ণের হিন্দুদের ঘৃণার চোখে, অবজ্ঞার মনোভাবেই দেখতেন তাঁরা এই বিধর্মী পরিবেশে নিম্নবর্ণের মানুষদের সঙ্গে কিছুটা নৈকট্য-ও স্থাপন করলেন। হিন্দু ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে এতকাল ধরে বহু কু-সংস্কার, ধর্মীয় গোঁড়ামি, বর্ণবিভেদ, উচ্চবর্ণের সঙ্গে নিম্নবর্ণের জন-অচল সম্পর্ক, জড়তা, হীনতা বাসা বেঁধেছিল, সেই অচলায়তনে এসে লাগল জোর আঘাত, উচ্চকোটির আর্থ সংস্কৃতি গরী বর্ণহিন্দু এবং নিম্নকোটির অনার্য সংস্কৃতি যুক্ত সাধারণ মানুষ এই মুসলমান শাসনের আঘাতে একাকার হয়ে গেল। একই ধর্ম সম্প্রদায়ে থেকেও হিন্দুর নিজেরাই বিভাজিত ছিল নানা উপসম্প্রদায়ে। শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, সৌর, গণপত্য,—বিভাজিত এই পাঁচটি হিন্দু সম্প্রদায়ই পরস্পরের ধর্মমত সম্পর্কে ছিল অসহিষ্ণু, ক্ষমাহীন ও প্রখর সমালোচনা প্রবণ। তাই তুর্কি বিজয়ের পরে বহু সংস্কৃতি ও সাহিত্যে আর্থ অনার্য মিলন সম্ভব হয়ে উঠল, অনার্য দেব দেবীদের আর্থিকরণ হল, সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের কাছে পূজা পেলেন এই সব অনার্য দেবতার। দেবতাদের সেই ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি দখলের লড়াই-এ অনার্য দেবদেবীদের যে প্রাধান্য সূচিত হল, তারই কাব্যকাহিনী মঙ্গলকাব্যগুলিতে রচনা হয়েছিল, সেখানে আমরা দেখেছি মনসাকে, যিনি সাপের দেবী ; সেখানে আমরা দেখলাম বন্যপশু পালনের দেবী চণ্ডীকে, আমরা পেলাম অনার্য দেবতা ধর্ম ঠাকুরকে ; আমরা পেলাম এরকম আরো বহু অনার্য দেব-দেবীকেও। সেখানে ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে কাব্যগুলি রচিত হলেও মানব মানবীর জীবনের সংক্ষেভ, আঘাত, দুঃখ, আনন্দ, বেদনা সবই ধর্মের প্রচ্ছদে ধরা রয়েছে, বিশেষত নারীজীবনের অপমান জ্বালাপোড়া ধর্মীয় প্রচ্ছদ ভেদ করে সংবেদনশীল পাঠকের বুকে এসে লাগে, মনসামঙ্গল কাব্যে স্বামী পরিত্যক্তা মনসার ক্ষত-বিক্ষত হৃদয়ের খবর তার ধর্মীয় মহিমাকে ছিঁড়ে খুঁড়ে অব্যবহৃত হয়ে পড়েছে, মনসা বলছেন,

“জনম দুখিনী আমি জন্মে গেল কাল।
যেই ডাল ধরি আমি ভাঙ্গে সেই ডাল।।

শীতল ভাবিয়া যদি পাষণ লই কোলে।
পাষণ আগুন হয় মোর কর্মফলে।।”

পশু পালনের দেবী চণ্ডী আর আৰ্যদেবী চণ্ডী একাকার হয়ে গিয়েছেন চণ্ডীমঙ্গল নামের কাব্যটিতে, সেখানেও ধর্ম প্রচারের ছলে সে-সময়ের জীবনই ধরা পড়েছে, সেই জীবন যেখানে সামন্ত-তান্ত্রিক বাতাবরণে প্রতি পদক্ষেপে নারীকে হেয় করা হয়, ঘৃণা করা হয় ; লাঞ্ছনা করা হয়, দমিত করে রাখা হয়, সেই সমাজের যথাযথ ছবিটি ধরা পড়েছে এমন বহু বর্ণনায় ও সংলাপে, যা পড়লে বিশ্বয়ের আর অবধি-ও থাকে না। দেবপূজা প্রচারের ধর্মীয় তাৎপর্য ছাপিয়ে দেখা দিয়েছে সে সমাজের যথার্থ ছবিটি। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে ধনপতি সদাগরের আচরণে নারী জাতির প্রতি তার মনোভাব অব্যাহত হয়ে পড়েছে,

“পূজাগৃহে উপনীত হৈল ধনপতি।
জয় দিয়া পূজে চণ্ডী খুল্লনা যুবতী।।
বামপথী হইয়া করিস কার পূজা।
ইহা শুনি যদি মোরে ক্রোধ করে রাজা।।
পুনর্বীর জ্ঞাতি বন্ধু যদি ছল ধরে।
পরীক্ষা তোমারে কত দিব বারে বারে।।
কারো ঘরে নাহি আছে হেন পাপ বধু।
খুল্লনা গর্জিয়া তবে ক্রোধে বলে সাধু।।
এতেক বলিয়া সাধু জ্বলে কোপানলে।
লজিয়া দেবীর ঘট ধরে তারে চুলে।।
ভূমিতে দেবীর ঝাড়ি গড়াগড়ি যায়।
নিকট হইয়া সাধু ঠেলে বাম পায়।।
কেমন দেবতা এই পূজিস ঘট ঝারি।
স্ত্রী লিঙ্গ দেবতা আমি পূজা নাহি করি।।”

সমাজের নেতৃস্থানীয় ধনপতি সদাগরের আপন স্ত্রীর প্রতি কী চমৎকার ব্যাপারে ! স্ত্রী প্রহার করা, চুলের মুঠি ধরে মারা, পূজা-রতা স্ত্রীর পূজার আয়োজনকে লাথি মেরে ফেলে দেওয়া, এসবই বেশ পৌরুষ ব্যঞ্জক দৃশ্যাবলী ! সবচেয়ে আশ্চর্য-ময় বাক্যটি হল ধনপতি সদাগর আশ্ফালন করে বলেছে ‘স্ত্রী লিঙ্গ দেবতা আমি পূজা নাহি করি।।’—সমস্ত স্ত্রীজাতিই তার মতো সম্মানিত ধনী প্রতিষ্ঠিত পুরুষের কাছে অপমানের ঘৃণার পাত্রী এমনকি ধর্মীয় বাতাবরণে আশ্রয় প্রাপ্ত স্ত্রী দেবীর ও তার পৌরুষ আশ্ফালনের থেকে মুক্তি নেই ; সমস্ত ধর্মীয় পরিমণ্ডলে, ধর্মীয় পরিবেশে রচিত সাহিত্যে নারীকে কেবলই দেওয়া হয়েছে হেলা, হেলাফেলা, অপমান, প্রহার, অবজ্ঞা ঘৃণা আর ঘৃণা।

নারীকে কি অন্য মূর্তিতেও দেখেনি এই উদ্ধত পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থার সমাজ, হ্যাঁ

যে মূর্তিগুলি আঁকবার পশ্চাতে অন্য উদ্দেশ্য জায়মান ছিল, তাহল নারীর প্রেমার্তি
কিন্তু পিতৃ-পিতৃরূপ আঁকবার প্রয়োজন কখনো অনুভব করেছেন ধর্মীয় কাব্যের
রচয়িতারা, কখনো বা নারীর জননীরূপটিকেও কিছু মহিমা দিয়ে এঁকেছেন এঁরা,
তারা কারণ নারীকে প্রেমময়ী এবং স্নেহময়ী করে দেখলে পরিবার প্রধান এই
সমাজের পুরুষের স্বার্থ সুরক্ষিত থাকে। নারীকে ভোগ করা, নারীকে ব্যবহার করা,
সংসারে বিনা পারিশ্রমিকে তার শ্রমকে কাজে লাগানো, সন্তান পালনের ধারাবাহিক
কাজটি তাকে দিয়ে করিয়ে নেওয়া,—এসবই ছিল এই সব ছবিকে বড় করে
দেখানোর পেছনের কারণ।

বিখ্যাত পণ্ডিত আগস্ট বেবেল তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ, ‘Woman in the Past,
Present And Future’ গ্রন্থে লিখেছিলেন, “—মানব জাতির মধ্যে নারীই
সর্বপ্রথম দাসত্বের শৃঙ্খল পরেছে। নারীর দাসত্ব শুরু হয়েছে ইতিহাসে দাস প্রথারও
পূর্বে”। ইতিহাসের সেই আদ্যযুগে নারীকে সমাজের সামগ্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা
থেকে ধনোপার্জনের ব্যবস্থা থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তাকে করা হয়েছিল
গৃহবন্দী, সেই দাসীত্ব, গৃহ সেবাদাসীত্ব নারীর আজও ঘোচেনি,—সেই সুপ্রাচীন
যুগে যখন ধর্মমত তৈরি হচ্ছিল, ধর্মগ্রন্থ লেখার সূচনা হয়েছিল তখন থেকেই নারী
ছিল বন্দিনী, সেবাদাসী, পুরুষের অনুকম্পার পাত্রী ; ফলে সমস্ত ধর্মগ্রন্থে সকল
ধর্মমতে কী হিন্দুধর্ম, কী খৃষ্টধর্মে কী ইহুদী ধর্মে কী বৌদ্ধ ধর্মে, কী ইসলামে সর্বত্র
মেয়েদের হীন অপমানিত নিকৃষ্ট শ্রেণীর জীবন হিসাবেই দেখা হয়েছে, এটি একটি
ঐতিহাসিক সত্য।

প্রকৃতি তাঁর সৃষ্টিকার্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পুরুষ মানুষকে অসহায় করে
রেখেছেন, সেই বিষয়টি হল সন্তানের পিতৃত্বের বিষয়ে সুনিশ্চয়তা, পিতৃত্ব প্রমাণিত
ছিল না, বিশ্বাস ও অনুমান নির্ভর ছিল, পিতৃত্বের সুনিশ্চয়তার বিষয়ে পুরুষের এই
অসহায়তার জন্যই পুরুষ মানুষ মেয়েদের ওপরে, সমগ্র নারী জাতির ওপর নানাবিধ
মূল্যবোধ আরোপ করেছে। যে নারী সৎ তাকে যদি সতী বলা হয়, তবে একথা
আমরা কে না জানি যে ‘সতী’ নারী বলতে শারীরিক ভাবে বিবাহিত পুরুষটির প্রতি
একনিষ্ঠতাকেই বোঝায়, যে নারী হীন মনোভাবের হতে পারেন, তিনি মিথ্যাভাষণী-
ও হতে পারেন, চোর বা ইতরও হতে পারেন, শুধুমাত্র স্বামীর প্রতি অন্ধ একনিষ্ঠতাই
সতীত্বের শর্ত বলে সমাজে ধরে নেওয়া হত। নারীকে এ বাবদ মানুষ বলেই গণ্য
না করে, সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র হিসাবেই দেখা হত, তাই সেই যন্ত্রটির প্রতি নানাবিধ
‘না’ আরোপ করা হয়েছিল। পুরুষ তার উপার্জিত বা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত
সম্পত্তির যথার্থ উত্তরাধিকারী চাইত বলেই নারীর ওপর সহস্র নিষেধাজ্ঞা আরোপ
করছে, নারীকে অবরোধে বেঁধেছে, নারীকে অবিশ্বাসও করেছে, আমরা তো জানি
প্রজানুরঞ্জনের নামে প্রকৃত প্রস্তাবে নিজের সন্দেহকেই মূল্য দিয়েছিলেন রামচন্দ্র,
যিনি হিন্দুধর্মের এক প্রাচীন প্রতীক বলা চলে। ধর্মের দৃষ্টিতে ধর্মরাজ্য বা রামরাজ্য

প্রতিষ্ঠিত হয়, যে রাজ্য থেকে গর্ভবতী স্ত্রীকে বার করে দেন দেশের ধর্ম ও নীতি প্রতিভূ রাজা রাম, এবং তাকে নির্বাসন দেবার পর সুদীর্ঘকাল প্রায় পনের বছর তাঁর খোঁজও রাখেননি সেই ধর্মানুযায়ী মহৎ রাজা রামচন্দ্র! জন্ম মুহূর্তের সূচনায় শুধু বীজ বপনের তাৎক্ষণিক কাজ টুকু ছাড়া পুরুষের প্রয়োজন সন্তান পালনের ক্ষেত্রে যে কত তুচ্ছ হতে পারে, পিতা ছাড়াও সন্তানের অস্তিত্ব সম্ভব, লব-কুশই তার প্রমাণ,—প্রাচীন মহাকাব্যটি লব-কুশের বিকাশ বৃত্তান্তে পিতার ভূমিকা যে কত গৌণ হতে পারে, তা যথার্থ ভাবে দেখিয়ে দিয়েছে। আমাদের ধর্মে চিরদিন সীতাকে সাবিত্রীকে নারীত্বের শীর্ষবিন্দু রূপে দেখানো হয়েছে, পুরুষ তান্ত্রিক ব্যবস্থাকে মাথা পেতে নিয়ে পিতৃতান্ত্রিক নির্যাতনের মুকুট পরেছিলেন এঁরা, তাই এঁরা মহৎ নারী, সমস্ত নারীকুলের আদর্শ এঁরা,—এরকমই শিখিয়েছে সমাজ, শিখিয়েছে ধর্ম ও লিঙ্গ রাজনীতির স্বার্থপরতা।

পৃথিবীতে যত রকমের রাজনীতি রয়েছে, তা প্রাচীনকাল থেকে ধর্মের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী ভাবেই জড়িত ছিল, আর সবচেয়ে কুৎসিত সবচেয়ে প্রাচীন, সবচেয়ে নিন্দাযোগ্য রাজনীতি হল লিঙ্গ-রাজনীতি। পুংলিঙ্গ ও স্ত্রী লিঙ্গে এই যে বিভাজন, তা সু-প্রাচীন কাল থেকে ধর্মকে আশ্রয় করেই বেড়ে উঠেছে, প্রসারিত ও পল্লবিত হয়েছে। সমাজের এই যে জঘন্য লিঙ্গ-রাজনীতি যার বলি হয়েছে অজস্র শিশুকন্যা, যাদের মায়ের পেট থেকে পড়বার পর এবং পড়বার আগেই হত্যা করা হয়, বোঝানো যে, মেয়েদের জীবন পুরুষের জীবনের তুলনায় কম মূল্যবান, এবং তার সেই নিকৃষ্ট জীবনকে সেই জীবনের সকল দিককে ঘৃণা করতে প্ররোচিত করে এই সামন্ত সমাজ ও এই সমাজের ধর্ম। ধর্মশব্দটি এসেছে ধৃ+ম (মন)-ক,—এই প্রত্যয় নিষ্পন্ন করে, যা ধারণ করে তাই ধর্ম, যা শুভকারক, শ্রেয় তাই ধর্ম,—তো, এই শুভকারক, শ্রেয় বস্তুটি নারীর কোন্ শুভ করেছে তা এই বিগত সহস্রাব্দের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করে। ধর্মের আশ্রয়েই তাকে কোথাও মৃত স্বামীর জলন্ত চিতায় পুড়িয়ে মেরে ফেলা হয়েছে, তাকে কোথাও সারাজীবনের বৈধব্যের লাঞ্ছনাময় জীবন অতিবাহিত করতে হয়েছে, তাকে মাতৃগর্ভে মেরে ফেলা হয়েছে, নবজাতিকাকে নুন দিয়ে কাঁচা ধান দিয়ে, আকন্দ আঠার রস দিয়ে মেরে ফেলা হয়েছে, যে ধর্ম এই সব মারণযন্ত্রকে প্রশ্রয় দিয়েছে, নারীকে ঘৃণা করতে। নারীকে দমিত রাখতে, নারীকে নিকৃষ্ট জীব ভাবতে প্ররোচিত করেছে, সেই সব ধর্মের অন্ধকার দিকগুলি আবার এই সু-প্রাচীন উপমহাদেশে জেগে উঠতে চাইছে, এই লক্ষ্মণ কোনোমতে শুভ ও সুন্দর নয়, সকল শিক্ষিত সচেতন মানুষের এইসব ধর্মের গুট গোপন প্ররোচনার বিষয়ে অতন্দ্র সচেতনতা সতর্কতা কামনা করি :

পুনর্বীর সীতা

দেবু দত্তগুপ্ত

প্রাণবন্ত এই বসন্তে কোকিলও পালন করল বেদনার্ত নীরবতা। শুষ্ক শীতের মত বৃক্ষ হল শীর্ণকায়া, নিষ্পত্র। ফুলে এলো না মধু। ফলে এলো না মিষ্টতা। ধানের বুকে জমল না দুধ। নীরব অশ্রুপাতে আর্দ্র হয়ে উঠল প্রকৃতি। সত্যনিষ্ঠার আবরণে আবৃত দ্বিধাবিহীন গৃহী-রাজা এবং ভিক্ষালে পালিত ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসীদের এক ধর্মকামী সমাবেশ অভাবনীয় স্পর্ধার এই আঘাতে মৌন থাকলো বহুক্ষণ। প্রশস্ত রাজসভার মাঝে জ্বলন্ত বিশাল হোমকুণ্ড। আগুনের লেলিহান শিখাও এখানে দাহহীন, বেদনায় নতশির। জনকনন্দিনী সীতা, অপমানে, প্রত্যাখ্যানে অগ্নিশিখার ক্ষিপ্ততায় ঘুরে দাঁড়িয়েছিলেন পুরুষকারহীন, এই কেচ্ছাপ্রিয় সমুপবেশের দিকে।

চোদ্দ বছরের আত্মীয়-পরিজনহীন বন্দিনী জীবনে তিনি পেয়েছেন দশ হাজার বছরের লাঞ্ছনা। রক্তমাংসের এই অনিন্দ্যসুন্দর জীবন্ত প্রতিমাকে ঘিরে চোদ্দ বছর ধরে নেচেছে ত্রোগাধোন্মত্ত যৌনতার রোগাক্রান্ত আত্মফালন। চোদ্দ বছরে, পরাক্রান্ত যোদ্ধাদের শৌর্য, বীর্য, দম্ভ মৃত কৃষ্ণকীট-পতঙ্গের মত গলে মিশে যেতে দেখেছেন প্রবৃত্তির কর্দমে। আকাশচুম্বী অসম্মান তাঁর আত্মাকে শতচ্ছিন্ন করেছে। তবুও তেজোদীপ্ত নারীত্বের রক্ষাবলয়ে কেউ প্রবেশাধিকার পায় নি। দ্বিধাবল্লভের বায়ু পারেনি সীতাকে স্পর্শ করতে। অগ্নিতে ছিল না এমন কোনো দাহ, যা তাঁর অন্তরের শুদ্ধতাকে দগ্ধ করতে পারে। পৃথিবীতে ছিল না এমন কোনো তরবারি, যা তার সুগভীর আনুগত্যকে ছেদন করতে পারে! চোদ্দ বছর অপরিমেয় লাঞ্ছনার গর্ভে তিনি তাঁর চারপাশে রচনা করেছিলেন দুর্ভেদ্য বেদনার হোমাগ্নি। অগ্নিবলয়ের সেই প্রাচীরে ছিল না কোনো ছিদ্র, মালিন্য কিংবা অবিশ্বাস যেখানে অনুপ্রবেশের পথ খুঁজে নিতে পারে।

সেই লোলচর্মসার অমরুদণ্ডী সমাজের দিকে মুখ ফিরিয়ে জনকনন্দিনী গভীরতম ঘৃণা থেকে স্মরণ করলেন মাতা বসুন্ধরাকে। জন্মপূর্ব অচেতনতায় লজ্জা-ব্রীড়া ঘুমের ক্রীড়ায় যাঁর গর্ভে তিনি মিশেছিলেন। অকর্ষিত মৃত্তিকায় প্রথম লাঙলের কর্ষণের স্পর্শে তিনি জন্মেছিলেন যাঁর জঠর থেকে। পুরুষের ক্লীবত্বে মানহারা মানবী সীতা, মাতৃগর্ভে ফিরে যেতে চাইলেন পুনর্বীর। মুহূর্তে অন্ধ বিচারালয়ের অন্ধকার দূরীভূত হল। কেঁপে উঠল ফসলের আদিঅস্ত মাঠ এবং মেদিনী। দ্বিখণ্ডিত পৃথিবীর গর্ভ থেকে উঠে এলেন সালঙ্কারা জননী বসুন্ধরা। মাতৃকোড়ে টেনে নিলেন

কন্যা সীতাকে। সম্মিলিত কাপুরুষতায় প্রতিমূর্তি টিকিধারী পণ্ডিত, উপবীতধারী ব্রাহ্মণ এবং মুকুটধারী রাজন্যবর্গ আচ্ছন্ন থাকলেন ক্ষুদ্র অকিঞ্চিতকর হয়ে যাওয়ার অবসাদে।

দুই

বাৎসল্যের শুশ্রূষায় বসুন্ধরা-দুহিতা সীতা এখন সুস্থ। মহিমান্বিত নারীত্বে পুনর্বাসিত। কিন্তু এখনও আধা জাগরণে মাঝে মাঝে ফিরে আসে চতুর্দশ বর্ষের দুঃসহ স্মৃতি। মাঝে মাঝে গ্রাস করে সুগভীর বিপন্নতা। গভীর নৈরাশ্যে মগ্ন হয়ে যান অভিষ্ট ঈশ্বরের প্রার্থনায়। তখনই এগিয়ে আসে মা বসুন্ধরার স্নেহ-সিক্ত হাত। সেই স্পর্শ তাঁকে ভরসা দেয়। শক্তিও দেয়। মমতাময়ী বসুন্ধরা আপন আত্মজাকে স্নেহে বলেন—দুঃখকে অনন্ত আয়ু দিও না। লাঞ্ছনার স্মৃতিকে দিও না জীবনীশক্তি। আমরা কন্যা, জায়া, জননী। আমাদের জন্ম জ্যোৎস্নায় মমতায় আমন্ত্রণে হয় না। কেউ শঙ্খ বাজায় না। উলুধ্বনি তোলে না কেউ। মানুষের পৃথিবীতে আমরা লালিত হই না। বেড়ে উঠি অশথ বৃক্ষের মত। মানব প্রজাতির জন্মদাত্রী হিসাবে নয়, জন্ম দেবার এক স্থূল কৃৎকৌশলের মত ব্যবহৃত হই আমরা। তুমি কোন দেবী ঈশ্বরীর কাছে প্রার্থনা করছ? ঈশ্বরের রাজ্যে কোন দেবী নেই। এখানেও তাঁরা অপমানে অমর্যাদায় ভ্রিয়মান। তোমার ত্রেতাযুগের পৃথিবীর পিতৃপ্রধান সমাজের হাতে নারীদের সমস্ত লাঞ্ছনা, নিপীড়নের ইতিবৃত্ত ঈশ্বরের এই বাসভূমিতেও সমান তীব্রতায় বহমান।

একটা জোরালো অবলম্বন হারিয়ে যেতে থাকে। জন্মকাল থেকে প্রবাহিত রক্তজ সংস্কার তরল হতে থাকে মজ্জায়। কী নিদারুণ সত্য উদ্ভাসিত হলো আজন্ম বিশ্বাসের জাল ছিন্ন করে। অলৌকিক ঈশ্বরের মহিমান্বিত সমাজ কী দ্রুত ভাঙতে থাকে পুরানো রাজপ্রাসাদের মত ! সীতা আশ্চর্য দ্রুততায় মুক্ত হতে থাকেন পতি-সম্মোহিতার আচ্ছন্নতা থেকে।

মা-বসুন্ধরা লক্ষ করেন আপন দুহিতার অভ্যন্তরে নতুন বিশ্বাস আর মর্যাদাবোধের অঙ্কুরোদগম। নারীজন্মের সার্থকতাবোধ প্রস্ফুটিত হতে থাকে সীতার হৃদয়ে।

আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বর্ষীয়সী, প্রজ্জাবতী হলেন দেবী শোচনা। সীমাহীন যন্ত্রণা আর বিশাল দুঃখ অতিক্রম করে লাঞ্ছিতা নারীত্বের এই স্বর্গোদ্যানে তিনি অধিষ্ঠিতা হয়েছেন। মা-সীতা, তুমি তাঁর কাছে যাও। স্বর্গের অধিশ্বর ঈশ্বরের এই সমাজে দেবী ঈশ্বরীরা কী বেদনার্ত মহিমায় বেঁচে আছেন, বুঝে নাও। নিজের শোক-তাপ লাঘব হবে অনেকখানি। অবরুদ্ধ জীবনের যন্ত্রণা, অগ্নি পরীক্ষার অপমান

তখন মনে হবে পালকের মত হালকা।

বিশ্বাস অবিশ্বাসের তদ্রাচ্ছন্নতায় সীতা শুধান তাঁর জননীকে—কে এই দেবী শোচনা? কী তার বৃত্তান্ত? কোন উৎস থেকে তিনি পেলেন সেই ক্ষমতা, যেখানে অপমান লাঞ্ছনা, দুঃখ বেদনাকেই প্রস্তুতীভূত করে সেই প্রস্তরেই বানান তিনি সত্যতার দুর্ভেদ্য প্রাচীর? শোক-তাপের মধ্যে থেকে দহনের সবটুকু পবিত্রতা স্বেদে নিয়ে নিজেই হয়ে ওঠেন বিদ্রোহের অগ্নিশিখা?

বাথাতুরা জননী—বলেন সে অনেক কালের কথা। তখন অরণাচারী ছিলাম আমরা। সামাজিক সম্পর্কের বন্ধনে তখনও গ্রস্থিত হয়নি নরনারীর দৈহিক সম্পর্ক। প্রেম ছিল অবাধ। তখন সন্তানের পিতা কে এই প্রশ্নে সুনির্দিষ্ট চিহ্নিতকরণ সম্ভব ছিল না। কিন্তু সন্তান কোন নারীর গর্ভজাত, তা নিশ্চিত ছিল। ফলে মাতৃপরিচয়েই উত্তরাধিকার নির্ধারিত হত। সামাজিক এই সম্পর্ককে ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছিল জননী-সমাজ। আর সেই সমাজে মাতৃজাতির এই মহিমাম্বিত অবস্থানই প্রতিফলিত হল প্রকৃতির কাছে অসহায় মানুষের ধর্মচেতনায়। যার প্রকাশ ঘটল মাতৃপূজায়।

যে পৃথিবী তোমার নারীত্বের শুচিতায় অবিশ্বাস করেছে বারে বারে। বারে বারে দেখতে চেয়েছে তোমার আপাপবিন্দু শরীর। যারা তোমাকে রাজমহিষীর সিংহাসন থেকে টেনে নামিয়ে নির্বাসনে পাঠিয়েছে স্বাপদ সংকুল অরণ্যে। যে পুরুষ পৃথিবীর পবিত্রতম ভার বহনের ক্লান্তিতে অবসন্ন গর্ভিনী স্ত্রীকে পরিত্যাগ করেছে আপন সন্তানের জন্ম মুহূর্তে, তাদের প্রশ্ন করো প্রশ্ন করো প্রাণধারণের বায়ুকে, জীবন ধারণের জলকে, স্রোতস্বিনী নদীকে, অতলান্ত সমুদ্রকে, গর্বোদ্ধত পর্বত আর অনুসন্ধিৎসু জ্ঞানীকে। প্রশ্ন করো ইতিহাসমনস্ক তপস্বীকে, ঐতিহ্য-প্রিয় আচার্যকে, পরিশ্রমী পরাক্রান্ত পুরুষকে। পৃথিবীর সমস্ত প্রান্তে মানুষের অনন্ত অনুসন্ধিৎসা যেখানেই নিজের অতীতকে খুঁজে পেতে খনন করেছে মৃত্তিকা, প্রত্নতাত্ত্বিক অন্বেষণে সর্বত্রই উঠে এসেছে মাতৃমূর্তি বা দেবী মূর্তি—পুরুষ ঈশ্বর সেখানে অনুপস্থিত।

প্রত্নতত্ত্বেই এই সব মাতৃমূর্তির নাম ‘ভেনাস’। প্রতিটি মূর্তির মুখমণ্ডল অস্পষ্ট, কিন্তু প্রতিটি মূর্তিই নগ্নিকা, নারীত্বসূচক দৈহিক লক্ষণগুলি বড় বেশি প্রকট।

প্রশ্ন করো, এই সব সুপ্রাচীন নারী মূর্তি নগ্ন এবং গর্ভিনী কেন? প্রশ্ন করো, আমাদের সুপ্রাচীন প্রত্নগর্ভ শুধুমাত্র নারী মূর্তিকেই ধারণ করেছে কেন? কেন পুরুষ ঈশ্বর সেখানে অনুপস্থিত? দেবী শোচনার কাছে যাও, তিনি আপন হৃদয়ে সঞ্চিত রেখেছেন অনন্ত সত্যকে! তিনি অনেক জানেন। তাঁর কাছে শোনো আমাদের মহিমাম্বিত অতীত এবং দুঃখ-ভারাক্রান্ত বর্তমানের ইতিবৃত্ত।

তিনি ছিলেন দুঃখের দেবী। শুনেছি পিতৃদেব ব্রহ্মা লোলচর্মসার মহাবার্ককো রিপুগ্রস্ত হয়ে পৌত্রীসমা দেবী শোচনাকে কামনা করেছিলেন। দুঃখের দেবী তাঁকে শুধু প্রত্যাখ্যানই করেননি। ‘বিকৃতমনা ব্যাভিচারী’ বলে ভৎসনাও করেছিলেন।

প্রত্যাখ্যাত ব্রহ্মা স্বর্গ থেকে তাঁকে বিতাড়ন করে অভিশাপ দিয়েছিলেন। অন্তহীন দুঃখের এক অমারাত্বিতে দেবী শোচনার অশ্রু থেকে জন্ম নিয়েছিল শূদ্র। সেই পরিশ্রমী পুত্রের পিতা ছিলেন মর্তবাসী পুরুষকার।

তিন

বসুন্ধরা-দুহিতা সীতাকে বুকে টেনে নেন দেবী শোচনা, আলিঙ্গনে মুহূর্তে মুছে যায় মালিন্য আর দুঃখময় অতীতের স্মৃতি। রোগমুক্ত মনে হয় নিজেকে।

পরম মমতায় দেবী শোচনা বলেন—কন্যা আমার, প্রতারণার এই স্বর্গোদ্যানে তুই কেন এলি অভিমানিনী? মানুষের বিশ্বাসের গর্ভে, অজ্ঞতার সাতরঙা বৃন্দবুদে যে ঈশ্বরের জন্ম, সেই ঈশ্বরের বাসভূমি স্বর্গে। এবং স্বর্গের অবস্থান অন্তরীক্ষে। অন্তরীক্ষের কোনে মাটি থাকে না। আর মাটি ছাড়া অস্তিত্বের শিকড় গভীরে প্রোথিত হয় না, দৃঢ় হয় না অধিকারের ভিত্তি মূল।

এইখানে, এই মায়াময় অলৌকিক স্বর্গোদ্যানে যে সমস্ত ঈশ্বরেরা সদর্পে ঘুরে বেড়ান, মানুষের অধ্যাত্মচিন্তার ফেনিল বৃন্দবুদের জঠরে এদের জন্ম।

প্রকৃতি কিংবা যে জড় পদার্থ মানুষের জীবনযাত্রাকে বিঘ্নিত করেছে, তাকে করেছে বিস্মিত, বিমোহিত, সেই সমস্ত কিছুর মধ্যেই সত্ত্বা কিংবা পরাক্রমশালী শক্তির অস্তিত্ব আছে—এই ধারণা মানুষ জগতের কল্পনা করেছে মানুষেরই দৈহিক অবয়বে। কেননা প্রকৃতি এবং জীব জগতের বিবর্তনের গতিপথে শ্রেষ্ঠ এবং সুন্দরতম সৃষ্টি মানুষ নিজেই, নিজের চাইতে সুন্দরতম কোন প্রাণ যে দেখেনি। স্বভাবতই দৈহিক সৌন্দর্যে দেবতা যখন মানুষেরই মত কান্তিমান, তখন মানুষের মত দেবতাদেরও কাম, ক্রোধ, লোভ, ক্ষুধা, তৃষ্ণার জৈবিক চাহিদাগুলি থাকবে। এবং সেই সব জৈব চাহিদা পূরণ করতে পারলেই দেবতারা তৃপ্ত হবেন। প্রতিদানে মানুষের জীবনে আসবে নিরাপত্তা এবং সমৃদ্ধি। তীব্রভাবে বৈষয়িক এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই ঈশ্বর-চিন্তার বিকাশ এবং বিবর্তন। বেঁচে থাকার সংগ্রামে, ব্যবহারিক জীবনের সঙ্গে সঙ্গতিহীন কোন কিছুই মানুষের ঈশ্বর-চিন্তায় স্থান পায়নি।

মানব সমাজের সূচনায় বেঁচে থাকার প্রয়োজনে মানুষের কাছে গভীরতম কামনার বস্তু ছিল দুটি। সন্তান ও শস্য। প্রকৃতি ও হিংস্র জীব জগতের বিরুদ্ধে বেঁচে থাকার সংগ্রামে সংখ্যাগত ভাবে বৃদ্ধি হোক আপন গোষ্ঠীর, আর শস্যের প্রাচুর্য তাকে মুক্ত করুক যাযাবর জীবনের অনিশ্চয়তার হাত থেকে। তাকে দিক স্থায়ী অর্থনৈতিক জীবন। এই আকাঙ্ক্ষা থেকেই আমাদের আদিম জননীদের কাছে সবচেয়ে কাঙ্ক্ষিত ছিল সন্তান আর শস্য। আর এই দুটি সম্পদ আসে পৃথিবী আর নারী থেকে। এ কারণেই তাঁদের দৃষ্টিতে নারী আর ধরিত্রী ছিল সমার্থক ও অভিন্ন। সন্তান ধারণের প্রাকৃতিক নিয়ম, নারীকে যে মহিমাম্বিত অবস্থানে প্রতিষ্ঠিত

করেছিল—সেই বাস্তবতাই মানুষের কল্পনায় প্রতিবিম্বিত হয়ে সূচনা করেছিল মাতৃপূজার। মা সীতা, তুমি শস্যের কোন দেবতা পাবে না। সেখানেও পরিশ্রমী কৃষকের আরাধনায় দেবী লক্ষ্মী।

আদিম সমাজে খাদ্যের আশায় বন্য বরাহ বা হরিণের পেছনে সারাদিন অক্লান্ত ছুটে যখন শিকারকে গুহা-কন্দরের আশ্রয়ে টেনে আনত, শারীরিক শ্রমে বিধ্বস্ত পুরুষের আর কিছু করার থাকত না। স্বভাবতই নারী বহন করত বণ্টনের দায়িত্ব। ক্ষুধার্ত পুরুষ, শিশু এবং বৃদ্ধদের মুখে এগিয়ে দিতে হতো খাদ্য। আদিম সমাজে নারীদের এই ভূমিকার মধ্যেই সুপ্ত ছিল ভবিষ্যতের গৃহিণী-রূপ।

স্বভাবতই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের দিনগুলিতে যখন শিকার সম্ভব হবে না, গুহা কন্দরে আটকে থাকতে হবে বহুদিন, তখন ক্ষুধার্ত শিশু, বৃদ্ধ, পুরুষদের খাদ্যের আয়োজন করতে হবে নারীদেরই। এই দায়িত্ববোধ থেকেই নারীরাও সঞ্চয়ী হয়েছিল। ফলমূল, শিকড়-বাকড় সংগ্রহ করে সবার ক্ষুধার্ত দৃষ্টির অলক্ষ্যে দুর্দিনের জন্য সেই খাদ্য সঞ্চয় কর রাখতো মাটির গর্তে।

আজও মায়েরা মাটির ভাঁড়ে অর্থ সঞ্চয় করেন। সেই সঞ্চয় নিজেদের শাড়ি গয়না কেনার জন্যে নয়, যখন অনটনে পীড়িত হবে সংসার, অনাহারে ধুকবে স্বামী এবং সন্ততির, হঠাৎ অসুখে প্রয়োজন হবে চিকিৎসার, ভবিষ্যৎ সেই দুর্দিনে মাটির ভাঁড়ের সঞ্চিত অর্থ সংসারের প্রয়োজনে খরচ হবে। এখানেও সঞ্চয় ব্যক্তি-স্বার্থে নয়, পারিবারিক স্বার্থে। এবং এখানেও নারীরা সঞ্চয়ী, পুরুষেরা নয়।

আদিম সমাজে নারীদের মাটির নিচে ফলমূল লুকিয়ে রাখার অচেতন স্মৃতিই আজকের মর্তের মায়েদের লক্ষ্মীর রূপিণী বা ভাঁড়ের মধ্যে সুপ্ত আছে।

অভাবের তাড়নায় যখন লুকিয়ে রাখা ফলমূল প্রয়োজন হয়েছে, তখন লুকানো মাটির গর্ত থেকে তুলে আনতে গিয়ে আদিম সমাজের নারীরা বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়েছিলেন এক বিস্ময়কর দৃশ্যে। যেখানে গর্ত খুঁড়ে রাখা হয়েছিল ফলমূল-শিকড় বাকড়, সেখানে মাটি ফুঁড়ে মাথা তুলেছে অঙ্কুর।

তাহলে অরণ্যের গাছ গাছালির নিচে ঘুরে ঘুরে যে ফলমূল সংগ্রহ হয়, তাকে যদি মাটির তলায় গর্ত খুঁড়ে রাখা যায় তবে সেই ফল থেকে মাথা তুলবে আরও অসংখ্য ফলের সম্ভাবনাময় বৃক্ষের মহাঅঙ্কুর। গাছের চারা পুঁতে আরও অসংখ্য গাছ উৎপন্ন করার কৃষিকাজের রহস্য এই ভাবেই মাথায় এসেছিল আদিম সমাজের নারীদের। এই আবিষ্কারই দেশে দেশে নারীদের শস্যের দেবী হিসাবে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিল। সন্তান ধারণ এবং শস্য আবিষ্কারের জন্যই সমগ্র আদিম সমাজের কৃতজ্ঞতাবোধ প্রকাশ পেয়েছিল। নারীদের শস্য ও সমৃদ্ধির দেবী-কল্পনায়।

দীর্ঘ কথনে শ্রান্ত দেবী শোচনা ক্ষণিকের জন্য থামলেন। নারীত্বের মহিমান্বিত অতীতে সম্মোহিত সীতা অঈর্ষ্য হয়ে ওঠেন এই বিরতিতে। দেবী শোচনা লক্ষ করেন এই অসহিষ্ণুতা। মৃদু হেসে বলেন—একারণেই পৃথিবীর প্রাচীনতম কোনো

ধর্মে শস্যের কোন দেবতা নেই। ফসল আর ঐশ্বর্য কামনায় সব ধর্মেই মানুষের ঈশ্বর-কল্পনার কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করেছেন একজন দেবী। কোন পুরুষ দেবতা নন।

চার

মর্তে এখনও দেবী লক্ষ্মীর আবাহন হয় কৃষকের ঘরে। কোজাগরী পূজা। ফসলের প্রাচুর্য কামনায় এক সুন্দর প্রতীক পাওয়া যাবে এই অনুষ্ঠানের মধ্যে। কোজাগরী মানে—কো-জাগতী। কে জাগে? বীজ রোপণ থেকে ফসল পাকার সময় পর্যন্ত যে নিরলস শ্রমে ফসলের মাঠ সোনালি হয়ে ওঠে, সেই পরিশ্রমে, সতর্কতায়, অতদ্রুত প্রহরায় ক্ষান্তি দিওনা।

আর কটা দিন রাত জাগো। পরিশ্রমের এই শেষ প্রহরেই ক্লান্তি নামে, তন্দ্রা এসে আচ্ছন্ন করে দেয়। পরগাছা ও তঙ্করেরা ফসল তোলার এই সময়েরই প্রতীক্ষায় থাকে। রাতের অন্ধকারে ফসল কেটে সর্বস্বান্ত করে কৃষককে। পাকা ফসলের গন্ধে মাতাল হয়ে ওঠে জন্তুরা। সুতরাং আর কটা রাত জেগে থাক, পাহারা দাও ক্ষেতের সীমানায়। মাঠের ফসল ঘরে তোলো, তারপর বিশ্রাম। নবান্ন উৎসব।

কো জাগতী? যে জাগে তারই গোলায় ওঠে স্তম্ভাভ শস্য। এই সতর্কতা ঘোষিত হয় কোজাগরী লক্ষ্মী পূজায়। এই পূজার প্রতিটি অনুষ্ঠানই অপূর্ব প্রতীকীতে বিন্যস্ত। পূর্ণিমায় প্লাবিত জোৎস্নায় স্বচ্ছন্দ পাহারাদারি। এমন কি দেবী লক্ষ্মীর বাহনটিও নৈশ প্রহরার পরিপ্রেক্ষিতে কী সামঞ্জস্যপূর্ণ। নিশাচর পেঁচা ছাড়া আর কেই বা হতে পারে কোজাগরী লক্ষ্মীর বাহন!

মানুষের বেঁচে থাকার সংগ্রাম যতই এগিয়েছে পুরুষের সামাজিক শ্রম ততই হয়ে উঠেছে দক্ষ। উন্নত হয়েছে হাতিয়ার। এর জোরেই পুরুষ সামাজিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত উৎপাদন করতে পেরেছে। উদ্বৃত্ত সম্পদ পরিণত হয়েছে সম্পত্তিতে।

অন্যদিকে নারীদের গার্হস্থ্য শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়নি। এভাবে নারীর শ্রমের ওপরে আধিপত্য বিস্তার করেছে পুরুষের সামাজিক শ্রম। এই পরিবর্তন প্রভাবিত করেছে নরনারীর অবাধ সম্পর্ককেও। ধীরে ধীরে অবাধ মেলামেশার পরিবর্তে এসেছে এক বিবাহ প্রথা। এসেছে সম্পত্তির উত্তরাধিকার নির্বাচনের প্রশ্ন। নারীসমাজের ওপরে পুরুষের আধিপত্যের কাল।

ধর্মাচরণের ক্ষেত্রেও এই পরিবর্তন স্বাভাবিক ভাবেই ছায়া ফেলেছে। মাতৃমূর্তির পাশাপাশি এসেছে পুরুষদেবতার কল্পনা। ধীরে ধীরে ভেঙে গেছে জননী-কেন্দ্রীক সমাজের কাঠামো। ক্ষয়ে গেছে নারীদের সামাজিক মহিমাম্বিত অবস্থান। এই ভাবেই

মাতৃসত্তার গৌরবজনক অবস্থানকে পেছনে ঠেলে স্থান দখল করেছে পিতৃসত্তা।

এই অসম্মান, পরাজয় আর অবনমনের সামাজিক প্রক্রিয়া অনিবার্যভাবে প্রতিফলিত হয়েছে মানুষের দৈব কল্পনায়। শুরু হল পুরুষের একটানা আধিপত্যের যুগ। সামাজিক বৈষম্য দেবতাদের রাজ্যেও মাতৃসত্তাকে করলো অপমানিত। পিতৃপ্রধান সমাজের হাতে নারীদের সমস্ত অপমান জলছবির মত ফুটে উঠল দৈবশক্তির কল্পনাতে।

একটা দীর্ঘ পটভূমি রচিত হল। গৌরব থেকে লজ্জা, সম্মান থেকে অপমানের দীর্ঘ পথ পরিক্রমার রূপরেখাটি দেবী শোচনার নির্মোহ কথকতায় প্রাঞ্জল হয়ে উঠল অভিমানিনী সীতার মানসপটে।

ব্যথাতুর কণ্ঠে দেবী শোচনা সীতাকে বললেন—মা সীতা, এই মোহময় স্বর্গোদ্যানে আসলে আমরা সকলেই দুঃখের দেবী। নিপীড়ন আর লাঞ্ছনার ঈশ্বরী। রাজদুহিতা হিসাবে মর্তে তুমি ব্রাহ্মণদের কন্মুকণ্ঠে বেদপাঠ শুনেছ। শুনেছ শাস্ত্র, শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ আলোচনা।

পশুচারণজীবী আর্যদের ঋক্বেদে তুমি পুরুষ দেবতাদেরই শুধু আধিপত্য দেখতে পাবে। ইন্দ্র, বরুণ পৃষা, সোম প্রমুখ দেবতাদের পাশে মনে রাখার মত কোন নারীচরিত্র পাবে না। এই সব প্রবল পরাক্রমশালী দেবতাদের পাশে স্মরণে থাকার মত একমাত্র দেবী-নারী হলেন উষা। যদিও উষা ছিলেন আর্যপূর্ব কৃষিভিত্তিক সিদ্ধু সভ্যতার মহামাতৃকা দেবী। কৃষি উৎসবের তাত্ত্বিক ধর্মাচরণে দেবী উষা, সিদ্ধু সভ্যতার কৌলিন্যে সর্বজন পূজিতা, হলেও কালভেদে ঋক্বেদে এই উষাই অপহৃত্য এবং ইন্দ্রকর্তৃক ধর্ষিতা হইল। সম্ভবত এই সব দৈব কাহিনী যাযাবর আর্যদের কাছে পরাভূত সিদ্ধুবালাদের লাঞ্ছনারই ইতিবৃত্ত।

সমাজ বিকাশের ধারা বেয়ে প্রতিটি পর্যায়ে নারী সম্পর্কে পিতৃতান্ত্রিক সমাজের দৃষ্টিভঙ্গী যেভাবে অধঃপতিত হয়েছে, পুরুষ-শাসিত দেবতাদের স্বর্গেও মাতৃদেবীরা সমান মাত্রায় নিপীড়নে, অপমানে ক্ষতবিক্ষত হয়েছেন।

দুর্গতিনাশিনী দেবী দুর্গার উপাখ্যান তো তুমি জানো। স্বর্গ থেকে বিতাড়িত দেবতাদের পুনর্বাসিত করার কাহিনীতে মহিষাসুর হত্যার মধ্য দিয়ে যতই মহিমাস্বিত করা হোক দেবী দুর্গাকে, অতি সুক্ষ্ম ভাবে যৌন বিকৃতির কুৎসিত ইঙ্গিত লুকানো আছে এই কাহিনীতেও। শৌর্যে বীর্যে পরাক্রান্ত মহিষাসুরের প্রতাপে স্বর্গ থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন দেবতারা। নির্বাসিত দেবতাদের সম্মিলিত কাপুরুষতা থেকে জন্ম নিলেন মহাদেবী দুর্গতিনাশিনী দুর্গা। যদিও পুরাণে কথিত আছে দেবতাদের সম্মিলিত তেজোরাশি থেকে জন্ম নিলেন তিনি। কিন্তু পরাভূত দেবতাদের তেজোরাশি তো মহিষাসুরের প্রবল পরাক্রমেই বাষ্পীভূত হয়ে গেছে, স্বভাবতই পরাভূত দেবতাদের সম্মিলিত কাপুরুষতা বললেই বাস্তবতার কাছাকাছি

হবে।

তো, দেবতাদের সম্মিলিত ক্রোধ মহিষাসুরকে পরাভূত করতে পারল না কেন? পুরাণে যাই থাক, কৃষি সভ্যতার স্থপতি অনার্যদের মেধা এবং কুশলতার কাছে যাযাবর আর্যরা ছিল অসহায়। তাদের ক্রোধে ছিল না সৃজনশীল শ্রমের সর্বগ্রাসী দহন, যা শত্রুজয়ের অমোঘ শক্তি হয়ে উঠতে পারে।

দুর্গাকে সমস্ত পুরুষদেবতাদের সম্মিলিত শক্তি এবং অস্ত্রে সুসজ্জিত করা হল। ইন্দ্র দিলেন বজ্র। বিষ্ণু দিলেন চক্র। দেবাদিদেব মহাদেব দিলেন ত্রিশূল। সমুদ্র দেবতা বরুণ বহুমূল্য রত্নরাজি আর স্বর্ণালঙ্কারে দেবী দুর্গার সর্বাঙ্গে দিলেন দুর্ভাগ্য সৌন্দর্য। মা সীতা, এ প্রশ্ন তোমার মনে কোনদিন আসেনি যে রণংগেই দুর্গাকে সুরাপূর্ণ পানপাত্র কেন দিল কুবের? দেবী দুর্গাকে মোহিনী রূপ দিল কে?

মোহিনী রূপ, যা মাতৃভাবে, মহাশক্তিকে মোহময়ী করে। প্রবল পরাক্রান্ত বীর্যবান সৃষ্টিশীলতাকে নিষ্ফলা যৌন কামনায় অস্থির করে, মুহূর্তের ভ্রান্তিতে টেনে নেয় স্বলনের পিচ্ছিল পরাজয়ের পথে। সেই মহাশক্তির রক্তমাংস অস্থিমজ্জার শরীরকে প্রাধান্য দিয়ে, যৌন প্ররোচনার ইঙ্গিতে তাঁকে সাজিয়ে তোলার প্রয়োজন কেন হয়? ঈশ্বরের রাজ্যেও নারীত্বের মহিমান্বিত বৈশিষ্ট্যগুলি এখানে প্রাধান্য পায় না। দেবীমাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠার নামে এখানেও তাঁকে সাজানো হয় ব্যভিচারী পুরুষ-শাসিত সমাজের লুক্কারিত দৃষ্টিতে।

অমল শৈশবে তুমি তো তোমার পিতামহীর কাছে সমুদ্র মছনের উপাখ্যান শুনেছ। ইন্দ্রকে দুর্বাসা দিয়েছিলেন পুষ্পমালা। ভোজন-রসিক হস্তী ঐরাবত তা মুহূর্তে মুখগহ্বরে নিক্ষেপ করে পরমহর্ষে চিবিয়ে ফেলেছিলেন। ক্রুদ্ধ দুর্বাসা সম্পদ আর শস্যের দেবী লক্ষ্মীকে সমুদ্রের গভীরে ডুব দিতে বলেছিলেন ইন্দ্রকে শ্রীহীন, ঐশ্বর্যহীন করতে! মন্দার পর্বত আর বাসুকী নাগের সাহায্যে দেবতা এবং অসুরদের সম্মিলিত মছন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে উঠে আসেন অমৃতকুণ্ড কাঁখে দেবী লক্ষ্মী। একই সাথে উঠে আসে সুতীত্র গরল। অমৃতকুণ্ডের দখল নিতে শুরু হয় ভয়ঙ্কর যুদ্ধ। যুদ্ধে পরাভূত হল দেবতারা। তখন নারায়ণ মোহিনী রূপ ধারণ করে দাঁড়ালেন বিজয়ী অসুরকুলের মুখোমুখি।

অস্ত্র হাতে পুনরাক্রমণের পরিবর্তে সালঙ্কারা মোহিনী যুবতী কেন? কেন বীররসের পরিবর্তে শৃঙ্গার রস? কেন সমুদ্র মছনে ক্লান্ত, ভয়ঙ্কর রণে বিজয়ী উন্মত্ত অসুরকুলের সামনে আদিরসের কদর্য প্রলোভন? মোহিনী কে? দেব-চিকিৎসক ধন্বন্তরীর কনিষ্ঠা ভগ্নী। বিভ্রমের দেবী। সম্মোহনের দেবী। তো, সেই অপরূপা মোহিনী নিজেই দায়িত্ব নেন অমৃত বণ্টনে। শর্ত একটাই; অসুরদের চোখ বুজে থাকতে হবে, ধৈর্যের এই পরীক্ষায় যে সবশেষে চোখ খুলবে, মোহিনী তারই দয়িতা হবেন। চক্ষুস্থান অসুরকুল মুহূর্তের লালসায় চোখ বন্ধ করে। এই অবসরে অমৃতকুণ্ড

নিয়ে সরে পড়েন বিভ্রমের দেবী মোহিনী। ঈশ্বরের রাজ্যেও কোন আবু নেই। একেবারে সরাসরি প্রস্তাবনা। এখানেও দেবী-নারীর যৌবন ধর্ষকামের টোপ হিসাবে ব্যবহৃত।

মা-সীতা, দুঃখ পেয়ো না। এক নিদারুণ লজ্জাজনক সত্য বলব তোমায়। দেবজ্ঞানে যে পতিকে তুমি পূজা করেছ আজন্মকাল, ত্রেতাযুগে তিনিই হলেন বিষ্ণুর অবতার।

বিষ্ণু অসংখ্য দার পরিগ্রহ করেছিলেন। তার মধ্যে অন্যতম ছিলেন তিনজন। গঙ্গা, সরস্বতী এবং লক্ষ্মী। শ্রোতস্বিনী নদী সমস্ত জঞ্জালকে, নিরন্তর বহমানতায় ভাসিয়ে নিয়ে যায়, দূষণমুক্ত করে প্রকৃতিকে। ব্যবহারিক এই বাস্তবতা থেকে পবিত্রতার প্রতীক হিসাবে দেবী গঙ্গা পূজিতা হন।

বুদ্ধিবৃত্তি এবং প্রজ্ঞার দেবী সরস্বতী। শস্য আর ঐশ্বর্যের দেবী লক্ষ্মী।

রূপেগুণে পবিত্রতায় গঙ্গা ও সরস্বতী মহিয়সী হলেও, দুজনের কেউই পতিদেবতাদের হৃদয়েশ্বরী হতে পারেননি। তিন সতীনের পারস্পরিক ঝগড়ার সুযোগ নিয়ে বিষ্ণু শিবের অঙ্কশায়িনী হতে দিলেন গঙ্গাকে। বিকৃত কামনায় অস্থির মহাবৃদ্ধ ব্রহ্মার হাতে তুলে দিলেন দেবী সরস্বতীকে। শুধু অর্থের দেবী লক্ষ্মী থাকলেন বিষ্ণুর হৃদয়েশ্বরী হয়ে।

সমাজ বিকাশের যে অধঃপতিত পর্যায়ে পুষ্টি-শাসক সামাজিক প্রতিষ্ঠা আর প্রতিপত্তির জন্য নারীকেও হস্তান্তরযোগ্য পণ্য বলে মনে করতে শুরু করেছিল, সামাজিক সেই কদর্য বাস্তবতাই প্রতিফলিত হয়েছে স্বর্গরাজ্যের কল্পনায়।

পাঁচ

অভিমানিনী সীতাকে এই প্রথম মনে হল মুক্তমোহ প্রবল মানবী। বেদনার চিহ্ন মাত্র নেই দৃষ্টিতে। কুমি-কীট পতঙ্গের মত অকিঞ্চিতকর মনে হল আপন সন্তানের জনককে। স্বল্পায়ু দাম্পত্য জীবনের স্মৃতিকে মনে হল মালিন্যে ভারাক্রান্ত। ধনুর্ধর এক প্রবল পুরুষের সুবাসিত স্মৃতিকে ঝেড়ে ফেলে উঠে দাঁড়ালেন পৃথিবীর প্রথম মানবীর মত আকাশচুম্বী অহংকারে। অশ্রু নির্গমনের সমস্ত রক্তপথ শুকিয়ে গেল প্রবল দহনে।

অন্তরীক্ষে কোন মাটি থাকে না। মাটি ছাড়া অধিকারের শিকড় গভীরে প্রোথিত হয় না। আমি মা-বসুন্ধরার গর্ভ থেকে পুনর্বীর উন্মিত হব মুক্তিকায়। রূপ, রস, গন্ধ, বর্ণ, শোক, তাপ আর দ্রোহী জীবনের অবিনাশী কোলাহলেই আমি খুঁজে নেব বেঁচে থাকার সার্থকতা। দেবী শোচনার কথাগুলিই পুনর্বীর উচ্চারিত হল সীতার স্বগতোক্তি। গভীরতম বিশ্বাস এবং বাৎসল্যে দেবী শোচনা সীতাকে এগিয়ে দিলেন পৃথিবীর দিকে।

মানুষের ধর্ম—মানবতা

সুমিত্রা পদ্মনাভন

ধর্ম নিয়ে আমি একটা খুব সহজ লেখা লিখতে চাই, যেটা সবাই পড়ে বুঝতে পারবে। ধর্ম যেহেতু সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষকেই প্রভাবিত করে, তাই ধর্মকে একটা কঠিন গবেষণার বিষয় হিসাবে বোধহয় সবসময় দেখা উচিত নয়। জন্ম, মৃত্যু বা ভালোবাসার মত বিশ্বজনীন এবং সর্বজনগ্রাহ্য বিষয় হিসাবেই দেখা উচিত। দেখানোও উচিত।

কিন্তু সবসময় তে তা হয় না। আমরা প্রায়শই দেখি ধর্মবিষয়ক আলোচনা হয় কিছুটা গবেষণামূলক, কিছুটা উপদেশমূলক। তার ভাষাও হয় সাধারণের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। এই দুর্বোধ্যতাই ধর্মতত্ত্বকে সাধারণের চোখে mystic করে তোলে। ধর্মগুরুদের করে দেয় Superman-মস্ত্রোচ্চারণের আলো-আঁধারি যে ধর্মীয় বাতাবরণ তৈরি করে, তাতে সাধারণ মানুষের মনে যে ভয়-ভক্তির সঞ্চার হয়, তার অনেকটাই না বোঝার কারণে। অর্থাৎ একটা বিষয়কে ভালো করে জানি না, বুঝি না বলেই সেটাকে ভক্তি করি—সেটাতে আকৃষ্ট হই। এই যে উল্টো কারণে আকৃষ্ট হওয়া এটাতেই যুক্তিবাদী আধুনিক মানুষের আপত্তি। এখানেই বিজ্ঞানের সঙ্গে ভক্তিবাদের বিরোধ। একটা সহজ উদাহরণ দিই : একেকটা পূজোর প্রচলিত সংস্কৃত মন্ত্র যদি সোজা বাংলায় অনুবাদ করে গড় গড় করে পড়ে যাওয়া যায়—তাহলেই তার সব রহস্যময়তা ঘুচে যাবে। তখন তার আকর্ষণও কমে যেতে বাধ্য। অনেক সময় কিছুটা হাস্যকর ও অপ্রাসঙ্গিকও মনে হতে পারে। আবার তার মধ্যে কিছু চিরন্তন সত্যও পাওয়া যেতে পারে। আর সেটা জেনে বেছে নেওয়ার জন্যেই দরকার আগে বুঝে নেওয়া। প্রচলিত প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের অপ্রয়োজনীয় বাহ্যিক রীতিনীতিকে বাদ দিতে হলে তাই প্রথমে ধর্ম কী ও কেন এটা সহজ ভাবে বুঝতে হবে। এখানে আমি ধরে নিচ্ছি আমরা সবাই বর্তমান সামাজিক অবস্থায় প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের যে ভূমিকা তাতে খুশি তো নই-ই—বরং অবশ্যই কিছু পরিবর্তন ও বিকল্প চাইছি। চাইছি মানবিকতা। চাইছি যুক্তিবোধ, ন্যায়বিচার।

প্রথমে দেখা যাক ধর্ম কথাটার অর্থ কী? চলন্তিকা বাংলা অভিধানে এর মানে করা হয়েছে সংকর্ম, সদাচার পুণ্যকর্ম, কর্তব্যকর্ম, সমাজ হিতকর বিধি।

আরেকটি অর্থ হ'ল—পরম্পরাগত সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান, উপাসনা পদ্ধতি, সংস্কার রীতিনীতি এবং ঈশ্বর পরকাল ইত্যাদি বিষয়ক মতামত।

তৃতীয়া অর্থে বস্তু বা ব্যক্তি নির্বিশেষে—স্বভাব, গুণ বা শক্তি।

এই শেষ সংজ্ঞাটি বস্তুর ওপর যেভাবে প্রযোজ্য অর্থাৎ পদার্থের ধর্ম, আত্মার ধর্ম, ওরল বা মৌলিক পদার্থের ধর্ম, সেই অর্থে মানুষের ওপর প্রয়োগ করলে পাই মানুষের বিশেষ স্বভাব বা গুণ। যদিও আমরা জানি মানুষের গুণের বদলে মেলা দোষও থাকতে পারে—আমরা তাকে ধর্ম বলবো না। ধর্ম বলবো সেই সব বিশেষত্বকে যা আদর্শ মানুষের গুণাবলী, যা মানুষকে সভ্যতার পথে এতদূর এগিয়ে নিয়ে এসেছে—মানুষকে মানুষ করেছে। অর্থাৎ প্রথম সংজ্ঞা অনুযায়ী সংকর্ম, সদাচার, কর্তব্যকর্ম সমাজহিতকারিতা ইত্যাদি।

ধর্মের এই বিস্তৃত সংজ্ঞা থেকে এসেছে দ্বিতীয় সংজ্ঞা, যাকে আমরা বলতে পারি ধর্মের সংকীর্ণ সংজ্ঞা। সংকীর্ণ, কারণ এটা স্থান কাল ভেদে পাল্টেছে, পাল্টেছে। বিভিন্ন ধর্মের উপাসনাপদ্ধতি আচার অনুষ্ঠান কতটা আলাদা তা তো আমরা জানি, ঈশ্বর সম্পর্কে মতও হরেকরকম। বৌদ্ধ ধর্মে ঈশ্বর নেই। হিন্দুদের আছে তেত্রিশ কোটি দেবতা আর ব্রাহ্মধর্মে পরমপিতা হচ্ছেন নিরাকার। তাহলে এই দ্বিতীয় সংজ্ঞা থেকেই আমরা পাচ্ছি বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের রূপগুলি। অথচ সমাজহিতকর পুণ্যকর্ম বা কর্তব্যকর্ম সংজ্ঞাটি কিন্তু বিশ্বজনীন রূপ নিতে পারতো—হতে পারতো সকলের জন্য এক ধর্ম। কিন্তু তা তো হয়নি। স্থান কাল ভেদে আচার অনুষ্ঠান পরম্পরাগত বিশ্বাস পাল্টে গেছে। কারণ প্রতিটি আলাদা গোষ্ঠীপতি বা গ্রামের মোড়ল যেমন তার নিজের মত করে নিয়মাবলী তৈরি করে, ধর্মের প্রবর্তকরাও তাই করেছে। প্রতিষ্ঠাতার রচনায় ও প্রচারেই পৃথক পৃথক রূপ নিল প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মগুলো। আর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতে সচেতন হল ধর্মের মোড়লরা ও তাদের অনুসরণকারীরা তাদের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখতে। প্রতিটি ধর্মগুরু তাই আজও সর্বধর্ম সমন্বয়ের কথা ও উদার প্রগতিবাদী কথার ফাঁকে ফাঁকে নিজের ধর্মমতটির শ্রেষ্ঠত্বের কথা মনে করিয়ে দিতে ভোলেন না। অনুগামীরা ক্রমশই ভুলে যেতে থাকলো ধর্মের আসল সমাজহিতকর উদ্দেশ্য। প্রকট হতে থাকলো আচার বিচার প্রকরণ পদ্ধতি। মাঝে মাঝে প্রতীকী সমাজসেবা করে পুণ্যার্জন করার মধ্যে আবদ্ধ রইল তাদের সদাচার। বাড়তে লাগল বিভেদ। শুরু হল মৌলবাদীদের তাণ্ডব বিশ্বজুড়ে। মৌলবাদীরা তো ধার্মিকই। অতিমাত্রায় ধার্মিক।

এখন আর পৃথিবী পরম্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন ছোট ছোট গোষ্ঠীতে বিভক্ত নয়। এখন তাই আলাদা আলাদা নিয়মকানুনগুলো সমন্বয়ের চেয়ে বেশি সংঘর্ষের কারণ হয়ে উঠেছে স্বাভাবিকভাবেই।

শিক্ষিত মহলের একটা প্রিয় উক্তি হচ্ছে—“কেন? সব ধর্মেই তো ভালবাসার কথা, সহনশীলতার কথা বলা হয়েছে—তাহলে ধর্ম কি দোষ করল? থাক না প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মগুলো মিলে মিশে।” তারপর একটু গভীরে গেলেই উদারতার মুখোশ ছিঁড়ে বেরিয়ে আসে আসল চেহারা। তখন দেখা যায় প্রতিটি তথাকথিত

ধার্মিক মানুষই কী মমতায় আঁকড়ে থাকে বাপ ঠাকুরদার ধর্মটিকে, কী সযত্নে এড়িয়ে যায় বা ভুলে যায় জন্মসূত্রে পাওয়া ধর্মটির দোষত্রুটিগুলোকে। কী খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বিশ্লেষণ করে পরধর্মের ত্রুটি বা ভ্রান্তবিশ্বাসকে। ভুলে যায় তার ধর্মটি সে নেহাতই উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছে—দেখে শুনে বেছে নেয়নি। তাই শ্রেষ্ঠ বলে গর্ব করা সাজে না।

অর্থাৎ বিরোধ যত তা সবই মূলত আচার-অনুষ্ঠান, উপাসনা পদ্ধতি, ঈশ্বর সম্পর্কিত মতামত—এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। মিল যেখানে তা হল—ন্যায়াবোধ কর্তব্যকর্ম, সংগুণ, সমাজকল্যাণ ইত্যাদি বিষয়ে। তাহলে আজ এই বিজ্ঞানের যুগে দাঁড়িয়ে আমরা কেন ভুলে যাবো ধর্মের আসল উদ্দেশ্য? কেন আচার-অনুষ্ঠান, বাহ্যিক পদ্ধতি প্রকরণকে ছেঁটে ফেলতে পারবো না? কেন মেনে নেব না মানবিক গুণকেই ধর্ম বলে?

নিশ্চয়ই পারবো। পুরনো ধর্মগ্রন্থ বা ধর্মগুরুদের আদেশকে অশ্রান্ত বলে মেনে না নিলেই পারবো। সমাজবিজ্ঞান, প্রকৃতিবিজ্ঞানে যা পরীক্ষিত সত্য তা নিয়ে খোলা মনে পড়াশোনা করে নিলেই পারবো ন্যায় অনায়েব, ঠিক ভুলের বিচার করতে। বেরিয়ে আসতে পারবো ভয় ও অজ্ঞতাজনিত অন্ধভক্তির গণ্ডি থেকে। তখন আর মস্তকে যাদুশক্তি বলে ভুল হবে না, কষ্টকর অমানবিক আচার বিচারকে আদর্শ ধর্মাচরণ বলে ভুল হবে না। সত্যকে এড়িয়ে না গিয়ে তাকে জানার চেষ্টাই সঠিক ধর্মাচরণ। এই জানার চেষ্টাই মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। মানবধর্ম।

১৯৮১ সালের জেনারেল অ্যাসেমব্লিতে রাষ্ট্রসংঘ ঘোষণা করেছে—“প্রতিটি মানুষের স্বাধীনতা আছে ব্যক্তিগতভাবে বা সংঘবদ্ধভাবে নিজের পছন্দমত বিশ্বাস বা ধর্মকে অনুসরণ করার।” অর্থাৎ একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ নিজের পছন্দমত ধর্মমত বা বিশ্বাস গ্রহণ করতেই পারেন। পিতা-মাতার ধর্মকেই মেনে নিতে হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। অথচ অনেকেই এই সহজ কথাটা জানেন না। সেই ছোটবেলায় চাপিয়ে দেওয়া, না বুঝে মস্তোচ্চারণ করা, ভয়-ভক্তি মেশানো ধর্মের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে আসাকে তাই অনেকেই এখনও মনে করেন অসম্ভব বা অন্যায়।

প্রথম মানবধর্ম সমাজ অবশ্য প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯২৯ সালে নিউ ইয়র্কে। অর্থাৎ রাষ্ট্রসংঘের অধিকার ঘোষণার অনেক আগে। তাই মানবধর্মীরা তখন ধর্মগোষ্ঠী হিসাবে স্বীকৃতি পান নি। কিন্তু আজ, UNO-র ধারা অনুযায়ী স্বীকৃতি না পাওয়ার কোনো কারণ নেই। ১৯২৯ এ পাশ্চাত্যে ‘Humanism’ নামে যে নতুন পন্থার জন্ম হয়েছিল সেটা ছিল ইহুদী-খ্রীস্টান কটর পন্থীদের অবিরাম সংঘর্ষের একটা ফলস্বরূপ। তখনকার অনেক গণ্যমান্যরাই ছিলেন এই দলে। প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে ছিলেন একজন ইহুদী (জন্মসূত্রে) ধর্মযাজক ও কয়েকজন একেশ্বরবাদী পাদ্রী। তখনকার সমাজে সমস্ত ব্যাপারে ধর্মীয় ধ্বজাধারীদের খবরদারীর অবশ্যান্তাবী প্রতিক্রিয়া হিসেবেই এই নতুন আদর্শ, নতুন জীবনদর্শন উঠে এসেছিল। এরা

মানবধর্মকে অন্য সমস্ত প্রচলিত ধর্মের বিকল্প হিসাবে চেয়েছিলেন। এদের উপদেষ্টামণ্ডলীতে ছিলেন Albert Einstein, Will Durant, Thomas Mann, Julian Huxley ইত্যাদি জ্ঞানী গুণী বোদ্ধারা। এদের পথপ্রদর্শক ছিল আধুনিক প্রকৃতিবিজ্ঞান। এদের আস্থা ছিল, প্রত্যয় ছিল। ছিল না অন্ধবিশ্বাস। এদের আস্থা ছিল গণতন্ত্রে, বিজ্ঞানে, সব মানুষের সমান অধিকারে। সেযুগে ধর্ম হিসাবে এরা স্বীকৃতি পান নি।

এখন এই ধর্মীয় স্বাধীনতার যুগে অনেক বিশ্বাস যা Cult বা ধর্মীয় গোষ্ঠী হিসাবে উঠে এসেছে, তারা আলাদা স্বীকৃতি চাইছেন। যেমন রামকৃষ্ণভক্তরা 'Ramkrishnaite' হিসাবে আলাদা ধর্মীয় স্বীকৃতি চাইছিলেন বেশ কিছু বছর ধরেই কিন্তু তাঁরা মূলত হিন্দু বলেই তাঁদের এই আবেদন বাতিল করে দেয় সরকার।

অবাক লেগেছিল যখন একজন সফল আবেদনকারীর চাকরিতে ঢোকা নাকচ হয়ে যায় শুধু 'ধর্ম' কলামে 'মানবতাবাদ' লেখার জন্য। যেন মানবিক হওয়াটা খুব গর্হিত কিছু ব্যাপার। সেটা ১৯৯২-৯৩ সাল। তখন যুক্তিবাদী আন্দোলন তুঙ্গে। পশ্চিমবঙ্গের ছেলেমেয়েরা আবেদনপত্রে 'ধর্ম' কলাম তুলে দেওয়ার দাবি জানাচ্ছে। 'ধর্ম' যেহেতু ব্যক্তিগত ব্যাপার ধর্মনিরপেক্ষ দেশে ধর্মীয় পরিচয় জানানো জরুরি নয়। যারা কোনো ধর্মই মানে না তারা কলামটা খালি রাখতে চাইলেও আপত্তি উঠেছে নানা জায়গায়। Form বাতিল করা হয়েছে 'incomplete' বলে। সেই সময় বহু মানুষ দ্বারস্থ হয় মানবতাবাদী সমিতির। এই সময় প্রথম এই সমিতি Humanists' Association of India সক্রিয় হয় মানবতাকে ধর্ম হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে। দেশের রাজনৈতিক নেতাদের কাছে ও সংবাদপত্রের দপ্তরে যোগাযোগ করে ঘটনাটি জানানো হয়। যাতে একজন মানুষ নিজের ধর্ম 'মানবতা' বলতে পারে তার জন্য সরকারি কোনও নিয়মাবলী বা guideline আছে কিনা তা স্পষ্টভাবে জানতে চাওয়া হয়। উত্তরে রামকৃষ্ণ মিশনের ঘটনার উল্লেখ করে সবাই বলেন যে এভাবে নতুন আলাদা ধর্ম তৈরি করা সম্ভব নয়।

তারপর মানবতাবাদী সমিতি সরাসরি চিঠি পাঠায় রাষ্ট্রসংঘের অফিসে। উত্তর আসে দেরি না করেই। UNO তাদের Human Rights এবং Religious Rights সংক্রান্ত যাবতীয় বই ও কাগজপত্র পাঠিয়ে স্পষ্ট জানিয়ে দেয়—“১৯৮১”-র জেনারেল অ্যাসেম্বলিতে রাষ্ট্রসংঘ ঘোষণা করেছে প্রতিটি মানুষের যে কোনো ধর্মমত গ্রহণ করার ও চর্চা করার স্বাধীন অধিকার আছে।

তারপরই এই আইনী লড়াইতে যৌথভাবে নেমে পড়ে মানবতাবাদী সমিতি ও যুক্তিবাদী সমিতি। রাষ্ট্রসংঘকে চিঠি দিয়ে জানানো হয় যে ভারত UNO-র সদস্য দেশের অন্যতম হওয়া সত্ত্বেও প্রচলিত ধর্মের বাইরে অন্য ধর্মকে এখানে স্বীকৃতি দেওয়া হয় না। Humanism-কেও ধর্ম বলে স্বীকার করা হয় না। কিন্তু যেহেতু UNO তার Guideline পাঠিয়ে দিয়েছে, আমরা UNO অন্তর্গত দেশ হিসাবে মনে

করি মানবতা আমাদের ধর্ম হতে কোনো বাধা নেই। এবং আইনীভাবে এই ধর্মমতকে গ্রহণ করার অধিকার আমরা প্রতিষ্ঠা করবো। এই চিঠির প্রতিলিপি পাঠানো হয় রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, আইনমন্ত্রী, সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী ও পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও বিদেশী দূতাবাসগুলিতেও। তারপর ভারতের মানবতাবাদী সমিতির সহায়তায় কোর্টে গিয়ে affidavit করে দলে দলে ছেলেমেয়ে Humanism কে ধর্ম হিসাবে গ্রহণ করে। (১৯৯৩ এর ১০ ডিসেম্বর।)

১৯৯৩ এর ১০ ডিসেম্বর 'বিশ্ব মানবাধিকার দিবসে' প্রথম ৫৪ জন সদস্য-সদস্যা আইনীভাবে Humanist হন। এই কঠিন লড়াইটা জেতার পর এখন আর কোনো বাধা নেই—যে কোনো রাষ্ট্রসংঘের সদস্য দেশে এই একইভাবে যে কেউ প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে আসতে পারেন। আইনী কাগজে Humanist ঘোষিত হওয়ার পর তাকে অস্বীকার করার অর্থ কোর্টের অবমাননা করা। তারপর Humanist দের কার্যকলাপ শাখা বিস্তার করেছে নানাভাবে। বিভিন্ন বিজ্ঞান ক্লাব ও সাংস্কৃতিক সংস্থা স্বাধীনভাবে মানবতাবাদী আন্দোলন গড়ে তুলছেন। মানবতাবাদীদের সংখ্যা এখন আর কম নেই। তাঁরা যেহেতু প্রচলিত ধর্মীয় রীতিনীতি মানেন না, 'মরণোত্তর দেহদান' কর্মসূচি তাঁরাই এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। মৃত্যুর পর দেহটাকে প্রচলিত প্রথায় সৎকার না করে চিকিৎসাবিজ্ঞানের ব্যবহারে কাজে লাগানোর জন্য স্বাক্ষর সংগ্রহ করছেন স্মৃতিদপ্তরের নিয়মমত।

তবু এখনও লক্ষ মানুষ আছেন যাঁরা এই আন্দোলন থেকে শতযোজন দূরে। অনেকে আছেন যাঁরা এতসব জানার প্রয়োজন মনে করেন এই প্রচলিত ধর্মকে বাদ দেওয়াটা এখনও সম্ভবপর নয়। চেষ্টা করাটাই সময়ের অপচয়। মানবতাবাদী আন্দোলনের সাফল্যই তাঁদের প্রশংসার জবাব। অনেক শুভানুধ্যায়ী আছেন যাঁরা মনেপ্রাণে সত্যিকারের মানবতাবাদী কিন্তু খাতায় কলমে মানবধর্মী হননি। হয়ত তাঁদের কিছু দ্বিধা আছে। হয়ত আত্মীয় বন্ধুদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবেন মনে করে এগিয়ে আসতে সংকোচ বোধ করছেন। এরকম মানুষদের কাছ থেকে দুটো সুচিন্তিত মতামত বা প্রশ্ন পেয়েছি যেগুলোর উত্তর দেওয়াটা জরুরি। এত ধর্ম থাকতে আবার একটা নতুন ধর্ম 'মানবধর্ম'? তাহলে আবার বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবো না তো? মানবিক হতে হলে আবার কাগজে সই করতে হবে কেন?

আবার একটা নতুন ধর্ম কেন?

এর উত্তরে একটা কথা বুঝতে হবে, প্রথম যারা মানবতাবাদী হয়েছেন— তারা সবাই জন্মসূত্রে কোনো প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মাবলম্বী ছিলেন। কিন্তু সেই উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া ধর্মটিকে তাঁরা ত্যাগ করেছেন। যতটা নিরপেক্ষতা তাঁদের আছে পিতা-মাতার ধর্মের প্রতি ততটাই নিরপেক্ষতা আছে অন্যান্য সব ধর্মের প্রতি তাই তাঁরা

বিচার করে নির্দিষ্টায়, পক্ষপাতহীনভাবে। তারা কিন্তু কেউ সমাজবিচ্ছিন্ন নন। প্রত্যেক ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে ছড়িয়ে আছেন এমন মানুষ—যাঁরা প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের ত্রুটি ও দিবাগুণ্ডলোর সঠিক নিরপেক্ষ বিচার করেন নির্দিষ্টায়। নাকচ করেন হাসিমুখে। অসততা বা ভণ্ডামির গন্ধ পেলে বাতিল করেন সহজেই। এমন নিরপেক্ষ সংসারী মানুষেরা সর্বত্রই আছেন। তারা আত্মীয়-বন্ধু পরিবৃত হয়েই আছেন। তাঁরা শারদীয় উৎসবে আনন্দ করেন, অঞ্জলি দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেন না। ঈদের উৎসবে খাওয়া দাওয়া করেন, কোরবানির ধার ধারেন না। পাহাড়ের সৌন্দর্য দেখতে কেদারনাথের পথে পাড়ি দেন, মন্দিরে পূজা দেন না। তাঁরা কেউ আলাদা হননি। তাঁরা নিজেদের পরিচয় দেন মানবতাবাদী, যুক্তিবাদী, ধর্মনিরপেক্ষ বলে। তাঁরা প্রভাবিত করেন বন্ধুদের। নিজেরা বর্জন করেন সমস্তরকম অর্থহীন আচার-অনুষ্ঠানকে। ধর্মপরিচয় বহনকারী নাম পদবী পোশাক বা স্টাইল বর্জন করেন। এদের অনেকেই পদবী ত্যাগ করেছেন, বিয়ে করেছেন Special Marriage Act মেনে, মেয়েরা বিয়ের পরও স্বামীর পদবী নেননি, স্টাইল করেন নিজের রুচি অনুযায়ী তবে কোথাও কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। মানবতাবাদী হতে গেলে কোনো কঠিন পরীক্ষা নিতে হয় না, দীক্ষা দিতে হয় না, কোনও বিশেষ পুস্তক বা ধর্মগুরু প্রতি আনুগত্য দেখাতে হয় না। কাজটা তাই খুব কঠিন নয়। শুধু চাই মানসিক দৃঢ়তা, সোচ্চার ঘোষণা—‘আমি মানবতায় বিশ্বাসী। কোনও প্রচলিত ধর্ম মানি না।

এই ‘মানি না’ বলাটা সকলের পক্ষে সহজ হয় না। কারণ মেনে চলারাই দলে ভারী—তারা সংগঠিত। তাই মানবতাবাদীদেরও সংগঠিত হওয়ার সময় এসেছে। যাঁরা প্রতিকূল পরিবেশে একা লড়ছেন, তাদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতেই এই সংগঠিত আন্দোলন আজ দরকার বাঁধছে। তাঁদেরকে শুধু ‘নাস্তিক’ পরিচয় আশ্রয় দিতে পারে না। তাই যতদিন না ধর্ম-পরিচয় অবাস্তব বা অপ্রয়োজনীয় বলে স্বীকৃত হচ্ছে—ততদিন বিকল্প হিসাবে মানবতাই শ্রেষ্ঠ ধর্মমত। সমস্ত বঞ্চিত মানুষদের পাশে দাঁড়াতে, সমাজে মানুষের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে এই মানবতাবাদীদেরই একজোট হতে হবে। হয়ত অদূর ভবিষ্যতে দেখা যাবে সমস্ত পৃথিবীতে যত মানবতাবাদী ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে—তারা সম্মিলিত ভাবে অন্য সব ধর্মাবলম্বীদের ছাড়িয়ে যাচ্ছে। যেদিন পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ যুক্তিবাদী ও মানবতাবাদী হয়ে উঠবেন—সেদিন আর প্রয়োজন হবে না সংগঠন গড়ার বা সই করে ‘মনুষ্যধর্মাবলম্বী’ হওয়ার।

দ্বিতীয় প্রশ্নটি হচ্ছে—ধর্মকে ঘিরেই আমাদের যত উৎসব, শিল্প, সংস্কৃতি, আনন্দানুষ্ঠান। প্রচলিত ধর্মকে বাদ দিয়ে কী করে হবে উৎসব? ছুটি হবে কী উপলক্ষে? একেবারে যান্ত্রিক হয়ে যাবে যে সমাজজীবন!

এখন দেখা যাক ধর্মাচরণকে বাদ দিয়ে কী কী উৎসব-অনুষ্ঠান পালন করা যায়?

রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিশ্বভারতীতে তো আজীবন চেষ্টা চালিয়ে গেলেন প্রচলিত মূর্তিপূজা আচার-বিচার বাদ দিয়ে কী ভাবে উৎসবে মাতিয়ে রাখা যায় আশ্রমিকদের। আজকের মানবতাবাদীদেরও তাই বারো মাসে তেরো পার্বণ না থাকলেও চোদ্দরকম কর্মসূচি থেকেই যায়। মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটতে দেখলেই ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়, তাছাড়া সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বিজ্ঞান মেলা রক্তদান-চক্ষুদান-দেহদান শিবির তো আছেই বছরের যে কোনও সময়ে।

সত্যিই কি ধর্ম ছাড়া অনুষ্ঠান হয় না? ছুটি হয় না?

ভেবে দেখুন তো? শিশুর জন্মের পর তার নাম হবে। সে প্রথম ভাত খাবে। তার হাতেখড়ি হবে। এগুলো সবই তো আনন্দের একেকটা উপলক্ষ। সবাই মিলে উৎসব করাই যায় তার জন্য ঈশ্বর-বিশ্বাস, পূজো প্রার্থনা মন্তোচ্চারণের কী প্রয়োজন? তাছাড়া জন্মদিন, পরীক্ষায় পাশ, বিবাহ (অবশ্যই আইনী মতে) এ সবই তো সাধ্যমত আনন্দ উৎসব করাই যায়। কিন্তু যুক্তিবাদী, মানবধর্মীদের কাছে কোনোটাই বাধ্যতামূলক নয়। না করলেই সাংঘাতিক কিছু ক্ষতি হয়ে যাবে না। আর সময়মত মরণোত্তর দেহদানকে সার্থক করতে হলে যথেষ্ট কাঠখড় পোড়াতে হয়। শ্মশানযাত্রা নাই বা হোলো—আত্মীয়বন্ধুদের ডাক পড়বেই দেহদানের ব্যবস্থাপত্র করতে। তারপর সবাই মিলে স্মরণসভার আয়োজন করাটাই শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের সবচেয়ে ভাল উপায় নয় কি? একটা ছুটির দিন বেছে নিয়ে প্রয়াত মানুষটির ছবি ও স্মৃতিকে ঘিরে গান, আলোচনা জীবনী পাঠ—সবই চলতে পারে। দিনক্ষণ দেখে গঙ্গাস্নান, যজ্ঞ, মন্ত্র, মাথা ন্যাড়াকরে অদ্ভুত পোশাক পরে কচ্ছসাধন—এসবই অর্থহীন আর হাস্যকর। আত্মার অস্তিত্বই যেখানে নেই—সেখানে ‘আত্মার শান্তি’ ইত্যাদি অর্থহীন কল্পনা। মৃত্যুতেই জীবনের শেষ—তাতে কি জীবন অর্থহীন হয়ে যায়? এক শ্রদ্ধেয় মানুষের স্মৃতি, কর্ম ও শিক্ষাই তো তাঁকে অমর করে। তাহলে স্মৃতিচারণই তো সবচেয়ে ভাল উপায় শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের। আর সাধ্য না থাকলেও কারুর মৃত্যু উপলক্ষে বহু মানুষকে ডেকে ভুরিভোজন করানোও একরকমের অশ্লীল মুখতা মনে করে মানবধর্মীরা। তাদের প্রতিবাদকে সোচ্চার করতে তাই মানবতাবাদীরা সবচেয়ে মারাত্মক আর অর্থহীন দুটো ভুরিভোজের নিমন্ত্রণকে সামাজিকভাবে বয়কট করে। একটি শ্রদ্ধের খাওয়া, আরেকটি পৈতে বা উপনয়ন। একটি কিশোরকে পৈতে পরিয়ে তাকে দ্বিজত্বে উত্তীর্ণ করা হচ্ছে জঘন্য জাতপ্রথাকে স্বীকার করে নেওয়ার অমানবিক প্রথা। এই অনুষ্ঠান শিক্ষিত সুমাজের লজ্জা। বাকী সব প্রচলিত অনুষ্ঠানে ধর্মীয় আচার পালন বাদ দিয়ে প্রীতিভোজে অংশগ্রহণ করতে মানবধর্মীদের আপত্তি নেই। তবে কোনো বিবাহে পণের ব্যাপার জানা থাকলে তা অবশ্যই বর্জনীয় হবে।

এই ভাবে সমাজে অন্য ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে থেকেও মানবতাবাদীরা আনন্দ

উৎসবে মেতে ওঠে এবং সুযোগমত মানবতার প্রচার ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে থাকে। মানুষের সাম্যে বিশ্বাসী যুক্তিবাদী আন্দোলনও তো আনন্দ উৎসব।

এতক্ষণ তো গেল পারিবারিক অনুষ্ঠানগুলো, এরপর দেখা যাক সামাজিক অনুষ্ঠান। সমস্ত রকম পূজো প্রার্থনা, অর্থহীন মস্তোচ্চারণ, অলীক ঈশ্বরভক্তি, অমানবিক ব্যয়সাপেক্ষ আচার বিচার ও পুরোহিত-নির্ভরতা বাদ দিয়ে অর্থহীন সমস্ত কিছু বাদ দিয়ে শুধুমাত্র আনন্দের উৎসবগুলোর একটা তালিকা করলে আমরা কী পাই?

নতুন ধান কাটার সময় ঘরে ঘরে পিঠেপুলির উৎসব দিয়ে শুরু করা যাক। কোনো ধর্মীয় গন্ধ ছাড়াই এটি সারা ভারতে ও দুই বাংলায়ই জনপ্রিয় উৎসব। শীতের পর যুক্তিবাদী দিবস ১ মার্চ, গ্রীষ্মে নববর্ষ। বর্ষায় বৃক্ষরোপণ তারপর শরতে আকাশ পরিষ্কার হতেই শারদীয় মেলা। তারপর ঝকঝকে আকাশে ঠাণ্ডার ছোঁয়া লাগতেই বাজী আর আলোর খেলা। মূর্তিপূজো আর পুরোহিততন্ত্র বাদ দিয়ে কি এগুলো উপভোগ করা যায় না? ১০ ডিসেম্বর বিশ্ব মানবাধিকার দিবস আর তারপরই বইমেলার তোড়জোড়। এটা একটা উদাহরণ কলকাতা আর তার আশেপাশের মানুষের জন্য। এইভাবে সময় ঋতু ও আবহাওয়া ভেদে প্রচলিত সব অনুষ্ঠানই রাখা যায় মানুষের ঈশ্বরভীতিকে বাদ দিয়ে। যে অর্থ ব্যয় হয় শুধু দুর্গাপূজোয় তাই দিয়ে বিগত বর্ষায় বন্যাসিঁড়িতদের সাহায্য করেও খরচ করা যায় প্রতি এলাকায় স্থায়ী কিছু গঠনমূলক কাজ করতে—পার্ক লাইব্রেরি হাসপাতাল ইত্যাদি। নতুন কিছু তৈরি মানেই তো কিছু মানুষের কর্মসংস্থান, কিছু প্রতিভার বিকাশ। ছুটির দিনগুলোকে একটু অদলবদল করে নিলে কতগুলো নতুন ছুটি পাওয়া যাবে—যেমন বিজ্ঞান দিবস, যুক্তিবাদী দিবস, মানবাধিকার দিবস। কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠানে দেশশুদ্ধ সকলের ছুটি চলবে না। তার বদলে আপৎকালীন বিশেষ ঘটনার প্রেক্ষিতে ছুটি ঘোষণা করা হবে। যেমন বন্যাভ্রাণে সাহায্য করার জন্য শহরে মানুষের ছুটি, মহামারী বা বড় রকমের দুর্ঘটনা ঘটলেও ছাত্র-ছাত্রীদের স্বেচ্ছাসেবক হওয়ার জন্য ছুটি। তাছাড়া খুব বর্ষা খুব শীত বা খুব गरমে টানা ক’দিন ছুটি দিলে কাজের একঘেয়েমি কাটে—সময় ও শক্তির অপচয় বন্ধ হয়। অথবা রক্তদানের ছুটি, বিশ্বকাপ খেলা দেখার ছুটি ইত্যাদি কিছু নতুন ছুটি যোগ করা যায় যেগুলো ধর্মনিরপেক্ষভাবে প্রতিটি মানুষই কাজে লাগাতে পারে। অবাঞ্ছিত রীতিনীতি বাদ দিলে বাদ হয়ে যাবে অনেক কিছুই—বাদ যাবে নিষ্ঠুর বলিপ্রথা, যা কোনো সুস্থ মনের মানুষের আনন্দের অঙ্গ হতে পারে না। বাদ হয়ে যাবে দিনের পর দিন চলতে থাকা বিসর্জনের হামলা, যানজট, বাদ হবে অনাবশ্যিক ব্রত উপবাস—এটা খেও না, সেটা খেতে নেই—যা অধিকাংশ ভারতীয় মহিলার পেটের রোগের গোপন রহস্য,

বাদ হয়ে যাবে বহু অর্থ ও সময়ের অপচয় যে অর্থ ও সময় কাজে লাগবে সুস্থ পরিবেশ গড়তে—শিক্ষার প্রসার ঘটাতে। তাই টানা সাতটা দিন ছুটি বরাদ্দ থাক বইমেলা আর সাক্ষরতা প্রসারের কাজে।

এসবই কি মানবতাবাদীদের দিবাস্বপ্ন? নাঃ, বোধহয় এরকম দিন আসতে আর বেশি দেরি নেই।

দেরি যে নেই, তারই সংকেত মিলেছে '৯৯-এর শিশু অধিকার সপ্তাহ' তে। হায়দ্রাবাদের পঞ্চাশটি স্কুলের পাঁচ হাজার ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে একটা সমীক্ষা চালিয়েছিল 'দিব্য দিশা' ও 'প্রেরণা' নামের দুটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এবং স্কুলগুলোর মিলিত উদ্যোগ। তাতে ৬৫ শতাংশ ছাত্র-ছাত্রী জানিয়েছে, ধর্মভিত্তিক অনুষ্ঠানের জন্য ছুটি বাতিল করা উচিত, সে ক্রিসমাসই হোক বা গণেশ পূজোই হোক। তাদের এই মতামত ভ্রমা পড়েছে স্কুলশিক্ষা দফতরের অধিকর্তা মনমোহন সিং-এর কাছে।

AMARBOI.COM

ধর্মনিরপেক্ষতার মুখ ও মুখোশ

প্রবীর ঘোষ

ধর্মনিরপেক্ষ মানে, দুদু খাব, তামুকও খাব
ধর্মনিরপেক্ষ মানে, পক্ষ নেওয়া সুবিধে বুকে
ধর্মনিরপেক্ষ মানে, ফড়ে-দালাল নেতা-ছাতার
ভোট কুড়োবার ফন্দি ফিকির
ধর্মনিরপেক্ষ মানে, বাজা বুদ্ধি, খাজা বুদ্ধির
ফরমাইসি কচকচানি
লক্ষ্মী সোরেন, করিম চাচা, মনে রাখিস এ তোর দেশ
এ তোর বাতাস, এ তোর আকাশ, ঘুরে দাঁড়া
ছাতা-মাথা আবর্জনা ঝেঁটিয়ে তড়া

ধর্মনিরপেক্ষতার পক্ষে शामिल হওয়ার স্লোগান একটি সরল ভণ্ডামি

২০০০-এর নভেম্বর। তাও দু-সপ্তাহ অতিক্রান্ত না। টিভি চ্যানেল ও সংবাদপত্র একটা খবর প্রচার করলো, পশ্চিমবঙ্গের সদ্য প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু অধর্মনিরপেক্ষ শক্তির বিরুদ্ধে কামান দাঙ্গা দেন। ভারতীয় জনতা পার্টির হিন্দুত্ববাদী ফ্যাসিবাদের ঘনায়মান বিপদ থেকে দেশবাসীকে বাঁচাতে রাজনৈতিক দলগুলোকে আন্তরিক হতে বলেছেন। সাবধান করেছেন, নতুবা ইতিহাস ক্ষমা করবে না। অধর্মনিরপেক্ষ শক্তির বিরুদ্ধে সর্বাঙ্গীন লড়াইয়ের আবশ্যিক ও প্রাথমিক শর্ত হিসেবে কংগ্রেস সহ সমস্ত ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক দলকে নিয়ে একটা ফ্রন্ট গড়ে তোলার জরুরী আহ্বান জানিয়েছেন জ্যোতি বসু।

জ্যোতি বসুর আহ্বানের অর্থ এই নয় যে—তিনি বা তাঁর দল মনে করেন, কংগ্রেস সহ অনেক রাজনৈতিক দলই ধর্মনিরপেক্ষ। কোনও ধর্মের পক্ষে নয়। ভারতীয় জনতা পার্টির হিন্দু তোষণ রাজনীতিকে ঠেকাতে মুসলিম তোষণের সাম্প্রদায়িক কাজে লিপ্ত নয়। জ্যোতিবাবুর মত প্রখর বাস্তববাদী মানুষ এমন অবাস্তব চিন্তাকে মাথার ধারে কাছে ঘেষতেই দেন না। তবু তাঁকে এমন কথা বলতে হয়, কারণ—গরজ বড় বালাই। তিনি বোঝেন, কংগ্রেসকে সঙ্গে না পেলে বিজেপিকে কেন্দ্রের ক্ষমতা থেকে হঠানো বর্তমানে অসম্ভব। জ্যোতিবাবু জানেন, ভারতীয় জনজীবনে সাম্প্রদায়িকতার শিকড় এতই গভীর যে, তাকে হটাতে গেলে ভোটের রাজনীতির জগত থেকে নিজেদের হটতে হবে। এ দেশের রাজনীতিতে টিকে থাকতে হলে পুজোর উদ্বোধন, ইফতার পার্টিতে অংশ গ্রহণ এবং একই সঙ্গে

ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক দল হিসেবে বিজেপির বিরুদ্ধে গাল পাড়তে হবে।

মুখে সাম্প্রদায়িকতাকে গাল পাড়লেও আজও মুসলিম প্রধান এলাকায় মুসলিম প্রার্থীকে দাঁড় করাবার কৌশল আঁকড়ে রাখতে হয়েছে কমিউনিস্ট বলে পরিচিত দলগুলোকেও। এর কারণ, রাজনৈতিক দলগুলো মনে করে মুসলিম ভোটারদের বেশির ভাগই নিজের পার্টির চেয়ে নিজের ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মানুষকে ভোট দিতে অনেক বেশি পছন্দ করে।

মুসলিমদের এই সম্প্রদায়-প্রীতির পিছনে অনেক কারণ থাকতে পারে। এদেশের বাতাবরণে হিন্দু-মুসলিম বিদ্বেষ, ধর্মের ভিত্তিতে দেশ বিভাজন মুসলিম হিসেবে নিরাপত্তাহীনতা, সামাজিক অবিচারের শিকার বলে মনে করা, দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসেবে এদেশে থাকতে হচ্ছে বলে বিশ্বাস করা—এসবই কারণ হতে পারে। কিন্তু এসবের বাইরেও কারণ রয়েছে। কারণটা হলো, রাজনৈতিক দলগুলোর ধর্ম নিয়ে রাজনীতি। বিজেপি ও তার সহযোগী কিছু পার্টি রাম মন্দির গড়া নিয়ে রাজনীতি করছে, তো বিজেপি বিরোধী দলগুলো বাবরি ভাঙা নিয়ে রাজনীতি করছে। বিজেপি হিন্দুদের মধ্যে হিন্দুজাতীয়তাবোধ জাগাবার রাজনীতি করছে তো অ-বিজেপিরা মুসলিমদের মধ্যে উগ্র সাম্প্রদায়িকতাবোধ উস্কে দেবার রাজনীতি করছে।

এদেশের সংসদীয় গণতন্ত্রে ভোট বড় দামী। মুসলিম ধর্মীয় কুসংস্কার, তা সে যতই মধ্যযুগীয় হোক না কেন—তার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ভোট হারাতে নারাজ কংগ্রেস থেকে বাম, প্রায় তামাম রাজনৈতিক দলগুলো। এক সময় বামপন্থীরা মুসলিম নারীদের মুক্তির পক্ষে স্লোগান তুলেছিলেন, ‘কমন সিভিল ল’ চালু করতে হবে। এক দেশ এক আইনের পক্ষে এই সওয়াল যেই ভারতীয় জনতা পার্টি তুলে নিল, ওমনি বামপন্থীরা তাদের অবস্থান থেকে একশো আশি ডিগ্রি ঘুরে গেল। এই অবস্থান পাল্টে পিছু হটারও কারণ আছে। শাহবানু মামলায় সুপ্রিম কোর্টের দেওয়া রায়ের বিরুদ্ধে মুসলিম পুরুষদের স্কেভের তীব্রতা। হোক না মধ্যযুগীয় চেতনায় আচ্ছন্ন মুসলিম পুরুষদের স্কেভ, কিন্তু তাকে অগ্রাহ্য করাটা রাজনৈতিক আত্মহত্যা ছাড়া কিছু নয়। কারণ আজও মুসলিম পুরুষরাই ঠিক করে দেয়, তাদের নারীদের ভোট কোথায় পড়বে। আর, মুসলিম ভোটের বড় অংশই বামেরা পেয়ে আসছে। এই ভোট ভাবনা থেকে ডিগবাজি খেল বামেরা।

ধর্মেও আছি, ধর্মনিরপেক্ষতাতেও আছি—এ’ভগামী আর কতদিন...

ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার জনক কংগ্রেস, মুসলিম লীগ...

মগজে সাম্প্রদায়িক চিন্তা ও গলায় ধর্মনিরপেক্ষতার বুকনি—এই হলো এদেশের নির্বাচন-নির্ভর রাজনৈতিক দলগুলোর বৈশিষ্ট্য। আজ আমরা দু-বেলা

চৈচাচ্ছ—ভারতীয় জনতা পাৰ্টি হিন্দু চেতনায় মুসলিম বিদ্বেষের বাতাবরণ তৈরি করে চলেছে।

মানেটা এমন যেন—বিজেপি

বা ভারতীয় জনতা পাৰ্টির জন্মের (১৯৮০ সাল)

আগে ভারতে হিন্দু-মুসলিম বিদ্বেষ, অবিশ্বাস ছিল না।

বিজেপি'র জনক জনসঙ্ঘের জন্ম ১৯৫১-তে।

বিশ্বহিন্দু পরিষদের জন্ম ১৯৬৪-তে।

শিবসেনা ১৯৬৬-তে।

এইসব হিন্দুত্ববাদী সাম্প্রদায়িক দলগুলোর জন্মের আগেও হিন্দু-মুসলিম বিদ্বেষ ও অবিশ্বাসের প্রবল উপস্থিতি ছিল। বিশ শতকের চারের দশকে ভারতের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় ধর্মের ভিত্তিতে দাঙ্গা হয়েছিল। প্রাণ দিয়েছিল ছয় লক্ষ মানুষ। অগ্নিসংযোগ, লুট-পাট ও ধর্ষণের শিকার হয়েছিল দেড় কোটি মানুষ। তখন কোথায় বিজেপি থেকে শিবসেনা? ওদের তো তখন জন্মই হয়নি! তবে কী করে সংগঠিত হলো এত বড় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা? এই হিন্দু-মুসলিম অবিশ্বাসের জনক ছিল কংগ্রেস আর মুসলিম লীগ, নেহরু অ্যান্ড কোম্পানী আর জিন্না অ্যান্ড কোম্পানী, দু-দলই তখন গদির লোভে পাগল। গদি একটা হলে দু-দলই বসে কী করে? অতএব ভাগ করতে হবে দেশকে। হিন্দু ও মুসলিম ধর্মের ভিত্তিতে দেশ ভাগের জিগির উঠল। জিগির থেকে ধর্মীয় উন্মাদনা, হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা।

এই ধর্মীয়-সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পিছনে এদেশের কমিউনিস্টদের ভূমিকাও কম নয়। কমিউনিস্টরা সেদিন সোচ্চার হয়েছিল মুসলিমদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের পক্ষে। জেনারেল বডির মিটিং থেকে সভা, সর্বত্রই বুঝিয়েছে—হিন্দু ও মুসলিম দুটি পৃথক জাতিগোষ্ঠী। মুসলিম জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার বা স্বাধীনতার অধিকার কোনও অজুহাতেই খর্বিত হতে দেওয়া যায় না। মার্কস ও লেনিন সর্বদাই ছিলেন প্রতিটি জাতিগোষ্ঠীর আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের পক্ষে। এটুকু উল্লেখ করলে বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে—কাশ্মীরি থেকে কামতাপুরী যখনই যে ধর্মীয় বা ভাষা গোষ্ঠী অথবা জাতিগোষ্ঠী আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দাবি করেছে তখনই তথাকথিত মার্কসবাদীরা অবস্থান পাল্টে একশো আশি ডিগ্রি ঘুরে গেছে। এই নয় যে, সেদিনের ভুল স্বীকার করে এই অবস্থান পাল্টানো। আজ পর্যন্ত স্বীকার করেনি যে—ধর্মের ভিত্তিতে এই দ্বিজাতিতত্ত্ব ছিল ভুল। অথচ ধর্মের ভিত্তিতে এই তথাকথিত মার্কসবাদী জাতিতত্ত্বকে অসার প্রমাণ করেই পূর্বপাকিস্তান এখন বাংলাদেশ। ধর্মের ভিত্তিতে দেশ ভাগ করে যারা এই উপমহাদেশে ধর্মীয়-সাম্প্রদায়িকতার অন্যতম জনক, তারাই আজ সাম্প্রদায়িকতার জুজুকে সুবিধামত

ব্যবহার করছে।

বি জে পি, শিবসেনার মত রাজনৈতিক দলগুলো কোনও রাখ-ঢাক না করেই হিন্দুত্বের উত্থান চাইছে। রাম মন্দির-বাঘরি মসজিদ বিতর্কের প্রসঙ্গ টেনে সাধ্বী ঋতাস্ত্রা স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছিলেন—ধর্মের ভিত্তিতেই ভারতবর্ষ বা হিন্দুস্তানকে দু-টুকরো করা হয়েছিল। ধর্ম-ভিত্তিক দ্বিজাতিতত্ত্বে সেদিন দু-দেশের নেতারা ইমেনে নিয়েছিলেন হিন্দু ও মুসলিম ধর্মের মানুষেরা দুটি পৃথক জাতি। নেতারা ই ঠিক করে দিলেন, হিন্দুদের মাতৃভূমি হিন্দুস্তান ও মুসলিমদের পিতৃভূমি পাকিস্তান। এরপর হিন্দুজাতির উত্থান চাইলে তাকে কোনওভাবেই ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা বলা যায় না। জাতির উত্থান চাওয়া কোনভাবেই অপরাধ নয়। এ হলো জাতীয়তাবোধ।

এমন সাফ জবাবের পাল্টা উত্তর দেওয়া কঠিন। তারচেয়ে অনেক সোজা, উত্তর এড়াতে অন্য প্রসঙ্গ এনে ফেলা। সুবিধামত সাম্প্রদায়িকতার ভয় দেখান। এক সময় যাদের ‘জাতিগোষ্ঠী’ বলেছে, সেই জাতিগোষ্ঠীর উত্থান প্রচেষ্টাকে ‘সাম্প্রদায়িকতা’ বললে তাকে সুবিধাবাদী নীতি বলতে হয়। এমন সুবিধাবাদী নীতি এক সময় সাধারণের কাছে ধরা পড়ে যেতে বাধ্য।

হিন্দু-সাম্প্রদায়িকতা রোখার দাওয়াই মুসলিম-সাম্প্রদায়িকতা নয়

মুক্ত চিন্তার অভাবে, যুক্তিমনস্কতার অভাবে আমরা নানা ভাবেই সাম্প্রদায়িক। ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার সঙ্গে পাশ্চাত্য দিয়ে বেড়েছে ভাষাগত সাম্প্রদায়িকতা, আঞ্চলিক সাম্প্রদায়িকতা, জাত-পাতের সাম্প্রদায়িকতা, রাজনৈতিক সাম্প্রদায়িকতা, পেশাগত সাম্প্রদায়িকতা।

পড়শির হাতে উকিলবাবু মার খেয়েছেন, আমরা উকিলরা প্রতিবাদে কোর্টের কাজ বন্ধ করে দিলাম। ছাত্র বিনা টিকিটে ট্রেনে ভ্রমণের সময় টিকিট চেকারের হাতে ধরা পড়েছে। আমরা ছাত্ররা স্টেশন তোড়ফোর করে তিন ঘণ্টার জন্য ট্রেন অবরোধ করে দিলাম। রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। ডাক্তারকে ‘কলবুক’ দেওয়া হয়েছে। ডাক্তার তখন নার্সিংহোমে প্র্যাকটিসে ব্যস্ত। রোগী মারা গেছে। আত্মীয়রা ক্ষিপ্ত। নার্সিংহোম থেকে ডাক্তারের গাড়ি হাসপাতালে পৌঁছতেই ডাক্তারের ওপর আক্রমণ। আমরা হাসপাতাল কর্মীরা মৃতের আত্মীয়দের পিটিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দিয়ে, নিরাপত্তার দাবিতে হাসপাতাল অচল করে দিলাম। এই ইডেনেই এক অদ্ভুত ক্রিকেট খেলা দেখার সুযোগ হয়েছিল আমাদের। নেমে আসা অন্ধকার ঠেকাতে দর্শকদের হাতে হাতে কাগজের জ্বলন্ত মশাল। ব্যাটসম্যানদের স্বপ্ন আলোর আবেদন ভারতীয় অ্যাম্পায়াররা যতবারই বাতিল করে দিচ্ছে, ততবারই আমরা ভারতীয় দর্শকরা উল্লাসধ্বনিতে ইডেন ভাসিয়েছি। আমরা জয় দেখতে চাই। এক ব্যাটা দর্শক অ্যাম্পায়ারের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলতেই আমরা ইন্ডিয়ান

ক্রিকেটের সাপোর্টাররা ওকে পেঁদিয়ে বৃন্দাবন দেখিয়ে দিয়েছিলাম। পাকিস্তান থেকে ইংলন্ড, কোন্ দেশের আম্পায়াররা না চুরি করে? আমরা যদি চুরি করে থাকি তো, বেশ করেছি।

রোগটা সর্বত্র ছড়িয়েছে। রাজনীতিতেও। আমরা ক্যাডার। জোর গলাতেই বলি, সুযোগ পেলে কোন্ পার্টি না রিগিং করে? ক্ষমতায় থাকলে কোন্ পার্টি না পুলিশ-প্রশাসনকে কাজে লাগায়?

এভাবেই আমরা আমাদের সব বে-আইনি কাজকে জাস্টিফাই করতে চাইছি। এক অপরাধের বদলা নিতে চাইছি পাল্টা অপরাধ করে। এতে সমাজে অপরাধ ও অনৈতিক কাজের সংখ্যা বাড়ছে। বাড়ছে হজুক। অপরাধমনস্ক মানুষের সংখ্যা বাড়ছে। কমছে যা তা হলো, যুক্তি দিয়ে বিচার করার প্রবণতা। কমছে মুক্ত চিন্তার প্রবণতা।

ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার অংকটাও বেশ জটিল। দক্ষিণ ভারতে জাত-পাতের অংক কষে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলকে হিন্দু তাস ফেলতে হয়। উত্তরপ্রদেশে হিন্দু অনগ্রসররা মুলায়ম সিংহের কাছা ধরে চলেছে। দলিতরা মায়াবতীর সঙ্গে। বর্ণ-হিন্দুদের কেউ সোনিয়ার সঙ্গী তো কেউ বাজপেয়ীর। বর্ণহিন্দুদের কাছে টানতে হিন্দুদের জিগির তুলেছে তাই বিজেপি। এটাই ২০০১ সালের চিত্র। বাবরি মসজিদের ধ্বংসস্তূপে রাম মন্দির গড়া হিন্দু ধর্মীয় অধিকার। একথা বলে নিজেদের খোলামেলা ভাবে হিন্দু সাম্প্রদায়িক দল হিসেবে প্রজেক্ট করে উত্তর প্রদেশে আগামী বিধান সভার নির্বাচন জিততে চাইছে বিজেপি। পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত অঞ্চলগুলোতে উদ্বাস্তুদের মধ্যে মুসলিম বিদ্বেষ জাগিয়ে তোলার কাজ করে চলেছে বিজেপি। ওরা মনে করে, হিন্দু ধর্মীয় ভাবাবেগকে জাগিয়ে তুলে ও হিন্দুদের মধ্যে মুসলিম বিদ্বেষকে কাজে লাগিয়ে দল বাড়াতে পারবে। বাস্তবে অনেক ক্ষেত্রেই বাড়াতে পারছেও। কাশ্মীরে ভারত বিদ্বেষ এমনই একটা পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যে লক্ষ লক্ষ হিন্দু শরণার্থী নিজেদের বাড়ি-ঘর, ব্যবসা সব ফেলে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছে। এদের অনেকেরই আস্তানা আজও জন্ম, দিল্লি, মুম্বাইয়ের শরণার্থী শিবির। এদের দাবির কথা বি জে পি, শিবসেনার মত তথাকথিত সাম্প্রদায়িক দল ছাড়া কোনও রাজনৈতিক দল ভুলেও উচ্চারণ করে না। একটাই ভয়, উচ্চারণ করলে যদি মুসলিম সাম্প্রদায়ের ভোট হারাতে হয়। ফলে বহু হিন্দু ভোটারদের চোখেই কংগ্রেস থেকে বাম রাজনৈতিক দলগুলো মুসলিম তোষণকারী, নীতিহীন, সুবিধাবাদী হিসেবে ধরা পড়ছে। শরীরে লেগে থাকা এই কালি-ঝুলি মুছে সাফ করতে হলে নিজেদের পাল্টাতে হবে। সততার সঙ্গে সাদাকে সাদা, কালোকে কালো বলতে হবে। তাত্ত্বিক লাভের আশায় শুধু নানা কুট কৌশল আঁকড়ে থাকার পথ ছাড়তে হবে।

বর্তমান বাস্তব অবস্থার দিকে
 ফিরে তাকালে দেখতে পাবো বিজেপি এখন
 কিছু মুসলিমদেরও সমর্থন পেতে শুরু করেছে। 'এক
 দেশ এক আইন' স্লোগান অনেক মুসলিম
 নারীকেই বিজেপি'র পিছনে
 দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।

সাম্প্রতিক কিছু সমীক্ষা স্পষ্টতই এ কথা বলেছে। এমনকী লিঙ্গ নির্বিশেষে কিছু মুসলিমদের মধ্যে একটা ধারণা দানা বাঁধতে শুরু করেছে—হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা এড়াতে হলে বিজেপি সরকারকে গদিতে বসানোই ভালো। এমন ভাবনার পিছনেও কারণ আছে। বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলোর তুলনায় কংগ্রেস শাসিত রাজ্যগুলোতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বেশি।

বিজেপি'র দীর্ঘস্থায়ী কর্মসূচীর পাল্টা কোনও কর্মসূচী বাম বা অ-বিজেপি দলগুলো নেয়নি। বরং আমরা বারবারই দেখেছি বিজেপিকে রুখতে তারা পাল্টা মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাকে উস্কে দেওয়ার খেলায় মেতেছে। ভি. পি. সিং ও তার দল মুসলিম ভোটারদের মন পেতে দলের ঝগড়ার রঙ সবুজ করে ছিলেন। ইমাম আবদুল্লা বুখারির মত ধর্মীয় নেতার সমর্থন আদায় করে সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন মুসলিমদের আবেগকে উস্কে দিলেন ভি. পি. সিং। যেন কোনও মূল্যে বাবরি মসজিদ রক্ষা করার প্রতিজ্ঞা করে ধর্মের তাস-ই খেললেন ভি. পি।

বিজেপি সাম্প্রদায়িক দল। কংগ্রেস থেকে সি. পি. এম. সব নির্বাচন নির্ভর রাজনৈতিক দলই সাম্প্রদায়িক। ওরা হিন্দু সাম্প্রদায়িক তো এরা মুসলিম সাম্প্রদায়িক। পাকিস্তানের জন্মের পরও ভারতে মুসলিম লীগের অস্তিত্ব রয়েছে। লক্ষণীয় যে বিজেপি হিন্দু সাম্প্রদায়িক দল বলে চিহ্নিত হলেও যে কোনও ধর্মের মানুষই বিজেপি-র সদস্য হতে পারে। কিন্তু মুসলিম লীগ দলের সদস্য হওয়ার প্রাথমিক ও আবশ্যিক শর্ত মুসলিম হতে হবে। এমন একটা কট্টর সাম্প্রদায়িক দলের সঙ্গে মার্কসবাদী দলগুলোও বারবার নির্বাচনী গাঁটছড়া বেঁধেছে। হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা রোখার জন্যেই নাকি এই কৌশল।

এ-সব নিয়ে প্রশ্ন তোলা নিষিদ্ধ। প্রশ্ন তুললেই 'বিজেপি-র দালাল,' 'সাম্প্রদায়িক' ইত্যাদি বলে চিহ্নিত হওয়া নিশ্চিত। চিহ্নিত করবেন এ-রাজ্যের বুদ্ধিজীবী ও অ-বিজেপি দলগুলো। বিজেপি-কে সাম্প্রদায়িক বলে সোচ্চার হলে আপনি প্রগতিশীল হয়ে যাবেন রাতারাতি।

অ-বিজেপি দলগুলি যেন বিজেপি-র একচেটিয়া সাম্প্রদায়িক বাজার দখলের লড়াইতে নেমেছে।

শুরুও শুরু আছে, আছে ভুল জানা জাতীয়তাবোধ

বিশ শতকের চারের দশকে হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার যে প্রাণঘাতি বিস্ফোরণ দেখেছি, তার মূল দায়িত্ব অবশ্যই কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের। কিন্তু বিস্ফোরক বারুদ সংগ্রহের কাজ শুরু করেছিলেন ব্রিটিশ ঐতিহাসিক জেমস্ মিল। তিনিই প্রথম ভারতের ইতিহাসকে তিনটি পর্বে বা অধ্যায়ে ভাগ করলেন। পর্ব বা অধ্যায়গুলো হলো হিন্দু সভ্যতা, মুসলিম সভ্যতা ও ব্রিটিশ সভ্যতা। প্রথম দুটি সভ্যতা ধর্মের ভিত্তিতে ভাগ হলেও তৃতীয় অধ্যায়কে খ্রিস্টান সভ্যতা না বলে ব্রিটিশ সভ্যতা হিসেবে চিহ্নিত করলেন।

খ্রিস্টপূর্ব ১০০০ থেকে ১২০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কে হিন্দুযুগ বলে চিহ্নিত করা হলো। অর্থাৎ বলা হলো, শাসকরা ছিলেন হিন্দু ধর্মাবলম্বী। মৌর্য, ইন্দো-গ্রীসিয়, শক, কুশান প্রভৃতি রাজবংশ ভারতের ইতিহাসে প্রবলভাবে হাজির। এই রাজবংশগুলো অহিন্দু ছিল। এদের মধ্যে অনেক রাজাই নিজেদের বৌদ্ধ বলে পরিচয় দিতেন। খ্রিস্টপূর্ব ৫০০ থেকে ৩০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ভারতে বৌদ্ধযুগ—এমনটা কেন বললেন না মিল সাহেব? কেনই বা মিল পরবর্তী ঐতিহাসিকরা এই ভুল অধ্যায় ভাগকে বিনা প্রশ্নে মেনে নিলেন?

মিল সাহেব ভারতীয় পণ্ডিতদের
শেখালেন—হিন্দু মানুষ ও মুসলিম মানুষরা
দুটি পৃথক জাতি গোষ্ঠী। আমাদের পণ্ডিতরাও তাই
শিখলেন। মেনে নিলেন ধর্মের ভিত্তিতে
জাতি গোষ্ঠী তত্ত্ব। এবং সেই সূর
এখনও বাজিয়ে চলেছেন।

ইংরেজরা একটা জাতি। একই ভাষা-ধর্ম-সংস্কৃতি ও ভৌগোলিক এলাকায় বসবাসকারী হিসেবে জাতিগোষ্ঠী। একইভাবে ইউরোপের ছোট ছোট জনসংখ্যার দেশগুলো ভাষা-ধর্ম-সংস্কৃতি ও ভৌগোলিক এলাকায় বসবাসকারী হিসেবে জাতি ভিত্তিক এক একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র। লক্ষ্যণীয়, ইউরোপীয়রা ধর্মে খ্রিস্টান হলেও, খ্রিস্টান জাতি হিসেবে পরিচিত নয়। 'ইউরোপ' নামে আলাদা কোনও রাষ্ট্র নেই। বছর বৈচিত্রের মধ্যে একতার গাল ভরা বুকনি নেই।

একইভাবে আরব ভূখণ্ডে সংস্কৃতিগত জাতিভিত্তিক নানা স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গড়ে উঠেছে। গড়ে উঠেছে দেশপ্রেম। ইরাকি দেশপ্রেম ও ইরানি দেশপ্রেম তাই শেষ পর্যন্ত দুটি স্বতন্ত্র জাতির দেশপ্রেম। রাষ্ট্রকে জড়িয়েই তাদের দেশপ্রেম,

জাতীয়তাবোধ। ইসলাম ধর্মের ভিত্তিতে তাদের রাষ্ট্রচেতনা বা দেশপ্রেম গড়ে ওঠেনি। ধর্মকে জড়িয়ে ধর্মীয় উন্মাদনা গড়ে উঠতে পারে, কিন্তু রাষ্ট্রীয় চেতনাবোধ, দেশপ্রেম গড়ে ওঠে না।

‘মুসলমান’ শব্দটির বর্তমান সার্বজনীনতার পিছনে রয়েছে ইংরেজ ঐতিহাসিকদের অবদান। আজ আমরা তুর্কি, আফগান, পারসিক ও আরবদের ‘মুসলমান’ বলি। ইংরেজদের ভারত আগমনের আগে আমরা এমনটা বলতাম না। বলতাম ‘যবন’। ‘ম্লেচ্ছ’-ও বলতাম। যে সব লোক আর্য-সংস্কৃতির অংশ ছিল না সে‘সব অ-আর্য জাতি ও উপজাতিদের ‘ম্লেচ্ছ’ বলা হতো। ‘ম্লেচ্ছ’ ও ‘যবন’ শব্দ দুটি ধর্মীয় পরিভাষা নয়। সাধারণভাবে শব্দ দুটি সাংস্কৃতিক পরিচয় বোঝাতে ব্যবহৃত হতো। ইংরেজ প্রভুরা যেমনটি শেখালেন, আমরা তেমনটি শিখলাম। যেমনটি বলাতে চাইলেন, তেমনটি বললাম। আমরা মুসলিম শব্দের আমদানি ঘটলাম।

এটা বাস্তব সত্যি যে, প্রাচীন ভারতের ইতিহাসকে শিক্ষিত সমাজের কাছে তুলে এনেছিল ব্রিটিশরা। ভারতের বিভিন্ন কালের, সম্প্রদায়ের, ভাষাভাষির, অঞ্চলের সংস্কৃতির পরিচয় ব্রিটিশদের হাত থেকেই আমরা পেয়েছি। রাষ্ট্র চেতনা, জাতীয়তাবোধ ব্রিটিশরাই প্রথম এ‘দেশের উচ্চশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মাথায় ঢুকিয়েছিল। যে ছাঁচেই ঢোকাক, ব্রিটিশরাই যে প্রথম ঢুকিয়েছিল, এই নিয়ে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই।

তার আগে কোথায় বা রাষ্ট্র চেতনা? কোথায় বা জাতীয়তাবোধ? কোথায় বা বৈচিত্রের মধ্যে মিলনের জাতীয় সংহতি? ভারতবর্ষের ভৌগোলিক চৌহদ্দি আমরা ততখানি বলেই জেনেছি, যতখানি ব্রিটিশ শক্তি আমাদের জানিয়েছে।

সাহেবদের প্রাচীন ভারতকে খোঁজার চেষ্টা নিশ্চয় অভিনন্দনযোগ্য। তাঁরাই আমাদের জানালেন হরপ্পা ও মহেনজোদারো সভ্যতার কথা। ১৮৭৫-এ ইংরেজ প্রত্নতত্ত্ববিদ কানিংহাম হরপ্পা সভ্যতার নিদর্শন একটি শীল পেয়েছিলেন। সেই-ই সূচনা। তারপর আমাদের পরিচয় ঘটলো অতীত ভারতের সঙ্গে। যে‘ভাবে আমাদের দেখালেন, সে‘ভাবেই আমরা দেখলাম।

প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতির উপাদান থেকে আমরা জেনেছিলাম, মৌর্য রাজবংশের একজন ছিলেন অশোক। অশোকের বিশালত্ব আমরা প্রথম দেখতে পেলাম ব্রিটিশদের চশমা পরে। অশোকের শিলালিপি ও বৌদ্ধ উপাদান থেকে ব্রিটিশরাই আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন নতুন অশোকের সঙ্গে।

বুদ্ধ যে এ‘দেশেই জন্মেছিলেন, বৌদ্ধধর্ম যে এ‘দেশ থেকেই বিদেশে পাড়ি দিয়েছিল, সে ইতিহাসও আমরা জেনেছি ইংরেজ প্রত্নতত্ত্ববিদ ও ঐতিহাসিকদের গবেষণায়।

৮০০ থেকে ১২০০ খ্রিস্টাব্দের ভারতীয়দের মধ্যে জাতীয় সংহতি, জাতীয়তাবোধ খুঁজলে, তা হবে কষ্ট-কল্পনা। অথচ অনেক ভারতীয় পণ্ডিতরা এমনই একটা চিত্র আমাদের সামনে তুলে ধরছেন। বাস্তব অবস্থা ছিল, এইসব আবেগ আশ্রুত, সাজানো কথার সম্পূর্ণ বিপরীত। দেশ তখন হাজার হাজার ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত। ১৯৪৭-এর ১৪ আগস্ট ভারতবর্ষে দেশীয় করদ রাজ্য ছিল পাঁচশোর বেশি। করদ রাজ্য বলা হতো তাদের, যে রাজ্যের শাসকরা ব্রিটিশদের কর দেবার বিনিময়ে স্ব-শাসনের অধিকার অর্জন করেছিল।

ইংরেজ শাসনাধীনে আসার আগে এ দেশ আরও বহুগুণ বেশি রাজ্যে বিভক্ত ছিল, এই নিয়ে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই। হাজার হাজার ছোট ছোট রাজ্যের সামন্তপ্রভু বা গোষ্ঠীপতিরা নিজেদের বড় বলে জাহির করতে চাইতেন। রাজার সুরে সুর মেলাবার মত মোসাহেব দরবারের সকলেই। মন্ত্রণাদাতা মন্ত্রী থেকে রাজ-জীবনীকার—প্রত্যেকেই রাজ-অনুগ্রহ পেতে জুতোর শুকতলা হতে এক কথায় রাজি। রাজ দরবারের এইসব শুকতলারা সামন্তপ্রভুদের নানা উপাধিতে সম্মানিত করে ধন্য হতো। উপাধির মধ্যে রাজা, মহারাজা, রাণা, মহাসামন্ত, মহামণ্ডল, চৌধুরী, রাণক, ঠাকুর—এমনই কতকী-ই না ছিল। সামন্তপ্রভুদের অধীনে থাকতো উপ-সামন্ত শ্রেণী। এদের অধীনে থাকতো এক বা একাধিক গ্রাম।

১২০০-১৩০০ খ্রিস্টাব্দে উত্তর ভারতে তুর্কিরা তাদের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিল। মাত্র হাজার বারো সেনা নিয়ে ভারতের কিছু রাজাদের হারিয়ে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে ছিল। তুর্কিরা শাসকদের পরাজিত করে তুর্কিদের বসায়নি। পরাজিত শাসকদের অধীনস্ত দরবারের ক্ষমতাবানদের হাতেই শাসনভার ছেড়ে দিয়েছিল। ছোট ছোট রাজা ও সামন্তপ্রভুকে না গিয়ে সুলতানকে কর দেবার বিনিময়ে নিজেদের সম্পত্তি ও পদমর্যাদা রাখার সুযোগ পেল এবং যেন বর্তে গেল। সম্মিলিতভাবে তুর্কিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের চেয়ে কর দিয়ে স্ব-শাসন বজায় রাখাটাই বুদ্ধিমানের কাজ বলে প্রায় সর্বত্র গৃহীত হয়েছিল। আমাদের হিন্দু জাতিয়তাবোধ সেদিন কোথায় ছিল? তুর্কি সাম্রাজ্য বলতে আমরা যত বিশাল ভূখণ্ড ভাবি, আসল চিত্রটা আদৌ তেমন ছিল না। ছিল বহু করদ রাজ্যের সমষ্টি।

বলে রাখা ভালো, ‘হিন্দু’ শব্দটি হিন্দুদের সৃষ্ট নয়। ইসলাম ধর্মের তুর্কি ও আফগানরা ভারতবর্ষের অমুসলিম ধর্মের মানুষদের বলতো ‘আল-হিন্দ’। ‘আল হিন্দ’ শব্দেরই পরিবর্তিত রূপ ‘হিন্দ’।

‘জাতীয়তাবোধ’ ব্যাপারটাই আধুনিক যুগের সৃষ্টি। ব্রিটিশ শাসনের আগের হাজার দেড়েক বছরের ইতিহাস ঘাঁটলে দেখবো, সাধারণ মানুষের চিন্তায় ‘জাতীয়তাবোধ’ বিষয়টির কোনও স্থান ছিল না। তখন সাধারণ প্রজাদের সঙ্গে শাসক হিসেবে সম্পর্ক ছিল জমিদার, জোতদার, চৌধুরী ইত্যাদি শ্রেণীর প্রান্তিক

শাসকদের বা গোষ্ঠীপতিদের। আর সে সম্পর্কটাও ছিল খাজনা আদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ। কোন্ রাজা এলো, কে গেল—তা নিয়ে প্রজাদের কোনও মাথা ব্যথা ছিল না।

বেশি নয়, মাত্র দেড় শ, দু'শ বছর আগের আমাদের পূর্বপুরুষদের অবস্থার কথা একবার ভাবুন। বাস পল্লীতে। পথ বলতে আলপথ ও জলপথ। গাড়ি বা যান বলতে গরুর গাড়ি আর নৌকো। নিজস্ব পৃথিবী বলতে নিজের গ্রাম বা বড়জোর আশে-পাশের দু-দশটা গ্রাম। সময় মছুর। তীর্থ ভ্রমণে যেতে হলে পথের ডাকাতদের ভয়ে দলবদ্ধ যাত্রা। তীর্থ ভ্রমণ শেষে কোনও কোনও 'পুণ্যাত্মা' পথ কষ্টে বা কালাজ্বরে দেহ রাখতেন। যাঁরা ফিরতেন, তাঁদেরও ফিরতে ফিরতে দু-তিন বছর লেগে যেত। একটু দূরের গাঁয়ে বিয়ে দিতে গেলে পাড়ার বয়োজ্যেষ্ঠদের অনুমতি লাগতো। এমন এক সময়ে অচ্ছেদ্য জাতীয় সূত্রে ভারতবাসীরা বাঁধা ছিল—বলে সোচ্চারে জয় গান গাইলে তা হবে অজ্ঞতা বা মিথ্যাচারিতা। বর্তমান অবস্থানকেই নিরপেক্ষতার সঙ্গে ফিরে দেখি আসুন। আজও ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের মানুষগুলোর ভাষা বুঝতে পারি না। এমন কী পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন অঞ্চল বা গোষ্ঠীর ভাষা বুঝতে হোঁচট খাই। এই রাজ্যের রাজবংশী, সাঁওতালি, গুর্খা, সিলেটি ভাষা আমাদের কাছে অপরিচিত এক জগত। অনেক প্রদেশের পোশাক-পরিচ্ছদ এতই ভিন্নতর যে, আমরা সে পোশাকে ঘুরছি, ফিরছি স্কুল-কলেজ অফিস করছি—ভাবতেই পারি না। আমরা নাগাদের বর্ণময় পোশাক, গুজরাটি পুরুষদের আধা-ফ্রক মার্কা বেনিয়ান আর পাগড়িতে দূরের কথা, দক্ষিণ ভারতীয়দের স্টাইলে লুঙ্গির মত করে ধুতি পরে তার ওপর সার্ট চাপিয়ে সর্বত্রগামীতার কথাই ভাবতে পারি না। আমরা অনেক প্রদেশবাসীর খাবার মুখে তুলতে গেলে বমন-বেগ সামলানোই মুশকিল হয়ে পড়বে। গিরগিটির রোস্ট, হাঁদুরের-সাপের-কুকুরের মাংস তো দূরঅস্ত্র নারকোল তেলের রান্না খেতেই অস্বস্তি অনুভব করি। এই যখন আমাদের পার্থক্যের জগত, তখন 'এক জাতি এক প্রাণ, একতা' স্লোগান স্লোগানের বাড়তি কিছু হয়ে উঠতে পারে না। কেন্দ্রের মন্ত্রী তার প্রদেশে নিজের দপ্তরের সবচেয়ে বেশি টাকা ঢালবে—এটাই এখন স্বাভাবিক চিত্র। ছোট ছোট প্রদেশগুলো থেকে কম কম কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি আসেন। মন্ত্রী কম আসেন। প্রভাবশালী মন্ত্রী—আসেনই না। এমন অবস্থায় বড় বড় প্রদেশ, বেশি বেশি পায়, ছোট ছোট প্রদেশের অবস্থা ছাগলের তৃতীয় বাচ্চার মত। ফলে ক্ষোভ, আন্দোলন, বিস্ফোরণ। আমরা ত্রিকোটে শক্তিশালী প্রদেশগুলোর কোটা প্রথা মেনে নিয়েছি। আবার মেনে নিয়েছি—কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী, নাগাল্যান্ড থেকে পাঞ্জাব পর্যন্ত প্রতিটি সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর অচ্ছেদ্য জাতীয়সূত্রে মালা হয়ে গেঁথে থাকার কাহিনী। এই অলীক কাহিনী কখনও মগজ ধোলইয়ের করিশমার ফল, কখনও বা নব্য জেগে ওঠা জাতীয়তাবোধের অতিশয্য।

এ' আমাদের ভুল শেখা, ভুল জানা
 জাতীয়তাবোধ। বহু সংস্কৃতি ভিত্তিক বহু জাতিকে জোর
 করে এক সঙ্গে বেঁধে হাজির করা জাতীয়তাবোধ।
 প্রকৃতিবিরুদ্ধ এক বিচিত্র জাতীয়তাবোধ, যে'খানে জাতিগুলোর
 মধ্যে মিলের চেয়ে অমিল বেশি। বহু সংস্কৃতিগত
 জাতি নিয়ে এক রাষ্ট্র গড়ে তোলার
 চিন্তা প্রকৃতির ও সমাজবিজ্ঞানের স্বচ্ছন্দ
 নিয়মের মধ্যে পড়ে না।

তাই তো ইউরোপ সংযুক্ত একটা রাষ্ট্র গড়ে তোলার চিন্তা করেনি। ইউরোপে
 এমন অনেক রাষ্ট্র বলিষ্ঠভাবে তাদের অস্তিত্ব জানান দিচ্ছে, যাদের জনসংখ্যা
 পশ্চিমবঙ্গ বা কলকাতার চেয়েও কম। এই সমস্ত রাষ্ট্রের অধিবাসীরা জাতি। সংস্কৃতি
 ভিত্তিক জাতি। তাদের জাতীয়-চেতনা, তাদের জাতি ভিত্তিক রাষ্ট্র। তাই রাষ্ট্রকে
 জড়িয়ে তাদের জাতীয়-চেতনাবোধ স্বতঃস্ফূর্ততার সঙ্গে উদ্দীপ্ত হয়।

আমাদের মধ্যে ভুল জাতীয়তাবোধ ও ভুল জাতীয়-চেতনাবোধের স্রষ্টা ব্রিটিশ
 শক্তি। ভাষা, পোষাক-পরিচ্ছদ, খাদ্যাভ্যাস ইত্যাদি সংস্কৃতির গণ্ডিতে লালিত
 বাঙালি জাতি, বিহারী জাতি, ওড়িয়া জাতি, তামিল জাতি, তেলেগু জাতি,
 মালয়ালম জাতি, মারাঠি জাতি, গুজরাটি জাতি, পাঞ্জাবি জাতি, ছত্তিশগড়ি জাতি,
 সাঁওতাল জাতি, নাগা জাতি, মিজোরাম জাতি, খাসিয়া জাতি, গারো জাতি, কুকি জাতি,
 মুণ্ডা জাতি, মগ জাতি, লুসাই জাতি, ওঁরাই জাতি ইত্যাদি কত না জাতি। ব্রিটিশ
 শক্তি এইসব জাতিকে দুটো বাগুণে বেঁধে ফেললো। হিন্দু জাতি ও মুসলিম জাতি।
 প্রধান দুটি ধর্মের ভিত্তিতে জাতি ভাগ। এ'দেশের শিক্ষার সুযোগ পাওয়া উচ্চবিত্ত
 মানুষরা ব্রিটিশদের এই জাতি ভাগ সুবোধ বালকের মতই মেনে নিল। আমরা
 ভারতীয়রা হয়ে পড়লাম হয় হিন্দু জাতির মানুষ, নতুবা মুসলিম জাতির
 মানুষ। আমাদের জাতীয়তাবোধেরও সরাসরি বিভাজন বা আরও সঠিক অর্থে
 Polarization হলো। আমরা হিন্দু জাতীয়তাবোধ ও মুসলিম জাতীয়তাবোধ
 নামের ভাবাবেগ দ্বারা তাড়িত হলাম। ভারতে ধর্মের সংখ্যা বিচারে হিন্দুরাই দলে
 ভারী। তাই ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদের মূলশ্রোত হিন্দু জাতীয়তাবাদের রূপ
 পেল।

কোনও জাতির নিজের সংস্কৃতিকে চেনা ও ভালোবাসার মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে
 জাতীয়তাবোধ। সে জাতীয়তাবোধ, ভারতীয়ত্ববোধ আমাদের কোথায়? ২০০১-

এর জুন। মণিপুরে জনবিদ্রোহ। বিধানসভা পুড়ে ছাই। জঙ্গি নাগাদের সঙ্গে অর্ধশতাব্দী ধরে চলে আসা লড়াই থামাতে কেন্দ্রীয় সরকার চুক্তি করলো। চুক্তির বিরুদ্ধে মণিপুরের জনতা হিংসাত্মক বিক্ষোভে উত্তাল হয়ে উঠলো। অসম ও অরুণাচল রাজ্য দুটির মানুষও এই চুক্তিতে ক্ষুব্ধ। যে কোনও মুহূর্তে এই দুই রাজ্যেও গণবিদ্রোহের সম্ভাবনা প্রবল। বিদ্রোহীদের ভয়ে মণিপুরের সব বিধায়ক ও সাংসদ রাজ্য ছেড়েছেন প্রাণ বাঁচাতে। এই বিদ্রোহ ভারতের জনজাতির মধ্যে অবিশ্বাস ও অসন্তোষের হিমশৈলের জেগে থাকা অংশ মাত্র। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য ধরে রাখতে কেন্দ্রীয় সরকারের একমাত্র ভরসা নিরাপত্তা বাহিনীর রাইফেল। গোটা ভারত জুড়ে বিভিন্ন জনজাতির মধ্যে, বিভিন্ন ভাষা-ভাষির মধ্যে বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে হত্যা, অগ্নিসংযোগের ঘটনা নিরবচ্ছিন্নভাবে ঘটে চলেছে। এইসব ঘটনা থেকে মুখ ফিরিয়ে জাতীয় ঐক্যের জয়গান গাওয়ার ভণ্ডামি আর কত দিন চালাবো? সত্যের থেকে কত দিন মুখ ফিরিয়ে থাকবো? কতদিন আমরা ভুল জাতীয়তাবাদের ইতিহাসে মুখ গুঁজে থাকবো?

জাতির সংস্কৃতি, ঐতিহ্যকে তুলে আনে ইতিহাস। ইতিহাস একটা সংবেদনশীল চর্চার বিষয়। আবেগ আপ্লুত হয়ে ইতিহাসকে একটু অন্য রকমভাবে হাজির করলে তা আর ইতিহাস থাকে না। বিকৃত ইতিহাস শেষ পর্যন্ত এক ভ্রান্ত জাতীয়তাবোধেরই জন্ম দেয় ও পালন করে।

**বিশ শতকের গোড়ায় ভারতীয়
ঐতিহাসিকদের বেশিরভাগই জাতীয় আন্দোলনের
দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। সেই জাতীয়তাবাদ ছিল ধর্মীয়-
সাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদ। ইতিহাস চর্চার শৃঙ্খলাবোধ
বহির্ভূত সাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদ।**

বঙ্কিমচন্দ্র-বিবেকানন্দ-শরৎচন্দ্র সহ বাঙালি বুদ্ধিজীবীরাও হিন্দু জাতীয়তাবোধে এতটাই উদ্দীপ্ত যে মুসলিম বিদ্বেষের চড়া সুর থাকতো কোনও রাখ-তাক না করেই।

পদ্ম চাষের জলাশয় তৈরি। বঙ্কিমচন্দ্র-বিবেকানন্দ-শরৎচন্দ্রের ছবি সামনে রেখে ভারতীয় জনতা পার্টি আজ পদ্ম ফুটিয়ে চলেছে। পদ্ম বনের জলা বুজিয়ে সবুজ জমিতে 'তারা' আঁকার চেষ্টায় কাদায় নেমেছে বিজেপি বিরোধীরা।

জেমস্ মিলের রোপিত দ্বিজাতিতত্ত্বের বীজ আজ বৃক্ষ হয়ে ফল দেওয়া শুরু করেছে।

ধর্মনিরপেক্ষতা কতখানি নিরপেক্ষ থাকবে, ঠিক করে অর্থনীতি

ভারত এক বিশাল ভূখণ্ড। এক বিশাল জনসমষ্টির দেশ। এ'দেশে বিভিন্ন অঞ্চলে বিকাশের অসমতা আছে। তাই চিন্তারও অসমতা আছে। যেমন, মহারাষ্ট্রের মানুষের কাছে শিবসেনা দলের নীতি গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। তাঁরা মার্কসবাদ-প্ৰীতি দেখলে অবাক হন। আবার পশ্চিমবঙ্গবাসীদের কাছে শিবসেনার নীতি পশ্চাৎমুখী চিন্তার ফসল। প্রযুক্তির জয়যাত্রা ও বাজার অর্থনীতির সর্বস্বতার স্বাদ যে যুব-সমাজ পেয়েছে, তারা ব্যক্তি-স্বার্থ-তাড়িত হয়েছে। আবার প্রাচীন ভারতের শিক্ষা ঐতিহ্যের মধ্যে প্রজ্ঞার অহংবোধ অনুভব করে যুব-সমাজের একাংশের আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণকে নতুন করে প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস চালাচ্ছে সংঘ পরিবার। ব্যক্তি-স্বার্থে পরিচালিত ভোগবাদী চিন্তা ও আধ্যাত্মিক চেতনার খোঁজে অকাজে ডুবে থাকা—উভয় শ্রেণীর মানুষই বৃহত্তর সমাজ ও তার দায়দায়িত্ব থেকে বিচ্ছিন্ন। আপাতদৃষ্টিতে বিপরীত মেরুর দুই চিন্তার জগতে বিচরণকারী তরুণ-তরুণীরা একটা বিষয়ে কিন্তু একমত—ধর্মনিরপেক্ষতা ভালো, সুনীতি, উদারতার লক্ষণ।

ছাত্র থেকে অধ্যাপক, আমলা থেকে রাজনীতিবিদ প্রত্যেকেই মনে করে, ধর্মীয় রাষ্ট্রের চেয়ে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র অনেক বেশি উদার ও প্রগতিশীল, আধুনিক ভাবনার ফসল। অর্থাৎ রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র যে অগ্রবর্তী মানসিকতার প্রমাণ এ'বিষয়ে শিক্ষিত সমাজ এক মত।

বুদ্ধিজীবীদের ধারণায়—উত্তর আধুনিক ভাবনার ফসল ধর্মনিরপেক্ষ নীতি, ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। এ'সবই সুসংকেত—কিন্তু সংকেত মাত্র। আস্তরিকতার কোনও পরিচয় আমরা এখনও অবধি পাইনি। কিছু বুদ্ধিজীবী ভারতীয় জনতা পার্টির হিন্দুত্ববাদকে একমাত্র বিপদ বলে মনে করেন। এই মনে করাটা অতিসরলীকৃত, অজ্ঞাতপ্রসূত ভ্রান্তি, অথবা লুকানো সুবিধাবাদ। ধর্মনিরপেক্ষতাকে বাঁচাতে হলে অনেক তত্ত্ব থেকে উপাদান আহরণ করতে হবে।

কিছু বুদ্ধিজীবী ভারতীয় জনতা পার্টির পরিবারকে নানাভাবে আক্রমণ চালিয়ে, তাদের 'নন-সেকুলার' চরিত্রকে বে-আব্রু করেই সামাজিক দায়বদ্ধতা পালন করেছেন। অ-বিজেপি বুদ্ধিজীবীরা তাঁদের সমর্থক রাজনৈতিক দলের গুণমুগ্ধ হয়ে যে দাবিই করুন না কেন, তাঁদের দল যেমন ছিল, তেমনটিই আছে। সাম্প্রদায়িক, অধর্মনিরপেক্ষ।

‘রাষ্ট্র’ হলো

শ্রেণীবিভক্ত সমাজে রাজনৈতিক

ক্ষমতার হাতিয়ার। যে কোনও রাষ্ট্রের মূল কথা

একই—অর্থনৈতিকভাবে আধিপত্যশীল

শ্রেণীর একনায়কত্ব।

ভারতেও একইভাবে ধনী জোতদার, বেনিয়া ও শিল্পপতিদের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত। এরই মাঝে দেশি ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের হাত ধরে ঢুকে পড়েছে বিদেশের বড় বড় কিছু বহুজাতিক সংস্থা। এই জোতদার থেকে বহুজাতিক সংস্থার জোট নিজেদের আড়ালে রেখে এদেশের আর্থিক, সাংস্কৃতিক, রাজনীতির নিয়ন্ত্রা। ভারতের নির্বাচনী রাজনীতিতে এই ধনীক-জোটের কালো টাকার অনুপ্রবেশ ঘটেছে। বিপুল কালো টাকা, বা হিসাব বহির্ভূত টাকা বিভিন্ন বড় রাজনৈতিক দলের পিছনে, বিশিষ্ট প্রার্থীদের পিছনে ঢালার প্রক্রিয়া দীর্ঘকাল ধরে এ দেশে চলে আসছে। প্রয়োজনে বিধায়ক ও সাংসদ কেনার কালো টাকা আসে এই ধনকুবেরদের কাছ থেকেই। নির্বাচনের পর এই ধনীরা তাদের বিনিয়োগের বিনিময়মূল্য দাবি করবেই। আদায় করে নেবে সুদে আসলে। বিধানসভায় ও লোকসভায় আইন এভাবেই তৈরি হয় যাতে, আইন মেনেই শোষণের মধু খাওয়া যায়।

অর্থনৈতিক আধিপত্যশীল শ্রেণীর সহযোগী হিসেবে নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণে এক পায়ে খাড়া মন্ত্রী, আমলারা। ওঁরা অসাংবিধানিক বিশেষ ক্ষমতা বলে ঋণ মুকুব থেকে পারমিট বিতরণের মত কাজ করে দেওয়ার বিনিময় মূল্য কুড়ানোকেই ধ্যান-জ্ঞান করে থাকেন। পদে বহাল থাকার সময় বড় অল্প। কত তাড়াতাড়ি পদকে কাজে লাগিয়ে দেশি-বিদেশি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টকে ভারী করা যায়, এটাই ওঁদের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ধনী জোতদার-ব্যবসায়ী-শিল্পপতিরা দেশ শাসনের ঝামেলা কাঁধে না নিয়ে নিজেদের মুনাফা বাড়াবার দিকে মনোনিবেশ করেছে। আর দেশ শাসনের নামে রাজনৈতিক দল ও রাজনীতিকরা ঘুষখোরি কৃতজ্ঞতা দেখিয়ে শোষক শ্রেণীর ইশারা পালন করে চলেছেন। ফলে দেশের অর্থনীতি, শিক্ষানীতি, স্বাস্থ্যনীতি, কৃষিনীতি, শিল্পনীতি, ধর্মনীতি, বলাতে কি, গোটা সংস্কৃতিনীতির মূল নির্ধারক শক্তি ধনী জোতদার, বেনিয়া, শিল্পপতি ও বহুজাতিক সংস্থা।

যদিও শোষকশ্রেণীর সঙ্গে শাসকশ্রেণীর এই দেওয়া-নেওয়া সম্পর্কের ব্যাপারটা কাঁটায় কাঁটায় সত্যি, তবু এই সত্যটা সাধারণ মানুষ দেখতে পান না। কারণ ধনী শোষকশ্রেণী সরাসরি নিজেরা নীতি নির্ধারণ করে না, আইন প্রণয়ন করে না। এসব করার জন্য ঝুলি পেতে বসে রয়েছে তাদের সহায়ক শক্তি। এই সহায়ক শক্তি হলো, সরকার, বড় বিরোধী দল, বড় রাজনীতিক, আমলা, পুলিশ, প্রশাসন, সেনা, প্রচারমাধ্যম ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি।

ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতা

কতটা ধর্ম-বর্জিত নিরপেক্ষ থাকবে,
কতটা সুবিধাবাদী হয়ে সব ধর্মকেই তোলাই
দেওয়ার কাজ চালিয়ে যাবে—সবই শেষ
পর্যন্ত ঠিক করে দেয় অর্থনৈতিক
আধিপত্যশীল শ্রেণী।

ভারতের বুদ্ধিজীবীদের বড় অংশের দ্বারা সংজ্ঞায়িত ‘ধর্মনিরপেক্ষতা’ শব্দের মধ্যে লুকানো রয়েছে সাম্প্রদায়িকতা ও সুবিধাবাদের উপস্থিতি। কারণ বুদ্ধিজীবীরা জেনে, না জেনে যন্ত্র। শোষকশ্রেণী যন্ত্রী। আর প্রচারমাধ্যম দু-য়ের মাঝের যোগসূত্র, দালাল।

ধর্মনিরপেক্ষতার সংকট শুধু ভারতের মাটিতে শিকড় গাড়েনি। যে রাষ্ট্রেই হুজুরেরা অর্থনৈতিক একাধিপত্যের স্টিয়ারিং নিজের দখলে রেখেছে, সেখানেই মেকি-গণতন্ত্র, মেকি-ধর্মনিরপেক্ষতা হাজির। সংকট হাজির। গত এক দশকে অবিশ্বাস্য গতিতে সমাজতান্ত্রিক দুনিয়া জুড়ে যে ধস নেমেছে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের অনুপস্থিতির সুযোগে, তাতে জনগণের গণতন্ত্রের চিন্তা বিরাট ধাক্কা খেয়েছে।

পৃথিবীর একটা বড় অংশ জুড়ে
যে ‘বুর্জোয়া গণতন্ত্র’ গণতন্ত্রের নামে জাঁকিয়ে
বসেছে, তা কোথাও জনগণের গণতন্ত্র হয়ে ওঠেনি।
এই গণতন্ত্র শেষ পর্যন্ত বুর্জোয়া বা শোষকশ্রেণীর
শোষণ-গতি মসৃণ রাখার তন্ত্র।

‘উদার অর্থনীতি’র উদারতা হুজুরশ্রেণীর প্রতি উদারতা। আর ‘ধর্মনিরপেক্ষতা’ হলো, সুবিধে বুঝে বিভিন্ন ধর্মের প্রতি প্রশংসাপাত দেখান। ধর্মকে রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে পালন ও পুষ্ট করা। বিপ্লব রাখার স্বার্থে পালন ও পুষ্ট করা।

ধর্মনিরপেক্ষতা : বিশ্ব জুড়ে ফাঁদ পেতেছে

ইউরোপ, আমেরিকা, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া রাষ্ট্রগুলো ধর্মনিরপেক্ষ তকমায়ে উজ্জ্বল ও গর্বিত। শুধু ভারত নয়, তামাম তৃতীয় বিশ্বের দেশও মেনে নিয়েছে—ওদের আদর্শ ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসেবে। দেশ মেনে নিয়েছে, মানে—দেশের বুদ্ধিজীবীরা মেনে নিয়েছেন, রাষ্ট্রশক্তি মেনে নিয়েছে। ফলশ্রুতিতে মেনে নিয়েছে দেশের আমজনতা। অথচ ‘ধর্মনিরপেক্ষ’ সুসভ্য সাদা চামড়ার দেশগুলোতে রাষ্ট্র পরিচালনায় ক্রিস্টান ডেমোক্র্যাট, ক্রিস্টান সোসিয়ালিস্ট ইত্যাদি নামের পার্টিগুলো জাঁকিয়ে রয়েছে। তারজন্য তৃতীয় বিশ্বের কোনও লেখক বা বুদ্ধিজীবী এইসব রাষ্ট্রগুলোকে ‘পিছিয়ে থাকা দেশ’ হিসেবে চিহ্নিত করেন না। আমাদের দেশের বুদ্ধিজীবীদের অসুবিধে অবশ্য্য বুঝি। তাঁরা সত্যটা বুঝতে পারলেও বলতে ভয় পান। ইউরোপ, আমেরিকার রাষ্ট্রগুলো তাঁদের ‘কালো তালিকা ভুক্ত’ করলে বিনে পয়সায় ওসব দেশ ভ্রমণের ইচ্ছের কফিনে পেরেক পোতা সাজ হবে।

এইসব ধর্মনিরপেক্ষ অভিজাত দেশগুলোর দিকে স্বচ্ছ চোখে তাকালেই দেখতে পাবেন খ্রিস্টধর্ম-সংখ্যাগুরুদের ধর্ম। বিধর্মীদের সঙ্গে রাষ্ট্রের প্রচ্ছন্ন বিরোধীতা আছে। এইসব উন্নত রাষ্ট্রগুলো তাই শুধুমাত্র খ্রিস্টধর্মীয়দের পক্ষেই বার বার এককাটা হয়ে সোচ্চার হয়েছে।

**ভারতে খ্রিস্টধর্মীয়রা অত্যাচারিত
হলে যে ক্ষোভ, উদ্ভা ওইসব অভিজাত রাষ্ট্রের
নায়করা প্রকাশ করেছেন, সেই ক্ষোভ বা উদ্ভা কখনই
প্রকাশ পায়নি, ভারতে অখ্রিস্টিয় কোনও
সংখ্যালঘু অত্যাচারিত হলে।**

এই উদ্ভার কারণ এই নয় যে, অত্যাচারের শিকার মানুষগুলো ও'সব দেশের নাগরিক। ভারতের নাগরিক কিন্তু ধর্মে খ্রিস্টান মানুষদের ওপর আক্রমণ হলে, গীর্জায় আক্রমণ হলে ও'সব ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের খ্রিস্টপক্ষীয় চরিত্র বেআব্রু হয়ে পড়ে। ওরা প্রয়োজনে 'ধর্মনিরপেক্ষ' হয়, প্রয়োজনে ধর্মনিরপেক্ষতা বর্জন করে।

খ্রিস্টধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো উন্নত রাষ্ট্রগুলোর অকুণ্ঠ-সহযোগিতায় পাঁচটি মহাদেশেই জাঁকিয়ে বসেছে। আর্থিক সহযোগিতা আসছে অনেক সময় একটু ঘুর পথে। সোভিয়েত রাশিয়া এক সময় সেই দেশ থেকে ভারতীয় বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত পত্র-পত্রিকা-বই দান হিসেবে পাঠাত কমিউনিস্ট পার্টি অব ইন্ডিয়াকে। কমিউনিস্ট পার্টি খোলা বাজারে সে-সব বই-পস্তর বিক্রি করে এ'দেশে পার্টি চলবার খরচ তুলতো। একই খেলা চলছে খ্রিস্টধর্ম প্রচারের রাজনীতির বেলায়। ভারতের বিভিন্ন খ্রিস্টধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে দান হিসেবে বিদেশ থেকে আসছে গুঁড়ো দুধ, ভোজ্য তেল ইত্যাদি ভোজ্যসামগ্রী। তারপর এ-সবই খোলাবাজারে বিক্রি করে টাকায় রূপান্তরিত করে ভারতের আদিবাসী গ্রামগুলোতে খ্রিস্টধর্মের প্রচারে ব্যয় করা হচ্ছে। চার বাঁশের খুঁটির ওপর টিনের চাল দিয়ে যে মিশনারী প্রতিষ্ঠান বা চার্চ এ-দেশে কাজ শুরু করেছিল, তারা কয়েক বছরেই দশ-বিশ বিঘার জমির চৌহদ্দিতে বিরাট পাকা বাড়ি ফেঁদে ফেলেছে। চিত্রটা ভারতের সর্বত্রই এক। আমদানি করা দান খোলাবাজারে বিক্রি হচ্ছে, সরকার আমদানি শুল্ক পাচ্ছে না। কিন্তু সরকার বা রাজনৈতিক দলগুলোর তাতে মাথা ব্যথা নেই।

ভারতে শিকড় গাড়া চার্চগুলো কাউকে জোর করে ধর্মান্তরিত করে না। তবে খ্রিস্টধর্ম নিলে তাদের বিনে পয়সায় রেশন মেলে, চিকিৎসা মেলে, শিক্ষা মেলে, হাতের কাজ শেখানো হয়। ফলে ধর্মান্তরের রাজনীতি চলছে। একটু ভালো করে বাঁচার হাতছানি দিচ্ছে চার্চগুলো। খ্রিস্টধর্ম না নিলে এ'সব সেবা বা সাহায্য অধরাই থেকে যায়। এ'টাই চার্চ রাজনীতির স্বরূপ চিনিয়ে দেয়—ওরা নিঃস্বার্থ সেবার মহৎ

ব্রত নিয়ে আসেনি। ওদের নীতি, এক হাতে নাও, এক হাতে দাও। এই নীতিই পাঁচ মহাদেশ জুড়ে। খ্রিস্টধর্ম প্রচারের মধ্যে ধর্মের ব্যাপারটা গৌণ। রাজনীতিটাই মুখ্য। বিশ্ব জুড়ে খ্রিস্টধর্মীদের ‘ভাতৃত্ববোধ’ চাগিয়ে তোলার রাজনীতি।

নভেম্বর ‘৯৯ এর মাঝামাঝি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের প্রধান কে এস সুদর্শন ঘোষণা করেছেন—খ্রিস্টধর্ম প্রচারের রাজনীতির তাঁরা বিরোধী। এই বক্তব্যে বহু রাজনীতিক, বুদ্ধিজীবী ও প্রচারমাধ্যম উগ্র হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির গন্ধ পেয়েছেন। ধিক্কার জানিয়েছেন। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ এদেশের কয়েক হাজার গ্রামে অবৈতনিক শিক্ষা, হাতের কাজ শিখিয়ে স্বনির্ভর করে তোলা কর্মসূচী নিয়েছে। জোর কদমে কাজ চলছে। ওরা চার্চের মতই সেবার ভেতর দিয়ে হিন্দুধর্ম প্রচারের রাজনীতি করছে। এই হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির বিরুদ্ধে সরব বামপন্থী-ডানপন্থী বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিক। ধর্মের রাজনীতির বিরুদ্ধে সরবতা নিশ্চয়ই ভালো। কিন্তু খ্রিস্টধর্ম প্রচারের রাজনীতির বিরুদ্ধে এই সরব মুখগুলো নীরব কেন? কেন এই পক্ষপাত? এই পক্ষপাতের আর এক নাম সুবিধাবাদ, দুর্নীতি।

রাষ্ট্রে-রাষ্ট্রে লড়াই দু-দেশের নাগরিকদের পরস্পরকে ঘৃণা করতে শেখায়। রাষ্ট্রের লাগাতার প্রচারে জনতা জাতীয়তাবোধের জ্বরে আক্রান্ত হয়। ভাবতে শুরু করে এ যুদ্ধ তার নিজের যুদ্ধ।

**জনতা ভাবে—জনগণই রাষ্ট্রের সার্বভৌমতার
ধারক-বাহক-আধার। জনগণই রাষ্ট্র। অথচ মজাটা হলো,
শ্রেণীবিভক্ত সমাজে রাষ্ট্র মুষ্টিমেয় ধনীকশ্রেণীর
রাজনৈতিক ক্ষমতার হাতিয়ার।**

শোষক ও শোষিতের শ্রেণীতে বিভক্ত সমাজে ‘রাষ্ট্রশক্তি’ মানে—অর্থনৈতিক আধিপত্যশীল শ্রেণীর একনায়কত্ব বজায় রাখার শক্তি। বাস্তবে এই রাষ্ট্রশক্তি জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন ও অর্থনৈতিকভাবে জনশোষণ-বজায় রাখার শক্তি।

প্রাচীন যুগে রাজায় রাজায় যুদ্ধ হতো। তাতে সাধারণ প্রজাদের মধ্যে জাতীয়তাবাদের কোনও হেলদোল ছিল না। এক রাজা যেত, আর এক রাজা আসতো। সাধারণ প্রজারা রাজা বদলের খবরও রাখতো না। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্র নিপুণ কৌশলী হয়েছে। নাগরিকদের মধ্যে ‘জাতীয়তাবোধ’, ‘জাতীয়চেতনা’ ইত্যাদি অদ্ভুত মোহময় শব্দের গোলাগোলা ধারণা ঢুকিয়ে দিয়েছে। এই ‘জাতীয়চেতনা’ হজুর শ্রেণীর ধনীজাতের চেতনার সঙ্গে মজুর শ্রেণীর গরীবজাতের

চেতনা, শোষকদের চেতনার সঙ্গে শোষিতের চেতনাকে পরিকল্পিতভাবে একাকার করে দিয়েছে। একই পংক্তিতে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। ফলে বারবারই শব্দব্রহ্মের গোলকধাঁধায় আবেগতাড়িত গরীবজাতির মানুষ তাদের নিজ গোষ্ঠীর জাতীয়চেতনা, শ্রেণীচেতনা ভুলে শোষক ধনীজাতীয় মানুষদের সঙ্গে সামিল হয়েছে। শ্রেণীবিভক্ত সমাজকে টিকিয়ে রাখতে ‘রাষ্ট্র’ শব্দটির যে সংজ্ঞাটিকে টিকিয়ে রাখার প্রক্রিয়া চলেছে, তা হলো—‘রাষ্ট্র’ মানে নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, ভূখণ্ডের জনগণ, সরকার ও সার্বভৌমত্ব। এই ‘রাষ্ট্র’ সংজ্ঞার সঙ্গে সাম্য চিন্তার মানুষদের ‘রাষ্ট্র’ সংজ্ঞা মেলে না।

একবিংশ শতকেও আয়ারল্যান্ড থেকে ইউনাইটেড সোভিয়েত সোসালিস্ট রিপাবলিক ভেঙে গড়ে ওঠা নব্য-গণতন্ত্রী অনেক রাষ্ট্রে ধর্মের ভিত্তিতে লড়াই চলেছে। লক্ষ্য করার বিষয়—সোভিয়েত রাশিয়ায় ধর্মীয় বিরোধ ছিল না। এ’সব বিরোধ ধর্মহীন রাষ্ট্র-কাঠামো ভেঙে পড়ার পরের ঘটনা। গণতন্ত্রের পশ্চিমী হাওয়া প্রবেশের পরের ঘটনা। আবার ইরাক ইরানের যে দ্বন্দ্ব—তার মূলে রয়েছে ইসলাম ধর্মের ভিতরকার সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ।

ইউরোপ, আমেরিকা, কানাডা, অস্ট্রেলিয়ার মত জ্ঞান-বিজ্ঞানে এগিয়ে থাকা দেশও ধর্মে-ধর্মে লড়াইকে এড়াতে পারেনি। একাধিক ধর্মকে জিইয়ে রাখা যেমন ধর্মে-ধর্মে বিরোধের প্রাথমিক শর্ত, তেমনই ধর্মে-ধর্মে বিরোধের আরও একটি কারণ হলো বুর্জোয়া রাষ্ট্রের কপট ধর্মনিরপেক্ষতা। এইসব বুর্জোয়া সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলো ধর্মকে ব্যক্তিগত বিষয় বলে ঘোষণা করলেও শেষ পর্যন্ত ধর্মকেই প্রতিষ্ঠা করতে চায়। আর তাই, রাষ্ট্রীয় জীবনে বা রাষ্ট্রীয় নীতিতে অনেক সময়ই ধর্ম প্রকাশ্যে ও প্রবলভাবে হাজির হয়।

উন্নত গণতন্ত্রী ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলোর দাদা রাষ্ট্র আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে অপ্রিস্টিয়ের রাষ্ট্রপতি হওয়ার অধিকার অর্জিত হয়নি আজও।

তারচেয়ে ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র অনেক বেশি ভণ্ডামী মুক্ত। ভারতে হিন্দুধর্ম সংখ্যাগুরুদের ধর্ম। তারপরও এদেশের প্রধানমন্ত্রীর পদে বসেছেন পার্শী রাজীব গান্ধি, নিরিশ্বরবাদী ইন্দ্রকুমার গুজরাল। রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হয়েছেন মুসলিম জাকির হুসেন।

‘ধর্মনিরপেক্ষ’ কথার অর্থ, কোনও ধর্মের পক্ষে নয়। এই অর্থ বা সংজ্ঞার জোরেই আজও কিছু ভারতীয় সোরগোল তুলতে পারেন—এ দেশের রাষ্ট্রনায়করা

কেন ধর্মসভায় যাবেন, কেন ধর্মগুরুদের সঙ্গে বেশি গা ঘষাঘষি করবেন? এ দেশের প্রগতিশীলদের চোখে এই ধরনের রাষ্ট্রনায়কেরা প্রগতিবিরোধী হিসেবে চিহ্নিত হন। অনেক পত্র-পত্রিকাই এসব নিয়ে তীব্র ভাষায় সম্পাদকীয় লেখেন। ইউরোপ থেকে আমেরিকার সেকুলার স্টেটের রাষ্ট্রনায়করা পোপের মুখোমুখি হলেই ভক্তির আতিশয্যে গলে একেবারে পোপের পদকমলে। চার্চগুলোর অধিপতিদের কাছে নতজানু হওয়াটা ওসব উচ্চকোটির রাষ্ট্রনায়কদের কাছে জল-ভাত। ওসব রাষ্ট্রের স্লোগান—‘ধর্মবিশ্বাসের স্বাধীনতা’ তাই শেষ পর্যন্ত ধর্মবিশ্বাস থেকে মুক্তির ও মুক্ত থাকার স্বাধীনতা হয়ে ওঠেনি।

যারা নিজেদের ‘ধর্মীয় রাষ্ট্র’

হিসেবে ঘোষণা করেছে, তারা অসম্পূর্ণ রাষ্ট্র। রাষ্ট্রের ধর্ম ছাড়া অন্য ধর্মের মানুষ সেখানে হয় শত্রু, নতুবা বড় জোর আশ্রিত। বিধর্মীদের কোন রাজনৈতিক স্বাধীনতা নেই।

রাষ্ট্র-ধর্মের বিরুদ্ধে বলার কোনও স্বাধীনতা নেই। পাকিস্তানের ‘জং’ পত্রিকায় প্রকাশিত একটি খবর—এক খ্রিস্টান পাদরী পাকিস্তানের এক রেস্টোরায়ে আল্লার বিরুদ্ধে কিছু খারাপ কথা বলেছেন, রেস্টোরার এক শ্রোতার অভিযোগের ভিত্তিতে আদালত পাদরীকে ফাঁসির ছকুম দেয়। রাষ্ট্রের এই ধরনের ধর্মীয় স্বৈচ্ছাচারিতা, অসম্পূর্ণতা-ই নগ্ন করে। মধ্যপ্রাচ্য, আফ্রিকা ও এশিয়ার বহু রাষ্ট্রই ‘ধর্মীয়-রাষ্ট্র’। এইসব দেশে ‘রাষ্ট্র-ধর্ম’ আর ‘মধ্যযুগের ‘রাজধর্ম’ একই। সেই একইভাবে নাগরিকদের জোর করে ধর্মের বড়ি গেলানো। ধর্মীয় রাষ্ট্রে শ্রেণীসংগ্রাম, বিপ্লব তো দূরঅন্ত; শোষিত, অত্যাচারিত মানুষদের পক্ষে রাজনীতির প্রথম পাঠও অসম্ভব। চরম স্বৈরাচারীদের সঙ্গে খোলা রাজনীতি করার মত রাজনৈতিক দল গড়ে তোলা অসম্ভব। ধর্মীয় রাষ্ট্রের শাসকরা রাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে দুর্বল, কিন্তু পেশীশক্তিতে প্রবল বিক্রমশালী।

তবু বলবো, এইসব ধর্মীয় রাষ্ট্র চরিত্র বোঝা সহজ। কারণ এদের ভেতর বাইরে খোলা-মেলা, স্পষ্ট দেখা যায়। ভণ্ডামি নেই। বড় কঠিন গণতন্ত্রের পীর-পয়গম্বর রাষ্ট্রগুলোর ধর্মনিরপেক্ষতার আড়ালের চরিত্রকে চিনে নেওয়া।

ভারতীয় সংবিধানে ঢুকে পড়লো ‘ধর্মনিরপেক্ষ’ শব্দটি

১৯৫০-এর ২৬ জানুয়ারি ভারতের সংবিধান কার্যকর হলো। এই সংবিধান তৈরির কাজ শুরু হয়েছিল ব্রিটিশ শক্তির ক্ষমতা হস্তান্তরেরও আগে। ১৯৪৬-এর ৯

নভেম্বর সংবিধান রচনাকারী সভায় ভারতীয় সংবিধানের মূল উদ্দেশ্য নিয়ে একটি প্রস্তাব পেশ করেন জওহরলাল নেহরু। প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। প্রস্তাবে নেহরু বলেছিলেন, ভারতের সংবিধানের মুখবন্ধে বা Preamble-এ ঘোষণা রাখা হবে, ‘আমরা ভারতের জনগণ বিধিসম্মতভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছি যে, ভারত গঠনতাত্ত্বিকভাবে সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র।’ এবং ভারতের প্রতিটি অধিবাসীই রাষ্ট্রের কাছে পাবে ‘সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায়বিচার’। প্রত্যেকের চিন্তার, মত প্রকাশের ও বিশ্বাস মত ধর্ম আচরণের স্বাধীনতা থাকবে। অর্থাৎ বিশেষ কোনও একটি ধর্মকে ‘রাষ্ট্র-ধর্ম’ হিসেবে গ্রহণ করা হলো না। আবার সংবিধান স্পষ্টভাবে জানালো না যে—ধর্মের সঙ্গে রাষ্ট্র যুক্ত থাকতে পারবে, অথবা বিযুক্ত থাকবে।

১৯৭৫-এ শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধি এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায়কে অমান্য করে প্রধানমন্ত্রীর গদিতে টিকে থাকতে চাইলেন। তাঁর এই বে-আইনি ও অনৈতিক কাজের বিরুদ্ধে বিরোধী রাজনৈতিক দল ও জনতার কণ্ঠ যাতে সোচ্চার না হয়, তাই ‘জরুরী অবস্থা’ জারি করলেন। গণতন্ত্রের ওপর স্বৈরাচারী বুলডোজার চালানোয় বিশ্ব জুড়ে টি টি পড়ে গেল। নিজের স্বৈরাচারী দুর্নাম অন্তত রুশ শিবিরের দেশগুলোর কাছে ঘুচুক—এই কথা মাথায় রেখে গেমপ্ল্যান তৈরি করতে বসলেন। গেমপ্ল্যান মার্কিন সংবিধান সংশোধন করে ভারত রাষ্ট্রের চরিত্রকে প্রগতিশীল পোশাক পরালেন। ‘সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র’-এর মাঝে ‘সমাজতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ’ শব্দ দুটি সংবিধানের মুখবন্ধ (Preamble)-এ জুড়ে দিলেন, ৪২ তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে। পৃথিবীর তিন ভাগের এক ভাগ দেশ যখন সমাজতান্ত্রিক ছাতার তলায় ধর্ম বিচ্ছিন্ন দেশ, তখন ভারতকে সমাজতন্ত্রের ও ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শে বিশ্বাসী দেশ হিসেবে হাজির করে সহানুভূতির হাওয়া টানতে চাইলেন শ্রীমতী গান্ধী। এতে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের দেশগুলোর অনেককেই পাশে পেলেন। তাৎক্ষণিক স্বার্থ চিন্তায়, নিজের অজান্তেই বড় মাপের কাজ করে ফেললেন। রাষ্ট্রকে সংবিধানগতভাবে ‘সমাজতন্ত্রী’ অর্থাৎ সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সব রকমের শোষণ মুক্ত করলেন এবং ‘ধর্মনিরপেক্ষ’ অর্থাৎ রাষ্ট্রকে স্পষ্টতই ধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন করলেন। রাষ্ট্রের প্রতীক রাষ্ট্রপতি, মন্ত্রী, সাংসদ, বিধায়ক ও সরকারী আমলাদের প্রকাশ্যে ধর্ম আচরণ অসংবিধানিক হয়ে গেল, বেআইনি হয়ে গেল।

কোনও সংজ্ঞা ছাড়াই ‘সমাজতান্ত্রিক’ ও ‘ধর্মনিরপেক্ষ’ বিশেষণ দুটি আমাদের সংবিধানের সংশোধনী বিলে ঢুকে পড়লো। এটা কি বিশাল ভুল ছিল? নাকি পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলি ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির সংবিধানে শব্দ দুটির সংজ্ঞা এতই স্পষ্ট ও অবিতর্কিতভাবে উঠে এসেছে যে, আবার করে সংজ্ঞা দেওয়া সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় মনে হয়েছিল? আমরা ধরে নিতেই পারি, দ্বিতীয় কারণটাই ঠিক। আমাদের

সংবিধানের 'সার্বভৌম' শব্দের সংজ্ঞাও দেওয়া নেই। নেই অপ্রয়োজনীয় বিবেচনায়। একইভাবে অপ্রয়োজনীয় বা বাড়তি বিবেচনায় 'ধর্মনিরপেক্ষ' শব্দের সংজ্ঞা সংবিধানে টেনে আনা হয়নি। 'সার্বভৌমত্ব' শব্দের সংজ্ঞাও কিন্তু আমাদের সংবিধানে নেই। কারণ নিশ্চয় একই। এইসব সংজ্ঞা এতটাই আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে যে, নতুন করে সংজ্ঞা হাজির করা অপ্রয়োজনীয়।

আরও একটা কথা এই প্রসঙ্গে টেনে আনা অপ্রাসঙ্গিক হবে না মনে হওয়ায় এখানে আলোচনায় আনছি।

**১৯৮৯ সালে রিপ্রেজেন্টেশন অফ দ্য
পিপল (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট-এর ২৯(এ) ধারায়
বলা হয়েছে, কোনও রাজনৈতিক দল অধর্মনিরপেক্ষ
কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত হলে সেই দলের
স্বীকৃতি খারিজ করা হতে পারে।**

স্বৈরাচারীদের আইনকে মান্য করার প্রয়োজন হয় না। শ্রীমতী গান্ধিরও হয়নি। তিনি মন্দির, মসজিদ, গীর্জা, গুরুদুয়ারায় প্রকাশ্যে ভক্তি উজাড় করতে লাগলেন। ভোটারদের কাছে তাঁর ধর্ম-ভক্তির রূপটাই ছিলে ধরতে চাইলেন। 'দুদু খাবো, তামুকও খাবো'—প্রবাদটির অসাধারণ উদাহরণ শ্রীমতী গান্ধি।

তারপর থেকে ধর্মনিরপেক্ষতার প্রশ্নে সব রাজনৈতিক দলই শ্রীমতী গান্ধির কৌশল অনুসারি। সবাই আজ কৌশল-পাটি। ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি বিসর্জন দিয়ে ধর্মনিরপেক্ষতার পক্ষে নৈতিক সংগ্রাম চালাবার স্লোগান দিচ্ছে। নীতি বিসর্জন দিয়ে নৈতিক সংগ্রাম চালানো যায় না। চালানো যায় ভণ্ডামী। 'ঠগ বাছতে গাঁ উজাড়'। কাদের ওপর ভরসা রাখবো? কাদের কাছে অভিযোগ জানাবো? অন্ধকার মেঘ আরও ঘন হয়ে আসছে, সাম্যের স্বপ্ন দেখা মানুষগুলোর কাছে। বিপ্লবের প্রত্যাশা যাঁরা জাগিয়েছিলেন, তাঁরাই আজ ছাঁদা বাঁধতে ব্যস্ত।

ভারতীয় সংবিধানে 'ধর্মনিরপেক্ষ' শব্দটি আজও ছাপার অক্ষরের বাইরে বেরিয়ে আসতে পারেনি। ভণ্ডামী আমাদের সংবিধান রচনা থেকেই শুরু। সর্বত্রগামী ভণ্ডামী আজ এতটাই জাতীয় মাত্রা পেয়েছে যে, এই নিয়ে মাথা ঘামানোটাই পাগলামী বলে মনে করে পাবলিক। শক্তিত হওয়ার মতই ঘটনা।

নানা 'সিভিল ল' : সামন্ততান্ত্রিক সমাজে ধর্মনিরপেক্ষতার ফাঁসি

ভারতের ৭০ শতাংশ মানুষ এখনও কৃষিক্ষেত্র থেকে জীবিকা অর্জন করেন।

কৃষিজীবীদের বেশির ভাগই ভূমিহীন কৃষক বা ক্ষুদ্র চাষি। জমিদারি প্রথা বিলুপ্ত। কিন্তু বৃহৎ চাষি বা জোতদারদের প্রভাব প্রবল। তারা সামন্তপ্রভু। নিজস্ব সেনাবাহিনী পুষে সমান্তরাল শাসন চালিয়ে যাচ্ছে দাপটে। কেন্দ্রীয় সরকার থেকে রাজ্য সরকার—সর্বত্র সামন্তপ্রভু ও জোতদারদের ‘লবি’ জোরদার। ফলে

সার, বিদ্যুত, সেচের জল ইত্যাদি
কৃষি উৎপাদন সামগ্রীতে সরকার ঢালাও
ভরতুকি দিয়ে চলেছে। তারই সঙ্গে চলছে কম সুদে কৃষি
ঋণ, কৃষি ঋণ মুকুব ইত্যাদি। এসবেরই পুরো লাভ
তোলে ধনী কৃষিজীবী বা জোতদার। গরীব
কৃষকদের এইসব কৃষি উৎপাদন সামগ্রী
ব্যবহার করার মত সামর্থ নেই।

ছোট কৃষকরা ফলনের পরে খুব বেশি দিন উৎপাদন ধরে রাখতে পারেন না। ফলনের কিছুদিন পরেই ছোট কৃষকদের উৎপাদন বড় কৃষকদের হাতে চলে যায়। বছরের বেশিরভাগ সময় বড় কৃষকরাই কৃষিপণ্যের বাজার নিয়ন্ত্রণ করে। তুলোর লবি, আখের লবি, গমের লবি, ভোজ্য তেলের লবি ইত্যাদি লবির রাজনীতিকরা বড় কৃষকদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে থাকে। জোতদার মহাজনদের এই শোষণের হাত থেকে ছোট কৃষকদের বাঁচাতে প্রয়োজন ছিল কৃষক সমবায় আন্দোলন। কিন্তু বাম-ডান নির্বিশেষে কৃষক সমবায় গড়ার চেষ্টা না করে কৃষকদের দিয়ে শুধু বইয়ে চলেছে দলীয় ঝগড়া।

এই আধা-সামন্ততান্ত্রিক সমাজে রয়েছে জাতপাতের বিভেদ, ধর্মে-ধর্মে বিভেদ। এই বিভেদ সৃষ্টিকারী সমাজপতিরাই রয়েছে রাজনৈতিক নেতৃত্বে। এদেশের রাজনীতি তাই জাতপাতের ভিত্তিতে, সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে, ভাষার ভিত্তিতে, আঞ্চলিকতার ভিত্তিতে, এলাকার ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। এই খণ্ডিত রাজনীতি আধা-সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থারই ফল। এই খণ্ডিত রাজনীতির ফলেই এসেছে বিভিন্ন জাত-সম্প্রদায়-ধর্মগোষ্ঠীকে খুশি করে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলে রাখার প্রয়াস। ফলে পদে পদে স্ববিরোধিতা, দুর্নীতি হাত ধরাধরি করে বিভিন্ন সময় রাজনীতিকে প্রভাবিত করেছে। তার প্রতিফলন ঘটেছে সংবিধানেও। একটা ধর্মনিরপেক্ষ দেশের সংবিধানে ধর্মের ভিত্তিতে ‘সিভিল ল’ বা দেওয়ানি আইন ভিন্ন ভিন্ন।

অর্থনীতির নিরিখে উন্নত দেশগুলোর
 'এক দেশ, এক আইন' নীতি মেনে 'সিভিল ল'
 তৈরি হয়েছে। বুর্জোয়া রাষ্ট্রের 'এক দেশ, এক আইন'
 নীতিকে আমাদের মত পিছিয়ে থাকা দেশের
 সংবিধানে জায়গা দেওয়া সম্ভব হয়নি।

ভারতে মুসলিম সমাজ মানে—মুসলিম পুরুষদের সমাজ। নারীরা সেখানে শোষিতদের মধ্যেও শোষিত। শাহবানু এই ভারতের মুসলিম সমাজের এক ব্যতিক্রমী নারী। মুসলিম পুরুষ সমাজের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করা এক ব্যতিক্রমী নারী। শাহবানুর বিবাহিত সঙ্গী তালাক দিয়েছিল শাহবানুকে। শাহবানু খোরপোশের দাবি জানিয়েছিলেন প্রাক্তন বরের কাছে। প্রাক্তন বর মুসলিম ধর্মীয় নিয়মের দোহাই দিয়ে খোরপোশের দাবি খারিজ করলো। শেষ পর্যন্ত শাহবানু আদালতের দ্বারস্থ হলেন। মামলা গড়ালো সুপ্রিম কোর্ট অর্থাৎ ভারতের সর্বোচ্চ আদালত পর্যন্ত। সুপ্রিম কোর্ট রায় দিল, শাহবানুকে খোরপোশ দিতে হবে। মুসলিম পুরুষ সমাজ সুপ্রিম কোর্টের এই রায় মেনে নিতে রাজি হলো না। ভারতের তামাম রাজনৈতিক দলগুলো জানে—ভারতের মুসলিম পুরুষ সমাজ মানেই মুসলিম সমাজ। মুসলিম নারীরা মুসলিম পুরুষদের সম্পত্তি মাত্র। ওঁরা স্বতন্ত্র ব্যক্তি হয়ে উঠতে পারেননি। মুসলিম সমাজের পুরুষদের খুশি করে মুসলিম ভোট এককাট্টা করতে রাজীব গান্ধির নেতৃত্বাধীন সরকার রাতারাতি বিশেষ আইন পাশ করলো। সুপ্রিম কোর্টের আইনকে নস্যাৎ করে নতুন আইন হলো—তালাক দিলে প্রাক্তন স্বামীকে কোনও খোরপোশ দিতে হবে না। সরকারের এই ভ্রষ্ট নীতির বিরুদ্ধে, সুবিধাবাদী নীতির বিরুদ্ধে, লিঙ্গ-বৈষম্য ও ধর্ম-বৈষম্যের বিরুদ্ধে, ধর্মনিরপেক্ষতার বিরোধী ভূমিকার বিরুদ্ধে কোনও রাজনৈতিক দলই প্রতিরোধ গড়ে তুলতে এগিয়ে এলো না। আশ্চর্য এই নীরবতার কারণ, মুসলিম পুরুষ সমাজকে তুষ্ট করার পুষ্ট নীতি।

এ দেশের রাজনৈতিক দলগুলোর ভোট কুড়োবার সুবিধাবাদী নীতি সংবিধানকে স্ববিরোধী চরিত্র দিয়েছে, আর নিজেদের চরিত্রহীন করেছে। আধুনিক তারুণ্যের প্রতীক ও প্রগতিশীল বলে পরিচিত রাজীব গান্ধি কি জানতেন যে, তিনি সঙ্গীর্ণ রাজনীতির স্বার্থে ভয়ঙ্কর অন্যায় ও অবিচার করলেন। তবু করলেন। আর তাই রাজীবের এই কাজ আরও বড় অন্যায় ও দ্বিচারিতার নিদর্শন হয়ে রইলো।

ঠগ বাহতে গাঁ উজাড়

ভারতের আইন অনুসারে উগ্র-ধর্মবাদী, সাম্প্রদায়িক, অধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক

দলের রেজিস্ট্রেশন বাতিল করার অধিকার নির্বাচন কমিশনের আছে। কিন্তু এই অভিযোগে কোনও দলের রেজিস্ট্রেশন বাতিল হয়নি আজ পর্যন্ত। একবার যদিও রাজনৈতিক দল শিবসেনার বিরুদ্ধে ‘উগ্রধর্মবাদী’ প্রচারের অভিযোগ উঠেছিল এবং সেই প্রেক্ষিতে নির্বাচন কমিশন শিবসেনার রেজিস্ট্রেশন বাতিলের হুমকি দিয়েছিল, কিন্তু শিবসেনার পাল্টা হুমকিতে সব ঠাণ্ডা মেরে যায়। শিবসেনা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিল—তাদের রেজিস্ট্রেশন বাতিল করলে ভারতের বড় মাপের প্রতিটি রাজনৈতিক দলের রেজিস্ট্রেশন একই অভিযোগে বাতিল করতে হবে।

আজ সব রাজনৈতিক দল বিজেপি-কে ‘অ-ধর্মনিরপেক্ষ’ বলে চিহ্নিত করে জনমানসকে সমাবেশিত করতে চাইছে। তারা কেন সাংবিধানিক আইনি অধিকার প্রয়োগ করে বিজেপির স্বীকৃতি খারিজ করতে উদ্যোগ নিচ্ছে না? বিজেপির বিরুদ্ধে তেমন আইনি লড়াইতে নামতে গেলে একই অপরাধে তাদেরও স্বীকৃতি খারিজ হতে পারে বলেই কি? আজ বামফ্রন্ট ও জনতা দল গলার শির ফুলিয়ে চেষ্টাচ্ছে বিজেপি ‘নন-সেকুলার’ দল। বামফ্রন্ট ও জনতা দল যখন বিজেপির সঙ্গে গাঁট-ছড়া বেঁধে বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং-এর নেতৃত্বে কেন্দ্রে ক্ষমতা দখল করেছিল, তখন কি বিজেপির চরিত্র অন্য রকম ছিল? ‘সেকুলার’ ছিল? নাকি গদিতে বসার তাড়নায় তখন বিজেপির মধ্যে ‘নন-সেকুলার’ গন্ধ খোঁজার তাগিদ তামাদি ছিল? এ-কথা বলার উদ্দেশ্য বিজেপিকে সমর্থন বা অসমর্থন নয়। উদ্দেশ্য, আমাদের দেশের সংসদীয় রাজনৈতিক দলগুলোর প্রকৃত স্বরূপ চেনানো, জনস্বার্থেই চেনানো।

মানুষ কিন্তু ধর্মবিশ্বাস নিয়ে জন্মায় না। সাংস্কৃতিক পরিবেশের প্রভাবে ধর্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠে। এটা একটা হয়ে ওঠার ব্যাপার। ধর্মীয় প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে নিজেকে ধর্মনিরপেক্ষ কল্পে গড়ে তোলার মধ্যেও থাকে একটা হয়ে ওঠার ব্যাপার। ‘ধর্মনিরপেক্ষতা’ একটা আদর্শ। ভোট-বাক্সের কথা ভেবে নানা ধর্মের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত রাখব, আবার ধর্মাসক্ততার বিরুদ্ধে বুলি কপচাব—এ হয় না। যা হয়, তা হল—প্রতারণা। দেশের জনগণের সঙ্গে প্রতারণা। দেশের প্রতি প্রতারণা।

বিজেপির মত ধর্মীয়-সাম্প্রদায়িক দলকে রাখতে কেন্দ্রে গড়ে ওঠা যুক্তফ্রন্টের নেতা নির্বাচিত হয়েই দেবগৌড়া দৌড়োলেন তিরুপতির মন্দিরে মাথা ঠেকাতে। একে কী বলব? ‘ধর্মনিরপেক্ষতা’? তা হলে ‘অ-ধর্মনিরপেক্ষতা’-র সংজ্ঞা কী হবে? দূরদর্শনে শত কিস্তি ‘রামায়ণ’ ‘মহাভারত’ হাজির করে সুপরিকল্পিতভাবে ধর্মীয় আবেগকে উসকে দিয়েছিল যে কংগ্রেস সরকার, তাকে ‘সেকুলার’ বলে চিহ্নিত করি কী করে? ১৯৪৯ সাল থেকে অযোধ্যার বিতর্কিত কাঠামোয় ঝুলছিল তালা। সে তালা খুলেছিল কংগ্রেস সরকার, হিন্দুমনে রাম-ভক্তির জোয়ার আনতে। এরপর কংগ্রেস সরকারকে ‘সেকুলার’ বলতে কতটা দুর্নীতির কাদা গায়ে মাখতে হয়? ‘রামায়ণ’ টিভি সিরিয়ালের রামের চরিত্রভিনেতাকে রাম সাজিয়ে ভোটের প্রচারে নামিয়েছিল যে কংগ্রেস, সেই কংগ্রেসকে ‘সেকুলার’ বলি কী করে?

বিতর্কিত বাবরি মসজিদ ধ্বংস করার জন্য ভারতীয় জনতা পার্টি'কে 'নন-সেকুলার' বলে চিহ্নিত করতে হলে, কংগ্রেসকেও বাবরি মসজিদ ধ্বংসের সহযোগিতার জন্য 'নন-সেকুলার' বলেই চিহ্নিত করতে হয়। কংগ্রেসী প্রধানমন্ত্রী নরসিমা রাও'এর 'নিষ্ক্রিয়তা' নামের সহযোগিতায় বিজেপি বাবরির এমন ধর্মীয় উন্মাদনা সৃষ্টি করতে পেরেছিল।

নরসিমা রাও তাঁর জমানায় কেন্দ্রে কংগ্রেসকে ক্ষমতায় রাখতে শিবসেনার কিছু সাংসদের সমর্থন আদায়ের খেলায় যখন মেতে ছিলেন। তখন কি শিবসেনা হঠাৎ করে 'সেকুলার' হয়ে উঠেছিল?

ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করার ক্ষেত্রে কেন্দ্রের যুক্তফ্রন্টের নেতৃত্বে থাকা জনতা দলের চরিত্র ছিল পুরোপুরি সাম্প্রদায়িক। জনতা দলের চেয়ারম্যান এন টি রামারাও রাম সেজে রথ সাজিয়ে দেশ পরিভ্রমণে বেরিয়ে ছিলেন। উদ্দেশ্য—হিন্দুদের আবেগে সুড়সুড়ি দিয়ে ভোট-বাক্স ভরানো। এন টি রামারাও থেকে যুক্তফ্রন্টের প্রধানমন্ত্রী দেবগৌড়া ধর্মকে সঙ্গী করে রাজনীতি করে গেছেন। এমনই অধর্মনিরপেক্ষ যুক্তফ্রন্টকে সরকার তৈরিতে সমর্থন যুগিয়েছিল পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট।

'সেকুলার' বামফ্রন্টের শাসনে পশ্চিমবাংলায় ফি-বছর কালীপূজো, দুর্গাপূজো, জগদ্ধাত্রীপূজোর রমরমা বেড়েছে কমরেড, ক্যাডার ও লিডারদের ব্যাপক অংশগ্রহণে। মার্কসবাদী মন্ত্রীদের স্নেহধন্যপূজায় মুম্বাই থেকে উড়ে আসছেন স্টার অভিনেতা-অভিনেত্রী। পূজো উল্লেখ্যে মার্কসবাদী মন্ত্রীরা হাজির থাকছেন ক্যাডার ও ভোটারদের মন পেতে। সি পি এম-এর দৈনিক মুখপত্র 'গণশক্তি'-তে 'মা নির্মলাদেবী'র টাউস বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় দিনের পর দিন। 'মা' নাকি সহজ যোগ' এর মাধ্যমে ঈশ্বর দর্শনের ব্যবস্থা করে দেন।

ভারত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। কিন্তু রাষ্ট্রনীতিকাররা তার প্রমাণ দিতে বারবার ব্যর্থ। গত কয়েক বছরে আমাদের দেখতে হয়েছে বিভিন্ন শিল্পী ও শিল্পীগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে মৌলবাদীদের হামলা। দীপা মেহেতার 'ওয়াটার' চলচ্চিত্র স্যাটিং পর্বেই হিন্দুত্ববাদীদের হামলায় কাজ বন্ধ হতে দেখেছি। 'গদর' চলচ্চিত্রের বিরুদ্ধে মুসলিম মৌলবাদীদের সিনেমা হলে আগুন লাগাতে দেখেছি। এই দুটি ক্ষেত্রেই কোনও ধর্মীয় বা সাম্প্রদায়িক বিপন্নতাবোধ ছিল না। ছিল ধর্ম নিয়ে রাজনীতি। ওয়াটার-এর ওপর হামলার বিরুদ্ধে আমরা পশ্চিমবাংলার বামবুদ্ধিজীবীদের মিটিং মিছিল করতে দেখেছি। 'গদর'-এর ওপর সংঘবদ্ধ গুণ্ডামীর বিরুদ্ধে বাম-বুদ্ধিজীবীদের নীরবতা তাঁদের নিরপেক্ষতা নিয়ে সন্দেহ তৈরি করেছে। আমাদের রাষ্ট্রনীতিকাররা, রাজনীতিকরা বারবার তাঁদের নিরপেক্ষতা, তাঁদের শুভবুদ্ধির পরিচয় দিতে ব্যর্থ। নাগরিকের বাক স্বাধীনতা ও সৃষ্টির স্বাধীনতাকে রক্ষা করতে অক্ষম। যুথবদ্ধ সংকীর্ণ ধর্মান্ধ মানুষ বলে, "ধর্মগ্রন্থ অপৌরুষেয়, ধর্মগুরুরা সমস্ত প্রশ্নের উর্ধ্বে। ঠিক কি

না?” ভোট ভিখারী রাজনীতিকরা মাথা নেড়ে বলেন, “ঠিক, ঠিক।” এই ট্রাডিশনই চলছে।

আমরা আর কতদিন ঠগ বাছবো? বাছতে বাছতে গাঁ উজার হয়ে যাবে না তো?

‘ধর্মনিরপেক্ষ’ শব্দের সংজ্ঞাকে বিকৃত করবেন না প্লিজ

সমস্ত ধর্মকে প্রয়োজনে তোলাই দিয়ে ভোট-বাক্সকে স্ফীত করার সুবিধাবাদী মানসিকতা থেকেই রাজনৈতিক দলগুলো সংবিধানে হাজির করা ‘সেকুলারিজম’-এর ব্যাখ্যা পালটে দিয়ে বিকৃত ব্যাখ্যা হাজির করতে সদা সচেষ্ট। বিতর্কিত বাবরি মসজিদ ভাঙার পর পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার হোর্ডিং-এ হোর্ডিং-এ বিজ্ঞাপন দিয়ে রাজ্যবাসীকে জানাতে সচেষ্ট হল—‘ধর্মনিরপেক্ষতা’ শব্দের অর্থ ‘সর্বধর্মের সমন্বয়’। ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি এই বিকৃত ও অবনমিত ব্যাখ্যার অগ্রগমন রোধ করে ‘ধর্মনিরপেক্ষতা’র সংজ্ঞার সঙ্গে জনসাধারণের পরিচয় ঘটিয়ে দিতে ব্যাপক প্রচারে নামল। প্রচারের গভীরতায় বুদ্ধিজীবী থেকে সাধারণ মানুষ এতটাই প্রভাবিত ও সমাবেশিত হলেন যে, রাজ্য সরকার বাধ্য হয়ে প্রতিটি হোর্ডিং-এ নতুন করে তিনটি শব্দ যুক্ত করলেন—‘আমরা মনে করি’। কারও উলটো-পালটা মনে করার গণতান্ত্রিক অধিকার আছে। রাজ্য সরকারেরও আছে। কিন্তু তাদের এই নতুন করে তিনটি শব্দের সংযুক্তি এ-কথাই প্রমাণ করল, এক : ‘ধর্মনিরপেক্ষতা’র সাংবিধানিক অর্থ ‘সর্বধর্মের সমন্বয়’ নয়। দুই : ‘সেকুলারিজম’-এর আন্তর্জাতিক ব্যাখ্যা বিকৃত করে, শব্দার্থে অবনমন ঘটিয়ে জনগণের সামনে হাজির করতে তারা সমান উৎসাহী। ধর্মের সঙ্গে নিজ-দলকে সংযুক্ত রাখার স্বার্থেই এই উৎসাহ। বর্তমান সমাজ কাঠামোর স্থিতিবাক্য বজায় রাখার স্বার্থেই এই উৎসাহ।

সংসদীয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণকারী অন্যান্য অ-প্রধান দল যথা—সমাজবাদী, অগপ, তেলুগু দেশম (নাইডু), তেলুগু দেশম (পার্বতি), ডি এম কে, এ আই এ ডি এম কে, সমতা, বহুজন সমাজ পার্টি, তৃণমূল কংগ্রেস, মানিলা কংগ্রেস, বিকাশ কংগ্রেস, তেওয়ারি কংগ্রেস, মুসলিম লিগ, অকালি ইত্যাদিদের তথাকথিত ‘সেকুলার’ চরিত্র, প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর চেয়ে কিছু ইতরবিশেষ নয়। এইসব দলের রাজনীতিকরা ভোটদাতাদের ধর্মীয় আবেগকে নিজের পক্ষে আনতে সংবিধানকে বলাৎকার করেন। প্রকাশ্যে বিভিন্ন ধর্মের গুরুদের আশীর্বাদ ভিক্ষা করেন ; পুজো উদ্বোধন করেন, জগন্নাথের রশিতে টান দেন, দরগায় সিল্লি চড়ান, গির্জায় মোম জ্বালেন, গুরুদ্বারে ভক্তিনিবেদন করেন। আর ‘সেকুলার’ রাষ্ট্রের প্রচারযন্ত্রগুলো বিলকুল বেপরোয়া। দিব্বি এসব প্রচার করে। রাষ্ট্রনায়করা দেওয়ালি, ঈদ, বড়দিন ইত্যাদি ধর্মীয় অনুষ্ঠানের প্রাক্কালে রাষ্ট্রীয় প্রচারযন্ত্র মারফত শুভেচ্ছা জানান। ইফতার পার্টিতে গিয়ে ধর্মবিশ্বাসীদের আবেগে একটু বিলি কেটে আসেন। ধর্মক্ষেত্রে এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোতে দান-টান করলে ট্যাক্সে

ছাড় পাওয়ার রাষ্ট্রীয় নীতি ঘোষিত হয়।

ভারতের প্রধান-অপ্রধান রাজনৈতিক দলগুলো বুঝে বসে আছে, আমজনতা সংবিধান নিয়ে মাথা ঘামায় না। বুদ্ধিজীবীরা না জেনে জানার ভান করে। অতএব ‘ধর্মনিরপেক্ষ’ শব্দের ব্যাখ্যা খুশি মত বিকৃত কর। আপন স্বার্থে ব্যবহার কর।

সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী : ধর্মনিরপেক্ষতার সংজ্ঞা

১৯ জানুয়ারি ১৯৯৩ দূরদর্শনের জাতীয় কার্যক্রমে ‘পরখ’ নামের অনুষ্ঠানে বিনোদ দুয়া ও সে সময়কার সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী বসন্ত শাঠের একটি আলোচনা প্রচারিত হয়েছিল। বিনোদ জানতে চেয়েছিলেন, ‘ধর্মনিরপেক্ষ’ শব্দের সাংবিধানিক ব্যাখ্যা। উত্তরে বসন্ত জানিয়েছিলেন—‘ধর্মনিরপেক্ষ’ শব্দের অর্থ হওয়া উচিত সমস্ত ধর্মের প্রতি সমান শ্রদ্ধা, সমস্ত ধর্মের সমন্বয়। বিনোদ বলেছিলেন, কি উচিত তা জানতে চাইছি না। জানতে চাইছি, সংবিধান এ বিষয়ে কী বলছে? এই প্রশ্নে আলোচনা করতে গিয়ে বসন্ত দু’টি কথা স্বীকার করলেন। এক : উনি যেটা হওয়া উচিত মনে করেছিলেন, সেটা সংবিধানের ব্যাখ্যা নয়। দুই : একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত সংগঠনের হাজির করা ‘ধর্মনিরপেক্ষ’র ব্যাখ্যা অতি সম্প্রতি বিপুলভাবে প্রচারিত হয়েছে এবং বহু বুদ্ধিজীবীদের কাছে অপ্রাণযোগ্যতা পেয়েছে। (এটা জানানো বোধহয় অ-প্রাসঙ্গিক হবে না, একটি ভ্রান্ত সংগঠনই ‘ধর্মনিরপেক্ষ’র ব্যাখ্যা নিয়ে হাজির হয়েছিল। সংগঠনটির নাম—ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি।) বসন্ত শাঠের সেদিনের আলোচনার মধ্যে দিয়েও একথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল, ‘ধর্মনিরপেক্ষ’ শব্দের সাংবিধানিক অর্থ সমস্ত ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন বা সর্বধর্মের সমন্বয় নয়।

রাষ্ট্রনীতি জনচেতনাকে প্রভাবিত করে। জনচেতনা রাষ্ট্রনীতিকে। রাষ্ট্র অধর্মনিরপেক্ষ হলে তারই প্রতিক্রিয়া স্বরূপ ‘মৌলবাদ’, অর্থাৎ ‘গভীর ধর্ম-বিশ্বাস’-এর উত্থান অনিবার্য। এই দুই সত্যকে মাথায় রাখলে বুঝতে অসুবিধে হয় না,

মৌলবাদ রোখার স্বার্থে

রাষ্ট্রনীতিকে ‘ধর্মনিরপেক্ষ’ করে তোলাটা যেমন জরুরি,

তেমনই জরুরি রাষ্ট্রকে ধর্মনিরপেক্ষতার পথে চলতে

বাধ্য করতে ‘ধর্মনিরপেক্ষ’ শব্দের প্রকৃত সংজ্ঞার

সঙ্গে জনগণকে পরিচিত করানো।

জন-চেতনাই পারে অসং রাজনীতিকদের ‘ধর্মনিরপেক্ষতা’র নামে চালিয়ে যাওয়া বিকৃত ও নোংরা খেলা বন্ধ করতে।

ধর্মনিরপেক্ষতা যখন 'সুবিধাবাদ'-এর আর এক নাম

১৯৯৬-এর নির্বাচনের পর রাষ্ট্রীয় মোর্চা, বাম মোর্চা ও কিছু আঞ্চলিক দল মিলে 'যুক্তফ্রন্ট' তৈরি করে কেন্দ্রের গদিতে বসল। আমরা প্রচার-মাধ্যমগুলোর দৌলতে জানলাম—'যুক্তফ্রন্ট' ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলোর 'ফ্রন্ট'। বিজেপি-শিবসেনা জোটের মত 'অ-ধর্মনিরপেক্ষ' শক্তিকে ঠেকাতে 'ধর্মনিরপেক্ষ' শক্তির 'ফ্রন্ট'। প্রিয় পাঠক পাঠিকা, যুক্তফ্রন্ট গড়ে ওঠার আগের কয়েকটা দিনের দিকে একটু ফিরে তাকাই আসুন। সে-সময় যুক্তফ্রন্টের অন্তর্ভুক্ত বেশ কয়েকটি আঞ্চলিক দল একই সঙ্গে রাষ্ট্রীয় মোর্চা, বামমোর্চা জোটের সঙ্গে এবং বিজেপি-শিবসেনা জোটের সঙ্গে কেন্দ্রে সরকার গঠনে সমর্থনের প্রস্তাবে দরকষাকষি চালিয়ে গেছে। ব্যক্তিগত ও দলীয় লাভের চুলচেরা বিচার করে তবেই রাষ্ট্রীয়-বাম মোর্চার সঙ্গে মিলিত হয়ে যুক্তফ্রন্ট গঠন করেছে। ফলে যুক্তফ্রন্ট সরকার বাস্তবিকই অ-ধর্মনিরপেক্ষ শক্তিকে ঠেকাতে ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক দলগুলোর একটা জোট, না একটা সুবিধাবাদী সমঝোতা মাত্র, তা স্পষ্ট করে বুঝে নেওয়াটা জরুরি হয়ে পড়েছে। বুঝে নেওয়া দরকার, যুক্তফ্রন্টের অন্তর্ভুক্ত দলগুলো কতটা 'ধর্মনিরপেক্ষ'।

কংগ্রেস এ আই সি সি-র মুখপাত্র বি এন গ্যাডগিল ৪ জুন '৯৬ দিল্লিতে সাংবাদিকদের সামনে ঘোষণা করেছেন, 'কংগ্রেস চায় দেশের রাজনৈতিক দলগুলো ধর্মের সঙ্গে সমস্ত রকম সম্পর্ক বর্জন করে দিশিকে প্রকৃত অর্থে ধর্মনিরপেক্ষ হিসেবে গড়ে তুলুক।' শ্রীগ্যাডগিল তার সঙ্গে এও ঘোষণা করেছেন, 'ধর্মীয় মৌলবাদের মত, জাতপাতের মৌলবাদ ধর্মনিরপেক্ষতার পক্ষে ভয়াবহ'। কংগ্রেসের এ-সব কথা 'ছেলেভুলানো' নাকি 'আন্তরিক, তা বুঝে নেওয়ার সময় উপস্থিত। বিজেপিও দাবি করেছে, 'ধর্মনিরপেক্ষ' সংজ্ঞা নিয়ে দেশ জুড়ে বিতর্ক শুরু হোক। মেকি 'ধর্মনিরপেক্ষ'দের স্বরূপ চেনার স্বার্থেও এই বিতর্ক জরুরী'।

জরুরী, এ'নিয়ে কোনও দ্বিধা
নেই। আপনি-আমি-আমরা চাই 'ধর্মনিরপেক্ষ' শব্দের
আন্তর্জাতিক সংজ্ঞার সঙ্গে এ'দেশের
মানুষ পরিচিত হোন।

কথায় কাজে এক হলোই মুশকিল আসান

কথায় আর কাজে এক হওয়া একটা অভ্যেসের ব্যাপার। সততার অভ্যেস। ভগুমীটাও একটা অভ্যেস। নিজের তাৎক্ষণিক স্বার্থের জন্য লোক-ঠকানোর অভ্যেস। এই বদ-অভ্যেসটাই গদী-লোভী রাজনৈতিক দলগুলোকে পেয়ে বসেছে।

ভারতকে খাঁটি ধর্মনিরপেক্ষ করার প্রতিজ্ঞা না করে কোনও রাজনৈতিক মুখে অ্যাগো বলেন না। এটা রাজনৈতিকদের ভণ্ডামী। যেসব রাজনৈতিক দল নির্বাচনের মশা দিয়ে ক্ষমতায় কিছুটা হলেও পৌঁছোতে চায়, যেন-তেন-প্রকারে ভোটারদের খুশি করাই তাদের লক্ষ্য। ভারতের বেশিরভাগ মানুষই শিক্ষায় ও মননে অনেক পিছিয়ে। আজও তারা প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের দ্বারা আবিষ্ট। এই ভোটারদের আবেগে অখ্যাত করে নিজের পায়ে কুড়ুল মারতে রাজি নয় কোনও রাজনৈতিক দল। আবার অ্যাগো এক মুশকিল হলো ‘ধর্মনিরপেক্ষ’ শব্দটি প্রগতিশীল শব্দ হিসেবে বহু সাধারণ মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। রাজনৈতিক দলগুলো তাই ভোটের স্বার্থে একই সঙ্গে ধর্মও আছে, আবার ধর্মনিরপেক্ষতাতেও আছে। নিজেদের স্ববিরোধিতা, ভণ্ডামীকে আড়াল করতে ‘ধর্মনিরপেক্ষ’ শব্দের অবনমন ঘটিয়েছে, বিকৃতি ঘটিয়েছে।

ধর্মনিরপেক্ষতা নিয়ে জনচেতনাই পারে রাজনৈতিকদের ভণ্ডামীর মুখোশ ছিঁড়ে ফেলতে। জনচেতনাই পারে পার্টিগুলোকে মেরুকরণে বাধ্য করতে। মেরুকরণ—ধর্মবাদী ও ধর্মনিরপেক্ষ শক্তির।

ধর্মনিরপেক্ষতাকে ভারতের সংবিধানে দু-মলাটের মধ্যে বন্দি অবস্থা থেকে মুক্ত করার একটাই রাস্তা—প্রয়োগ। কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারকে ধর্মনিরপেক্ষতার যথাযথ প্রয়োগ করতে হবে। এই প্রয়োগের সঙ্গে জনসমর্থন যুক্ত করতে সমস্ত মিডিয়াকে কাজে লাগিয়ে লাগাতার প্রচার চালাতে হবে। এই প্রচার হলো, সচেতন করার অর্থাৎ ‘অ্যাওয়ারেনেস’ বাড়ানোর প্রচার। প্রচারের মূল সূর হবে, ভারতীয় সংবিধানের ‘ধর্মনিরপেক্ষ’ (secular) শব্দের অর্থ তুলে ধরা। বোঝাতে হবে—সংবিধানকে মর্যাদা দিতে হলে ভারতকে ধর্মের ক্ষেত্রে থাকতে হবে নিরপেক্ষ, বিযুক্ত। রাষ্ট্রনীতি, রাজনীতি ও শিক্ষানীতি ধর্মীয় অনুপ্রবেশ থেকে মুক্ত থাকবে। একজন ফুটবলের রেফারি যেমন নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে গেলে কখনও কোনও দলকে টেনে খেলা পরিচালনা করতে পারেন না। তাকে হতে হয় দু-দল থেকেই মুক্ত, বিযুক্ত। সেই সঙ্গে ভারতকে ধর্মনিরপেক্ষ দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য আবশ্যিক ও প্রাথমিক কিছু শর্ত পালন করতে হবে।

আবশ্যিক ও প্রাথমিক শর্ত হল : (১) প্রকল্পের শিলান্যাস, উদ্বোধন-সহ সমস্ত একম রাষ্ট্রীয় কার্য-কলাপে পূজো বা অন্য কোন প্রকার ধর্মীয় আচার পালন এবং ধর্মীয় অনুপ্রবেশ বন্ধ করতে হবে। (২) শিক্ষায়তনগুলোতে ধর্মীয় প্রার্থনা ও পূজো বেআইনি ঘোষণা করতে হবে। (৩) শিক্ষাক্ষেত্রের পাঠ্যক্রমে ঈশ্বরতত্ত্ব আধ্যাত্মবাদ ও প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মীয়-বিশ্বাস ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে হবে। পাঠ্যপুস্তকে ধর্ম থাকতে পারে, শুধু ইতিহাস জানার প্রয়োজনে, ইতিহাসের পাতায়। ধর্মগুরু ও তথাকথিত অবতারদের জীবনীকে পাঠ্যভুক্ত করা চলবে না। (৪) ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও কার্যকলাপে রাষ্ট্রনায়ক, বিধায়ক, রাজনৈতিক-নেতা-সহ সরকারি

আমলাদের যেকোনও রকম অংশগ্রহণ, সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতা নিষিদ্ধ করতে হবে। (৫) কোনও রাষ্ট্রনায়ক, সাংসদ, বিধায়ক বা রাজনৈতিক-নেতা ধর্মীয় কার্যকলাপে সহযোগিতা বা পৃষ্ঠপোষকতা করলে অথবা প্রকাশ্যে ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশ নিলে অংশগ্রহণকারীকে রাষ্ট্রনায়ক বা সাংসদ বা বিধায়ক হিসেবে ধরে রাখা প্রতিটি পদ থেকেই বহিষ্কার করতে হবে। (৬) সরকারি প্রচার-মাধ্যমে ধর্মীয় প্রচারকে নিষিদ্ধ করতে হবে। (৭) কোনও আবেদন পত্রে আবেদনকারীর ‘ধর্ম’ জানতে চাওয়া চলবে না। (৮) সাংসদ, বিধায়ক অথবা মন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে শপথ নেবেন ‘সত্য’-এর নামে। ‘ঈশ্বর’ ইত্যাদির নামে নয়। (৯) আদালতে ধর্মগ্রন্থ ছুঁয়ে শপথ গ্রহণ বাতিল করতে হবে। (১০) সংবিধান হবে আবশ্যিকভাবে ধর্মীয় বিধান ও অনুশাসনের উর্ধ্বে। (১১) কোন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে দান করা অর্থকে ‘করমুক্ত’ করার সরকারি নীতি বাতিল করতে হবে। (১২) কোন পূজো বা ধর্মীয় অনুষ্ঠান উপলক্ষে রাষ্ট্রনায়কেরা—যখন জনগণের উদ্দেশ্যে শুভেচ্ছা জানান, তখন রাষ্ট্রনায়কদের পৃষ্ঠপোষকতার রাষ্ট্রনীতি আর ধর্মনিরপেক্ষ থাকে না। ধর্মনিরপেক্ষতার স্বার্থে ধর্মীয় অনুষ্ঠান উপলক্ষে শুভেচ্ছা জানাবার এই প্রচলিত সরকারি নীতি বাতিল করতে হবে। (১৩) কোন ধর্মের তীর্থযাত্রীদের যাত্রা খরচে সরকারি অনুদান বা ভরতুকি দেওয়া স্পষ্টতই ধর্মীয় ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় সহযোগিতা এবং পৃষ্ঠপোষকতা। রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র বজায় রাখতে হলে ‘হজ’-সহ যে কোন তীর্থযাত্রীদের যাত্রা খরচে সরকারি অনুদান বা ভরতুকি দেওয়ার প্রথা বাতিল করতে হবে। (১৪) সরকারি তহবিল থেকে কোন ধর্মগুরুর মাইনে দেওয়া চলবে না। ইমামদের সরকারি তহবিল থেকে মাইনে দেওয়ার যে প্রথা এ-দেশের কিছু প্রদেশে চালু আছে, তা বাতিল করতে হবে। (১৫) রাষ্ট্রীয় নেতাদের মৃত্যুকে উপলক্ষ করে ধর্মগ্রন্থ-পাঠ ও সরকারি প্রচার-মাধ্যম দ্বারা তা প্রচারের যে প্রথা রাষ্ট্র চালু রেখেছে, রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষতা বজায় রাখার স্বার্থে সেই প্রথা বাতিল করতে হবে। (১৬) আমাদের দেশের সংবিধানের মূল নীতিকে বজায় রাখতে হলে রাষ্ট্রের ‘ধর্মনিরপেক্ষ’ চরিত্রকে বজায় রাখতেই হবে।

এই অবস্থায় ধর্মনিরপেক্ষতার পরিপন্থী প্রতিটি আইনকে বাতিল করতেই হবে।

ধর্মনিরপেক্ষতার পক্ষে সোচ্চার রাজনৈতিক দলগুলো কি পারবে ধর্মনিরপেক্ষতার প্রশ্নে আবশ্যিক ও প্রাথমিক শর্তগুলোকে পূরণ করতে? শর্ত পূরণ করা খুবই সোজা। ভোটবাক্সের কথা চিন্তা না করে রাষ্ট্রীয় নীতিকে ধর্মনিরপেক্ষ করতে আন্তরিক হলে, খুব সোজা। ধর্মে বিশ্বাসী ভোটারদের সন্তুষ্টি সাধনের বিভিন্ন কূটকৌশল মাথায় প্রবলভাবে থাকলে, খুব কঠিন।

মানুষের ইতিহাস ঘুরে-ফিরে প্রগতির ইতিহাস

মানব প্রজাতির ইতিহাস

খুললে দেখবো প্রস্তর যুগ থেকে একবিংশ
শতাব্দী পর্যন্ত এগিয়ে যাওয়ার ইতিহাস। ইতিহাসের
কাঁটা উল্টো দিকে ঘোরাবার
ব্যর্থ চেষ্টা হয়েছে বারবার।

এ সময়ে এ দেশের সমাজে জমে থাকা ধুলো আর কালিবুলি ধোঁয়া, সাময়িক।
'সাময়িক' বলে বসে থাকলে 'সাময়িক' সময় দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর ছায়া ফেলে যাবে।
ধুলো, ধোঁয়া সাফ করতে ধর্মনিরপেক্ষতার প্রশ্নে রাষ্ট্র, সরকার ও রাজনৈতিক
দলগুলোর বর্তমান অবস্থান বুঝে নেওয়াটা আমাদের প্রত্যেকের জরুরী। 'আমার
পার্টির সমালোচনা শুনবো না, মানবো না'—এমন পূর্বশর্ত আরোপ করলে আর যাই
হোক, মুক্ত চিন্তা করা যায় না, যুক্তিপূরণ হওয়া যায় না। পূর্বশর্ত ও পার্টির
লক্ষণগণ্ডী ভেঙে বেরিয়ে আসতেই হবে, বাস্তবে ভারতকে 'সেকুলার' করে তুলতে
চাইলে। আপনার-আমার-আমাদের সক্রিয় জনচেতনাই পারে ভারতকে প্রকৃত অর্থে
'সেকুলার' করে তুলতে।

আবারও বলি—ইতিহাস আমাদের বারবার শিক্ষা দিয়েছে। সমাবেশিত
জনচেতনার সক্রিয় আন্তরিক অংশগ্রহণই পার্টির সংঘর্ষ ও নির্মাণে পুরনো সমাজ
কাঠামো ভেঙে নতুন সমাজ গড়ে তুলতে। এই শিক্ষাই আমাদের প্রেরণা। নতুন
ইতিহাস গড়ার প্রেরণা।

স্বপ্ন ভঙ্গ হয়েছে অনেকবার। প্রতিটি ব্যর্থতাই আমাদের নতুন অভিজ্ঞতা দিয়েছে,
নতুন কিছু শিখিয়েছে। আগের ব্যর্থতা কোনওভাবেই মূল্যহীন হয়ে যায়নি।
রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলি

“ও তুই বারে বারে জ্বালবি বাতি
হয়তো বাতি জ্বলবে না,
তা বলে ভাবনা করা চলবে না।”

এ'কথা ঐতিহাসিকভাবে সত্য যে ভারতীয় উপমহাদেশে গত দশকে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের ও ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার আগ্রাসন বিশাল ব্যাপকতা পেয়েছে। সমাজবিজ্ঞানের ছাত্র হিসেবে আমরা জেনেছি— ইতিহাসের অনিবার্য গতি বিশ্বাসের বিপরীতে যুক্তির অভিমুখে। তার সঙ্গে এও জেনেছি, সত্য ততটাই এগোয়, যতটা আমরা এগিয়ে নিয়ে যাই। এই ধর্মযুদ্ধে, চিন্তাযুদ্ধে সত্যকে প্রতিষ্ঠা করতে হলে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম, 'ধর্মীয়' সাম্প্রদায়িকতা, 'ধর্মের' সঙ্গে রাষ্ট্রের প্রকাশ্য ও প্রচ্ছন্ন সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়ে বিভিন্ন চিন্তাবিদদের সমগ্র অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণের সঙ্গে উপমহাদেশবাসীদের পরিচয় ঘটিয়ে দেবার প্রয়াস অত্যন্ত জরুরী। এই ধর্মযুদ্ধে, চিন্তাযুদ্ধে আমাদের সেনানী দুই বাংলার পঁচিশজন চিন্তাবিদ, সমাজ সচেতন, যুক্তিমনস্ক লেখক বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে 'ধর্ম'কে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন।

লেখক সূচি : অহমদ শরীফ, কবীর চৌধুরী, বদরুদ্দীন উমর, হায়াৎ মামুদ, আনিসুজ্জামান, বেবী ইসলাম, বুলবন ওসমান, নূরুর রহমান, সৈকত চৌধুরী, ওয়াহিদ রেজা, সুকুমারী ভট্টাচার্য, পবিত্র সরকার, জয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবনারায়ণ রায়, ড. তারকমোহন দাস, পল্লব সেনগুপ্ত, জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়, গৌতম রায়, রাধারমণ চক্রবর্তী, অসিত চক্রবর্তী, সমীরণ মজুমদার, কৃষ্ণ বসু, দেবু দত্তগুপ্ত, সুমিত্রা পদ্মনাভন এবং প্রবীর ঘোষ।